ভূদানের কথা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দাক্ষিণাত্যে এক প্রার্থনাসভার শেষে গ্রামের দরিদ্রেরা আচার্য বিনোবার কাছে নিবেদন ক'রল তাদের দুঃখের কাহিনী। ওরা বড গরীব, একবেলাও ওদের আহার জোটে না। বিনোবা জিজ্ঞাসা করলেন, কি করলে তাদের অন্নের অভাব দূর হ'তে পারে? ওরা ব'লল, চাষের জমি পেলে ওদের দুঃখের অবসান হয়।

চকিতে বিনোবার মানসপটে এই বিপুল সত্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। আকাশ জল বাতাস আলোর মতো জমিও তাঁরই, যিনি এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, যা ঈশ্বরের তাতে সমস্ত মানুষেরই সমান অধিকার—কেননা তিনি আমাদের সকলেরই পিতা এবং আমরা সবাই তাঁর সন্তান। পিতৃধনে সমান অধিকার সকলেরই।

ভূমিহীনদের জন্য জমি চাইবার মতো তিনি জোর পেলেন মনের মধ্যে। হৃদয়ের মাঝে দৈববাণীর মতো শুনতে পেলেন তিনি, ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমির সমবণ্টন ব্যতীত তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি নেই, আর চাষীরাই তো সমাজের মেরুদণ্ড। তাদেরই উদয়াস্ত পরিশ্রমের উপরে সমাজের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে তাদের মঙ্গল নেই সেখানে সমাজের মঙ্গল নেই।

প্রার্থনা-সভায় বিনোবা ভূমিহীনদের জন্যে জমি চাইলেন। নিমেষে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। রেড্ডী নামে জনৈক ভদ্রলোক নিজের সম্পত্তি থেকে প্রচুর জমি দিয়ে দিলেন!

আচার্য বিনোবার চোখের সামনে একটা নূতনতর জগতের তোরণদ্বার খুলে গেল। মানুষের মধ্যে কেবল আত্মকেন্দ্রিক অসুর সত্য নয়, তার মধ্যে দেবতাও সত্য। মানুষ কি কেবল ধূলামাটিরই মানুষ? নক্ষত্রখচিত আকাশের নির্মল ঔদাস্যও তো তারই মধ্যে। মানুষের মধ্যে রয়েছে মানুষকে ভালবাসার কি অপরিসীম ক্ষমতা। সেই ভালবাসার ঐশী প্রেরণায় বিষয়সম্পত্তি তো তুচ্ছ—জীবন পর্যন্ত সে অনায়াসে বলি দিতে পারে। এতকাল ধ'রে লোকে ভেবে এ'সছে, শুধু রক্তাক্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়েই শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। রেড্ডীর মহানুভবতা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার নূতনতম পথের সন্ধান দিল। মানুষের মর্মের মধ্যে প্রেমের যে-দেবতা ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগ্রত করতে পারলে সমাজ-জীবনের দিগন্তে আসবে নবজীবনের আলো-ঝলমল প্রভাত, দূর হয়ে যাবে সর্বপ্রকারের ভেদ-বুদ্ধি, পৃথিবীতে নেমে আসবে সাম্যের স্বর্গ।

নতুন প্রভাতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে সকল-ডোবানো প্রেমের প্রেরণায় আচার্য বিনোবা শুরু করলেন দিগ্বিজয়ের অভিযান। এ অভিযানের হাতিয়ার ঢাল-তলোয়ার নয়, গোলাগুলিও নয়, হাতিয়ার—জ্ঞান আর প্রেম, লক্ষ্য—সর্বোদয় অর্থাৎ জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতের দরিদ্রতম, অধমতম মানুষেরও মুক্তি। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, অজ্ঞতা থেকে মুক্তি, দুর্বলতা থেকে মুক্তি। গান্ধীজীর আন্দোলন এদেশের জনসাধারণকে পৌঁছে দিয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মন্দির-দ্বারে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপনীত হবার আসল চাবি-কাঠিটি হ'ল আর্থিক সমতা। জাতির ধন-সম্পদের চৌদ্দআনা অংশ যদি মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে থাকে এবং কোটি কোটি

নিরন্ন মানুষ যদি ক্ষুধার যাতনায় অসহ্য কষ্ট পায় তবে স্বাধীনতাকে একটা প্রহসন ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? গান্ধীজী তাই জীবদ্দশায় জলদমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করেছিলেন: স্বাধীন ভারতে নয়াদিল্লীর আকাশচুম্বী সৌধরাজির পাশে শ্রমিকদের নোংরা বস্তীগুলির অস্তিত্বকে একদিনের জন্যেও সহ্য করা উচিত নয়।

স্বাধীনতার অমৃতকে সর্বসাধারণের কাছে সত্য ক'রে তুলবার জন্যে অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সার্থক করবার জন্যে প্রয়োজন ছিল আর এক নতুন মানুষের, যিনি আসমুদ্রহিমাচল ডুবিয়ে দেবেন এক নতুন চিন্তাধারার মহাপ্লাবনে।

প্রত্যেক যুগেরই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট একটি বিশেষ দায় আছে। আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর দায় হচ্ছে যারা সবার পিছে, সবার নীচে, যারা সর্বহারা তাদের পাতালপুরীর অন্ধকার থেকে উপরের আলোতে টেনে তোলা।

এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দিকে প্রথম অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন যুগাবতার পরমহংসদেব, যাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'ল, খালি পেটে ধর্ম হয় না। ঠাকুর চলে গেলেন বিবেকানন্দের কানে মানবসেবার মহামন্ত্র দিয়ে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত মুক্তির ধারণা সরিয়ে ফেলে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার আদর্শ স্থাপন ক'রে গেলেন। নব্য ভারতের কানে শোনালেন কর্মযোগের গায়ত্রীমন্ত্র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পর রবীন্দ্রনাথের রুদ্রবাণীতেও বেজে উঠল তার প্রতিধ্বনি:

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝ'রে।

বিবেকানন্দ দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মাহুতি দেবার তূর্যনাদে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতবাসীর ঘুম ভাঙিয়ে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করলেন। তাঁর জনসেবার ধ্বজা তুলে নিলেন মহামানব গান্ধী। দরিদ্রনারায়ণের মুক্তির পথে প্রবলতম অন্তরায় বিদেশী-শাসনের অভিশাপ। এই অন্তরায়কে দূর করবার জন্যে তিনি নিয়ে এলেন দিগন্তপ্রসারী গণবিপ্লবের বন্যা। নবতর ভাববন্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সফলতার পথে কিছু দূর আগিয়ে দিয়ে গান্ধীজী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। নিভৃত তপস্যার অজ্ঞাতবাসের নেপথ্য থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য বিনোবা ভাবে কালপুরুষের নির্দেশকে শিরোধার্য ক'রে। কণ্ঠে ভূদানের উদাত্ত আহ্বান।

সমাজের বিপুল প্রয়োজনে ভূদান-আন্দোলনের উদ্ভব। ভারতের শতকরা পঁচাশি জন লোকের বসতি গ্রামাঞ্চলে, শহরে নয়। গ্রামের উন্নতিতেই তাই ভারতবর্ষের উন্নতি। গ্রামের অন্নদাতা কৃষককে পিছনে ফেলে যাকিছু আমরা গড়তে যাব তা হবে বালুচরে ইমারত গড়বার চেষ্টার মতোই পণ্ডশ্রম। তাই গান্ধীজীর কাছে স্বরাজ ছিল গ্রামরাজ। গ্রামরাজের স্বপ্নকে বাস্তবে সত্য ক'রে তুলবার জন্যে বিনোবা শুরু করলেন ভূদান আন্দোলন।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মর্মের মধ্যে অনুভব না করলে কোন মানুষ কি রৌদ্রবৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে এমনভাবে সারা ভারতবর্ষ পদব্রজে পরিক্রমা করতে পারে? একদিন নয়, দুইদিন নয়, এক

মাস নয়, দুই মাসও নয়। বছরের পর বছর চলেছে এই পরিক্রমা। এর মধ্যে ক্লান্তি নেই, নৈরাশ্য নেই, বিরক্তি নেই।

বিনোবার এ আন্দোলনকে আমাদের বুঝবার প্রয়োজন আছে। লক্ষ লক্ষ ভূমিহীনের জন্যে ভূমির ব্যবস্থা আমরা যদি না করতে পারি লাখো লাখো বঞ্চিতের চিত্তক্ষোভ থেকে জন্ম নেবে রক্তাক্ত বিপ্লব, ভারত পরিণত হবে কুরুক্ষেত্রে, ইতিহাসে এ-রকম দক্ষযজ্ঞের নজির আছে ভূরি ভূরি।

ভূদান আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে একটা বৈপ্লবিক চিন্তার সৃজনী শক্তি। যারা বিলাস-স্রোতে সন্তরণ করছে, মাটির স্পর্শকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছে তারা হয়ে থাকবে জমির মালিক, আর যারা কৃষিকাজে অভিজ্ঞ এবং চাষ যাদের চিরদিনের পেশা তারা হয়ে থাকবে ভূমিহীন—এর মতো তামাসা জগতে আর কি থাকতে পারে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি যারা নিজেদের দখলে রেখেছে আর সবাইকে বঞ্চনা ক'রে, তাদের এ পাপ অপরাধ ব'লেই গণ্য হয় না বর্তমান সমাজে। বিনোবাজীর সংগ্রাম এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যাকে আমরা এতদিন অন্যায় বলে অনুভব করিনি—ঈশ্বরের দান সেই ভূমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক'রে রাখা একটা গুরুতর সামাজিক অপরাধ—এই নূতনতর সমাজ-চেতনা আমাদের মধ্যে তিনি জাগ্রত করতে চাইছেন। তাঁর সাধনা ফলবতী হ'লে বর্তমান সমাজের জীর্ণ কাঠামো ভেঙে যাবে, গড়ে উঠবে নূতনতর সমাজ, যেখানে সবাই হবে সুখী।*

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে।

মা

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

মাঝে মাঝে মনে পড়ে শৈশবের রাত।
শুয়েছি মায়ের কাছে, দুটি শাদা হাত,
আমার শিথান ঘিরে নিঃশব্দে লুটায়।
অন্ধকারে ভীরু চোখে ঘুম ভেঙে যায়,
অমনি মায়ের ছোঁয়া, 'খোকা, ভয় নেই,
আমি আছি।'
'আমি আছি'—শুনে নিমেষেই
মায়ের বুকের তলে মুখ গুঁজে থাকি,
অশেষ সান্ত্বনা নিয়ে প্রাণ ভরে রাখি।

আজো দেখি মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়,
জেগে থেকে তন্দ্রাহারা মহাশূন্যতায়
সমস্ত হৃদয় যেন কান পেতে থাকে,
অমনি আপন কণ্ঠে যদি কেউ ডাকে!
যদি ওই অন্ধকারে বেজে ওঠে সুর,
সকল সংশয়-শেষে একান্ত মধুর
অভয় মঙ্গলধ্বনি: 'আছি, আমি আছি',
তবে এই ধরণীতে সত্য ক'রে বাঁচি।
খোকা চায় মাকে,
যে খোকা একেলা-জাগা হৃদয়েতে থাকে।

ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার দাস

[সংক্ষিপ্ত জীবনী : বেনেদেত্তো ক্রোচে ১৮৬৬খৃঃ ইটালীর একুইলা প্রদেশে এক বর্দ্ধিষ্ণু ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পর তিনি নাস্তিক হইয়া যান। বেনেদেত্তো জীবনের ও ধর্মের সকল দিক অধ্যয়ন করিতে চান। বিশেষতঃ ধর্মের দর্শন ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে মানুষ কিভাবে বিভিন্ন প্রকার ধর্মবিশ্বাস পোষণ করে—এই সব অধ্যয়ন করিয়া ধর্মসম্বন্ধে এক প্রকার উন্নত ধরনের বিশ্বাস ফিরিয়া পান।

১৮৮৩ খৃঃ ভূমিকম্পে তিনি তাঁহার পিতা মাতা ও একমাত্র ভগিনীকে হারান, তিনি নিজেও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃতকল্প হইয়া ছিলেন, সারিয়া উঠিতে কয়েক বৎসর লাগে। তাঁহার হাড় ভাঙিয়াছিল, কিন্তু মন ভাঙে নাই। আরোগ্যলাভের সময়কার শান্ত অবসর তাঁহার মনে গভীর অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ আনিয়া দেয়, এবং দৈব দুর্বিপাকের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া তিনি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন, আজ তাঁহার গ্রন্থাগার ইটালীর অন্যতম সুন্দর লাইব্রেরী।

সারা জীবন তিনি ছিলেন ছাত্র, এবং ভালবাসিতেন অবসর ও অধ্যয়ন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে রাজনীতিতেও যোগ দিতে হইয়াছে, শিক্ষামন্ত্রীরূপে তিনি সেনেটের স্থায়ী সভ্য ছিলেন, তবে কখনই রাজনীতিকে গভীরভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সময় কাটিত আন্তর্জাতিক সমালোচনামূলক পত্রিকা 'লা ক্রিটিকা' সম্পাদন করিয়া।

অর্থনীতির জন্য ১৯১৪ খৃঃ মহাযুদ্ধকে ইউরোপের আত্মহত্যার প্রচেষ্টা—বলায় তিনি জনপ্রিয়তা হারান, পরে অবশ্য ইটালী তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছে এবং দেশবাসী তাঁহাকে নিরপেক্ষ দার্শনিক, বন্ধু ও পথের দিশারী বলিয়া মনে করে। ক্রোচের দর্শন বর্তমান চিন্তার অভিযানে এক অতি উচ্চ সীমা স্পর্শ করিয়াছে। উঃ সঃ]

যে সমস্ত উপাদান বা যে পরিবেশ চারুশিল্প সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল তা ইতালীর মতো আর কোথাও নেই। তাই সেখানে দার্শনিকের চেয়ে শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছেন অনেক বেশী। একুইনাস (Aquinas), ভিকো (Vico), রসমিনি (Rosmini) ও ক্রোচে (Croce) ছাড়া নামকরা দার্শনিক ইতালীতে নেই বললেই চলে, কিন্তু সেখানকার শিল্পীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করলে তুলনায় তা অনেক বেশী স্ফীত হয়ে উঠবে। যে ইতালীতে মাইকেল এঞ্জেলো (Michael Angelo) ও লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি (Leonardo Da Vinci)র মতো শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশে ক্রোচের মতো দার্শনিকের আবির্ভাব তাই নিতান্তই বিস্ময়াবহ বলে মনে হয়। মাইকেল এঞ্জেলো এবং লিওনার্ডো Concrete (বস্তুঘন) রসমূর্তির উপাসনা করেছেন—লৌকিক উপাদানের মধ্যে লোকোত্তরকে প্রকাশ করেছেন, আর ক্রোচে মননশক্তি-বহির্ভূত বাহ্য উপাদান শিল্প-সৃষ্টির আধার নয়—বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, ধরে নিয়েছেন আর্টের প্রকাশ কেবল স্বজ্ঞায় (intuition) সম্ভব। ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে একথা আরও স্পষ্ট হবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর শিল্পদর্শন-সম্বন্ধীয় মতবাদ বহু প্রতিভাশালী শিল্পীকে এমন ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল যে ক্রোচের মতবাদ যেখানে অভ্রান্ত সত্য সেখানে তাঁরা তাঁকে বর্জন করেছেন, আর যেখানে যুক্তিধর্মবিরোধী সেখানে তাঁকে মেনে নিয়েছেন। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ক্রোচের রচনায় জার্মান দার্শনিক-দের দুর্বোধ্যতা ও বের্গস (Bergson)র নিগূঢ়তা (mysticism)—এই উভয়বিধ গুণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ক্রোচে সত্তার (reality) বাহ্য ও আন্তর—এ দ্বৈত রূপ স্বীকার করেন না। তাঁর বিশ্বাস মননশক্তি-বহির্ভূত কোন বাহ্য অভি-

ব্যক্তি থাকতে পারে না। অবশ্য মননশক্তি স্বপ্রয়োজনে বাহ্য বস্তুকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পেতে পারে। জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে তাতে দু'রকমের উপাদান আছে—স্বজ্ঞা (intuition) ও ন্যায়চিন্তন (logic); বাইরের উপাদান কল্পনার সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের পথে মনে প্রবেশ করে, অথবা বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের সাহায্যে বাহ্য উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়।

রৌদ্রের তাপে যে মাথা গরম হয়, এ জ্ঞানের উপাদান রৌদ্র এবং পূর্বের ঠাণ্ডা ও পরে গরম—ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়েই মনে আসে, কিন্তু রৌদ্র, গরম ও মাথার সম্বন্ধটি অর্থাৎ তাদের কার্যকারণ-সম্বন্ধ মনের নিজের দান। এই কার্যকারণ তত্ত্বের প্রয়োগেই ঐ বাহ্য উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। বাহ্য উপাদান ও মানসিক তত্ত্ব—এ দুয়ের সংযোগ হ'লে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এর দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটি অন্ধ ও প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি কেবল পঙ্গু নয়, একেবারে শূন্য। উপরি-উক্ত জ্ঞান প্রতিরূপ (image) ও প্রত্যয় (concept) দুই-ই সৃষ্টি করে। শিল্পসৃষ্টির মূলে এই প্রতিরূপ-সৃষ্টির ক্ষমতাই কাজ করে। ক্রোচের মতে প্রতিরূপ-সৃষ্টির ক্ষমতা প্রত্যয়গঠন-ক্ষমতার পূর্বগামী হয়ে থাকে। ন্যায়চিন্তনের বহুপূর্বেই ভাব মনোজগতে রূপ পরিগ্রহ করে। এই মানসিক ভাব বা স্বজ্ঞাই (intuition) ক্রোচের মতে শিল্পের প্রাণ।

প্রতিভাশালী শিল্পীরা অবশ্য একথাই অনেক সময় স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। মাইকেল এঞ্জেলো বলতেন: শিল্পী হাতদুটো দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন না, শিল্পসৃষ্টি হয় তাঁর অন্তরলোকে—"One paints not with the hands but with the brain." লিওনার্ডো লিখেছেন: যখন তাঁদের বাহ্য কর্মবৃত্তিগুলি সবচেয়ে কম ক্রিয়াশীল থাকে, প্রতিভাশালী শিল্পীদের মন তখনই সবচেয়ে শিল্প-সৃষ্টিতে নিযুক্ত থাকে।

সকলেই লিওনার্ডোর গল্প জানেন। মঠাধ্যক্ষ তাঁকে 'Last Supper' (যীশুর শেষ ভোজনের) চিত্রখানির অঙ্কনভার দিয়েছেন। লিওনার্ডো কিন্তু দিনের পর দিন এসে পটের সামনে নিশ্চল চিত্রার্পিতবৎ বসে থাকতেন। মঠাধ্যক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন মনে মনে। রোজই তাগাদা দিতে লাগলেন, ছবির কাজ কবে আরম্ভ হবে? বীতশ্রদ্ধ লিওনার্ডো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন মঠাধ্যক্ষের মুখাবয়ব-অনুকরণে জুডাস্ (Judas)-এর চিত্র এঁকে। কিন্তু মানসলোকে শিল্পসৃষ্টি হলেও ক্রোচের মতো একথা এঁরা অস্বীকার করেন নি যে বাহ্য উপাদান-করণের (externalization) প্রয়োজনীয়তা আছে।

কিন্তু ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের প্রকৃত সত্তা (essence) হ'ল মানসলোকে কল্পনার অব্যর্থ প্রতিরূপ পরিগ্রহ করা। স্বজ্ঞার প্রয়োজনই হ'ল এ জন্য। কেবলমাত্র স্বজ্ঞায় এই সার্থক অন্তর্দৃষ্টি ও আনন্দময় সম্বিতের প্রত্যক্ষীকরণ সম্ভব হয়। বাহ্য উপাদানের মধ্যে রূপসৃষ্টি হয় না; রূপসৃষ্টির উৎস ভাব, বাহ্য উপাদানকরণ কেবল নৈপুণ্য ও শিল্পবিদ্যার আঙ্গিক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান।

ক্রোচে বলেছেন:

When we have mastered the internal word, when we have vividly and clearly conceived a figure or statue, when we have found a musical theme, expression is born and is complete, nothing more is needed. If then we open our mouth and speak or sing... what we do is to say aloud what we have already said within, to sing aloud what we have already sung within. If our hands strike the keyboard of the pianoforte, if we take up a pencil or chisel, such actions are willed...and what we are then doing is executing in great movements what we have already executed briefly and rapidly within.

তাই ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে স্বজ্ঞা বা মানস-লোকে রসমূর্তি ব্যতীত অন্য কোন উপাদানের অস্তিত্ব নাই। মন অনবরতই প্রতিরূপ গড়ছে আর ভাঙছে; আবার কখনও কখনও প্রতিরূপ প্রত্যয়ে পরিণত হচ্ছে। কেবল শিল্পীর প্রত্যক্ষীকরণ ক্ষমতা যদি শক্তিশালী হয় তবে কল্পনার সাহায্যে যে কোন বোধকে আর্টে পরিণত করা যায়। মানসতায় এ প্রত্যক্ষীকরণেরই আর এক নাম হ'ল—ক্রোচের ভাষায় 'expression' বা প্রকাশ। অবশ্য এ 'expression' বা প্রকাশ কেবলমাত্র স্বজ্ঞায় সম্ভব। এর উৎকর্ষ নির্ভর করে শিল্পীর সার্থক প্রত্যক্ষীকরণ-ক্ষমতার ওপর। সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি হ'ল আর্টের সুস্পষ্ট প্রকাশ। অন্তর্দৃষ্টি কী বাহ্য উপাদানকে অবলম্বন ক'রে রূপায়িত হচ্ছে, তা নিছক অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় কথা। জীবনের অসংখ্য ভাবপ্রবাহের কোন্‌টিকে কেন্দ্র ক'রে আকার নিচ্ছে তা আমাদের দেখবার দরকার নেই। মানসলোকে অন্তর্দৃষ্টি সার্থক রূপ পরিগ্রহ করলেই হ'ল। শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ হ'ল অন্তর্দৃষ্টির সার্থক প্রকাশের মুক্তির আনন্দ, সুতরাং সৌন্দর্য হ'ল মানসলোকেই সার্থক প্রকাশ। ক্রোচের কবি তাই নীরব কবি।

এতে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে—কাব্য, চিত্রকলা, প্রতিমা, ভাস্কর্য—এ-সবের প্রয়োজন কি? বাহ্য উপাদান-করণে তবে কি দরকার? ক্রোচে বলবেন, এরা স্মৃতির সহায়ক (aids to memory) বা উদ্দীপনা-সঞ্চারী স্থূল উপাদান মাত্র (physical stimulants)। শিল্পী এই স্থূল বাহ্য উপাদানগুলির মধ্যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সার্থক রূপকে ফিরে পেতে পারেন, তাঁর মূল স্বজ্ঞায় প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। তাই শিল্পসৃষ্টির সময় অর্থাৎ উপাদানকরণের সময় শিল্পীকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়; অন্তর্দৃষ্টির কোন ভগ্নাংশই যেন বাদ না যায়। সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা তাহলে প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টিকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। অবশ্য এ যুক্তির পক্ষে একটা বাধা আছে। শিল্পী ছাড়া শিল্পবস্তুর পিছনে যে অন্তর্দৃষ্টি তার পরিচয় আর কারো পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। শিল্প সমালোচক তাহলে কেমন ক'রে শিল্পী মনের অব্যর্থ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাবেন? ক্রোচের মতে 'আর্ট' হ'ল স্বজ্ঞা ও মানসলোকে তার প্রকাশ (expression), এই স্বজ্ঞা (intuition) হ'ল পৃথক-ব্যক্তিত্ব (individuality) এবং এর কখনও অনুলাপ (repetition) সম্ভব নয়। তাহলে ক্রোচে হয়তো বলবেন যে উপরোক্ত অন্তর্দৃষ্টির এমন একটা পরম শুদ্ধরূপ আছে, যা পৃথক-ব্যক্তিত্বের রসবেত্তার ও সমালোচকদের কাছে একই ভাবে ধরা দেবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, অন্তর্দৃষ্টি বা স্বজ্ঞা পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বে পৃথক পৃথক রূপ পরিগ্রহ করে।

ক্রোচের এই মতবাদের সঙ্গে উপরিলিখিত মতের সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাহলে কেমন ক'রে শিল্পসমালোচক আর্টের মধ্যে শিল্পী-মানসের স্বজ্ঞাকে ফিরে পাবেন? তিনি বলছেন যে শিল্পসমালোচককে বা রস-বেত্তাকে শিল্পী হতে হবে। "In order to judge Dante we must raise ourselves to his level."—অর্থাৎ দান্তের যথার্থ রসগ্রহণ করতে গেলে আমাদের দান্তের স্তরে উঠতে হবে। কিন্তু এ সৌভাগ্য কজনের ঘটে।

অবশ্য ক্রোচে একেবারে যে এ অসম্ভাব্যতার কথা অস্বীকার করেছেন এমন নয়। তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে, বাহ্য উপাদান—যাকে কেন্দ্র ক'রে আর্ট সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হয়তো সমালোচককে শিল্পীর যথাযথ স্বজ্ঞার (intuition) আদিম ভাবরূপকে প্রতিফলিত করবে না। সুতরাং শিল্পসমালোচককে জ্ঞান ও নিরীক্ষার সাহায্যে শিল্পী-মানসের মর্মে গিয়ে পৌঁছুতে

হবে। ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্যে শিল্পীর সমসাময়িক অবস্থা জানতে হবে।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে ক্রোচে 'আর্ট' বলতে যা বুঝেছেন, সাধারণ শিল্পসমালোচক ও রসবেত্তার কাছে তা 'আর্ট' নয়। তিনি বলেছেন যে লেখনী তুলি বা ছেনি হাতে নেওয়ার আগেই শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আমরা যাকে বাহ্য উপাদানকরণের সাহায্যে প্রকাশ-ভঙ্গী বলি, ক্রোচের কাছে তা মূল্যহীন? A thing of beauty বা Work of art অর্থাৎ *সৌন্দর্য-বস্তু বা শিল্পসৃষ্টি সাধারণতঃ যা বোঝায়* ক্রোচের কাছে তা হ'ল কেবলমাত্র উদ্দীপনা-সঞ্চারী বাহ্য উপাদানমাত্র।

এছাড়াও আর্টের 'theme' বা বিষয় সম্বন্ধে ক্রোচে যে পরিচ্ছেদে সমালোচকদের বিরুদ্ধতার কথা বলেছেন সেখানেও অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। নীচে ঐ পরিচ্ছেদের কিছুটা উদ্ধৃতি:

When critics against the theme or the content as being unworthy of art and blameworthy, in respect to works which they claim to be artistically perfect, if these expressions *really are perfect, there is nothing to be done* but to advise the critics to leave the artist in peace, for they cannot get inspiration save from what has made an impression upon them···So long as ugliness and turpitude exist in nature and impose themselves on the artist, it is not possible to prevent the expression of these things also.

—সমালোচকেরা যখন শিল্পীর নির্বাচিত কোন বিষয়-বস্তুকে শিল্পের ক্ষেত্রে অযোগ্য বা দূষণীয় বলে মনে করেন, অথচ শিল্প হিসাবে রচনাটিকে সার্থক বলে মনে করেন, তখন তাঁদের উচিত শিল্পীকে নিজের মনে কাজ করতে দেওয়া। কারণ যেসব বিষয় শিল্পীর মনে গভীর দাগ কাটে নি, সে সব বিষয় থেকে শিল্পীরা প্রেরণা পেতে পারেন না। পৃথিবীতে যতদিন কুশ্রীতা ও নীচতার অস্তিত্ব থাকবে এবং তারা শিল্পীর মন প্রভাবিত করবে ততদিন সাহিত্যে শিল্পে তার প্রকাশ বন্ধ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আর্ট তো ক্রোচের মতে intuition বা স্বজ্ঞার বিশেষ ভাব। তার বহিঃপ্রকাশ যদি গৌণ হয় তবে সমালোচক কেমন ক'রে তার বিরুদ্ধতা করবেন? যে আর্ট মানসলোকে ভাবমাত্র তা সমালোচক বা রসবেত্তার গণ্ডির বাইরে। এভাবে সমালোচকদের উল্লেখ ক'রে তাঁর ভাবী শিষ্যদের তিনি পথভ্রষ্ট করেছেন। তাঁরা উপরি-উক্ত মন্তব্যের দোহাই দিয়ে যে কোন বিষয়কেই শিল্পসৃষ্টির আধার বলে চালাবার সযত্ন প্রয়াস করেছেন, এবং নীচতা, কুশ্রীতা, কামিতা প্রভৃতিকে আর্টের আধার বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। শিল্পীর মনে এগুলি যে অনুভূতি সঞ্চার করে তার যথার্থ রূপায়ণ হলেই তো আর্ট হ'ল— এই হচ্ছে তাঁদের মত। যে কোন রকমের চিত্ত-প্রবৃত্তি, চিত্তবিকৃতি, অসুন্দর ও অকালজাত ভ্রষ্ট মানসিকতার যথাযথ রূপায়ণ হ'লেই তাকে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু ক্রোচের বক্তব্য আদৌ তা ছিল না। তাঁর মতে আমাদের সব স্বজ্ঞার (intuition) বাহ্য উপাদান করণ সম্ভব নয়। 'We select from the crowd of intuitions'—ভিড়ের মধ্যে থেকে আমরা একটি স্বজ্ঞা বেছে নিই। এখানে তিনি ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর সঙ্গে একমত। বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা আর্টের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তবে আর্নল্ড এর কারণ দেখিয়েছেন নৈতিক অনুশাসন, আর ক্রোচে বলেন যে শিল্পী সব রকম বাহ্য স্বজ্ঞার উপাদানকরণ করতে পারেন না, কারণ তাঁর শিল্পচেতনা খানিকটা এতে হারিয়ে যায়, আর তাঁর স্বাধীনতা এতে অনেকটা খর্ব হয়।

যাই হোক ক্রোচে নন্দনতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে যেটা বলবার কথা

সেটা হ'ল এই যে তিনি শিল্পতত্ত্ব বুঝিয়েছেন—শিল্পীদের বা তাদের শিল্পসৃষ্টি (work of art)কে বাদ দিয়ে। আর্টিস্ট বা শিল্পীদের মতামত নেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেননি, তাঁদের মতামত নিলে এ ধারণা তাঁর সুস্পষ্ট হ'ত যে শিল্পতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে 'communication' বা আস্বাদ্যমান রস-সঞ্চার, এবং এর জন্য দরকার লৌকিক উপাদান। শিল্পসৃষ্টির ভাগীরথী মানুষের লৌকিক সুখদুঃখের খাত ছাড়া প্রবাহিত হয় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর্ট বলে যা পরিগণিত হয়েছে তার উপকরণ হ'ল লৌকিক মন ও জীবন, এবং খুব বড় যে সাহিত্যসৃষ্টি—এই মন ও জীবনের বহু দিক ও বহু মূর্তি তার বিচিত্র উপকরণ, যেমন ইলিয়াড ওডিসিতে, রামায়ণ মহাভারতে, গ্রীক ট্রাজেডিতে, সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে, টলস্টয়ের উপন্যাসে।

অবশ্য ক্রোচে এই রসসঞ্চার মতবাদ (Theory of communication) যে একেবারে অস্বীকার করেছেন, তা নয়, তবে তার শিল্পী শুধু intuition বা স্বজ্ঞা নিয়েই ব্যস্ত, মানসভাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে একটু বেশী সচেতন। তাঁর বিশ্বাস উপাদান-করণের সময় শিল্পীসত্তা লৌকিক জগতের দাবির কাছে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। তাই উপাদানকরণ আর্টের ক্ষেত্রে গৌণ। কিন্তু একথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে 'সৃষ্টি যে সকল হৃদয়ে সমবাদী—তার অর্থ এ নয় যে বিজ্ঞানের মতো তা একটি abstract (ভাবরূপ) জিনিস। কবি যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন তা রূপবর্ণহীন সীমারেখা মাত্র (outline) নয়, সম্পূর্ণ concrete (বাস্তব) ভাব বা চরিত্র। কিন্তু তার মধ্যেই সহৃদয় নিখিল মানব নিজেকে প্রতিফলিত দেখে অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টি Concrete Universal-এর সৃষ্টি। মানুষের কতকগুলি চিত্তবৃত্তির বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উপর সমাজের স্থিতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কাব্যরসের মধ্য দিয়ে যাঁরা মঙ্গলকে চান, একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, তাঁরা চান যেন কাব্য এই সব সামাজিক চিত্তবৃত্তিগুলির দিকে পাঠকের মনকে অনুকূল করে। কাব্যের কাছে সভ্যতার মূল ভিত্তির এই দাবি আলঙ্কারিকেরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁরা কাব্যরসকে লোকোত্তর বলেছেন সত্য, কিন্তু এই অলৌকিক বস্তু লৌকিক জগতের কোন হিতেই লাগে না, সমাজের বুকে এত বড় অসামাজিক কথা সোজাসুজি প্রচার করা তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।'

From Bergson to Croce is an impossible transition ; there is hardly a parallel in all their lines. Bergson is a mystic who translates his visions into deceptive clarity ; Croce is a sceptic with an almost German gift for obscurity. Bergson is religiously-minded, and yet talks like a thorough-going evolutionist ; Croce is an anti-clerical who writes like an American Hegelian Bergson is a French Jew who inherits the tradition of Spinoza and Lamarck ; Croce is an Italian Catholic who has kept nothing of his religion except its scholasticism and its devotion to beauty.

—*Will Durant*

মন ও সাধনা

[গত ৩রা মার্চ—বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজজীর আলোচনা অবলম্বনে শ্রীমতী নলিনী ঘোষ—অনুলিখিত]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি পূজার দিন সকালে পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজজী তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে আছেন, ভক্তেরা একে একে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে যাচ্ছে, মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরাও প্রণাম করতে এলেন। মহারাজ সকলকেই আশীর্বাদ করছেন ও দুএকটি কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ গঙ্গার ওপার থেকে মাইকের ভিতর দিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান বেজে উঠল। গান শুনে মহারাজ বলে উঠলেন :

এই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতা। অনবরত মনকে বাইরের দিকে টানছে, মনকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করছে। এখন মানুষের মন অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ঠাকুর বলতেন, সরষের পুঁটলি একবার খুলে গেলে, সরষে ছড়িয়ে পড়লে তাকে জড় ক'রে এক জায়গায় করা খুব কঠিন। মন সেই রকম সরষের পুঁটলি। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে তাকে গুটিয়ে আনা খুব শক্ত কাজ।

মানুষের মন এখন অত্যন্ত বহির্মুখী হয়ে গেছে। বাইরের নানা রকম চাকচিক্য আর আড়ম্বরই মনের প্রধান আকর্ষণের বিষয় হয়েছে। এক জায়গায় একটু স্থির হ'তে পারে না। আধুনিক দুর্গাপ্রতিমাগুলিও কেমন এক রকমের হয়েছে। এক জায়গায় দুর্গা, আর এক জায়গায় লক্ষ্মী, আলাদা ভাবে সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। যেন কারো সঙ্গে কারো ভাব নেই, সবাই আলাদা হয়ে গেছে।

দেবীপূজার যে নিয়ম নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, সে সব কোথায় গেছে,, কেবল বাইরের আড়ম্বরের দিকে দৃষ্টি পড়েছে। ঠাকুর এসেছিলেন কি রকম গোপনে। কোন রকম বিভূতি নেই, বাইরে কোন প্রকাশ নেই। গেরুয়া ধারণ করলেন না, তিলকফোঁটা পর্যন্ত কাটলেন না। এমনকি বৈধী পূজাও করলেন না। বাইরে কোন প্রকাশই নেই। সবই রয়েছে অন্তরে। বাইরের জিনিস তো লোক-দেখানো। ভবতারিণীর পূজা করলেন, তাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। কোন রকম নিয়ম কানুন নেই, সরল শুদ্ধ মনে যা আসছে তাই করছেন।

সবাই ভাবল, একটা পাগলা বামুন। রাণী রাসমণির কাছে নালিশ গেল, সাধারণ লোক তো তাঁকে চিনতে পারেনি। রাণী রাসমণি তাঁকে চিনেছিলেন। ঠাকুর বলতেন—রাসমণি দুর্গার অষ্টসখীর এক সখী। এত বড় কথা তিনি নিজ-মুখে তাঁর সম্বন্ধে বলে গেছেন। ঠাকুর রাসমণিকে যেমন জেনেছিলেন, রাসমণিও তেমনি ঠাকুরকে কিছুটা বুঝেছিলেন; তাই বলেছিলেন, 'এ বামুন সাধারণ পাগল নয়, আসল পাগল। উনি যা করবেন তাই ঠিক হবে। কেউ যেন তাঁর কোন কাজে তাঁকে বাধা না দেয়।' ঠাকুরেরও কোন দিকে লক্ষ্য নেই। ঘরের কোণে এক মনে তন্ময় হ'য়ে আছেন মাতৃভাবে। পোষাক তো দূরের কথা, গায়ের কাপড়খানাও সব সময় গায়ে থাকতে চায় না। কাউকে দেখলেই যেন জড়সড় হয়ে যান।

পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যকে কতখানি গোপনে রেখেছিলেন। এই হ'ল সাধনার রীতি। ঠাকুর বলতেন, ভগবানকে ডাকবে মনে বনে ও কোণে—

কেউ যেন টের না পায়। মূল্যবান সম্পদকে লোকে যেমন লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে সযত্নে লুকিয়ে রাখে, অধ্যাত্ম-সম্পদকেও তেমনি অতি যত্নে লুকিয়ে রাখতে হয়। তা না হ'লে আবার সাধুতার 'অহং' এসে মানুষকে আশ্রয় করে। এ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। ধর্মের পথ দিয়েও অহঙ্কারের—আমিত্বের প্রকাশ হয়। এ পথেও অহঙ্কারকে নির্মূল করা দরকার। ঠাকুরের জীবন এই আদর্শের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যীশুখৃষ্ট বলতেন, ডান হাত দান করলে বাম হাত তা যেন জানতে না পারে। কি ভীষণ কথা। দুটো হাত পাশাপাশি রয়েছে তবু একজন আর একজনের কাজের কথা জানবে না। এই হ'ল প্রকৃত ধর্ম-সাধনা। এইজন্যই তো সেই পাগল বামুন কত অল্পদিনের মধ্যে সারা পৃথিবীতে কি আলোড়নটাই না এনে দিলেন। একি শুধু প্রচার ক'রে সম্ভব? সবই তাঁর ইচ্ছা।

বাইরের প্রকাশ তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। কেশব সেন অত বড় পণ্ডিত, অত বড় নামকরা লোক, তিনখানা কাগজ চালাচ্ছেন, তিনি ঠাকুরকে কিছু বুঝেছিলেন, ভাবলেন—তাঁর কথা লোককে কিছু জানানো উচিত। তাই ঠাকুরের কথা কাগজে লিখতেন। ঠাকুর কেশব সেনকে তাঁর কথা কাগজে লিখতে বারণ করে-ছিলেন, কাগজে লিখে কি কাউকে বড় করা যায়? সত্যিই তো ভগবানের কথা ব্যাখ্যা ক'রে জানানো কি মানুষের সাধ্য? মানুষের শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে কতটুকু বলা যায়? গিরিশ ঘোষ যখন স্বামীজীকে ঠাকুরের কথা লিখতে বলেছিলেন, তিনি তখন ভীষণ আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, দরকার হ'লে তিনি পৃথিবী ওলট পালট ক'রে দিতে পারেন, কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিরিশবাবু যেন তাঁকে অনুরোধ না করেন। শেষকালে তিনি কি তাঁকে ছোট ক'রে ফেলবেন? সে তিনি কিছুতেই পারবেন না। কত বড় সত্যি কথা। ঠাকুরের কথার কি ইতি আছে?

তবু তাঁরা আসেন পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণে, মানুষের মত হয়েই। মানুষ তার বুদ্ধির সীমার মধ্যেই তাঁকে ধরতে পারে, জানতে পারে। অন্তর দিয়ে তাঁকে বুঝতে হয়। বক্তৃতা ক'রে তাঁকে বোঝানো যায় না।

সমস্ত সম্পদের অধিকারী হয়েও কি রকম আত্মগোপন। তাঁর কি বিরাট সাধনার জীবন। তোতাপুরীর যে জিনিস জানতে দীর্ঘ ৪০ বৎসর বৎসর লেগেছিল, ঠাকুর তিন দিনে তাই পেয়ে গেলেন। তোতাপুরী তো বিস্ময়ে অবাক। শুধু একটিতে নয়, বিভিন্ন ধর্মে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। অনন্ত অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ ভাণ্ডারী। বাইরে কিন্তু এতটুকুও কিছু নেই। আখ্যা পেলেন—পাগলা বামুন সবই রয়েছে ভিতরে, সেইখানে ডুব দিতে হবে। অন্তরের গভীরে খুঁজতে হবে, তবে রত্ন মিলবে। ঠাকুরের জীবনাদর্শ আলোচনা করতে হবে, বুঝতে হবে, অন্তরে গ্রহণ করতে হবে, তবে কাজ হবে। কত বড় বিরাট ঐশ্বর্যের তিনি সন্ধান দিয়ে গেছেন। কত সহজ রাস্তা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই রাস্তাই আমাদের ধরতে হবে। আজ বড় শুভ দিন। আজকের দিনে তাঁর নির্দেশিত পথ ধরে চলবার শক্তিলাভের প্রার্থনা করা চাই। তবে তো উৎসব সার্থক হবে।

ভগিনী নিবেদিতা*

আচার্য যদুনাথ সরকার

মার্গারেট নোবল আয়র্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ভারত তাঁহার আধ্যাত্মিক বাসস্থান। স্বেচ্ছায় তিনি ভারতমাতার কন্যারূপে ভারতের উন্নতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। রোমের প্রাচীন ইতিহাসে একটি সুন্দর গল্প আছে: একজন সম্ভ্রান্ত রোমানকে শাস্তি দেওয়া হয়—'অনশনে মৃত্যু'। কয়েক সপ্তাহ পরেও দেখা গেল—সে বাঁচিয়া আছে। কারা-রক্ষক আবিষ্কার করেন—ঐ ব্যক্তির কন্যাকে তাহার সহিত দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, সেই নিজ স্তনদুগ্ধ দ্বারা পিতাকে জীবিত রাখিয়াছে। ইহাই কি নিবেদিতার ভারতে যাপিত জীবনের অন্তর্নিহিত রহস্য নয়? তিনি তাঁহার মাতার পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। তিনি ভারতের জন্য পরিশ্রম করিয়া মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে ১৯১১খৃঃ ভারতের মাটিতেই তাঁহার নশ্বর দেহ বিলীন করেন।

জীবনের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে শিক্ষয়িত্রীরূপে দর্শন বা প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কৌতূহল ছিল না, প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাতেই তিনি শুনিলেন, আধুনিক জগৎকে দিবার মতো একটি আধ্যাত্মিক সত্য—ভারতের আছে, সেটিকে অবহেলা করিলে মানব জাতিরই ক্ষতি, মার্গারেট স্বামীজীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। অনেক সংশয়, অনেক আলোচনার পর অবশেষে তিনি বেদান্তের সত্য এবং বর্তমান যন্ত্রযুগের পৃথিবীতে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। পরে ভারতের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া দুঃখ ও লজ্জার সহিত তিনি লক্ষ্য করিলেন—একদা উচ্চতম-সত্যপ্রচারকারী জাতির বর্তমান দুর্গতি। অতঃপর তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্তব্য হইল—অধঃপতিত এই জাতির পুনরুন্নয়ন। নব-নির্বাচিত ব্রহ্মচারিণী-জীবনে তাঁহার 'নিবেদিতা' নাম সার্থক হইয়াছিল, 'নিবেদিতা'—অর্থাৎ প্রেমপরায়ণ সমর্পিত প্রাণ।

ভারতবাসীদের মধ্যে অকপট অধ্যাত্ম-প্রেরণা, বিনয়, তপস্যা, ঈশ্বরপ্রেমে বিগলিত ভাব, সকল জীবের জন্য সহানুভূতি বরাবরই যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়াছে, তবে কেন উনবিংশ শতকে তাহারা রাজনীতিতে এত অবনমিত, মনীষায় এত অধঃপতিত, অর্থনীতিতে এত দুর্দশাগ্রস্ত? ইওরোপ ও আমেরিকার বিদ্বৎসমাজে কেন তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া অপমানিত? মনীষার সৃজনশীলতা ও পৌরুষের গৌরবের সেই উচ্চতায় না উঠিয়া কি আধুনিক হিন্দুগণ প্রাচীন মুনি-ঋষিদের প্রকৃত বংশধর বলিয়া নিজেদের দাবি করিতে পারে? এখন কি তাহারা পূর্বপুরুষের আধ্যাত্মিক কীর্তির উপর নির্ভরশীল নিঃস্ব দরিদ্র নয়? অতএব এখন প্রয়োজন এক সৃজনশীল প্রগতিশীল হিন্দুধর্ম। এই বিরাট কার্যসাধনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সারা ভারতকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এই কর্তব্য পালনের জন্যই তাঁহার মহীয়সী শিষ্যা আত্মনিবেদন করিলেন।

---

* কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইন্‌স্টিট্যুটে ১৫.৯.৫২ তারিখে প্রদত্ত—ইনস্টিট্যুটের মাসিক বুলেটিনে প্রকাশিত ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ।

নিবেদিতা ও প্রসারণশীল হিন্দুধর্ম

ভারতের এই নবজীবনের বীজ—সেই পুরাতন বেদান্ত-মন্ত্র 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—দুর্বল কখনও এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। আবার উঠিতে হইলে—আধুনিক হিন্দুদের শক্তিমান্ হইতে হইবে, শুধু ধ্যানের শক্তিতে বলীয়ান্ নয়—কর্মের শক্তিতে, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক অর্থনীতি-কেন্দ্রিক কর্মেও শক্তিমান্ হইতে হইবে। ইহা জড়বাদ নয়, এতদ্‌-ব্যতীত আর কি উপায়ে অর্ধাহারী, ছিন্নবাস-পরিহিত, অজ্ঞ, ত্রিশকোটি নরনারী—যাহারা জীর্ণ কুটিরে বাস করে, যাহারা মহামারীতে অসহায়ভাবে মরিতে বাধ্য হয়, কৃষিপ্রধান সমাজে যাহাদের নিশ্চয় কর্মসংস্থান নাই—ফসলের জন্য যাহারা আকাশে মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে—ভারতের সেই জনগণের আধ্যাত্মিকতা আর কি উপায়ে বিকাশ লাভ করিবে? প্রথমেই তাহাদের নিকট 'অদ্বৈত' বা নির্বাণের কথা বলিতে যাওয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করা, প্রথমে তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যপদে উন্নীত করিতে হইবে।

বিদেশী শাসনাধীনে তখন পরিপূর্ণ কল্যাণকামী রাষ্ট্র আশার অতীত ছিল, অতএব সে দায়িত্ব ছিল সমাজের—নেতাদের বহনীয়। তাই একদিন নিবেদিতা আলোচনামুখে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'রাজা রামমোহন রায় বর্তমান ভারতের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা (prophet), কিন্তু তাঁহার প্রকৃত স্থান ছিল লাহোরে রণজিৎসিংহের দক্ষিণ পার্শ্বে।' পঞ্জাবের অজ্ঞ অসম্বদ্ধ জনতা লইয়া রামমোহন রায়ের মতো মন্ত্রী-সহ রণজিৎসিংহও কিছু করিতে পারিতেন না। জনতাকে আগে উন্নত করিতে হইবে।

বৃটিশ ভারতে প্রথম প্রয়োজন ছিল জনসাধারণকে আত্মনির্ভরতা শেখানো। সরকার তাহাদের সব কিছু করিয়া দিবে—অসহায়ভাবে এই আশায় বসিয়া না থাকিয়া প্রয়োজন 'নিজেদের কাজ নিজেরাই করিয়া লইব'—এই ভাবে তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিয়া লওয়া। ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই ভাবই প্রচার করিয়াছিলেন। আর ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৯৮খৃঃ কলিকাতায় প্রথম প্লেগ-মহামারীর সময়—মানুষ যখন মৃত্যুর এই নূতন রূপ দেখিয়া আতঙ্কে পালাইতেছিল, মেথর যখন দুষ্প্রাপ্য, নিবেদিতা তখন বাগবাজারের যে গলিতে (বসুপাড়া লেনে) থাকিতেন, কোদাল লইয়া সেই অবহেলিত গলির ময়লা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া লজ্জায় কয়েকটি স্থানীয় যুবক তাঁহার সঙ্গে যোগ দেয়—এইরূপে নাগরিককে দৃষ্টান্তসহ স্বাবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হইল। এই ঘটনাদ্বারাই আমি তাঁহার কথা প্রথম জানিতে পারি।

কিন্তু একটি জাতির প্রধান শক্তির উৎস—নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস। পূর্বপুরুষের মহত্ত্বের উপর দৃঢ়নিশ্চয় হইলেই এ বিশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া থাকে, তাঁহারা যাহা করিয়াছেন আমরাও তাহা করিতে পারি—এই চিন্তাই বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে পারে তাই শুধু সর্বজন-পরিচিত ভারতের আধ্যাত্মিক কীর্তিকলাপেই নয়—শিল্পকলা বিজ্ঞান বাণিজ্য—সর্বব্যাপারে তিনি প্রাচীন ভারতের গৌরব করিতেন এবং আমাদেরও গৌরবান্বিত হইতে উৎসাহিত করিতেন।

প্রথম যে বাঙ্গালীরা ইংরেজী শিখিয়াছিল তাহারা প্রচলিত হিন্দুধর্মে বা প্রাচীন হিন্দুদের কীর্তিকলাপে প্রশংসার কিছুই দেখিতে পায় নাই। তাহারা আমাদের ধর্ম সমাজ ইতিহাস অতীত, সব কিছু অবিমিশ্র ঘৃণার চক্ষে দেখিত। ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ যুবকেরা শান্তির জন্য

খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিত। পরবর্তী পুরুষের অনেকে একইভাবে নিজেদের হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়। অধিকাংশ ব্যক্তি নামে মাত্র হিন্দু থাকিত, এবং নিজ নিজ ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে সন্দেহ লুকাইয়া রাখিত না। কিন্তু ১৮৭০-৮০ দশকের প্রথম হইতে প্রতিক্রিয়া শুরু হইল, সনাতন হিন্দুধর্ম প্রকাশ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। "হিন্দু দর্শন ও আচারধর্মের পক্ষে যুক্তিতর্ক করিবার বহু লোকের আবির্ভাব হইল—তাঁহারা জগতের কাছে প্রচার করিতে লাগিলেন, ঐগুলি মানুষের চিন্তার পরাকাষ্ঠা। ক্রমবর্ধমান শক্র ও ক্রমক্ষীয়মাণ অনুগামীদের মধ্যে নিরীহ হিন্দুধর্ম নিজের পরিচয় দিতে, আত্মরক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করিত, তাহার পরিবর্তে দেখা দিল এখন আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম (aggressive Hinduism)। শিক্ষিত হিন্দুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়াও বন্ধ হইল। ক্রমে এই আন্দোলন বাংলার রাজধানী হইতে জেলায় শহরে প্রসারিত হইল। সর্বত্র নূতন হিন্দুসংগঠন দেখা দিল।"* কিন্তু নিবেদিতা এ জাতীয় আধুনিক সনাতনী হিন্দুর সরব গর্বঘোষণা হইতেও বহু দূরে। ঠিকই তো, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যারূপে তাঁহার অন্যরূপ হওয়া যে সম্ভব নয়। স্বামীজী যে অক্লান্তভাবে বলিতেন—মুক্তি ছুঁৎমার্গে নয়, মুক্তি হৃদয়ের শক্তিতে ও পবিত্রতায়।

নিবেদিতার ব্যাখ্যা-শক্তি

নিবেদিতা ভারতের অতীত বা ভবিষ্যতের—সব কিছুর অন্ধ স্তাবক ছিলেন না। প্রাচীন গল্পগাথার, এবং রীতিনীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে প্রবেশ করিয়া আধুনিক জীবনে তাহার ভালটুকু লইয়া আসিবার জন্ম তিনি আমাদের বলিতেন। এখানে তাঁহার (রূপক) ব্যাখ্যা করিবার অপূর্ব শক্তি বিকশিত হইত।

(তদানীন্তন বড়লাটের পত্নী) লেডী মিণ্টো কয়েকটি আমেরিকান বন্ধুসহ অজানিতভাবে দাক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে যান, এবং নিবেদিতার সহিত কথাপ্রসঙ্গে অনেকক্ষণ তাঁহার ভারতীয় পুরাণের অন্তর্নিহিত রূপক ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, যদিও শ্রবণ করিয়াই তিনি ঐ সব মানিয়া লন নাই। শেষে তিনি তাঁহার পরিচয় ব্যক্ত করেন, এবং পরে উভয়ের আবার দেখা হয়।

এরূপ একটি ব্যাখ্যার কথা এখানে আমায় দিতেই হইবে; এই ব্যাখ্যাটি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে, সত্য লাভের জন্ম রাজপুত্র গৌতম তৃণাসনে বসিয়া দিনের পর দিন ধ্যান করিতেছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র ইহা দেখিয়া তাঁহার জন্ম বজ্রাসন পাঠাইয়া দেন। ১৯০৪ খৃঃ অক্টোবরে বুদ্ধগয়ায় একটি চালার নীচে আমরা এক বিরাট বৃত্তাকার পাথর পড়িয়া থাকিতে দেখি, তাহার চারিধারে বজ্রের চিহ্ন আঁকা ছিল। নিবেদিতা বলিলেন, 'মানুষ যখন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করে, তখন সে দেবতার হস্তস্থিত বজ্রের মতো শক্তিসম্পন্ন হয়।' তাই তিনি তাঁহার পুস্তকাবলীতে বজ্রের এই ভারতীয় (বা তিব্বতীয়) চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। স্যর জগদীশ বসুও তাহাই করিয়াছেন।

মানব-কল্যাণে ব্যবহৃত শক্তি সর্বত্র তাঁহার প্রশংসা অর্জন করিত। একদিন তিনি বর্ণনা করেন—জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়া যখন তাঁহাদের জাহাজ যাইতেছিল—স্বামীজী স্পেনের উপকূল

---

* লেখকের 'India Through the Ages' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দেখাইয়া কেমন উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠেন, 'ঐ, ঐ, আমি দেখিতেছি তারিকের নেতৃত্বে মূর যোদ্ধাগণ জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে এবং স্পেনের দুর্বল গথিক রাজ্য জয় করিয়া নিজেদের কর্ডোভা ও গ্রানাডা রাজ্য স্থাপন করিতেছে, যেখানে তাহারা সভ্যতাকে প্রগতিশীল করিয়াছে। বার্বার জাতি কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য জয়ের পর যখন খৃষ্টান ইওরোপে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল —তখন তাহারাই প্রাচীন গ্রীসের দর্শন ও বিজ্ঞান রক্ষা করিয়াছে।' আরবী ভাষায় জিব্রাল্টার 'জেবেল-আল তারিক', অর্থাৎ যে প্রস্তরে তারিক অবতরণ করিয়াছিলেন।

এ যুগের প্রয়োজন

বর্তমান যুগের প্রয়োজন কখনও না ভুলিয়া নিবেদিতা প্রাচীন হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনকারীদের সংস্পর্শ হইতে দূরেই ছিলেন। তিনি জ্ঞানালোকের বিরোধী বা যাহা কিছু প্রাচীন তাহারই সমর্থনকারী ছিলেন না। আধুনিক বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম যে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে, বরং হিন্দুর স্থায়ী আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য ঐগুলি একান্ত প্রয়োজন— স্বামীজীর প্রচারিত এই ভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। বুদ্ধগয়ার বিদ্বান্ ও সৎপ্রকৃতি মহান্ত (আমরা যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম) জ্ঞানবিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু দান করিতে চান। ভগিনী নিবেদিতা (এবং স্যর জগদীশ বসুও) সংস্কৃত বা দর্শন শিক্ষার (যাহার কোন অভাব নাই) কেন্দ্র অপেক্ষা উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ঐ দান করা উচিত—দৃঢ়তার সহিত একথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। ইহাই যে আজ ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন—এই বোধের জন্যই তিনি স্যর জগদীশচন্দ্রকে প্রশংসা করিতেন (কতকটা যেন দেবত্বে তুলিয়া ধরিতেন), বর্তমান ভারতের এই অন্ধকার যুগে জগদীশচন্দ্রই 'পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-তালিকায় ভারতের নাম প্রথম অঙ্কিত করেন'। বসুর মৃত্যু-সংবাদ দিতে গিয়া জনৈক ইংরেজ লেখক অতি সুন্দরভাবে এই কথাই লিখিয়াছেন।

ইতিহাস, জাতিবিজ্ঞান, চারুকলা—সর্বত্র আমাদের আধুনিক গবেষণাকে অগ্রসর করিবার জন্য, উৎসাহ দিবার জন্য—সমালোচনা ও সংশোধন করিবার জন্য নিবেদিতা সর্বদা আগ্রহশীল ছিলেন। 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর স্থাপনকাল (১৯০৭) হইতে তাঁহার দেহত্যাগ (১৯১১) পর্যন্ত তিনি ঐ পত্রিকার চিত্রকলা-সমালোচকরূপে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য তরুণ শিল্পীদের দেখাইয়া দিতেন—কি বর্জন করিতে হইবে, এবং কোন্ পথ অনুসরণ করিতে হইবে। সব কিছুর পিছনে তাঁহার মনে প্রেরণা-শক্তি ছিল অকপটে দেশসেবা। মূল্যবান্ ঐতিহাসিক রচনার জন্য একদিন যখন জনৈক ভারতীয় প্রাচ্যবিদের প্রশংসা করিতেছিলাম, তখন তিনি ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'না না, তাঁর কথা বলবেন না. তিনি ইংরেজদের মনোরঞ্জন করেন।' নিবেদিতার প্রকৃত ভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার নিজের সম্বন্ধে মাত্র একটি কথা এখানে বলিব। আমার ঐতিহাসিক গবেষণার প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, 'বিদেশীদের কাছে নিজের পতাকা অবনত করিবেন না। গবেষণার জন্য যে বিশেষ বিভাগ বাছিয়া লইয়াছেন, সে বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক হইবার চেষ্টা করিবেন, যেন সেইখানে ভারতের নাম সর্বাগ্রে স্বীকৃত হইতে হয়।'

আমাদের দেশের কয়েকজন নেতার দৈনন্দিন জীবনে স্বার্থপরতা, ভীরুতা, নীচতা ও

কুটিলতা দেখিয়া তিনি হৃদয়ে যে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন একদিন চাপিয়া রাখিতে না পারায় তাহা বাহির হইয়া পড়ে। আমরা একদিন ঐরূপ একজন তথাকথিত 'মহান্' বাঙ্গালীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছিলাম, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি আমাদের থামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এর চেয়ে কোন ভারতবাসীর কোন মহৎ কাজের কথা, আত্মত্যাগের কথা বলুন—আমি তাই শুনতে ভালবাসি।'

বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

মানুষের উচ্চতম প্রয়াসের উৎস—ধর্ম। তাই তো আমাদের প্রয়োজন প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করিয়া বর্তমান সমাজে তাহার পাবনী ধারা প্রবাহিত করা।

'যে ছোট বড় সব কিছুকেই ভালবাসে তাহার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ'—দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ইহাই ছিল মহাযানী বৌদ্ধদের শিক্ষা। জাতকের গল্পাদি দিয়া নিবেদিতা এই শিক্ষাটির উপর জোর দিতে ভালবাসিতেন। জাতকের সেই গল্পটি স্মরণীয়, যাহাতে বুদ্ধ বলিয়াছেন: প্রথম মানবজন্মে তিনি একটি ত্যাগের কাজ করিলেন এবং উচ্চতর জন্মলাভ করিলেন, পরে আবার বড় ত্যাগ করিয়া আরও উচ্চ অবস্থায় পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। অবশেষে তিনি আত্মীয়-স্বজনের জন্য নয়, বন্ধু-বান্ধবের জন্য নয়—সকলের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্ব-জীবন লাভ করিলেন, এবং পরিশেষে পূর্ণ বুদ্ধে বিকশিত হইলেন। মানুষ ও পশু-পক্ষীর সেবাই যে ধর্মের শ্রেষ্ঠ কাজ—একথা খৃষ্টজন্মের ২৫০ বৎসর পূর্বে অশোক আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম স্বীয় জন্মস্থান হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই ধর্মের বাণী সকলে ভুলিয়া গেল। নরের মধ্যে নারায়ণের (মানুষের মধ্যে ভগবানের) পূজা পুনরুজ্জীবিত হইল শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে—তাহাও সীমাবদ্ধ পরিসরে। বিবেকানন্দই এই ভাবকে জাগাইয়া তুলিলেন, ভারতের জন্য ও জগতের জন্য। তিনি রোমান ক্যাথলিকদের নিকট হইতে তাঁহার এই কর্মসূচী চুরি করেন নাই—কেহ কেহ তাড়াতাড়িতে ঐরূপই কল্পনা করিয়া থাকেন।

নিবেদিতা সর্বদা বলিতেন বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক বা হিন্দুধর্মের বিরোধী নহে। বরং হিন্দুধর্মের প্রশস্ত বক্ষে যেমন অনেক সম্প্রদায় নিরাপদ আশ্রয়ে রহিয়াছে—বৌদ্ধধর্মও সেইরূপ একটি সম্প্রদায়। হিন্দুধর্ম ইসলামের মতো অপর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু আত্মসর্বস্ব ধর্মবিশ্বাস নয়। তিনি যুক্তি দিতেন: বৌদ্ধেরা হিন্দুদের সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, যাহারা বিশ্বাস করে অষ্টাঙ্গ মার্গ অবলম্বন করিয়াই পবিত্র জীবন যাপন করা যায়, বৌদ্ধেরা নিজেদের 'সংস্কৃত' হিন্দু বলিয়াই দাবি করিতেন, ঠিক যেমন—শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ হিন্দুসমাজের বাহিরে নন, তাঁহারা হিন্দুধর্মেরই অংশ, তাঁহারা বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বহুতর অলস উদাসীন হিন্দু জনসাধারণ অপেক্ষা উন্নততর হিন্দু হইতে পারিবেন।

বহির্বিশ্বের কাছে বৌদ্ধধর্মই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান ছিল। ভারত এশিয়ার অন্যান্য দেশ জয় করিয়াছে, তরবারি দ্বারা নয়—ধর্মদানের দ্বারা, শাস্ত্র প্রেরণ করিয়া, শিল্প—এমনকি সাহিত্য দ্বারা। হিন্দু ভারত ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল, বৌদ্ধধর্মই তাহা ভাঙিয়া দিয়াছে। তাই আজ বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

১৯০৪ খৃঃ অক্টোবরের প্রথমে—নিবেদিতা, ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) ও ব্রহ্মচারী অমূল্য (এখন স্বামী শংকরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ) বুদ্ধগয়ায় এক সপ্তাহ কাটাইতে গিয়াছিলেন। পাটনা হইতে আমাকেও আসিতে বলা হয়। আমরা মহান্তের অতিথি-ভবনে ছিলাম।

প্রতিদিন ওয়ারেনের Buddhism in Translation (অনুবাদে বৌদ্ধধর্ম) কখনও বা এডুইন আর্নল্ড-এর Light of Asia (এশিয়ার আলো) পড়া হইত, কবি মাঝে মাঝে গান ও আবৃত্তি করিতেন। দিনের বেলা আমরা মন্দির-চত্বরে পায়চারি করিতাম, অথবা নিকটে কোন গ্রামে যাইতাম। সন্ধ্যার গোধূলিতে বোধিদ্রুমের নিকট গিয়া আমরা তাহার অন্ধকারে নীরব ধ্যানে বসিতাম। সেখানে আমরা একটি অপূর্ব চরিত্রের মানুষ দেখিয়াছিলাম। ফুজি—একটি দরিদ্র জাপানী মৎস্যজীবী, বহুবর্ষ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে টাকা জমাইয়াছিল, উদ্দেশ্য—বুদ্ধ যেখানে বোধি লাভ করিয়াছেন সেই তীর্থে গিয়া তাহার জীবনস্বপ্ন সফল করা। অবশেষে সে এ দেশে আসিয়াছে এবং পরিমিত আহার করিয়া যাত্রী-ভবনের একটি ঘরে রহিয়াছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় বোধিদ্রুমতলে আসিত—এবং গুনগুন স্বরে প্রার্থনা করিত :

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়, নমো নমো গোতমচন্দ্রিকায়।
নমো নমো অনন্তগুণনরায়, নমো নমো শাক্যনন্দনায়॥

সন্ধ্যার নীরবতায় সংস্কৃত (প্রাকৃত) শব্দগুলির জাপানী উচ্চারণ যেন মৃদুস্বরে-বাজা ঘণ্টার মতো মধুর শুনাইত, আমরা যেন ঐ স্থানের ভাবের ঐশ্বর্যে অভিভূত হইয়া যাইতাম। শব্দগুলি যেন উচ্চারিত হইত না, ভাব বাক্যের অতীত ছিল। আমার ভাবিতে ভাল লাগে রবীন্দ্রনাথ যখন 'নটীর পূজা' লিখিয়াছিলেন—তখন তাঁহার এই স্তবটির কথাই মনে পড়িয়াছিল। শ্রীমতীর প্রার্থনায়—তিনি সযত্নে ইহা বসাইয়া দিয়াছেন, ফুজিই যেন তাঁহাকে ইঙ্গিত দিয়াছিল।

একদিন বৈকালে আমরা উরবেল গ্রামে গেলাম—ইহাই সেই বুদ্ধের সময়ের উরুবিল্ব গ্রাম—যেখানে পল্লীপ্রধানের কন্যা সুজাতা বাস করিতেন, সম্বোধি লাভের পর বুদ্ধ তাঁহার আনীত পায়স গ্রহণ করিয়াই উপবাস ভঙ্গ করেন। পুরাতন ঘরবাড়ীর কোন চিহ্ন আজ আর নাই। তথাপি নিবেদিতা আনন্দে উদ্বেলিত হইলেন। মাঠ হইতে এক টুকরা মাটি তুলিয়া লইয়া ভক্তিভরে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'সমগ্র ভূখণ্ড পবিত্র! সুজাতা আদর্শ গৃহিণী ছিলেন, তিনি জগদ্গুরুর জীবনরক্ষার ভার লইয়াছিলেন।' তারপর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন : ভারতের ধর্মপরায়ণ গৃহস্থেরা যে ৫২ লক্ষ সাধুকে (সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে) খাদ্য দেয়—ইহা বৃথা নয়, কারণ এই 'অলস ভ্রাতৃমণ্ডলী' হইতেই মাঝে মাঝে একটি 'রামকৃষ্ণ' বাহির হইয়া আসেন, অন্য কোন সমাজ-ব্যবস্থায় এরূপ আবির্ভাব সম্ভব হইত না।

বুদ্ধগয়া হইতে তিনি কাশী ও প্রয়াগ তীর্থে যান—অতীতের ভাবটিকে পুনরায় হৃদয়ে ফিরিয়া পাইবার জন্য। আর একবার তিনি কিছুদিন রাজগীরে ছিলেন, একেবারে একলা, মগধের পাহাড়-ঘেরা রাজধানী গিরিব্রজের পাঁচটি পাহাড়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন; আমাদের জন্য এই গিরি-ব্রজেরই স্পষ্ট বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন ও য়ুয়ান্ চোয়াঙ্।...

পর্বতে এবং নদীসঙ্গমে পুণ্যতীর্থগুলির কথায় নিবেদিতা বার বার বলিতেন, 'এগুলি প্রাচীন হিন্দুদের ভৌগোলিক চেতনার নিদর্শন।' প্রকৃতি মানব-মনে সান্ত্বনা দিবার বা তাহাকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল পরিবেশ রচনা করিয়াছে—হিন্দুরা সেগুলির প্রত্যেকটি অতি দ্রুত ধরিয়া ফেলিয়াছে; এবং সেখানেই একটি মন্দির বা মঠ স্থাপন করিয়াছে—কিছু না হইলে পাথরের বেড়া দিয়া একটি বটবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে। এই স্থানটিকে অন্য স্থান হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে; *ঐ বৃক্ষ যেন দূরাগত ভক্তের পথ নির্দেশ করিতেছে।*

তাঞ্জোর, কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গমের বিরাট মন্দিরগুলির সহিত তিনি মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডের ক্যাথিড্রাল-গুলির তুলনা করিতেন। ঐ সকল আশ্রয়ে বিদ্যার্থী ও শিল্পীরা বাস করিত এবং চিরাচরিত শিক্ষাধারা ও পুরুষানুক্রমিক শিল্পশৈলী রক্ষা করিত। তিনি বলিতেন, হিন্দুভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতেও এইরূপ হইত। মন্দিরগুলির বার্ষিক রথযাত্রা জনসাধারণকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মশিক্ষা দান করিত। স্থানীয় শিল্পীরা ধর্ম-ব্যাপারে তাহাদের কার্যের জন্য গর্ব অনুভব করিত, এবং নিজেদের দৈনন্দিন কাজকে ক্ষুধার তাড়নায় বেগার বলিয়া মনে করিত না। কর্ম ও উপাসনা পাশাপাশি চলিত, একে অপরকে পবিত্র করিত। কারখানার যুগে আমরা এরূপ কিছু দেখাইতে পারি না।

নারীশিক্ষায় তাঁহার কাজ

বর্তমান ভারতের মুক্তি সাধিত হইবে একমাত্র শিক্ষাদ্বারা, মঞ্চ হইতে বক্তৃতা বা রাজনৈতিক বুলি দ্বারা নয়। এখানে তিনি শুরু করিয়াছেন—একেবারে মূল ভিত্তিতে, আমাদের গৃহকোণে, গৃহকর্ত্রীদের মধ্যে—একেবারে অ-আ-ক-খ হইতে। মানুষ তাহার মায়ের দ্বারাই গঠিত; অতএব হিন্দুসমাজ-সংস্কারকগণকে ভারতের ভবিষ্যৎ জননীদের শিক্ষার ভার শৈশবেই গ্রহণ করিতে হইবে, যখন তাহাদের মন সবচেয়ে গঠনযোগ্য,—এই উদ্দেশ্যই ছিল কলিকাতা বাগবাজারে বসুপাড়া লেনে নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের মূলে। একটি দরিদ্র, অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে তিনি একটি জীর্ণ ছোট বাড়ী ভাড়া করিলেন, এবং পাড়ার যে সব মেয়েরা জাত যাইবার ভয় না করিয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের লেখাপড়া শিখাইতেন। তাঁহার সঙ্গে আর একটি আমেরিকান সহকর্মী ছিলেন--তাঁহার নাম সিষ্টার ক্রিষ্টিন্। গৃহদ্বারে একটি ছোট সাইন বোর্ডে লেখা ছিল:

ভগিনী-নিবাস—দেখা করিবার সময়: সকাল ৭-৯টা।

আমাদের অনেক শিক্ষিত (?) দেশবাসী—লজ্জার সহিত বলিতেছি—দিনের যে কোনও সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন এবং তাঁহার ধ্যানে ও কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেন, কেহ বা চিন্তাশূন্যভাবে একজন পাকা মেমসাহেবের সহিত কথা বলিবার কৌতূহল লইয়াই উপস্থিত হইতেন, কেহ বা শেষে অর্থ সাহায্য চাহিতেন, অথবা চাহিতেন তাঁহার কিছু লেখা প্রবন্ধ বা কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির নিকট একটি পরিচয়পত্র। খুব কম লোকই তাঁহাকে টাকাকড়ি বা কায়িক পরিশ্রম দিয়া সাহায্য করিত। তাঁহার কাজ আগাইয়া চলিল—মহৎ ভাবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মাটিতে প্রবেশ করিয়া স্থিতিলাভ করিল। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় আমাদের একটি আলোকের কেন্দ্রে এবং দৃষ্টান্তস্থলে পরিণত হইল।

সমস্যা ছিল—দরিদ্র ভারতীয় মেয়েদের কিভাবে স্বল্প ব্যয়ে সর্বোৎকৃষ্ট আধুনিক শিক্ষা দেওয়া যায়—যাহাতে তাহাদের চরিত্র গড়িয়া উঠিবে এবং ভারতীয় উত্তরাধিকার হইতে বিচ্যুত না হইয়াও তাহাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি পুষ্ট হইবে, এবং সাধারণ গৃহস্থালী হইতেও তাহাদের সংযোগ ছিন্ন হইবে না। এই দুইএর মিলন কার্যে পরিণত করিতে হইলে একমাত্র প্রয়োজন সর্বদা ব্যক্তিগত যত্ন, এবং দেশ ভাষা ও স্বার্থের অতীত এক ভালবাসা, বিদ্যালয়টিকে হইতে হইবে—ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর নিজস্ব ঘর। কালক্রমে দারিদ্র্য, অজ্ঞ সমালোচনা ও স্বার্থপর কুসংস্কারের বাধার বিরুদ্ধে এই মহান্ আদর্শই জয়লাভ করিল। ভগবানের সৃষ্টিতে কোন মহৎ কার্যই বিনষ্ট হয় না, প্রতিটি ভাল বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হয়।

জার্মান নারীর জন্য হিটলারের নির্দেশ ছিল, 'Kirk, kitchen, kids'. অর্থাৎ—ধর্ম, ঘরের রান্নাবান্না ও সন্তান-পালন। নিঃসন্দেহ যে জাতি রক্ষার জন্য এগুলি প্রয়োজন, কিন্তু নিবেদিতা জানিতেন, এইগুলিই সব নয়। নারী এ সব করিয়াও উচ্চতর আদর্শ অনুসরণ করিতে পারে। একদিকে তিনি আমাদের ইঙ্গ-ভাবাপন্ন, জাতীয় ভাবশূন্য ইওরোপ-প্রত্যাগতা হিন্দুনারীদের (যাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—দ্বিতীয় শ্রেণীর ইওরেশিয়ান বলিয়া পরিগণিত হওয়া) দেখিয়া তিনি মর্মাহত হইতেন, অপরদিকে আমাদের লক্ষ লক্ষ কন্যার নিষ্পেষণকারী দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্যায়ের কবলে তাহাদের অসহায়তার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণা। আমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে হইবে। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন হইতে হইবে—এবং ভারতের স্বর্ণযুগের সেই ধারা তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করিয়া তাহাদের নবযুগের ভারতবাসীর উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হইতে হইবে—যে ভারতবাসীরা ইওরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা ও ঐহিক ঐশ্বর্য লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে। সাংসারিক পালপার্বণে শত শত লোককে খাওয়ানোর ব্যাপারে আমাদের বর্ষীয়সী গৃহিণীদের রান্না ও সংগঠন-শক্তির প্রশংসা তিনি প্রায়ই করিতেন, কিন্তু আবার আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ভারতীয় সহধর্মিণীকে তাহার স্বামীর গবেষণা লেখাতেও সাহায্য করিতে হইবে। এইখানেই পরীক্ষা!'

India, as she is, is a problem which can only be read by the light of Indian history. Only by a gradual and loving study of how she came to be, can we grow to understand what the country actually is, what the intention of her evolution, and what her sleeping potentiality may be.

* * *

If India itself be the book of Indian history, it follows that travel is the true means of reading that history.

Footfalls of Indian History—by Sister Nivedita

শৃঙ্গেরী মঠ

স্বামী আপ্তকামানন্দ

শৃঙ্গগিরি—শৃঙ্গেরী—আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রকৃতি-নির্বাচিত লীলাস্থল। শৃঙ্গেরীর গিরিশৃঙ্গ যোগিজন-আরাধিত, জ্ঞানী ভক্ত ও সাধক সেবিত, স্বাভাবিক শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতায় বিমণ্ডিত। তীক্ষ্ণধী ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রীশংকর তাঁহার আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পরে, চরম উপলব্ধির পর পরম সম্পদকে চির জাগ্রত রাখিবার জন্য ভারতের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত চতুর্থ শৃঙ্গেরী মঠ তাহাদের অন্যতম। জগদ্‌গুরু শ্রীশংকরাচার্য তাঁহার প্রধান চারিজন শিষ্যকে চারিটি মঠের অধিপতি নিযুক্ত করিয়া মঠাম্নায় ও অনুশাসনে ভারতের ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন। শংকরাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গিরি পুরী প্রভৃতি নামে অভিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠও পুরী সম্প্রদায় এবং শৃঙ্গেরী মঠের সহিত জড়িত। আবাল্য প্রাণের ইচ্ছা পুরী-সম্প্রদায়ের এই উৎপত্তিস্থানে গিয়া ঐস্থানের মাহাত্ম্য প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিব, আদিশংকরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত মঠ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিব। প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারাই আনন্দের দ্বার খুলিয়া যায়—হৃদয় মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

*　　*　　*

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই, বর্ষাকাল। তীর্থযাত্রার সংকল্প মনে উদিত হইল। মহীশূর শহর হইতে হাসান ৫৬ মাইল। ট্রেন ও বাস—উভয়ই নিয়মিতভাবে গমনাগমন করে। হাসান হইতে চিক্‌মগ্‌লুর পর্যন্ত ভাল রাস্তা, এই সময়েও বাস চলাচলের কোন অসুবিধা নাই। এখান হইতে শৃঙ্গেরী ৯০ মাইল; পথ অত্যন্ত দুর্গম। অতিরিক্ত বারিপাত-হেতু স্থানে স্থানে রাস্তা ভাঙিয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে ভালভাবে তৈয়ারী করিতে পারে নাই, কোথাও আবার মৃত্তিকার পথ। এরূপ কদর্য রাস্তায় বর্ষাকালে বাস চলাচল কিরূপ কঠিন ও বিপজ্জনক তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। কখন কোন্ দিক দিয়া বিপদ্ আসিবে—তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। স্থানে স্থানে পাহাড়ের চড়াই ও উতরাই, কোথাও পাহাড় হইতে শিলাখণ্ডের আপনবেগে পতন, কখন প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার সহসা আগমন—এ সমস্ত আকস্মিক দুর্ঘটনা তো অনিবার্য। অভিজ্ঞ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ অনুরোধ জানাইলেন, এই সময়ে শৃঙ্গেরী যাওয়ার আশা ত্যাগ করাই ভাল। নিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন হওয়া কি বুদ্ধিমানের কর্তব্য? তবুও নিরুৎসাহ হইলাম না, আশা ছাড়িলাম না। ভাবিলাম এত দেশ ঘুরিয়া কত আশা বুকে লইয়া এতদূর আগাইয়া আসিলাম, আর এখান হইতে শৃঙ্গেরী না দেখিয়া ফিরিয়া যাইব? এ কেমন করিয়া সম্ভব?

শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বাসের টিকিট কাটিলাম। হাসান হইতে শৃঙ্গেরী ১১৬ মাইল। শৃঙ্গেরী পর্যন্ত টিকিট পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল চিক্‌মগ্‌লুর পর্যন্ত। সকাল ৭॥ টায় বাস ছাড়িল। প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল ২৫ মাইল পথ আসিতে। চিক্‌মগ্‌লুর নানাদিক-অভিমুখী বাসরুটের সংযোগস্থল। বর্ষা নামিল ধীরে, মন্থরে। শৃঙ্গেরীর টিকিট কাটিতে চাহিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন—টিকিট মিলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বাসে বসিলাম। যাত্রীদের

বাক্যালাপ শুনিতে লাগিলাম। তাহাদের প্রসঙ্গ যেন আমাকে কেন্দ্র করিয়া—এইরূপই মনে হইল। একজন যাত্রী সাহসে ভর করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাইতেছেন? উত্তর দিলাম—শৃঙ্গেরী। বলিলেন,'ভোরবেলা এখান হইতে শৃঙ্গেরীর একটি বাস ছাড়ে, তাহাতে যাইলে আপনি বেলা ১১টার মধ্যে গন্তব্যস্থানে পৌছিতে পারেন, আর ইহাতে পৌছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে।' সময় থাকিতে পথ দেখা ভাল, ভাবিয়া ড্রাইভারকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'সন্ধ্যার বহুপূর্বে আপনি শৃঙ্গেরী যাইয়া আরাম করিতে পারিবেন।' সন্দেহের বেড়াজাল মনকে ঘিরিয়া বসিল। তথাপি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বেলা ১০ টায় মস্তকে ধারাবর্ষণ ধারণ করিতে করিতে বাসখানি অগ্রসর হইতে লাগিল। যাত্রীর চাপ অতিরিক্ত, যত পারে ঠাসাইয়া বসাইয়াছে, দণ্ডায়মান অবস্থাতেও ততোধিক যাত্রী। নিঃশ্বাসের উষ্মায় সমগ্র বাসখানি গরম হইয়া উঠিয়াছে। গজেন্দ্র গমনে হেলিতে দুলিতে নদী নালা, খাল বিল, জঙ্গলাকীর্ণ পথ, কদর্য কর্দমাক্ত পথ, চড়াই উৎরাই, গ্রাম অতিক্রম করিয়া বাস চলিয়াছে। লোক নামিতেছে—উঠিতেছে, বাস থামিতেছে—চলিতেছে। নীরবে বসিয়া বসিয়া কত নব নব দৃশ্য দেখিতেছি, নূতন মাঠ, সুবিশাল প্রান্তর, রকমারি মানুষের চেহারা পর্যবেক্ষণ করিয়া মনে কত ভাবের উদয় হইতেছে। মাঝে মাঝে বাক্যালাপ করিবার বাসনা মনে জাগে, প্রয়োজনের তাগিদ মনকে আকুল করিয়া তোলে। কখন কখন কৌতূহলী মন ইংরেজী ভাষায় প্রশ্ন করিয়া বসিত, উত্তর আসিত নীরস ঔদাসীন্য-মাখা। মৌন প্রকৃতিকেই অন্তরের ভালবাসা নিবেদন করিলাম, প্রণতি জানাইলাম। দ্বিপ্রহর পার হইয়া গেলে বাস এক স্থানে থামিল। অধিকাংশ যাত্রীই এখানে হোটেলে আহার করিল। আমিও কফি এবং উপমার (লবণ সহযোগে প্রস্তুত হালুয়া) সাহায্য লইলাম, তৎসহ কলা ও কমলালেবু ছিল।

একজন বিদ্যোৎসাহী উদারপ্রকৃতির লোকের সহিত আলাপ জমিয়া উঠিল। শৃঙ্গেরী মঠের অনুশাসন ও রীতিনীতি জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্রলোকের নিকট ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। মঠ-সম্বন্ধে তাঁহার প্রাঞ্জল কথাবার্তায় পরিতুষ্ট হইলাম। শ্রীশংকরাচার্য-লিখিত একখানি পুস্তকও তিনি সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন। প্রয়োজনীয় অংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

ধর্ম সনাতন। সনাতন ধর্মকে বিবিধ বিঘ্নের মধ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য মঠের আবশ্যকতা আছে। শুচিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেদাঙ্গাদি-বিশারদ, সকল শাস্ত্রের প্রয়োগকুশল সন্ন্যাসীই আচার্যপদ প্রাপ্ত হইবেন। সর্বদা মঠে বাস আচার্যের অনুচিত, তিনি নিজ নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ এলাকায় উত্তমরূপে ভ্রমণ করিবেন। আচার্যগণ বর্ণাশ্রমধর্ম ও সদাচার সর্বদা বিধিপূর্বক রক্ষা করিয়া চলিবেন। আলস্যকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মগ্লানি দূর করিতে সদা সচেষ্ট থাকিবেন। সাধুগণের ঐশ্বর্য কেবলমাত্র ধর্মরক্ষার উদ্দেশে ও বাহ্যবিষয়ে সংলগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণের উপকারের নিমিত্ত, সুতরাং পদ্মপত্রের নীতি অবশ্য পালনীয়।

রাজন্যবৃন্দ পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আচার্যগণ ধর্মতঃ অধিকার লাভ করিয়া ধর্মের জন্য প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। ধর্ম মনুষ্যগণের উন্নতির মূল কারণ, সেই ধর্ম সর্বদা আচার্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, অতএব উৎকৃষ্ট মণিসদৃশ আচার্যের

শাসন সকলের শাসন অপেক্ষা অধিক। সর্ব-প্রকার প্রযত্ন সহকারে আচার্য যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা সকলের অভিমত, বিশেষতঃ ঔদার্যপরায়ণ ব্যক্তিগণের আদরণীয়। মানবগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া আচার্যদত্ত দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পুণ্যবান লোকের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন, ইহাই অনুশাসন। বস্তুতঃ শ্রীশংকরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত চতুর্মঠের প্রত্যেকটি মঠের নিমিত্তই এই অনুশাসন প্রযুক্ত হইয়াছে।

শৃঙ্গেরীমঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নাম 'ভূরিবার'। ভূরি শব্দের অর্থ সুবর্ণ। ইহার গোত্র 'ভূর্ভুবঃ'। এই সম্প্রদায় সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই তিনটি নামে বিখ্যাত। যিনি সর্বদা বেদের স্বরজ্ঞানে রত, স্বরোচ্চারণে নিপুণ ও কবিশ্রেষ্ঠ এবং অসার সংসার-সাগরের হন্তা তাঁহার নাম 'সরস্বতী'। যিনি সকল ভার পরি-ত্যাগ করিয়া বিদ্যাভারের দ্বারা পরিপূর্ণ তিনি 'ভারতী' আখ্যায় আখ্যায়িত। যিনি জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ, জ্ঞানের উচ্চবর্ণে অবস্থিত, সর্বদা পরব্রহ্মে নিরত তাঁহাকে 'পুরী' বলে। এখান-কার ক্ষেত্রের নাম 'রামেশ্বর', দেবতা—আদি-বরাহ, দেবী—সর্বমঙ্গলদায়িনী কামাক্ষী। পৃথ্বীধর হইলেন আচার্য, তীর্থের নাম তুঙ্গভদ্রা। ব্রহ্মচারীর নাম চৈতন্য, তাঁহারা যজুর্বেদ পাঠ করেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এখানকার মহাবাক্য। আন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দেশভেদে দক্ষিণদিকৃস্থিত সমস্ত দেশ শৃঙ্গেরীমঠের অধীন। এইগুলি মঠাম্নায় বা মঠশাস্ত্র, অথবা মঠের নিয়ম-নীতি, প্রত্যেক মঠের পৃথক্ পৃথক্।

যাত্রীদের আহারাদির পর গাড়ী আবার নবোদ্যমে যাত্রা শুরু করিল। ভীষণ গর্জন করিতে করিতে ধূম উদ্গীরণ করিয়া দানবাকার বাসখানি উপরে স্বর্গে উঠিতেছে, আবার যেন পাতালপুরীতে নামিতেছে। ভদ্রলোকটি আমার পাশেই বসিলেন। গন্ন জমিয়া উঠিয়াছে; বৃষ্টির বেগও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। রাস্তার নিকটে নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, দারিদ্র্যের কঙ্কালসার উলঙ্গ মূর্তি—তাহারই মধ্য হইতে সরল সুন্দর হাস্যে লাস্যে চঞ্চল চপল বালক-বালিকা বাহির হইয়া আসিতেছে। কেহ পথি-পার্শ্বে ক্রীড়ারত, কোথাও বা একটি দল বিদ্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। সঙ্গের সাথীটি নামিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের বাহনটিও আমাদিগকে লইয়া ঘুরিয়া আকাশের দিকে উঠিতে উঠিতে হুস্ করিয়া কখন যেন থামিয়া গেল। দেখিলাম পাহাড়ের উপর প্রাকারবেষ্টিত এক প্রকাণ্ড সমতল, বাসের টার্মিনাস। তখন বেলা ৪॥টা। যাত্রীরা একে একে জিনিসপত্র লইয়া অবতরণ করিতেছেন। আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। অন্বেষণ করিলাম কোথায় শংকরমঠ, কোথায় দেবালয় ও সন্ন্যাসিগণের বাসস্থান। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কোথায় সেই মানসলোকের অভীষ্ট বস্তু চির-আকাঙ্ক্ষিত শ্রীশংকর? তাঁহার মঠ আর কতদূর?

৪ ফার্লং উচ্চ পাহাড়ের উপর মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। সঙ্গের কুলি পথপ্রদর্শক। রাজপথ চলিয়া গিয়াছে মন্দিরের গা ঘেঁসিয়া। মন্দিরদ্বারে কুলি মাথার বোঝা নামাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কপালের ঘাম মুছিয়া, ছাতা কমণ্ডলু একপাশে রাখিয়া দিয়া আমি সাষ্টাঙ্গ হইলাম। কই, মনঃপ্রাণ তো আনন্দে পরিপূর্ণ হইল না? তবে কি আমার আরাধ্যদেবতা এখানে নাই?

মন্দির দেখিয়া কেমন সন্দেহ হইল। আঙিনায় কয়েকজন সাধু বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, শৃঙ্গেরী মঠ কই? উত্তরে শুনিলাম, 'সে তো এখানে নয়, এখনও বহুদূর। ১৭ মাইল

পথ চড়াই উৎরাই করিয়া যাইতে হইবে।' 'তবে এ আমি কোথায় আসিয়াছি?' 'এ স্থানের নাম কুম্পা।' 'বাসওয়ালা আমায় কেন এখানে নামাইয়া দিল? আমার টিকিট তো শৃঙ্গেরী পর্যন্ত।' 'ঠিকই হইয়াছে, ঐ টিকিটেই অন্য বাসে আপনি যাইতে পারিবেন। আপনি যে বাসটিতে আসিয়াছেন, কুম্পাই তাহার শেষ সীমা। এইখানে পথের ধারে অপেক্ষা করুন, বাস এখনই আসিয়া পড়িবে।' হিন্দীতেই ভাব বিনিময় হইল। কুলিটি না বোঝে হিন্দী, না বোঝে ইংরেজী। তাহার সহিত ইঙ্গিতে কাজ চালাইয়া লইলাম।

বৃষ্টি পড়িতেছে অবিরাম। মেঘে মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। বর্ষণ যে থামিবে তাহার কোন লক্ষণ তো দেখা যাইতেছে না। সওয়া পাঁচটায় বাস আসিল। প্রকাণ্ড সরকারী বাস, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সৌখীন। এতবড় বাসে কয়েকজন মাত্র যাত্রী, স্প্রীংয়ের গদি আঁটা আসনগুলি অধিকাংশই খালি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিবার জন্য দরজার পার্শ্বেই বসিলাম। পাশেই বসিয়াছিলেন আর এক যাত্রী, লোকটির পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাকে গরীব বলিয়াই মনে হয়। তাহার সহিত একটি অদ্ভুত সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। যদিও ইহার সহিত এই তীর্থযাত্রার কোন সম্বন্ধই নাই, তবুও ঘটনাটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয়।

চতুর্দিকে নাতিউচ্চ পাহাড়, বর্ষাকালে মেঘদলের মাতলামির অন্ত নাই, বারিধারারও বিরাম নাই। সকলের সঙ্গেই ছাতা। সহযাত্রী মহাশয়ের ছিন্ন ছাতা আমার ছাতার পাশেই ছিল, তাহা যেন কেমন বেমানান লাগিল। আমি তখন প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন। ভরা ভাদ্র আর ভরা নদী—দুই কূল প্লাবিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ধ্যানগম্ভীর পর্বতমালা আর তারই ঝরঝরানি ঝরনা যেন বিশাল হর্ম্যকে বেষ্টন করিয়া দুলিতেছে, তালে বেতালে নাচিতেছে চলিতেছে, পথিপার্শ্বের বৃক্ষরাজিকে লতাপাতাকে যেন সম্ভাষণ জানাইতে জানাইতে চলিয়াছে তো চলিয়াছে। বাস থামিয়াছে, আমারও ভাব-বিহ্বলতা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। লক্ষ্য করিলাম আমার পাশের মানুষটি নাই, আমার ছাতাটিও নাই। পড়িয়া আছে ভগ্ন, শতছিন্ন সেই ছাতাটি। বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কণ্ডাক্টরকে বলিলাম বাস থামাইতে। বাস থামিল। কণ্ডাক্টর নামিয়া গিয়া এদিক ওদিক খুঁজিল, লোকটির কোন ঠিকানা করা গেল না গাড়ী চলিল সাবধানে। মধ্যে মধ্যে ভগ্ন রাস্তা দেখা যাইতেছে। বাহিরে বারিধারার শব্দ, ভিতরেও তাহার প্রতিধ্বনি। বাসখানি যেন চলিয়াও চলে না। যত চলিতেছে তার চেয়ে থামিতেছে বেশী। একটি ছোট বাজার, অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। বাস আসিয়া সেইখানে থামিল। পিল পিল করিয়া লোক বাসে ঢুকিয়া পড়িল। নিমিষে সমস্ত বাস ভরিয়া গেল। এজেণ্ট আসিয়া যাত্রীদের টিকিট কাটিল। যাত্রী-গণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নানাপ্রকারের মজলিস জমাইয়া তুলিল। তাহাদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা না বুঝিয়াও শুনিতে লাগিলাম। কয়েকটি চেহারা নজরে পড়িল, তাহাদের মধ্যে সারল্য ও সুমধুর ভাব লক্ষ্য করিলাম, কতকগুলি তেজোময়, দীপ্তিমান্। বৈচিত্র্যের মালমসলায় মনটি বেশ সরস স্বচ্ছন্দ উদার হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় চলিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি, কি করিতেছি সে চিন্তা মনে উদয় হইতেছে না। সহসা এক ব্যক্তি আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত, ভাল করিয়া দেখি আমার সেই সহযাত্রী মহাশয়। সেই জীর্ণ দীর্ণ বসন-পরিহিত, রুক্ষ কেশ—দারিদ্র্যের চিহ্ন

সমস্ত শরীরে ও বাহিরের আবরণে। সে অতি বিনয়সহকারে তাহার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিল, আমার নূতন ছাতাটি রাখিয়া নিজের শতছিন্ন ছাতাটি লইয়া চলিয়া গেল। তাহার সেই লজ্জিত, বিনীত, অনুতপ্ত চক্ষু দুইটি আজও আমার মনকে নাড়া দেয়। দরিদ্র হইলেও ব্যবহারে ও সত্যনিষ্ঠায় সে প্রকৃত ধনী।

* * *

শ্রীশংকর-প্রতিষ্ঠিত আর তিনটি মঠের নিয়ম ও নীতি এখানে লিপিবদ্ধ না করিলে সন্ন্যাসিগণের দশনামী সম্প্রদায়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকায় 'শারদামঠ' মঠের সম্প্রদায়ের নাম 'কীটবার'। উপাধি তীর্থ ও আশ্রম। কীটাদি জীবজন্তুগণকেও হিংসা না করায় নাম 'কীটবার'। যিনি 'তত্ত্বমস্যা'দিরূপ ত্রিবেণীসঙ্গম-তীর্থে তত্ত্বার্থভাবে স্নান করেন অর্থাৎ 'তত্ত্বমস্যা'দি প্রতিপাদ্য বস্তু অবগত আছেন তাঁহাকে তীর্থ বলা হয়। যিনি সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণে নিপুণ, যিনি আশারূপবন্ধনশূন্য ও সংসারের গতাগতি-বিরহিত তাঁহাকে আশ্রম বলা হয়। এখানকার পীঠদেবতা—সিদ্ধেশ্বর, দেবী—ভদ্রকালী, আচার্য—হস্তামলক। তীর্থ—গোমতী। ব্রহ্মচারী সামবেদীয় বক্তা, তাঁহার উপাধি 'স্বরূপ'। এই মঠের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' এবং গোত্র অবিগত। সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র এবং তন্মধ্যবর্তী পশ্চিমদিকৃস্থিত দেশসকল এই মঠের অন্তর্গত।

পূর্বপ্রান্তে পুরী জগন্নাথক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ। সম্প্রদায়ের নাম 'ভোগবার'। উপাধি বন ও অরণ্য। ক্ষেত্রের নাম—পুরুষোত্তম, দেবতা—শ্রীজগন্নাথ, দেবী—বিমলা, আচার্য—পদ্মপাদাচার্য। তীর্থ—সমুদ্র। ব্রহ্মচারীর নাম 'প্রকাশ'। মহাবাক্য—'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। এখানে ঋগ্বেদ পঠিত এবং কাশ্যপ তাঁহাদের গোত্র। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল ও বর্বর এই সমস্ত পূর্বদিকে অবস্থিত দেশসমূহ গোবর্ধন মঠের অধীন। যিনি অতি রমণীয় নির্জন বনে বাস করেন সমস্ত প্রকার আশাবন্ধন হইতে নির্মুক্ত হন তিনি 'বন' নামে অভিহিত। যিনি সমুদায় বিশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সদানন্দে নন্দনবনসদৃশ অরণ্যে বাস করেন তিনি 'অরণ্য' আখ্যায় ভূষিত। যিনি প্রাণিগণের ভোগ নিবারণ করেন সেই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় 'ভোগবার'।

ভারতের উত্তরপ্রান্তস্থিত বদরিকাশ্রমের সন্নিকট 'জ্যোতির্মঠ' বা 'শ্রীমঠ'। এই মঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নাম 'আনন্দবার'। উপাধি—গিরি, পর্বত, সাগর। ক্ষেত্র—বদরিকাশ্রম, দেবতা—নারায়ণ, দেবী—পূর্ণাগিরি, আচার্য—তোটকাচার্য। তীর্থ—অলকানন্দা, ব্রহ্মচারীর নাম আনন্দ, মহাবাক্য—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। ইহারা অথর্ববেদ পাঠ করেন, গোত্র—ভৃগু। কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কম্বোজ, পাঞ্চাল প্রভৃতি উত্তরদিকে অবস্থিত দেশসমূহ জ্যোতির্মঠের অধীন। যিনি পার্বত্যবনে বাস করেন, সর্বদা গীতাপাঠে নিরত, গম্ভীর ও স্থিরবুদ্ধি তাঁহার নাম 'গিরি'। যিনি পর্বতমূলে বাস করিয়া দৃঢ় জ্ঞান ধারণ করেন, যাঁহার নিত্যানিত্য-বিবেকজ্ঞান আছে তাঁহাকে 'পর্বত' বলে। যিনি তত্ত্ববিষয়ে সাগরবৎ গম্ভীর, যিনি জ্ঞানরূপ রত্ন ধারণ করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রমর্যাদা কখন লঙ্ঘন করেন না তিনি 'সাগর' বলিয়া কথিত হন। এই সম্প্রদায় জীবগণের আনন্দ ও বিলাস বারণ করেন বলিয়া 'আনন্দবার' নামে খ্যাত।

* * * *

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বর্ষণ বাড়িল ভীষণভাবে মুষলধারে। যেমনি

হৃদয়বিদারক মেঘগর্জন তেমনি ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি পড়ার শব্দ—যেন যাত্রীসহ বাসখানিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে চায়। এই অসীম শক্তিশালী এত বড় দানবতুল্য মোটরখানিকে নিশ্চল করিয়া দিয়াছে, বদ্ধ প্রাণীগুলি স্পন্দহীন জড়বৎ তাহারই অভ্যন্তরে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সহসা এক তুমুল ঝড় উঠিল, তিমিরাবরণ অপসারিত হইয়া পথঘাট পরিষ্কারভাবে দৃষ্ট হইল। বাস চড়াই উৎরাই অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। গ্রাম শহর নদী নালা পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ীখানি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। দেখিতে দেখতে আমরা শৃঙ্গেরীর পদপ্রান্তে উপনীত হইলাম। ঘড়িতে পৌনে সাতটা।

বাজার পরিক্রমা করিয়া বাস অতিথি-ভবনের সম্মুখে আসিল। ড্রাইভার বলিল, 'এই শৃঙ্গেরী মঠ, নামিয়া আসুন'। ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর দুইজনে মিলিয়া আমার বিছানাপত্র অতিথি-ভবনের বারান্দায় নামাইয়া দিল। দ্বিতল পাকা বাড়ী। ম্যানেজার মহাশয় উপরের একটি ঘরে স্থান করিয়া দিলেন। আধুনিক কায়দায় বাড়ীটি নির্মিত হইয়াছে। নিম্নে—সম্মুখে পশ্চাতে বারান্দা, মধ্যে হলঘর ও দুই পার্শ্বে তিনখানি করিয়া ছয়খানি ঘর, উপরেও ঐ প্রকার, কেবল সম্মুখে বারান্দা নাই। সমস্ত বাড়ীটিতে অতিথির মধ্যে আমি একা। মেঘাবৃত আকাশের জন্য সন্ধ্যা হইয়াছে মনে হইতেছে, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে এখনও অনেক দেরি। অতিথিদের নিমিত্ত পৃথক রন্ধনশালা। পাচক আসিয়া সন্ধান লইয়া গেল আমরা সংখ্যায় কতজন। স্নানাহ্নিক সারিয়া পরিষ্কার বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বৃষ্টির ধারাও বাড়িয়া চলিল। ছাতা মাথায় দিয়াও ভিজিতে ভিজিতে সমস্ত মন্দির পরিক্রমা করিলাম—বিদ্যাশংকর, সারদা-আম্বা, আদিশংকর, শংকর ও জনার্দন মন্দির। পথিপার্শ্বে আচার্যদেবের বাসস্থান। তুঙ্গার অপর পারে আচার্যদের সমাধিস্থান। প্রাচীনকালে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এই স্থানে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। তুঙ্গার তীরে সত্যপিপাসু তত্ত্বদর্শিগণ জ্ঞানচর্চায় কালাতিপাত করিতেন। শ্রেষ্ঠ সাধু মহাত্মাগণ ধ্যানধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন। আধ্যাত্মিক প্রবাহ দেশদেশান্তরের সুধী-সজ্জনের হৃদয়কে সদাই আকর্ষণ করে।

সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে, গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিয়া উঠিল। আরতির কাঁসর ঘণ্টা রসুনচৌকি বাজিল। মন্দির ব্যতীত সর্বত্র বৈদ্যুতিক আলোক। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শান্তরসাস্পদ আশ্রমটির মাধুর্য পান করিতে লাগিলাম। মঠাধীশ ও দেবতাগণকে হৃদয়ের আকুতি জানাইলাম। তাঁহাদের প্রসন্ন দৃষ্টি, করুণা ও কৃপা ভিক্ষা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। মন্দিরের কার্যালয়ে আসিয়া কার্যাধ্যক্ষের সহিত আলাপ করিলাম। আদর ও যত্নে আপ্যায়িত করিয়া পরিতোষ সহকারে প্রসাদ খাওয়াইলেন। আচার্যদেবের সহিত দেখা করিতে চাহিলাম, শুনিলাম তিনি তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইয়াছেন।

রাত্রে সুনিদ্রার পর সকালে শরীর মন অধিকতর সুস্থ স্বচ্ছন্দবোধ করিলাম। ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান জমিয়া উঠিল। চতুষ্পার্শ্বে স্তব্ধ শীতল পরিবেশ। আনন্দের রেশ প্রাণকে মাতাইয়া তুলিল। স্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকালে স্নানান্তে দেবালয়ে গিয়া দক্ষিণী কায়দায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। মুগ্ধচিত্তে বিদ্যার্থীদের আচারনিষ্ঠা, পূজার্চনা দেখিতে লাগিলাম। মন্দিরের মধুরিমা, ঈশ্বরের মহিমা, সাধকগণের সাধনসম্পদ এ স্থানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশাইয়া আছে। কুলকুলনাদিনী তুঙ্গা শিখর হইতে শিখরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাহার সনাতন ধারা সাধককুলের সাধনার ধারার সহিত মিশিয়া গলিয়া যেন একাকার হইয়া আছে। গিরিমালা-পরিবেষ্টিত, চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শৃঙ্গেরী একটি সুন্দর উপত্যকা। দূরে পর্বতচূড়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া দূরাগত সন্তানদের আশ্বাস দিতেছে, কোলে তুলিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিতেছে, বলিতেছে, 'এমন পবিত্র সাধনার অনুকূল পরিবেশ পাইবে কোথায়? এস, এখানে এস, শান্ত মনে আসনে উপবিষ্ট হও, ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাও, স্ব-স্বরূপে অবস্থান কর।'

গোস্বামী তুলসীদাস ও নামসাধন

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

গোস্বামী তুলসীদাস যখন ৺কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সে পূর্বে হত্যাদি পাপ করিয়াছিল। কিন্তু অনুশোচনার পর নূতন জীবন আরম্ভ করে। সে 'রাম' নাম করিত।

একদিন ভিক্ষা করিতে করিতে সে গোস্বামীজীর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে স্নান করাইয়া নিজের সঙ্গে বসাইয়া খাওয়ান। ইহাতে ৺কাশীর ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে তীব্র সমালোচনা হয়। ব্রাহ্মণগণ সভা করিয়া গোস্বামীজীকে অপমানিত করেন। তুলসীদাস বলেন যে এ ব্যক্তি 'রাম' নাম করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঐ খুনীর প্রায়শ্চিত্ত বিধানের পক্ষপাতী ছিলেন। তুলসীদাস 'রাম' নামকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্রতাবিধায়ক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কাজেই সেই ব্যক্তিকে পবিত্র মনে করিয়া এক সঙ্গে আহারাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তুলসীদাসের ব্যবহারকে শাস্ত্রবিগর্হিত ও হেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্রে আছে :

'স্মৃতিকীর্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্তৌ প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ।'

—ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্তন করা আর্তগণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

'ভূয়সামননুষ্ঠিতিরিতি চেন্নাপ্রয়াণমুপসংহারান্ মহৎস্বপি।'

—যদি বল যে আর্তগণ বহুপ্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করে না; তদুত্তরে এই বলিতে হইবে যে তাহা নহে, কারণ আমরণ ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্তন মহাপাপসমূহেরও প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

'লঘ্বপি ভক্তাধিকারে মহৎক্ষেপকমপরসর্বহানাৎ।'

ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্তন অল্পায়াসসাধ্য হইলেও উহা মহাপাতক বিনাশ করিয়া থাকে। কেননা; ভক্তগণের পক্ষে অন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই।

তুলসীদাস যখন ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে বলেন যে এ ব্যক্তি 'রাম' নাম করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, "এ ব্যক্তি পাপমুক্ত তার প্রমাণ কি?" তখন সভাস্থিত কোন কোন ব্যক্তি বলিলেন যে যদি এই ব্যক্তি ৺বিশ্বনাথজীর মন্দিরের পাশে প্রস্তরমূর্তি নন্দীকে নিজহস্তদ্বারা খাওয়াইতে পারে, তবেই আমরা বিশ্বাস করিব যে সে পাপমুক্ত হইয়াছে। তুলসীদাস সেই ব্যক্তিকে ৺বিশ্বনাথজীর মন্দিরে লইয়া যান এবং তাহার হস্তে কিছু ভোজ্য দ্রব্যের সংগ্রহ করান। পরে ঐ ব্যক্তিকে তিনি উহা প্রস্তরমূর্তি নন্দীর সম্মুখে ধরিতে বলেন। হঠাৎ সেই মূর্তি জীবন্ত হইয়া সকল ভোজ্য নিঃশেষিত করে। এই ঘটনায় সকলে স্তম্ভিত হন এবং গোস্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একদিন জনৈক সাধনহীন সাধু 'অলখ অলখ' শব্দ চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে তুলসীদাসের কাছে উপস্থিত হন। 'অলখ' শব্দের অর্থ—যিনি ইন্দ্রিয়াতীত, বাক্য-মনের অগোচর। প্রথমতঃ তুলসীদাস ঐ রকম চীৎকার শুনিয়া কিছু বলেন নাই। তারপর যখন সেই সাধু গোস্বামীজীর সামনে বারবার চেঁচাইতে আরম্ভ করেন, তখন গোস্বামীজী একটি দোঁহাতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,

'হম লখি লখহি হমার লখি হাম হমার কে বীচ।
তুলসী অলখহি কা লখহি রাম নাম জপু নীচ।'

হে সাধু! তুমি আগে নিজের স্বরূপ কি তাহা জান। পরে ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব কর। তারপর তোমার ও ব্রহ্মের মধ্যে যে মায়া আছেন তাহাকে চেন। ওরে নীচ! তুমি এই তিনটির উপলব্ধি না করিয়া 'অলখকে' কেমন করিয়া বুঝিবে? 'অলখ' 'অলখ' চীৎকার করা ছাড়িয়া 'রাম' নাম জপ কর। ইহা শুনিয়া সাধুর টনক নড়িল এবং তিনি গোস্বামীজীর চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন।

তুলসীদাস তাঁহার নামসাধনের কথা নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন :

'ভরোসো জাহি দূসরো সো করো। ·
মোকো তো রামকো নাম কলপতরু কলিকল্যাণ করো॥'

—যাহার যাহাতে ভরসা সে তাহাই করুক। আমার পক্ষে এই কলিযুগে রামনামই কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ। তাহাতে কল্যাণরূপ ফল ফলিয়াছে।

'করম উপাসন গ্যান বেদমত সো সব ভাঁতি খরো।
মোহি তো 'সাবনকে অংধহি' জ্যোঁ সুঝত রংগ হরো॥'

—যদিও কর্ম,উপাসনা এবং জ্ঞান এসব বৈদিক মত সর্বথা উত্তম, কিন্তু শ্রাবণ মাসে লোক অন্ধ হইলে যেমন সবই হরিত দেখে, আমিও তদ্রূপ এক রাম নামই দেখি।

'চাটত রহ্যো স্বান পাতরি জ্যোঁ কবহুঁ ন পেট ভরো।
সো হৌঁ সুমিরত নাম-সুধারস পেখত পরুসি ধরো॥'

—আমি কুকুরের মত অনেক উচ্ছিষ্ট পাতা চাটিয়া বেড়াইয়াছি। কিন্তু কখনও আমার পেট ভরে নাই। আজ আমি নাম স্মরণ করিয়া অমৃত রস প্রস্তুত রহিয়াছে, দেখিতেছি।

'স্বারথ ঔ পরমারথহু কো নহি কুংজর-নরো।
সুমিরত সেতু পয়োধি পষাননি করি কপি-কটক তরো॥'

—আমার পক্ষে রাম নাম মুক্তিরূপ স্বার্থ এবং ভগবৎপ্রেমস্বরূপ পরমার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে ইহা হস্তী কি মনুষ্য। আমি শুনিয়াছি যে এই নামের প্রভাবে বানরের সেনা পাথরের সেতু তৈরী করিয়া সমুদ্র পার হইয়াছিল।

'প্রীতি-প্রতীতি জহাঁ জাকী, তহঁ তাকো কাজ সরো।
মেরে তো মায়-বাপ দোউ আখর হোঁ সিসু-অরণি অরো॥'

—যাহাতে যাহার প্রেম ও বিশ্বাস থাকে, তাহাতেই তাহার কাজ সফল হয়। 'রা' ও 'ম' এই দুই অক্ষর আমার মা ও বাবা। আমি এই মা ও বাবার কাছে শিশুর মত জিদ্ করিয়া থাকি।

'সংকর সাখি জো রাখি কহোঁ কছু তৌ জরি জীহ গরো।
অপনে ভলো রামনামহি তে তুলসিহি সমুঝি পরো॥'

—যদি আমি কিছুমাত্র গোপন করিয়া বলিয়া থাকি, তাহা হইলে ভগবান শঙ্কর যেন সাক্ষী থাকেন। আমার জিহ্বা জলিয়া বা গলিয়া যেন খসিয়া পড়ে। আমার এই হৃদয়ঙ্গম হয় যে নিজের কল্যাণ একমাত্র রামনামেই হইতে পারে।

তুলসীদাসের জীবনে বহু ঘটনা আছে—যাহাতে নামেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। তিনি বহুশাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন এবং দার্শনিক প্রতিভা ও কবিত্ব তাঁহার 'রামচরিত-মানসে' প্রকটিত হইয়াছে। সাধারণ মানুষ যাহাতে শীঘ্র ধর্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে এমনভাবে যুগোপযোগী উপদেশ তাঁহার লেখনীতে যাহা বাহির হইয়াছে তাহার তুলনা বিরল।

শূদ্রজাতি ও বেদপাঠ

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

বেদাঙ্গবিহিত ক্রম ও স্বরাদিবিহীন বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার

সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি এবং পৈলপ্রমুখ শিষ্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত পরাশরাত্মজ মহামুনি বেদব্যাস হিমাচলে স্বীয় আশ্রমে সুখাসনে উপবিষ্ট। সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে সমাবর্তনের প্রাক্‌কালে সুমন্তুপ্রমুখ শিষ্যগণ কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীগুরুসমীপে প্রার্থনা জানাইলেন— "কাঙ্ক্ষামস্তু বয়ং সর্বে বরং দত্তং মহর্ষিণা। ষষ্ঠঃ শিষ্যো ন তে খ্যাতিং গচ্ছেদত্র প্রসীদ নঃ ॥ চত্বারস্তে বয়ং শিষ্যা গুরুপুত্রশ্চ পঞ্চমঃ। ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্ ন এষঃ কাঙ্ক্ষিতো বরঃ ॥ (মহাভাঃ[১] শান্তিঃ ৩২৭।৪০—৭১)— "মহর্ষি কর্তৃক এই বর প্রদত্ত হউক যে—আপনার ষষ্ঠশিষ্য [বেদজ্ঞরূপে] প্রসিদ্ধি লাভ করিবে না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মহর্ষি আমাদিগের উপর প্রীত হউন। আমরা চারিজন আপনার শিষ্য, আর গুরুপুত্র (শুকদেব) আপনার পঞ্চম শিষ্য। বেদসকল এই পাঁচজনেই প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থিত বর।"

মেধাশক্তির ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ অবস্থা বশতঃ একই ব্যক্তির পক্ষে যখন বহুশাখাযুক্ত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন ও রক্ষা করা সম্ভব হইতেছিল না, সেই সময় যুগাচার্য পূজ্যপাদ বাদরায়ণ বেদব্যাস ঋত্বিগ্‌গণের আবশ্যকতানুযায়ী চারিভাগে বিভক্ত করতঃ বেদরাশিকে রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন। বৈদিক যজ্ঞসকল চারিজন প্রধান ঋত্বিক্ দ্বারা সম্পাদিত হয়। যজ্ঞকালে "হোতা" নামক ঋত্বিক্ যে বেদভাগের প্রয়োগ করেন, তাহাকে বলা হয়—'ঋগ্বেদ'[২]। বেদবিভাগকর্তা আচার্য ব্যাসদেব স্বশিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ শিক্ষাদান করেন।

---

১ মহাভারতের উদ্ধৃতিসকল বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে নীলকণ্ঠি-টীকাসহ প্রকাশিত মূল মহাভারত হইতে প্রদত্ত হইল।

২ পাশ্চাত্যের মতানুশীলনকারী ইদানীন্তনকালীন সুধীমণ্ডলী বলেন— বেদসকলের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; সামবেদ ও যজুর্বেদ প্রভৃতি তাহার পরবর্তিকালে বিভিন্ন ঋষিগণ কর্তৃক রচিত। ঋগ্বেদ প্রভৃতির মধ্যে তাঁহারা প্রাচীন আর্যজাতির ইতিহাসেরও অনুসন্ধান করেন। এতদ্দেশীয় বৈদিক মনীষিগণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—বেদ নিত্যবস্তু, কাহারও রচিত নহে। নবকল্পারম্ভে প্রথম শরীরী ব্রহ্মার স্মৃতিপথে ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা প্রথমে উদিত হয়, পরে ইহা সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ এবং তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্য ও সন্তান-সন্ততিক্রমে মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে। বস্তুতঃ দ্বাপরের শেষভাগে আচার্য বেদব্যাস কর্তৃক চারিভাগে বিভক্ত হইবার পূর্বে বেদরাশি সংপিণ্ডিতাকারে একই ছিলেন। তখন ঋগ্বেদ সামবেদ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ ও নাম ছিল না। প্রত্যেক তত্ত্বৎ ব্যক্তি সংপিণ্ডিতাকার অবিভক্ত সেই বেদরাশিকে সামর্থ্যানুযায়ী সমগ্রভাবে অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ ও ধারণ করিতেন। সুতরাং অমুক বেদটা ব্রহ্মা বা অমুক ঋষি বা অমুক অমুক ঋষিগণ প্রথম রচনা করেন, এই প্রকার পরিস্থিতি সংঘটিত হয় না। বেদ যে নিত্য তাহা বেদ স্বয়ংই বলিয়াছেন, যথা—"বিরূপ নিত্যয়া বাচা বৃষ্ণে চোদস্ব" (ঋক্‌সং ৮।৭৫।৬)—হে বিরূপ, নিত্যবাণীর (উৎপত্তিরহিত বেদমন্ত্রের) দ্বারা বারিবর্ষণকারী অগ্নিদেবতার স্তুতি কর। "যজ্ঞেন বাচম্ পদবীয়ম্ আয়ন্ তাম্ অন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ (ঋক্‌সং ১০।৭১।৩)—'যজ্ঞের দ্বারা বাক্যের (বেদের) পদবীয়কে (—লাভযোগ্যতাকে) প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণের মধ্যে প্রবিষ্ট (—পূর্ব হইতে অবস্থিত) সেই বেদকে যাজ্ঞিকগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি। ইতিহাস হইতেও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—'আদি ও অন্তবিহীন যে নিত্যা বেদময়ী বাণী, যাহা হইতে সকল প্রকার প্রবৃত্তি হয়, তাহা প্রথমে (—নবকল্পারম্ভে) স্বয়ম্ভু কর্তৃক উচ্চারিত (—শিষ্যপ্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রবর্তিত) হইয়াছে—মহাভাঃ শাঃ ২৩১।৫৬—৫৭)। পূর্ব-মীমাংসা (১।১।৮)। বেদাপৌরুষেয়ত্বাধিকরণ এবং উত্তরমীমাংসা "অতএব চ নিত্যত্বম্" (ব্রঃসূঃ ১।৩।২১) ইত্যাদি স্থলে বেদের অপৌরুষেয়তা ও নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদে বিভিন্ন ঋষির নামদৃষ্টে সেই ঋষিগণকে বেদের রচয়িতা বলিয়া ভ্রম করা উচিত নহে। কালক্রমে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক প্রচারিত বেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে, সেই সেই ঋষিগণ তপস্যা প্রভাবে সেই সেই বেদ, বা মন্ত্র প্রভৃতি লাভ করেন, ইহাই সেই স্থলে তাৎপর্য। ইতিহাস হইতেও ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"[পূর্বকালে যাহা বিদ্যমান ছিল] যুগান্তে অন্তর্হিত ইতিহাসের সহিত সেই বেদসকলকে ঋষিগণ তপস্যা প্রভাবে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক অনুজ্ঞাত (—উপদিষ্ট) হইয়া লাভ করিয়াছিলেন" (মহাভাঃ শাঃ ২১০।১৯)। সাক্ষাৎ বেদে এবং বেদ যাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র, তাঁহাদের অন্যান্য শাস্ত্রে পঠিত এই সকল প্রমাণকে এবং তাঁহাদের বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত এতন্মূলক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা বলেন—অমুক বেদ এতকাল পূর্বে রচিত, তাহার পর অমুক বেদটি রচিত, অমুক বেদ হইতে আর্যজাতির এতাদৃশ ইতিহাস প্রাপ্ত হাওয়া যায়, ইত্যাদি; তাঁহাদের অভিমত কতটা গ্রহণীয় তাহা চিন্তার বিষয়।

অধ্বর্যু নামক ঋত্বিক্ যজ্ঞকালে যে বেদভাগের প্রয়োগ করেন, তাহাকে বলা হয়—যজুর্বেদ, বৈশম্পায়নকে তিনি 'যজুর্বেদ' শিক্ষাদান করেন। উদ্‌গাতা নামক ঋত্বিক্ যে বেদভাগের প্রয়োগ করেন, তাহাকে বলা হয়—'সামবেদ'। জৈমিনিকে তিনি সামবেদ প্রদান করেন। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকের জ্ঞাতব্য বেদভাগের নাম—'অথর্ববেদ' [যজ্ঞকালে যিনি ব্রহ্মানামক ঋত্বিকের কার্য করেন, তাঁহাকে বেদচতুষ্টয়ে বিহিত কর্মকলাপে অভিজ্ঞ হইতে হয়]। সুমন্তকে তিনি 'অথর্ববেদ' শিক্ষাদান করেন। যাহা হউক, এইভাবে সাঙ্গবেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে বেদব্রতক্লিষ্ট যোগ্য যুবক শিষ্যগণ ইহলৌকিক অভ্যুদয়কামী হইয়া যখন শ্রীগুরুর নিকট এতাদৃশ বর প্রার্থনা করিলেন, তখন আচার্য ব্যাসদেব বেদরাশির এতাদৃশ কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কারণ বেদরাশিকে রক্ষা করা ও তাহার প্রচার করাই ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত। অথচ উচ্চাভিলাষী যোগ্য ও প্রিয় শিষ্যগণকে তিনি বিমুখ করিতে পারিলেন না, উক্ত প্রার্থিত বর তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল। কিন্তু তৎকালেই এই বেদরাশিকে কি ভাবে প্রচার ও রক্ষা করিতে হইবে, বেদগ্রহণের উপযুক্ত শিষ্য কি প্রকারে নির্বাচন করিতে হইবে, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়সকলও তিনি প্রিয় শিষ্যগণকে বলিতে ভুলিলেন না। এই প্রসঙ্গেই আচার্য ব্যবস্থা প্রদান করিলেন,

শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯)

—ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে স্থাপনকরতঃ চারিবর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইবে। এই যে বেদের অধ্যয়ন, ইহা মহৎ কার্যরূপে স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

লক্ষ্য করিতে হইবে—এই স্থলে বেদবিদ্ আচার্য বর্ণচতুষ্টয়কেই বেদশ্রবণ করাইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। শূদ্রজাতিও এই বর্ণচতুষ্টয়ের অন্তর্গত, সুতরাং আচার্য শূদ্রেরও বেদশ্রবণে অধিকার স্বীকার করিলেন, ইহাই প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? উপনয়ন-সংস্কার ব্যতিরেকে কাহারও বেদাধ্যয়নে অধিকার হয় না। শ্রুতিতে "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, একাদশবর্ষং রাজন্যং, দ্বাদশবর্ষং বৈশ্যম্," এইভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির জন্যই উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, শূদ্রের জন্য তাহা হয় নাই। স্মৃতিও তাহাই বলেন—"শূদ্রঃ চতুর্থঃ বর্ণঃ একজাতিঃ," (মনুসং ১০।১২৬)—শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, তাহার জাতি (জন্ম) একটি, অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা তাহার দ্বিতীয় জন্ম হয় না। সুতরাং শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। আর "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" (মনুসং ৪।৮০)—'শূদ্রকে বেদার্থজ্ঞান দান করিবে না', এইভাবে নিষেধও পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবার এমন কি শূদ্রের নিকটেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা—"এই যে শূদ্র [বেদহীনতাবশতঃ] ইহা চলমান শ্মশানসদৃশ, সেইহেতু শূদ্রের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে না (বামনধর্মসূত্র ১৮।১১ ? বাশিষ্ঠসং ১৮ অঃ)। "সমীপবর্তী স্থান হইতে [৩] বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণবিবর সীসক ও গালাদ্বারা পরিপূরণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য"

৩ গৌতমধর্মসূত্রের মস্করিভাষ্যে কথিত হইয়াছে—পঞ্চমবর্ষের উর্ধ্ব বয়স্ক শূদ্র যদি বুদ্ধিপূর্বক [ভ্রমবশতঃ নহে] সন্নিকৃষ্টস্থান হইতে 'সাঙ্গবেদ' শ্রবণ করে, তবেই উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, অন্যথা নহে। 'সাঙ্গবেদ' বলিতে ষড়ঙ্গসহ বেদকে বুঝিতে হইবে। সেই অঙ্গ ছয়টি এই—১। শিক্ষা—ইহা স্বর ও ক্রমাদিবিধায়ক শাস্ত্র। ২। কল্প—ইহাতে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ৩। ব্যাকরণ। ৪। নিরুক্ত—বৈদিক অভিধান। ৫। ছন্দঃ—গায়ত্রী উষ্ণিক্ ইত্যাদি ছন্দোবোধক শাস্ত্র। ৬। জ্যোতিষ।

(গৌতমধর্মসূত্র ১২।৪)—বেদশ্রবণ করিলে শূদ্রের জন্য এতাদৃশ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও পরিদৃষ্ট হয়। উত্তরমীমাংসার ১।৩।৩৮ সূত্রের শারীরকভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যাহার সমীপেও বেদ অধীত হওয়া উচিত নহে, সে কি প্রকারে শ্রবণ না করিয়া [বেদ] অধ্যয়ন করিবে? এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও আচার্যগণের অভিমত দৃষ্টে শূদ্রজাতির বেদশ্রবণে ও বেদপাঠে অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। "বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রঃ তস্মাৎ বেদং ন সন্ন্যসেৎ" (বাশিষ্ঠ সং ১০)—"বেদ ত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেইহেতু বেদ ত্যাগ করিবে না," ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে বেদত্যাগই শূদ্রত্ব প্রাপ্তির হেতু। সুতরাং শূদ্রও হইবে, বেদপাঠও করিবে [৪] এই প্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে। অথচ বেদবিদ্ আচার্য উক্ত শ্লোকে শূদ্রকেও বেদশ্রবণ করাইবার ব্যবস্থা প্রদান করিলেন, ইহার তাৎপর্য কি?

কেহ কেহ বলেন—এইস্থলে 'বেদ' শব্দে মহাভারত ও পুরাণ গ্রহণীয়

এতাদৃশ পরিস্থিতিতে কেহ কেহ বলেন—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" (মহাভাঃ ৩২৭।৪৯) ইত্যাদি শ্লোকে 'বেদ' শব্দের অর্থ—পঞ্চমবেদ মহাভারত ও পুরাণ, কারণ "ইতিহাসঃ পুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২০), এই প্রকার বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার "দমগুণযুক্ত পঞ্চশিষ্যকে মহাভারত যাহাতে পঞ্চম স্থানীয় সেই বেদ সকল অধ্যাপন করিয়াছিলেন" (মহাভাঃ শাঃ ৩৪০।২০-২১) ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যে আচার্য ব্যাসদেব উক্ত পঞ্চশিষ্যকে বেদের সহিত পঞ্চমবেদ মহাভারতও অধ্যাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারতের উক্ত শ্লোকটীতে যে বেদশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ হইবে—মহাভারত ও পুরাণরূপ পঞ্চমবেদ। এই প্রকার অর্থ স্বীকার করিলেই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের এবং আচার্যগণের এতদ্বিষয়ক নির্ণয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। অতএব ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে স্থাপনকরতঃ চারিবর্ণকে মহাভারত ও পুরাণ শ্রবণ করাইবার ব্যবস্থাই আচার্য উক্ত শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন, মুখ্য বেদের কোন প্রসঙ্গই উক্ত স্থলে নাই, ইত্যাদি।

উক্ত শ্লোকে পঠিত 'বেদ' শব্দের মহাভারত ও পুরাণরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করা যায় না

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলা যায়—বেদ মনুষ্যগণের পরম শ্রেয়োলাভের উপায় নির্দেশ করেন, সেইহেতু তাহা শ্রেয়োলাভের প্রতি সাধন। "স্ত্রী শূদ্র ও অনাচারী ত্রৈবর্ণিকগণ যাহাতে বেদানুগ ধর্মের অনুষ্ঠান করতঃ শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন, সেই উদ্দেশ্যে মুনি (আচার্য ব্যাসদেব) কৃপাপরবশ হইয়া মহাভারতরূপ আখ্যান [অথবা ভারত ও আখ্যান অর্থাৎ মহাভারত ও পুরাণ] রচনা করিয়াছেন" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫)। সুতরাং ইহা নিশ্চিত হয় যে মহাভারত ও পুরাণেও শ্রেয়োলাভের উপায় সকল বর্ণিত হইয়াছে। অতএব বেদের ন্যায় 'শ্রেয়োসাধনতারূপ গুণযুক্ত হওয়ায়

---

[৪] "হে দেবি, এই সকল কর্ম ও শুভ আচরণসকলের দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত হয়, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়"। "আচরণে অবস্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত হয়" (মহাভাঃ অনুঃ ১৪৩,২৬,৫১ ইত্যাদি)। "জাতিপরিবর্তনে ধর্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্টবর্ণ পূর্ব পূর্ব বর্ণভাব প্রাপ্ত হয়। জাতি পরিবর্তনে অধর্মাচরণ দ্বারা পূর্ব পূর্ব বর্ণ নিকৃষ্ট বর্ণভাব প্রাপ্ত হয়"। (আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র ২।৫।১১।১০-১১) ইত্যাদি এই প্রকার বহু শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়—প্রাচীনকালে শুভাচরণের ফলে শূদ্র ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইতেন। [এই বিষয়ে উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৬০ "জাতিভেদের মূলকথা ও ক্রমপরিণতি" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য] কিন্তু যখন শূদ্র ব্রাহ্মণত্বের স্তরে উন্নীত হইতেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণই হইয়া পড়িতেন, শূদ্র আর থাকিতেন না। সুতরাং সেই অবস্থায় শূদ্রের পক্ষে প্রযোজ্য বেদাধ্যয়ন-বিষয়ক নিষেধও তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য হইত না। কিন্তু তিনি শূদ্রও থাকিবেন, বেদও অধ্যয়ন করিবেন, এই প্রকার পরিস্থিতি সম্ভব হয় না, ইহাই আমরা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

মহাভারত ও পুরাণকেও গৌণভাবে বলা হয় 'বেদ'। কিন্তু "শক্যার্থ গ্রহণ সম্ভব হইলে লাক্ষণিকার্থের (—গৌণার্থের) গ্রহণ অসঙ্গত"—ইহা মীমাংসাসম্মত ন্যায়। উক্ত ন্যায়ানুসরণকরতঃ এক্ষণে আমরা দেখিব, এই স্থলে 'বেদ' শব্দের শক্যার্থ গ্রহণ করা যায়, কিনা। "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" এই শ্লোকে পঠিত 'বেদ' শব্দটির শক্যার্থরূপে মুখ্য বেদকেই যে গ্রহণ করা হইয়াছে,সেই বিষয়ে **প্রথম যুক্তি** এই—উক্ত প্রকরণের উপক্রমে 'বেদান্ অধ্যাপয়ামাস ব্যাসঃ শিষ্যান্ মহাতপাঃ' (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।২৬) এইস্থলে মুখ্য বেদরূপ অর্থেই 'বেদ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে, কারণ উপসংহারে "স্তুত্যর্থম্ ইহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা" (ঐ ৩২৭।৫০)—'দেবগণের স্তুতির জন্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক বেদসকল সৃষ্ট (উচ্চারিত) হইয়াছিল', এইস্থলে মুখ্যবেদ-অর্থেই বেদ শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু নবকল্পারম্ভে ব্রহ্মাকর্তৃক মুখ্য বেদই উচ্চারিত হইয়াছিলেন, বেদব্যাসকৃত মহাভারত ও পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ নহে। অতএব উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা-বলে মুখ্য বেদই যে এইস্থলে বেদ শব্দের অর্থ, ইহাই নির্ণীত হয়। এই বিষয়ে **দ্বিতীয় যুক্তি** এই—উক্ত স্থলেই পঠিত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্মশুশ্রূষবে তথা" (ঐ ৩২৭।৪৩)—"এই বেদ ব্রাহ্মণকে সদাই দান করিবে, আর যিনি 'ব্রহ্মকে' শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেও দান করিবে।" এইস্থলে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম' শব্দটির অর্থ 'মুখ্য বেদ', ['বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম"—অমরকোশ, নানার্থবর্গ]। এইস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দে জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তুকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ তিনি এই প্রকরণে প্রস্তাবিত হন নাই, পরন্তু মুখ্য বেদই যে এই প্রকরণের প্রস্তাবিত বিষয়, ইহা উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বিষয়ে **তৃতীয় যুক্তি** এই—"ব্রহ্মলোকে নিবাসং যে ধ্রুবং সমভিকাঙ্ক্ষতে" (ঐ ৩২৭।৪৪)—যাঁহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘকাল বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বেদশ্রবণেচ্ছুগণকে বেদদান করিবেন, এইস্থলে নিয়মপূর্বক স্বাধ্যায়ানুশীলনকারীর (বৈধ বেদাধ্যায়নকারীর) ব্রহ্মলোকলাভরূপ ফল বর্ণিত হইয়াছে ["শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য উঃ ৮।১৫।১ দ্রষ্টব্য]। মহাভারত ও পুরাণ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোকলাভরূপ ফল হয়, ইহা কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং এইস্থলেও বেদশব্দের মুখ্যবেদরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে **চতুর্থ যুক্তি** এই—"ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২২)—'আমার পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাস (—মহাভারত) ও পুরাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন', এই বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়—মহর্ষি রোমহর্ষণ আচার্য বেদব্যাসের নিকট ইতিহাস ও পুরাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। আর তিনি ও তাঁহার পুত্র ও শিষ্য মহর্ষি সূত ইতিহাস ও পুরাণের বক্তা ও ব্যাখ্যাতা-রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন পুরাণ ও ইতিহাসই সেই বিষয়ে প্রমাণ। মহাভারতের প্রস্তাবিত স্থলে জৈমিনি প্রভৃতি ব্যাস-শিষ্যগণ বর প্রার্থনা করিলেন, "ষষ্ঠঃ শিষ্যঃ ন তে খ্যাতিং গচ্ছেৎ" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪০)—[শুকপুত্র শুকদেব ও সুমন্তু প্রভৃতি আমরা চারিজন, এই পাঁচজন ব্যতিরেকে] আপনার ষষ্ঠ শিষ্য যেন [বেদজ্ঞরূপে] খ্যাতিলাভ না করে'। এইস্থলে বেদশব্দের অর্থ মুখ্য বেদ না হইয়া যদি মহাভারতাদিরূপ পঞ্চম বেদ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধযোগী যুগাচার্য ব্যাসদেব কর্তৃক বরপ্রদান ব্যর্থ হইয়া যাইবে; কারণ ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণ মহাভারতাদির বক্তৃরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। মুখ্যবেদজ্ঞরূপে মহর্ষি রোমহর্ষণের তাদৃশ খ্যাতি না থাকায় আচার্যের বরপ্রদান ব্যর্থ হয় নাই। সেইহেতু অর্থাপত্তিবলে এইস্থলে প্রযুক্ত বেদশব্দের

অর্থ যে মুখ্য বেদ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই বিষয়ে **পঞ্চম যুক্তি** এই—"এতদ্বঃ সর্বমাখ্যাতং স্বাধ্যায়স্য বিধিং প্রতি" (মহাভাঃ ৩২৭।৫।২)—'স্বাধ্যায় বিষয়ে এই সমস্ত নিয়ম তোমাদিগকে বলিলাম', এইস্থলে 'স্বাধ্যায়শব্দের' প্রয়োগ হইতেও মুখ্য বেদই যে এই স্থলে প্রযুক্ত বেদশব্দটির অর্থ, ইহাই নির্ণীত হয়, কারণ মহাভারতাদির অধ্যয়নে স্বাধ্যায়শব্দের প্রয়োগ হয় না। পক্ষান্তরে 'পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাপ্রাপ্ত স্বশাখাভূত বেদের বিধিপূর্বক অধ্যয়নেই এই শব্দটির প্রয়োগ হইয়া থাকে (ঋক্‌সং, সায়ণভাষ্য, বেদোপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এখানে প্রযুক্ত বেদ শব্দটির অর্থ যে মুখ্য বেদ, মহাভারত প্রভৃতি নহে, ইহাই নির্ণীত হইল।

ষড়্‌বিধ তাৎপর্য গ্রাহকলিঙ্গের প্রয়োগ দ্বারাও মুখ্যবেদরূপ অর্থই লব্ধ হয়

ছয়প্রকার তাৎপর্যগ্রাহকলিঙ্গের প্রয়োগ দ্বারাও মুখ্যবেদরূপ অর্থেই যে মহাভারতের এই অধ্যায়ে বেদশব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যায়। যথা—১ (ক) **উপক্রমে**—"বেদানধ্যাপয়ামাস" (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।২৬) ইত্যাদি[৫]। ১ (খ) **উপসংহারে**—'স্বাধ্যায়স্ত বিধিং প্রতি' (ঐ ৩২৭।৫২) এই বাক্যে মুখ্য বেদাধ্যায়নবোধক স্বাধ্যায়শব্দের প্রয়োগ। ২। মহাভারত শান্তিপর্ব, ৩২৭।৩৪,৩৫,৪১, ৪২, ৪৭ ইত্যাদি শ্লোকে পুনঃ পুনঃ বেদশব্দের প্রয়োগরূপ **অভ্যাস**। ৩। "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্"—'চারিবর্ণকেই শ্রবণ করাইবে', এই প্রকার **অপূর্বতা**। ৪। "ব্রহ্মলোকে নিবাসরূপ" (মহাভাঃ শাঃ ৪২৭।৪৪) **ফল**। ৫। শুকদেবের রাজা জনকের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন, ব্যাসাশ্রমের বর্ণনা, শিষ্যগণকে বেদাধ্যাপন ইত্যাদি প্রকার আখ্যায়িকাত্মক **অর্থবাদ** এবং ৬। বেদপ্রদানার্থ শিষ্য নির্বাচনমূলক "যথা হি কনকং শুদ্ধং তাপচ্ছেদনিঘর্ষণৈঃ। পরীক্ষেত তথাশিষ্যান্ ঈক্ষেৎ কুলগুণাদিভিঃ" (ঐ ৩২৭।৪৬-৪৭) ইত্যাদি প্রকার **উপপত্তি** (যুক্তি) এইস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এইস্থলে মুখ্য বেদপ্রদান বিষয়েই যে আলোচনা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে অবগত হওয়া যায়। [উপপত্তি প্রদর্শনের জন্য উদ্ধৃত বাক্য যদি তৎবিষয়ক দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত না হয়, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ তাৎপর্যগ্রাহক ছয়টি লিঙ্গই যে সর্বস্থলে প্রাপ্ত হইতে হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। প্রস্তাবিতস্থলে তো পাঁচটি তাৎপর্যগ্রাহক লিঙ্গ স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হইতেছে]।

পূর্বপক্ষ—প্রস্তাবিত স্থলে বেদশব্দের লাক্ষণিকার্থই গ্রহণীয়

আচ্ছা, স্বীকার করিলাম—মহাভারতের উক্ত অধ্যায়ে আচার্য শূদ্রজাতিকে মুখ্য বেদই শ্রবণ করাইবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতির প্রামাণ্য আচার্যের বচনাপেক্ষাও বলবান্। শ্রুতি শূদ্রের জন্য উপনয়নসংস্কারের ব্যবস্থা দেন নাই, সুতরাং বেদাধ্যয়নেরও ব্যবস্থা দেন নাই, ইহা সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। আর অন্যান্য প্রাচীন স্মৃতি ও আচার্যগণ স্পষ্টভাবেই শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আচার্য ব্যাসদেব স্বয়ংই "শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, বেদমন্ত্র 'স্বধা' 'স্বাহা' ইত্যাদি ব্যতিরেকে ধর্মানুষ্ঠানে তাহারাও অধিকারী" (ব্যাস সং ১।৬), ইত্যাদি স্থলে 'বেদমন্ত্রে' অর্থাৎ বেদে শূদ্রের অধিকার নাই বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তির বিরোধও তো হওয়া উচিত নহে। সুতরাং মহাভারতের প্রস্তাবিত অধ্যায়ে বেদশব্দের শক্যার্থ 'মুখ্যবেদ' হইলেও,

---

৫ মুখ্যার্থেরই গ্রহণ প্রথমে হয়, কোন প্রকার অনুপপত্তি হইলে লাক্ষণিকার্থের গ্রহণ হয়, ইহাই মীমাংসাসম্মত ন্যায়।

তাহার গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বেদশব্দের লাক্ষণিকার্থ গৌণ বেদ মহাভারত ও পুরাণকেই এইস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত—বেদশব্দের শক্যার্থ ই এইস্থলে গ্রহণীয়, ক্রম ও স্বরাদিবিহীন বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার

এইপ্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে বলা হইতেছে—বেদবিদ্ আচার্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি শ্লোকে মুখ্যার্থক বেদশব্দের প্রয়োগ করেন নাই। কি তাঁহার সেই গূঢ় অভিসন্ধি তাহা নিরূপণের প্রয়াস আমরা করিতেছি—"আরোপিতক্রমস্বরবিশিষ্ট-বর্ণাত্মকস্য বেদস্য" (উত্তরমীমাংসা, ৪।১।৩ রত্নপ্রভা), ইত্যাদি টীকাগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়—শ্রুতিতে পঠিত বর্ণসকলে শিক্ষারূপ বেদাঙ্গে বিহিত প্রকারে ক্রম ও উদাত্তাদি স্বর প্রভৃতি যোজনাকরতঃ যে বেদাধ্যয়ন, তাহাই বিহিত বেদাধ্যয়ন। আর বিহিত স্বরাদিসহযোগে গুরু কর্তৃক উচ্চারিত শ্রুতিপঠিত বর্ণসকলের অনুচ্চারণ (গুরুর উচ্চারণের পর উচ্চারণ) করিতে করিতে যে বেদগ্রহণ, তাহাই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (শতপথ ব্রাঃ ১৫।৫।৭।২) এই যে বেদাধ্যয়নবিধি, সেই অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণ, ইহাও অবশ্য স্বীকরণীয়, কারণ বৈদিক সমাজে উপনীত দ্বিজবালকের বেদগ্রহণ-পদ্ধতি অদ্যাপি এই প্রকারই পরিদৃষ্ট হয়। বিবিধ প্রকার বেদব্রতও [যথা—অশ্বমেধবিষয়ক বেদগ্রহণকালে অশ্বের ঘাস আহরণ, মুণ্ডকাধ্যয়নকালে মস্তকে অঙ্গারপাত্র ধারণ, কারীরীযজ্ঞ-বিষয়ক বেদাধ্যয়নকালে ভূমিতে ভোজন, ইত্যাদি ব্রহ্মঃ সূঃ ৩।৩।১ টীকা দ্রষ্টব্য] উক্ত অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণের অঙ্গ। এই প্রকার অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণের জন্যই উপনয়ন-সংস্কারের আবশ্যকতা। সুতরাং শাস্ত্রে যে স্থলে শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেইস্থলে এই প্রকার অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণই নিষিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সেইহেতু শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার না থাকায়, এই প্রকার বেদব্রত এবং ক্রম ও স্বরাদিসহযোগে গুরুর অনুচ্চারণকরতঃ অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদগ্রহণে ও স্বরাদিসহযোগে বেদধ্যয়নে তাহার অধিকার নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু গুরুর অনুচ্চারণ না করিয়া ক্রম ও স্বরাদিরহিত বেদপাঠে তাহার অধিকার সিদ্ধ হয়, কারণ তাদৃশ অধিকারের নিবারক কেহ নাই। "শূদ্র বেদের একটি বর্ণও অধ্যয়ন করিবে না", ইত্যাদি এই প্রকার যে সকল স্মৃতিবচন পরিদৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ—'শিক্ষারূপ বেদাঙ্গে বিহিত ক্রম ও স্বরাদিযুক্তভাবে বেদের একটিও বর্ণ অধ্যয়ন করিবে না'। এই প্রকার অর্থ স্বীকার না করিলে শূদ্রের পুরাণাদি বা লৌকিক কোন গ্রন্থই অধ্যয়ন করা চলিবে না, কারণ বেদে পঠিত বর্ণ ও পুরাণাদিতে পঠিত বর্ণ বিভিন্ন নহে (উত্তরমীঃ ১।৩।২৮ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অতএব ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে—বেদ শব্দের শক্যার্থ যে মুখ্যবেদ শূদ্রের পক্ষে স্বরাদিবিহীনভাবে তাহার অধ্যয়নে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকায় এইস্থলে বেদশব্দের মহাভারত ও পুরাণরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।

উক্ত প্রকার শাস্ত্রতাৎপর্য স্বীকারে অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিতও বিরোধ হয় না

শূদ্র যদি "শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্" ইত্যাদি বাক্যে বিহিত প্রকারে ব্রাহ্মণের পশ্চাতে বসিয়া স্বরাদিসহিত বা তদ্রহিতভাবে বেদ শ্রবণ করেন, গুরুর অনুচ্চারণ না করেন ও বেদব্রতসকলের অনুষ্ঠান না করেন, তাহার তাদৃশ বেদশ্রবণ অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদশ্রবণ হইবে না। সেইহেতু তাদৃশ বেদশ্রবণ জন্য শূদ্রকে গৌতমধর্মসূত্রে ব্যবস্থাপিত সীসা ও গালা দ্বারা কর্ণবিবর পরিপূরণরূপ

প্রায়শ্চিত্তের ভাগীও হইতে হইবে না। আর "এই যে শূদ্র, ইহা চলমান শ্মশানস্বরূপ, সেইহেতু তাহার সমীপে বেদাধ্যয়ন করিবে না" (বাশিষ্ঠ সং ১৮), ইত্যাদি এই যে স্মৃতিবাক্য, ইহারও বিরোধ হইবে না, কারণ ব্রাহ্মণ সম্মুখে থাকায় শূদ্রের সমীপে বেদাধ্যয়ন করা হইল না। শূদ্রকে পুরোভাগে স্থাপনকরতঃ মুখ্যতঃ তাহাকেই স্বরাদিসহযোগে বেদ শ্রবণ করাইলে উক্ত বাশিষ্ঠ বাক্যের বিরোধ হইত। এই প্রকার ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলে "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যের সহিত উক্ত বাশিষ্ঠ স্মৃতিবাক্য সমবল হওয়ায়, 'শূদ্রকে কখনও বেদ শ্রবণ করাইবে, কখনও বা করাইবে না', এই প্রকার বিকল্পের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। উপায় থাকিতে অষ্টদোষগ্রস্ত বিকল্প স্বীকৃত হয় না—ইহা উভয়মীমাংসা-সম্মত। আর "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ", এইস্থলে 'মতি' শব্দের অর্থ বিষয়েই মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। মেধাতিথি বলেন, মতি শব্দের অর্থ—'দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ক হিতোপদেশ'। কুল্লুক ভট্ট বলেন, ইহার অর্থ—'লৌকিক বিষয়ে উপদেশ'। রত্নপ্রভাকার বলেন, ইহার অর্থ—'বেদার্থজ্ঞান'। সিদ্ধান্তলেশকার বলেন, ইহার অর্থ—'অগ্নিহোত্রাদি-কর্মবিষয়কজ্ঞান।' এই শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত মনে হয়, কারণ প্রথমোক্ত অর্থদ্বয় গৃহীত হইলে, পুরাণাদিতে বিহিত যে শূদ্রের স্বধর্মসকল, তদ্বিষয়ক জ্ঞানও তাহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়া পড়িলে, উক্ত শাস্ত্রসকলের প্রবৃত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই, সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি কর্মবিষয়কজ্ঞান, তাহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইলে কোন প্রকার বিরোধ হয় না। রত্নপ্রভাকারের মত গৃহীত হইলে, তিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, সেই সম্প্রদায়ের একজন প্রধানতম আচার্যের যে শূদ্রকে বেদশ্রবণ করাইবার "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি অনুজ্ঞা, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ পদ ও পদার্থবিষয়ক জ্ঞানবান্ শূদ্র বেদ শ্রবণ করিবে, অথচ তাহার অর্থবোধ হইবে না, এই প্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে। আর ক্রম ও স্বরাদিরহিত শূদ্রের যে বেদশ্রবণ, তাহা অধ্যয়ন-বিধিসিদ্ধ বেদশ্রবণ না হওয়ায় "শূদ্রও হইবে, বেদাধ্যয়নও করিবে", এই প্রকার আক্ষেপও নিরাকৃত হইয়া পড়ে, কারণ অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদাধ্যয়নই শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ, ইহা উপরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ইহাই নির্ণীত হয় যে—ব্রাহ্মণের পশ্চাতে বসিয়া ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বরাদিসহ বা তদ্রহিতভাবে পঠিত বেদশ্রবণ এবং স্বরাদিরহিতভাবে স্বয়ং বেদপাঠ শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। ইহাই "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি প্রকার অনুজ্ঞাপ্রদানকারী আচার্যপাদ ব্যাসদেবের গূঢ়াভিসন্ধি।

অন্যস্মৃতিবচন ও যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন

স্মৃতিবচন হইতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—"সর্বে বর্ণাঃ ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মজাশ্চ সর্বে নিত্যং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম" (মহাভাঃ শাঃ ৩১৮।৮৯)—সকলবর্ণই ব্রাহ্মণ, যেহেতু সকলেই ব্রহ্ম (—ব্রাহ্মণজাতি) হইতে উৎপন্ন* সেইহেতু সকলে নিত্যই ব্রহ্মকে (—বেদকে) উচ্চারণ করেন'। "নিত্যং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম", এই বাক্যটিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। উপনয়ন-সংস্কারযুক্ত বর্ণসকল স্বাধ্যায়বিধিবলে ক্রম ও স্বরাদিসহ নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবেন এবং উপনয়ন-সংস্কারবিহীনগণ তদ্রহিতভাবে তাহা করিবেন, ইহাই এই বাক্যটির তাৎপর্য। ইহা স্বীকার না করিলে 'ব্যাহরন্তে' এই ক্রিয়াপদের কর্তা যে "সর্বে বর্ণাঃ", তাহার অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে, কারণ শূদ্রও একটি বর্ণ। সর্ববর্ণ হইতে তাহার বাদ পড়া উচিত নহে।

---

* উদ্বোধন, ১৩৬৩ সাল, ভাদ্র সংখ্যা "জাতিভেদের মূলকথা ও ক্রমপরিণতি" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ বলেন—"অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা। শ্রোতব্যমেব শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন", (ভবিষ্যপুরাণ ১।৭২) ইত্যাদি বচন-বলে শূদ্রের পুরাণপাঠই নিষিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং ক্রম ও স্বরাদিরহিত বেদপাঠ বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠ হইলেও, পুরাণপাঠেই শূদ্রের অধিকার না থাকায় "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি বাক্যের উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলা যায়—ভবিষ্যপুরাণের উক্ত বাক্য বলে শূদ্রের পক্ষে উক্ত পুরাণপাঠই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, কারণ গ্রন্থারম্ভে সেই গ্রন্থের অধিকারিনির্বচন-প্রসঙ্গে উক্ত শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে। উক্ত বচনবলে কিন্তু সকলপ্রকার পুরাণ ও ইতিহাস পাঠে শূদ্রের অনধিকার অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ তাহাতে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা, কর্মশ্রেয়সি মূঢানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। ইতিভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্'॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫) এবং "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তধর্মযোগ্যাস্তু নেতরে॥ শূদ্রো বর্ণ-শ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্মমর্হতি। বেদমন্ত্র স্বধাস্বাহাবষট্কারাদিভির্বিনা"॥ (ব্যাস সং ১।৫—৬) ইত্যাদি বাক্যসকল বাধিত হইয়া পড়িবে। প্রথমোক্ত শ্লোকে ইতিহাস ও পুরাণে এবং শেষোক্ত সংহিতা-বাক্যে বেদমন্ত্র [অবশ্য পূর্বোক্ত যুক্তিবলে স্বরাদি সহ বুঝিতে হইবে] এবং স্বধাকার প্রভৃতি ভিন্ন শ্রুতিস্মৃতি এবং পুরাণোক্ত ধর্মে শূদ্রের অধিকার স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। আর "তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা" (ব্যাস সং ১।৪)—'স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতিই বলবান্', এই যুক্তিবলে উক্ত ভবিষ্য পুরাণবচন উক্ত ব্যাসসংহিতাবচনবলে বাধিতও হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত ভবিষ্যপুরাণবচনবলে শূদ্রের ইতিহাস (—মহাভারত) ও যাবতীয় পুরাণপাঠ নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

পুনঃ সংশয় হয়—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি বাক্যে শূদ্রকে বেদ শ্রবণ করাইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তুমি তাহাকে 'স্বরাদিরহিতভাবে স্বয়ংপাঠে শূদ্রের অধিকার আছে'—এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? বলিতেছি—'শূদ্র যে স্বয়ং ইতিহাসাদি পাঠ করিবে না', এই প্রকার নিষেধ পরিদৃষ্ট হয় না। যদি তাদৃশ নিষেধ কোথাও থাকে, যাহা আমাদের অজ্ঞাত, তাহা যুক্তিবলে বাধিত হইয়া পড়িবে। যুক্তিবলে স্মৃতি বাধিত হয়, সেই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিই প্রমাণ, যথা—"স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ" (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২।২১)। কি সেই যুক্তি? বলিতেছি—চতুর্থবর্ণ শূদ্রের জন্য ধর্ম বিহিত হইয়াছে, সেই ধর্মবিষয়ক জ্ঞান তাহার কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? অর্থিত্ব ও সামর্থ্য প্রভৃতি সত্ত্বেও সকল সময়েই তাহাকে তজ্জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে, এই প্রকার ব্যবস্থা কল্পনারও অযোগ্য। আর শূদ্র যদি পুনঃ পুনঃ বেদ ও পুরাণাদি শ্রবণ করতঃ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া করিয়া আবৃত্তি করে [বেদের বেলায় স্বরাদিরহিতভাবে আবৃত্তি বুঝিতে হইবে], তাহার বাধক কি? শূদ্র শ্রবণ করিবে, মনে মনে আবৃত্তি করিতেও বাধা নাই, আর কণ্ঠতঃ উচ্চারণ, অর্থাৎ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক কল্পনা। এই যুক্তির বলেই তাদৃশ কোন স্মৃতিবাক্য যদি থাকে, তাহা সেইস্থলে সঙ্কুচিত, অথবা বাধিত হইয়া পড়িবে। যুক্তি-হীন বিচারের দ্বারা ধর্মহানি হয়, ইহা শিষ্টগণের বাণী, যথা—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"॥ (মনুসং ১২।১১৩, কুল্লুকভট্ট টীকাতে উদ্ধৃত)। অতএব শূদ্র ব্রাহ্মণের পশ্চাতে উপবেশন করিয়া অনুচ্চারণ না করতঃ বেদশ্রবণ করিতে পারে এবং স্বরাদিরহিতভাবে বেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণাদি স্বয়ং পাঠ করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে পারে, ইহা সিদ্ধ হইল।

দুর্জ্ঞেয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোমার প্রসন্ন মূর্তি আমার নয়ন দুটি হ'তে
কেন মুছে মুছে যায় ? মাঝে মাঝে আঁধারের স্রোতে
ভেসে যায় সব আলো ; ঘিরে ফেলে আমার ভুবন
ঘন কৃষ্ণ মসীমাখা অন্ধকারে , বিষণ্ণ এ মন
পথ খুঁজে খুঁজে মরে , অবসন্ন ক্লান্ত দিশাহারা
হতাশার মরুপথে ঘুরে ফেরে , পায়নাক' সাড়া
কারো কাছে , বারবার সে গভীর অন্ধকার-মাঝে
শুধু তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় , প্রতিধ্বনি বাজে
দিক হ'তে দিগন্তরে , ক্ষণকাল পরে সেই স্বর
থেমে যায়, মিশে যায় ; দু'নয়নে বেদনা-নির্ঝর
অঝর ধারায় নামে , অসহায় এ রিক্ত হৃদয়
কাল গোনে , কবে হবে রুদ্ধশ্বাস এ আঁধার ক্ষয় ?
এ কালোর যবনিকা কেন নামে ? কেন যে কাঁদাও?
কিছুই বুঝি না, তুমি ব্যথা দিয়ে কী আনন্দ পাও !

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

ছিন্ন করো তমিস্রার ছিদ্রহীন নিবিড় তিমির,
আবরণ মুক্ত হোক্ জীবনের প্রাত্যহিকতার ;
চূর্ণ হোক্ কুহেলিকা সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ,
ক্ষণিকের তুচ্ছতায় জ্বালো দীপ অনন্ত আশার ।

দীপ জ্বালো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্ন মনের আঁধারে ,
যে মনে পেয়েছে সীমা আপন অস্তিত্ব ধরণীর ,
দাও আলো বেদনার্ত ব্যথা-ত্রস্ত হৃদয়ের পারে,
ব্যথিত বিশ্বের দুঃখে লুপ্ত হোক হৃদয়ের তীর ।

অন্তহীন তমিস্রার পুঞ্জ হ'তে টেনে নাও মোরে,
ফেলে দাও জ্যোতির অমৃতে যেথা লুপ্ত চেতনার
ক্ষণিক বিষাদ, স্থিতি । প্রাণের অমৃতে দাও ভরে,
যে প্রাণ লঙ্ঘিয়া যায় বারবার মৃত্যুর আঁধার ।

আমায় উদাত্ত করো, পূর্ণ করো আলোকে আলোকে
আনন্দের স্বর্গলোকে উত্তরণ দাও পুনর্বার ;
আমায় উত্তীর্ণ করো সংশয়ের হতাশ্বাস হ'তে
জ্যোতির অমৃতে মোর চেতনায় করো একাকার ॥

সমালোচনা

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) —প্রণেতা শ্রীতারকচন্দ্র রায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃঃ ৮+৩৪৪। মূল্য ১০৲

এই পুস্তকে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাকাব্যের যুগের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ষড়্‌দর্শন ও অন্যান্য দর্শন আলোচিত হইবে। গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। দীর্ঘকাল দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি যে সকল রত্নের সন্ধান পাইয়াছেন সেগুলি একত্র করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় দার্শনিক তত্ত্বগুলি অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই কারণে সাধারণ পাঠকবর্গও এই পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। গ্রন্থকার ভারতীয় দর্শনকে প্রধানতঃ চারি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বৈদিক যুগ—বেদের আবির্ভাব হইতে খৃষ্টপূর্ব ৭০০ বৎসর পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। বৈদিক যুগকে আবাব তিন স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ও আরণ্যক উপনিষদ্। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন উপনিষৎসকল এই যুগে রচিত হইয়াছিল। (২) মহাকাব্যের যুগ—খৃষ্টপূর্ব ৭০০ হইতে ২০০ পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। এই যুগে শ্বেতাশ্বতর ও পরবর্তী অনেক উপনিষদ্ এবং রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম এই যুগে উদ্‌ভূত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাও এই যুগে রচিত হয়। (৩) সূত্র যুগ—খৃষ্টীয় ২০০ অব্দে ইহার আরম্ভ, সমাপ্তিকাল অনিশ্চিত। (৪) সাম্প্রদায়িক যুগ—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। এই যুগে বিভিন্ন দর্শনানুবর্তিগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন এবং বহু ভাষ্য রচিত হয়।

গ্রন্থকারের মতে ভারতীয় দর্শন ভারতেই উদ্‌ভূত হইয়াছিল এবং ইহা ভারতেরই নিজস্ব। ভারতবর্ষে দর্শন কখনও জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট ছিল না। প্রত্যেক দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে জীবন-গঠনের প্রচেষ্টা হইত।

—স্বামী মৈথিল্যানন্দ

মনসা-চরিত—স্বামী শংকরানন্দ। প্রকাশক —শ্রীনীলমণি মহারাজ, ৮৮, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। পৃঃ ২৭৭। মূল্য ৪৷৷০

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকেরা বাংলার পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বভাবতই আগ্রহশীল। এ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী দেবী মনসা পৌরাণিক ও লৌকিক কল্পনা-উৎস থেকে আবির্ভূতা—অন্ততঃ বেদের সঙ্গে এ দেবীর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্বামী শংকরানন্দ গবেষণালব্ধ নবতথ্যের আলোকে দেবী মনসার বৈদিক উৎস সন্ধান ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাছাড়া, প্রাচীন (বিশেষভাবে মিশরীয় ও ভারতীয়) সভ্যতার বিভিন্ন উপকথাগুলির মধ্যে কাহিনী ও রীতিনীতিগত যে সব সমধর্ম রয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে মনসা-কাহিনীর অন্তরালে নিহিত বহুযুগের ভাবকল্পনার বিস্মৃত সম্পদের পরিচয়-লাভে পাঠকসমাজের সহায়তা করেছেন।

এই সুন্দর সুমুদ্রিত তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থটি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাংলা সাহিত্যের নবীন গবেষকদের দৃষ্টি এই বইটির দিকে আকর্ষণ করা কর্তব্য বলে মনে করি।

—শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

বিদ্যামন্দির-পত্রিকা— (অষ্টম বার্ষিক সংখ্যা—১৯৫৮)—প্রকাশক—স্বামী তেজসানন্দ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া। পৃঃ ১৪৬।

'বিদ্যামন্দিরে'র সুমুদ্রিত এবং সুসম্পাদিত অষ্টম বার্ষিক পত্রিকা তার যাত্রাপথে জয় ঘোষণাই করছে। ছাত্র ও অধ্যাপকদের লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ও ভ্রমণকাহিনী-সমৃদ্ধ পত্রিকাটিতে চিন্তার খোরাকও আছে যথেষ্ট। শিক্ষার মান উন্নয়ন, ছাত্র-বিশৃঙ্খলার কারণ প্রভৃতি সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচিত হয়েছে। 'আমাদের কথা'য় প্রতিফলিত হয়েছে সারা-বছরের আনন্দমুখর বিচিত্র কর্মসূচী। অধ্যক্ষ মহারাজ-প্রদত্ত বার্ষিক কার্যবিবরণীসহ ছয়টি ইংরেজী প্রবন্ধে শিল্প, বিজ্ঞান, বিশ্বশান্তি প্রভৃতি আলোচিত। ছেলেদের লেখা কয়েকটি গল্প ও শিক্ষামূলক ভ্রমণ 'অভিযাত্রী' 'সুদূরের আহ্বান' ও 'শান্তিনিকেতনের অ্যালবাম' মনে দাগ রেখে যায়।

নব প্রকাশিত পুস্তক

সৎপ্রসঙ্গ—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, আসাম। পৃষ্ঠা ১৫৪, মূল্য দুই টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ১৯৫৭ খৃঃ প্রথম ভাগে আসাম ও কুচবিহারে বহু ধর্মপিপাসু নরনারীর জিজ্ঞাসার উত্তরে যাহা বলিতেন তাহা কেহ কেহ লিখিয়া রাখিতেন। বিষয়ানুযায়ী সুসজ্জিত হইয়া বর্তমান পুস্তকে সেগুলি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। জ্ঞান-ভক্তি-প্রসঙ্গে ও সাধন-ভজনের নির্দেশে পুস্তকখানি শুধু সৎপ্রসঙ্গ নয় সৎসঙ্গও।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী বিশ্বনাথানন্দজীর দেহত্যাগ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ১৯শে জুন বৈকালে অত্যধিক তাপ-জনিত রোগে (heat-stroke) ৬৩ বৎসর বয়সে স্বামী বিশ্বনাথানন্দ (শরদিন্দু) ৺কাশীলাভ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি বাতরোগে ভুগিতেছিলেন।

ঢাকার একটি ভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানেই শিক্ষালাভের পর তিনি ২৯ বৎসর বয়সে ১৯২৪ খৃঃ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং পরে ১৯২৮ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের আরম্ভ হইতে, বিশেষতঃ তদন্তর্গত টি. বি ক্লিনিকের সূত্রপাত হইতে প্রায় ১৪ বৎসর একাদিক্রমে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ কয় বৎসর তিনি কাশীধামে তপস্যার জীবন যাপন করিতেছিলেন।

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, ঢাকাতে তিনি ধ্রুপদ-সঙ্গীত শিক্ষা করেন; দিল্লীর কালীবাড়ীতে এবং আশ্রমে, পরে বারাণসীতে তাঁহার গান ও কীর্তন সকলকে মুগ্ধ করিত; এমনকি অবাঙালীরাও তাঁহার গানে যোগদান করিত। সর্বোপরি তাঁহার সরল মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। এই সদানন্দ সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের চরণে লীন হইয়াছেন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

কার্যবিবরণী

পুরী : রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীর বর্ষত্রয়ের (১৯৫৫—৫৭ খৃ:) কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ইহাতে প্রকাশ :

১৯২৫খৃ: গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়, ১৯৪৪খৃ: রামকৃষ্ণ মিশন ইহার ভার গ্রহণ করেন।

গ্রন্থাগারটি পুরী শহরের কেন্দ্রস্থল বালুখন্দ খাসমহলে অবস্থিত। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্যই ইহা উন্মুক্ত। সদস্যেরা বাড়িতে পুস্তক লইয়া যাইতে পারেন; বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫০। গ্রন্থসংখ্যা ১৫,৭৮০, ১৯৫৭ খৃ: সংযোজিত পুস্তক ৮২৮ খানি।

সাধারণতঃ সকাল ৮টা—১১টা এবং বৈকাল ৪টা—৮টা পর্যন্ত পাঠাগার খোলা থাকে। ১২টি দৈনিক (ইংরেজী ৬, বাংলা ২, ওড়িয়া ৪) ও ১২টি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং ৪০ খানি সাময়িক রাখা হয়। পাঠাগারে আসিয়া যে কোন ব্যক্তি পুস্তক ও পত্র পত্রিকা অধ্যয়ন করিতে পারেন। বর্তমানে দৈনিক পাঠকবৃন্দের উপস্থিতির গড় ২০০।

পুরী কলেজের দুই জন বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রতি সপ্তাহে শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষদ্‌ নিয়মিত আলোচনা করেন। প্রতি বৎসর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই শাখা কর্তৃক মঠ-মিশনের কতকগুলি পুস্তক ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঠক-সমাজে সমাদৃত—চিকাগো বক্তৃতা, ভারত পুণ্যভূমি, বেদান্ত-বার্তা ও রামকৃষ্ণ-লীলামৃত।

ছোট ছেলেদের খেলাধূলা ও পড়াশুনার সুযোগ দিবার জন্য একটি শিশুবিভাগ খোলা হইয়াছে। সরকারের সহায়তায় 'Short-Stay Home' নামে একটি ওড়িয়া ছাত্রবাস পরিচালিত হইতেছে, বর্তমানে বিদ্যার্থিসংখ্যা ২০।

বার্ষিক উৎসব

বালিয়াটি (ঢাকা) **:** রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে ১৬ই হইতে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮ই মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় সারদামণি বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ, আবৃত্তি ও সমাগত ভক্তদের বক্তৃতাদির পর সভাপতি মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

মালদহ : গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ হইতে চার দিন এখানে বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন উষাকালে মঙ্গলারতি ও ভজন দ্বারা উৎসব ঘোষিত হয়। অপরাহ্নে মিশন-পরিচালিত বিবেকানন্দ শিশুসংঘ কর্তৃক নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়ামাদি প্রদর্শিত হইলে পর কাশী-নিবাসী শ্রীতারাপদ কুণ্ডু মহাশয়ের সুমধুর কীর্তন সহস্রাধিক নরনারীকে মুগ্ধ করে। পরদিবস সন্ধ্যায় এক বিরাট সভায় বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও কাটিহারের ডাঃ শ্রীগৌরমোহন মুখার্জী 'ভারতীয় নারীর আদর্শ—শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

তৃতীয় দিবসে কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অনুপমানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, সন্ধ্যায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী পরশিবানন্দ ঠাকুরের বাণী-সহায়ে সকলকে নিজ নিজ জীবন উন্নত করিতে বলেন। রাত্রে বিবেকানন্দ শিশুসঙ্ঘ কর্তৃক 'মহারাষ্ট্র গৌরব' কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। উৎসবের শেষ দিনে মঙ্গলারতির পর একটি কীর্তন-দল শহর পরিভ্রমণ করে। বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোমের পর ১২টা হইতে চার পাঁচ হাজার নরনারী প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় এক বিরাট জনসভায় স্বামী অনুপমানন্দ ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয় এবং শক্তিরূপিণী মাতৃজাতির নব জাগরণের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত কীর্তন চলিতে থাকে।

সমাজ-শিক্ষা

নরেন্দ্রপুর (২৪ পরগণা) :

মেদিনীপুর শহর থেকে বহুদূরে বাকচা একটি গ্রাম—বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ সামান্যই—সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা-পরিষদের নেতৃত্বে একটি সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র গত কয়েক বৎসর ধরে কাজ ক'রে যাচ্ছে।

১৭ই মে সন্ধ্যায় বিরাট এক জনসভায় 'লোক-শিক্ষা পরিষদে'র তিনজন কর্মী 'মালিকের সংসার' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। সুদূর পল্লী-প্রান্তে পল্লীগীতির মাধ্যমে নিরক্ষর মালিকের জীবন-কাহিনী শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

পরদিন সকালে পূজার পর কীর্তনের আসর বসে। সকাল ১০টা থেকে প্রায় ৯০০ গ্রামবাসীকে মধ্যাহ্নভোজনে তৃপ্ত করা হয়। বিকালে লোক-শিক্ষা-পরিষদের ব্যায়ামশিক্ষক ও তাঁর স্থানীয় ছাত্রবৃন্দ বিভিন্ন ব্যায়াম অনুষ্ঠান ক'রে সকলকে উৎসাহিত করেন। সন্ধ্যায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শেষে সঙ্গীত সহযোগে 'শ্রীশ্রীসারদামণি' সম্বন্ধে ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় দেড় হাজার লোকের সামনে।

তমলুক থেকে ১৭ মাইল দূরে ময়নার বৃন্দাবন-চক গ্রাম। সেই গ্রামে আমাদের পরিচালনায় একটি সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মিতালী সঙ্ঘের দুদিনব্যাপী (১০ই ও ১২ই মে) বাৎসরিক উৎসবে গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই যোগদান করে। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ব্রতচারী নৃত্য, গুড়গুড়ি নৃত্য, জগঝম্প নৃত্য, পল্লীগীতির আসর প্রভৃতির সুনিপুণ পরিচালনা প্রথম দিনের উৎসবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাত্রে ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী আলোচিত হয়।

দ্বিতীয় দিনে পূজার পর সংঘের নতুন গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় ও বিকালে প্রসাদ বিতরণ করা হয় প্রায় ৪০০ জনের মধ্যে। সন্ধ্যায় জনসভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই উৎসবে লোকশিক্ষা-পরিষদের 'চলমান বাহিনী'র সভ্যগণ যোগদান ক'রে দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দান করেন।

আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার

স্যানফ্রান্সিস্কো : উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়া বেদান্ত-সমিতি।

প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় ও প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় সোসাইটির বক্তৃতা-গৃহে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দেন। বিষয়সূচী :

জানুআরি : 'আমাকে অনুসরণ কর, মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক', আমার জানা দুইজন সাধু; মনই বন্ধু, মনই শত্রু, পাশ্চাত্যে প্রেরিত পুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বর-সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? সাধকের দৈনন্দিন জীবন কিরূপ হওয়া উচিত? মৌনব্রত অভ্যাস।

ফেব্রুআরি : স্বামী বিবেকানন্দের নূতন ধর্ম, যোগের নীতি ও প্রক্রিয়া, জন্মান্তর, ভক্তির সাধন, স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মবাদ, স্বপ্নের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, মানুষ নিজেই নিজেকে গঠন করে।

মার্চ : তবে—ধর্ম জিনিসটা কি? সার্থক ধ্যান, চেতন, অবচেতন ও অতিচেতন মন; অহংকার ও মানবাত্মা, অবিচ্ছিন্ন ধ্যান, শরণাগতি অভ্যাস, শক্তির সন্ধানে; একাগ্রতা, ধ্যান ও সমাধি, মানুষ ঈশ্বর হইতে পারে।

এপ্রিল : ঈশ্বরের নাম জপ, 'আমি পুনর্জীবন ও জীবন', বৈদান্তিক দৃষ্টিতে মানুষ; অন্তশ্চেতনা কিভাবে জাগানো যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দ ওঁকার, জগতে ব্রহ্মদৃষ্টি, আমাদের অতীত—ইহা লইয়া কি করা যায়? আত্মবিজ্ঞান, ঈশ্বরকে ভালবাসিবার কৌশল।

মে : প্রবর্তকের সাধনা, অবচেতন, চেতন, অতিচেতন, অমরত্বের প্রমাণ, শান্তভাবের অভ্যাস, 'আমিই পথ, আমিই সত্য ও আমিই জীবন'; আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপে বোঝা যায়? সৎস্বরূপের সাধন; স্বপ্নের দার্শনিক তাৎপর্য।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব ও সাধনা-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। রবিবার সকালে সমবেত শিশুগণকে বিভিন্ন ধর্মগুরুর উপদেশাবলী সহ উদার ধর্মমত শিক্ষা দেওয়া হয়।

চিকাগো: গত ২১শে মে বুধবার, চিকাগো বেদান্ত-সোসাইটীর উদ্যোগে নর্থ পার্ক হোটেলে এক সান্ধ্য ভোজসভার আয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসরিক জয়ন্তীর অনুষ্ঠানই এই সভার উদ্দেশ্য।

চিকাগো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক চার্লস্ মরিস বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যাহার গতি ধীর তাহাই স্থায়ী ও শক্তিমান্। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যনামধারী সঙ্ঘ সারা পৃথিবীতে যে মানবকল্যাণের কাজে নিয়োজিত তা বহুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।' কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত-ভ্রমণকালে রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়লাভের সুযোগ হয়। তদবধি তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের মাসিক মুখপত্রের একনিষ্ঠ পাঠক। তিনি মনে করেন পৃথিবীতে সর্বত্র আজ ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন।

নর্থ-ওয়েষ্টার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এডমণ্ড পেরী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রস্থিত বেদান্ত-সোসাইটীর কর্মীদের সহিত পরিচিত হওয়াতেই তিনি বুঝিয়াছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আদর্শ কত মহান ও উচুদরের। যে মহাপুরুষের নামে ও আদর্শে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত তিনি পৃথিবীতে বহুকাল যাবৎ দেবতার পূজা পাইবেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন: বিজ্ঞানের যুগে ধর্মকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরীক্ষা করার মত ক্ষমতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চরিত্রেই সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে দুনিয়ার নানা সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পন্থাই আতঙ্কিত মানবজাতির আশ্রয়স্থল।

সভার শেষে বোষ্টন বেদান্ত-সোসাইটীর অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দ ও চিকাগো বেদান্ত-সোসাইটীর অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দ উপস্থিত সকলকে ও মাননীয় বক্তাদের অভিনন্দন জানান।

সভায় প্রায় একশত লোকের সমাবেশ হয়, অধিকাংশই আমেরিকান। আনন্দের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু ও অমৃত বাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চিকাগো বেদান্ত-কেন্দ্রের অক্লান্ত কর্মী জন ও কার্লের প্রাণপাত পরিশ্রমেই এই বিরাট অনুষ্ঠান সাফল্য লাভ করে।

বিবিধ সংবাদ

আরারিয়া (পূর্ণিয়া): শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২০শে হইতে ২৩শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বহু ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করে। স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক হিন্দী ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পর্যালোচনা করিয়া উপস্থিত জনসাধারণকে আনন্দ দান করেন।

শান্তিপুর (নদীয়া): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক-সঙ্ঘ পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা ও ৪ঠা মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ ও আরাত্রিকের পর সমবেত ভক্তবৃন্দ ও সমাগত প্রায় ছয়শত দরিদ্রনারায়ণ সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের দুইখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র হাওদায় বসাইয়া বালিকাদের গীত ও কীর্তন সহকারে

এক বিরাট শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। পরদিন অপরাহ্ণে আহূত এক মহতী জনসভায় সভাপতি স্বামী অন্নদানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ আবির্ভাব ও জগৎকল্যাণে তাঁহার সুমহৎ অবদান সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়া সভার উদ্বোধন করেন এবং তৎপরে প্রধান অতিথি সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্বললিত ভাষণদ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি বাণীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

বেলাড়ী (হাওড়া): স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৪ই বৈশাখ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভোরে মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তন, প্রভাতফেরীর পর বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ ও কীর্তনাদির শেষে মধ্যাহ্নে প্রায় চারি সহস্র দরিদ্র ও ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। ৫। ঘটিকায় স্বামী সর্বানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভার অনুষ্ঠান করা হয়। রাত্রে তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুশান্তানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জীবনী সম্বন্ধে একটি হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

দোমড়া (বর্ধমান): গত ২রা চৈত্র রবিবার দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সঙ্গীত, নারায়ণসেবা, সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রামপুর (বাঁকুড়া): গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ সংগ্রামপুর গ্রামে, চুঁচুড়া প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবোৎসব বেশ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি, সানাই ও সংগীতসহ প্রভাতী নগরকীর্তন গ্রামবাসীদের মনে ভক্তি ও প্রেরণার সঞ্চার করে। পূজা ও হোমের পর মধ্যাহ্নে তিনশতের অধিক গ্রামবাসী প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী স্বাহুভবানন্দ এতদঞ্চলে এরূপ উৎসব এই প্রথম। ইহাতে চতুর্দিকে সাড়া পড়িয়া যায়।

ইম্ফল (মণিপুর): শ্রীরামকৃষ্ণ-সমিতির উদ্যোগে বাবুপাড়া পূজামণ্ডপে গত ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯শে অপরাহ্ণে জনসভা হয়। সভায় ভজন ও বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা হয়। এই উপলক্ষে স্থানীয় স্কুলকলেজসমূহের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে "স্বামীজী ও বর্তমান ভারত" বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। ২০শে রবিবার পূজা, হোম, অঞ্জলি-প্রদান, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও কীর্তন হয়।

কৃষ্ণনগর: শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের উদ্যোগে এখানে ১৩ই আষাঢ় (শনিবার) সারাদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হোম, ভোগ, আরাত্রিক, প্রসাদবিতরণ হয়। ভক্ত নরনারীর সানন্দ যোগদানে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়। টাউন-হলে সুসাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় শনি ও রবিবার সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়া স্থানীয় ভক্তদের আনন্দ দান করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বর: স্নানযাত্রা-দিবসে বানপ্রস্থ-আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বদিন শনিবার রাত্রে পাথুরিয়া-ঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচিত হইয়াছিল। উৎসব-দিন ভোরে মঙ্গল আরাত্রিক ও ভজন; ৮ ঘটিকা হইতে বিশেষ পূজা, হোম এবং কালী-কীর্তন হয়। বেলা ১১টা হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তনের পরে প্রায় ৫০০ ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ পান। বৈকাল ৪টায় স্বামী

নিরাময়ানন্দজীর পৌরোহিত্যে একটি সভায় বর্তমানযুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ঝাড়গ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যা ৬টায় আরাত্রিক ও ভজনের পরে শ্যামবাজার সুহৃদসঙ্ঘ কর্তৃক কালী-কীর্তনের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

পুরীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পুরী, ২৩শে জুন। দুর্গাবাড়ীতে 'শক্তি-সারদম্' নামক সংস্কৃত নাটকের অভিনয় ব্যতীত, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনী অবলম্বনে রচিত 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' এবং ভক্ত হরিদাসের জীবন অবলম্বনে বিরচিত 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্' নামক সংস্কৃত নাটকদ্বয়ও প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ কর্তৃক রাধাকান্ত গম্ভীরা মঠের মহান্ত বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে জগন্নাথবল্লভ মঠে পুরীর সমস্ত মঠাধীশ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্যন্ত হইতে আগত সন্ন্যাসিগণ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণ এবং অন্যান্য বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে অপূর্ব ভাবাবেশের সহিত অভিনীত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের অতি সরল মাধুর্যপূর্ণ ভাষা এবং অভিনেতৃবৃন্দের নাট্যকৌশল এবং সুমধুর সংস্কৃত উচ্চারণ সকলের বিশেষ মনোরঞ্জন করে।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সারদামণি-তত্ত্ব ও মাতৃলীলা-তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বরচিত সংস্কৃত ও বাংলা সঙ্গীতসহ যথাক্রমে দুর্গাবাড়ী ও রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী-হলে কথকতা করেন। এই কথকতায় সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমেঘনাথ বসাক, শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য এবং শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ এবং পুরীর ও ভারতের বিভিন্ন মঠের বহু সন্ন্যাসী ও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীতে সমাগত বহু মনীষী এই সভায় যোগদান করেন এবং বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

পৃথিবীর জনসংখ্যা

পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতি ঘণ্টায় ৫,৪০০ করিয়া অর্থাৎ বৎসরে ৪৭,০০০,০০০ বাড়িতেছে এবং এই ভাবে বাড়িতে থাকিলে মনে হয় এই শতাব্দীর শেষে লোকসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হইয়া যাইবে।

গত ২০ বৎসরে জনসংখ্যা এক চতুর্থাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি হাজারে জন্ম ও মৃত্যুর হার যথাক্রমে ৩৪ ও ১৮।

ওলন্দাজরা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী—পুরুষ ও স্ত্রীলোকের গড়পড়তা আয়ু যথাক্রমে ৭১ ও ৭৪ বৎসর। ভারতবাসীদিগের আয়ু সর্বাপেক্ষা কম, গড়ে মাত্র ৩২ বৎসর।

ল্যাটিন আমেরিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশী—প্রতি বৎসর ২৪,০০০,০০০।

প্রত্যেক দেশেই সাধারণত পুরুষের অপেক্ষা মেয়েরাই বেশী দিন বাঁচে।

[U.N. Demographic Year Book হইতে]

গঙ্গাজলে লবণতা-বৃদ্ধি

হুগলী নদীর জলে সম্প্রতি কয়েক বৎসরে যে পরিমাণ লবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে নির্মল সুস্বাদু জল সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

নদীর জল ও পলতার পরিস্রুত জলের লবণতা :

বর্ষ	গঙ্গাজলে লবণতা প্রতি লক্ষে	পরিস্রুত জলে লবণতা প্রতি লক্ষে
১৯৫৫	১৫৮	৫৪
১৯৫৬	১৩০ ৪	৪৫ ২
১৯৫৭	৪৩ ৪	১৬
১৯৫৮ (এ পর্যন্ত)	২২৮	৬৫·২

১৯০৬ খৃঃ প্রথম নদীজলে লবণতা লক্ষে ২০ ভাগ হইয়া সীমা লঙ্ঘন করে, ১৯৩৯ খৃঃ উহা ৪৯ পর্যন্ত উঠে, তাহার পর হইতে উহা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা কমাইবার একমাত্র উপায় উপর হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জল গঙ্গাবক্ষে আনয়ন করা, তাহার উপায়—গঙ্গাবাঁধ।

তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ

পাদাঙ্গং সন্ধিপর্বাণং স্বরব্যঞ্জনভূষণম্।
যমাহুরক্ষরং দিব্যং তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ।

যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ॥

যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥

অকুণ্ঠং সর্বকার্যেষু ধর্মকার্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্রূপং তস্মৈ কার্যাত্মনে নমঃ॥

সর্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ॥

যো নিষণ্ণো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ॥

যোঽসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চ্চির্বিভাবসুঃ।
সংভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ॥

—মহাভারত, (শান্তিপর্ব—৪৭অধ্যায়)

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—দেবকীনন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, শ্রীভগবানের পূর্ণরূপ। তিনি বাক্যস্বরূপ, জ্ঞেয়স্বরূপ, মোহস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, কার্যস্বরূপ, শান্তস্বরূপ, দ্রষ্টাস্বরূপ এবং ঘোরস্বরূপ—তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি।

সুপ্‌তিঙন্ত প্রকৃতি-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদসমূহ যাঁহার অঙ্গ, দুই বা ততোধিক পদের মিলনরূপ সন্ধি যাঁহার পর্ব এবং স্বর ও ব্যঞ্জন যাঁহার ভূষণ—সেই দিব্য অক্ষর বাক্যস্বরূপকে নমস্কার।

যিনি ঘনান্ধকারের পারে জ্যোতির্ময় পুরুষ, যাঁহাকে জানিলে মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়—সেই জ্ঞেয়স্বরূপকে প্রণাম।

যিনি এই সংসার পালন ও পরিরক্ষণের জন্য প্রাণিগণকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন—সেই মোহস্বরূপকে প্রণাম করি।

যিনি অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সপথ ও বেদোক্ত উপায় দ্বারা সত্যমার্গ যোগধর্ম বিস্তার করিতেছেন—সেই সত্যস্বরূপকে নমস্কার করি।

যিনি সমস্ত কার্যে অবিচলিত ও ধর্মকার্যের জন্য সদা উদ্যত, যিনি কুণ্ঠাবিহীন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠরূপী—সেই কার্য-স্বরূপকে প্রণাম করি।

যিনি সর্বভূতের আত্মা, প্রাণিসমূহের স্রষ্টা ও সংহারক এবং ক্রোধ মোহ ও দ্রোহ-পরিশূন্য—সেই শান্তস্বরূপকে প্রণাম করি।

যিনি রাত্রিতে (প্রলয়কালে) শান্ত আধাররূপে ও দিবসে (সৃষ্টি প্রকটরূপে) চৈতন্যময় অধিষ্ঠানরূপে শুভ অশুভ সব কিছু দেখিতেছেন—সেই সর্বসাক্ষী দ্রষ্টাস্বরূপকে নমস্কার করি।

যিনি যুগসহস্রের পর ভাস্বর মার্তণ্ডরূপ ধারণ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশ সাধন করেন, যেন ভক্ষণ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন করেন—সেই ঘোরস্বরূপকে প্রণাম।

গীতার প্রচারক কৃষ্ণ চিরজীবন ভগবদ্‌গীতার সাকার বিগ্রহস্বরূপ বর্তমান ছিলেন, তিনি অনাসক্তির মহদ্দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া ভূপতিত হইতেন, তিনি রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি বাল্যকালে যেমন সরলভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের অন্ত্য অবস্থায়ও তাঁহার সেই সরল ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গ

জীবন ও জীবিকা

জীবনের সহিত জীবিকা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনের জন্যই জীবিকা, জীবিকা দ্বারাই জীবন। জীবনের অভাবে জীবিকা নিষ্প্রয়োজন, আর জীবিকার অভাবে জীবনদীপ নির্বাপিত হয়, জাতি বিলুপ্ত হয়।

উপনিষদেও দেখি: 'অন্নাৎ পুরুষ, স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়:'—সেই পুরুষ অন্ন হইতে জাত, জীবদেহধারী আত্মা অন্নের উপরই নির্ভরশীল, —অন্নময়ের অভ্যন্তরেই প্রাণময়ের বিকাশ, তদভ্যন্তরে মনোময়ের প্রকাশ! মনোময়ের মধ্যে বিজ্ঞানময়, সর্বান্তরে আনন্দময়! এই আনন্দময়ই আত্মার সমীপবর্তী, অমৃত-স্বরূপের আভাস! কিন্তু দেহধারী জীবাত্মা অন্নের উপর নির্ভরশীল। আত্মানুভূতির আনন্দে বিস্ময়ে উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন 'অহমন্নম্ অহমন্নাদ: · অহংশ্লোককৃৎ···'—আমি অন্ন, আমি অন্নভোক্তা, আমিই উভয়ের মিলনকারী চেতনা! পিতৃ-নির্দেশে ব্রহ্মানুসন্ধানে রত ঋষি-বালক প্রথমেই জানিলেন, অন্নই ব্রহ্ম—'অন্নংব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'। অন্ন হইতেই প্রাণিবর্গ জাত হয়, অন্নের দ্বারাই তাহারা জীবন ধারণ করে, অবশেষে অন্নেই বিলীন হয়।

অন্নকে বাদ দিয়া ব্রহ্ম নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সরল ভাষায় বলিতেন, 'খালি পেটে ধর্ম না'; স্বামীজী বলিতেন, সর্বাগ্রে কূর্ম-দেবতার (উদরের) পূজা। গীতার স্পষ্ট উক্তি:

> অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
> যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥

জীবনের সহিত জীবিকার, অন্নের সহিত কর্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য! তাই 'অন্নং বহু কুর্বীত'। জীবন যাপন করিব, অথচ জীবিকার চেষ্টা করিব না; অন্ন চাই, অথচ কর্ম করিব না—প্রকৃতির নিয়মে ইহা অসম্ভব। প্রকৃতির নিয়ম নিষ্ঠুর, মায়াহীন, দয়াহীন, জীবিকার সংস্থান করিতে যে বা যাহারা পারিবে না—তাহারা ধীরে ধীরে জীবনের রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া যাইবে, যাহারা সংগ্রামে জয়ী হইবে তাহারাই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে জীবন-লীলার বিচিত্র অভিনয় করিবে—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'।

এই তাত্ত্বিক পটভূমিকায় আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চাই বর্তমান যুগের জীবন ও জীবিকার সমস্যা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে চিন্তায় কৃতিত্বে মধ্যবিত্তই চিরদিন অগ্রগামী, আজও সে অগ্রগামী—তবে দুঃখে ও দুর্ভোগে তার সমস্যার জটিলতায় ও জীবন-সংগ্রামে অসহায়তায়। সর্বত্র, বিশেষতঃ বাঙলায় এই জীবিকা-চেষ্টা জীবন-মরণ-সংগ্রামের আকার ধারণ করিতেছে।

বাঙলার এই সমস্যার স্বরূপ ও ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া যদি আমরা ইহার কোনও সন্তোষজনক ও সম্মানজনক প্রতিকার-পদ্ধতি খুঁজিয়া পাই, তবে অবশ্যই অন্যত্র না হউক ভারতীয় ক্ষেত্রে তাহা কাজে লাগিবে।

যে কোন কারণে হউক—ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে বাঙালীই পাশ্চাত্য শক্তি ও সভ্যতার সহিত প্রথম নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাদের সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহা আয়ত্ত করিয়াছিল। আবার এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য—এই বাঙলাতেই সর্ব প্রথম প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাব-সংঘর্ষ ঘটিয়াছে এবং মোক্ষ-মুক্তির সাধনা এখান হইতেই শুরু হইয়াছে। সে

হিসাবে বাঙালীর অন্তর-মনীষা এখনও ভারতের অগ্রগামী! কিন্তু বাহ্য জীবন-ক্ষেত্রে বাঙালী আজ যেন পরাজিত, পর্যুদস্ত। কেন এই অন্তর ও বাহিরের অসামঞ্জস্য—তাহাই আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে আগামী কালের অগ্রগতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা।

বাঙালী আত্মবিস্মরণশীল জাতি! মাঝে মাঝে সে জাগিয়া উঠে, চমকপ্রদ কিছু করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে, নিজেও মুগ্ধ হয়, আবার যেন ঘুমাইয়া পড়ে, ভুলিয়া যায় তার পূর্ব ইতিহাস, অস্বীকার করে তার পূর্বপুরুষকে, নূতনের সংঘাতে আবার একটা নূতনের ইঙ্গিতে সে জাগিয়া উঠে,—ইহাই তাহার ইতিহাস। কোন রাজতরঙ্গিণীর ধারা তাহার ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে জাগিয়াছে তথাগত বুদ্ধের সঙ্গে, সে মাতোয়ারা হইয়াছে শ্রীচৈতন্য-সঙ্গে, শ্মশানে একা একা 'মা, মা' বলিয়া ডাকিয়া শক্তি-সাধনায় সে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ঈশ্বরের মাতৃভাব।

* * *

বর্তমান যুগের জাগরণ ব্রিটিশ বণিক-শক্তির আঘাতে, ঘুমন্ত গৃহস্থের দ্বারে সে যেন তস্করের করাঘাত! নবাগত বিদেশীকে বরণ করিয়া যে পাপ বাঙালী করিয়াছিল—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সে আজও করিতেছে। ইংরেজ চিনিয়াছিল বাঙালীকে—প্রথমে তাহার তল্পীবাহকরূপে, পরে কেরানিরূপে, শেষে ডেপুটি ও অফিসাররূপে, সে শিক্ষিত বাঙালীকে 'বাবু'তে পরিণত করিয়া তাহার কাজ করিয়া গিয়াছে। আজ বাঙালীর প্রধান সমস্যা এই ইংরেজ-সৃষ্ট মধ্যবিত্ত 'বাবু'র সমস্যা—যাহার দুর্নামে সে কায়িক শ্রমে কাতর, অধৈর্য, গৃহমুখী, দলাদলিপ্রিয় ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ! এতগুলি গুণ যাহাদের তাহাদের সমস্যাও অনেকগুলি হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি!

আবার বাঙালীর আত্মবিশ্লেষণের ডাক আসিয়াছে। সম্প্রতি 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রশ্ন তুলিয়াছেন: 'বাঙালী কোথায়?' তাঁহারা ইহারই উত্তরে ক্রমিক পর্যায়ে কৃতী বাঙালী মনীষিগণ-কৃত বিশ্লেষণ পরিবেশন করিতেছেন। তাহাতে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে—যাহার সহায়ে হয়ত বর্তমান সংকটে আমরা মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইব।

বর্তমানের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা জীবিকা অথবা জীবনধারণের জন্য কর্মসংস্থান, যাহার আর্থনীতিক নাম 'বেকার সমস্যা'। কিন্তু এই সমস্যা এখন অর্থনীতি ও রাজনীতির গণ্ডি ছাড়াইয়া সমাজ জীবনে এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে ইহা অন্যতম জাতীয় সমস্যা! সেই হিসাবে চেষ্টা করিলে তবেই ইহার সমাধান সম্ভব।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যেভাবে বেকার দেখা দেয় এবং যেভাবে তাহার সমাধান করা হয়, এখানে সে-সকল তত্ত্ব ও পদ্ধতি কোন কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডও আজ দুই খণ্ডে বিভক্ত, পশ্চিমী পাশ্চাত্যে ধনিক-শক্তি প্রবল, অন্যত্র শ্রমিক-শক্তির রাজ্যে বেকার নাই, অন্ন ও কর্মের সমীকরণ তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন (Equation of food and work) ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেকারের কারণ এক আপাতবিরোধী রহস্য (paradox). দেশে দুঃখ আছে, অভাব আছে, কর্ম করিবার লোক আছে, তথাপি আর্থনীতিক কারণে, প্রতিযোগিতার জন্য কারখানার কাজ কমাইয়া দেওয়া হইল, শ্রমিক ছাঁটাই হইল, দেশে হয়ত বস্ত্রেরই অভাব রহিয়াছে, তথাপি মিল বন্ধ রাখা হইল। পণ্য দ্রব্যের অভাব সত্ত্বেও নূতন বেকারের সৃষ্টি হইল, সরকার সাময়িক সাহায্য দিয়া প্রাত্যহিক অভাব পূরণ করিলেন; আবার কল চালু হইলে বা অন্যত্র কোন নূতন শিল্পে বেকার কাজ পাইবে। ধনতান্ত্রিক দেশে এ এক বিষচক্র।

কল্যাণরাষ্ট্রে পূর্ণ নিযুক্তির (full employment) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ভারত ধনতান্ত্রিক নয়, শ্রমিকরাজ্যও নয়,—এখনও সম্পূর্ণভাবে কল্যাণ-রাষ্ট্রেও পরিণত হয় নাই।

* * *

আমাদের নিজেদের দোষ আমরা দেখিতে পাই না, তাই অপরের চোখে আমাদের দোষ দেখিতে হইবে। প্রতিবেশীরা আজ বাঙালীর প্রতি সহানুভূতিশীল নয় কেন? একদিন বাঙালী তাহাদিগকে হীন মনে করিয়াছে, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি-ফলিত আলোকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছে। ইংরেজ-সৃষ্ট মধ্যবিত্ত 'বাবু' বাঙালী হাতের কাজ ঘৃণা করিয়াছে, তাইতো আজ হাতের কাজ তাহাদের হাতে যাহাদের সে 'অবাঙালী' বলিয়া ক্ষোভ করে। আজ সকলের সঙ্গে হাত মিলাইয়া তাহাকে হাতের কাজে নামিতে হইবে। যাহারা কাজ করে—জগৎ ও জীবন তাহাদেরই হাতে।

আজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি গিয়াছে, ইংরেজীশিক্ষালব্ধ কেরানিগিরিতেও বাঙালীর একচ্ছত্র আধিপত্য গিয়াছে, তা ছাড়া তাহার দুর্নাম রটিয়াছে—সে কাজে অবহেলা করে, শৈথিল্য করে। দেখা যায়, কোন কোন বাঙালী মালিকও আজকাল অবাঙালী কর্মী রাখিয়া নিশ্চিন্ত হন। বাঙালীকে আজ এ সকল দুর্নাম দূর করিয়া, নূতন করিয়া সুনাম অর্জন করিতে হইবে। এ পথে না গিয়া সে আজ দলীয় রাজনীতিতে মত্ত।

জাতীয় চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে দল-ভিত্তিক রাজনীতি যে সুফলপ্রসূ হয় না, এই তত্ত্বটি বুঝিয়া আমাদের জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে,—নতুবা রাজনীতি কখনও দেশের বা জাতির কল্যাণ করিতে পারে না। দেশের ভাল মন্দ অপেক্ষা দলের ভাল মন্দই তখন সমগ্র চেতনা ও চেষ্টাকে অধিকার করিয়া লয়।

দলগত রাজনীতি সেখানেই সফল—যেখানে শতকরা ৯০।৯৫ জন শিক্ষিত, যেখানে বিপক্ষ নেতৃত্ব *সরকারের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শনের জন্য জাতি-*কর্তৃক নিযুক্ত, যেখানে বিপক্ষ দল জাতির সংকট-মুহূর্তে বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাড়িয়া জাতীয় সরকার গঠন করিতে সহযোগিতায় অগ্রসর হয়, যেখানে জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইল কিনা—এ বিষয়ে দেশবাসী সদা সচেতন এবং প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

ভারতে ইহা সফল করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার, নবতম ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে—শিক্ষকতা-কার্যেই একদিকে যেমন হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার কাজ পাইবে, অন্যদিকে অল্পদিনের মধ্যে শতকরা ৯০।৯৫ জন শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। তবে এ শিক্ষা প্রচলিত শিক্ষার ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে! এই শিক্ষায় শিক্ষিত চাষীর ছেলে লাঙল ছাড়িয়া কলম ধরিতে চাহিবে না, ভাল করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে লাঙলই ধরিবে, বা যন্ত্রচালিত কুটিরশিল্পের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে। এ শিক্ষায় শিক্ষিত কেরানির পুত্র কলম ধরিবার সুযোগ না পাইলে হাতুড়ি কিংবা বাটালি ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ইঞ্জিনিয়র হইতে না পারিলে বাঙালী যুবক মেকানিক হইবে। হাতের কাছে যা কাজ পাইবে সসম্মানে তাহাই তুলিয়া লইবে। শিক্ষিত যুবক বেকার থাকিবে না। সদুপায়ে জীবিকার্জনের জন্য কোন বৃত্তিই ছোট নয়। সুখের বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরিবর্তন আসন্ন; কিন্তু যে ভাবে উহা আসিতেছে—তাহা অতি ধীরে এবং অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষভাবে। দরিদ্র অনুন্নত দেশে অল্প খরচে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার প্রয়োজন।

উন্নতি আজ শিক্ষার এই আলোময় পথেই, শিল্পের কর্মময় পথেই। বাঙালীর আজিকার অবসাদ সাময়িক, দেশবিভাগের অঙ্গচ্ছেদের চরম আঘাতের অবসাদ, এ তাহাকে কাটাইয়া উঠিতেই হইবে! যে সাধনায় সে যুগযুগ-নিদ্রিত মহাজাতির চেতনা জাগ্রত করিয়াছে, তাহার দ্বারা সে কি পারিবে না তাহার নিজের এই ক্লৈব্য —এই বিষণ্ণ পরাজিত মনোভাব দূর করিতে?

তাহার আজ একান্ত প্রয়োজন এমন একজন নেতার—যিনি তাহাকে সস্নেহে বলিবেন:

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!
ক্ষুদ্র এ হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া ওঠ, জাগো, যুদ্ধ কর, জয় কর, যশস্বী হও।

একদিন সে শুনিয়াছিল এইরূপ একজন নেতার উদাত্ত আহ্বান। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়াছিল তার জাতীয় জাগরণ, দেখা দিয়াছিল দিকে দিকে দিক্‌পাল। ধর্মে কাব্যে সাহিত্যে বিজ্ঞানে শিল্পে বাণিজ্যে শৌর্যে বীর্যে বাঙালী 'স্বধর্ম' লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু 'স্বস্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ!' কেন, কিভাবে?—সেই তো তাহার ইতিহাস। বর্তমানের পরাজয় ভবিষ্যৎ জয়েরই সোপান-স্বরূপ।

বাঙালী একদিন কৃষ্টির সাধনায় সিদ্ধি চাহিয়াছিল, কৃষ্টি তাহাকে অমর করিয়াছে, কিন্তু বাঁচিবার জন্য আজ তাহাকে জীবনের সাধনা করিতে হইবে, পৌরুষ-সহকারে জীবিকার সাধনা করিতে হইবে, অভ্যুদয়ের সংকল্প লইয়া তাহাকে নূতনতর সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। সম বা অসম প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া আসিলে চলিবে না, শুধু প্রতিবাদ করিলে চলিবে না। বিফলতায় অধৈর্য হইলে চলিবে না, ঈর্ষ্যাদ্বেষে দলাদলিতে মত্ত হইলে চলিবে না—স্থির লক্ষ্যে ধীর পদ-বিক্ষেপে নিজের উন্নতি, তৎসহ দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য জীবন পণ করিয়া তাহাকে আজ কাজ করিতে হইবে।

জাতির পতন ও অভ্যুদয়

স্বামী বিবেকানন্দ

[বক্তৃতা ও পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত]

আমরা স্বয়ং না করিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে। অতএব আমাদের বর্তমান অবনতির জন্য দায়ী অপর কেহ নহে, দায়ী আমাদের কর্ম।

অবনতির অন্যতম কারণ আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও কর্মক্ষেত্রের সঙ্কোচন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন ব্যক্তি বা জাতি অপরের সহিত সম্পর্ক বর্জন করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। অপরকে ঘৃণা করিলে নিজেরই অবনতি হয়, এই সনাতন নৈতিক বিধান তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসব করিয়াছে।

আমার ধারণা, জনসাধারণের কল্যাণচিন্তা উপেক্ষা করিয়া আমাদের জাতি মহাপাতক করিয়াছে এবং তাহারই ফলে বর্তমান অধঃপতন। যতদিন না তাহারা সমাদৃত হইতেছে, যতদিন না তাহাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে, ততদিন আমাদের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষ্ফল হইবে—দেশের উন্নতি হইবে না।

বেদান্ত ঘোষণা করিতেছেন, সকল জীবে এক চেতন আত্মা বিরাজমান, অথচ এই দেশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এত পার্থক্য করা হয় কেন—বুঝা খুব কঠিন। জগজ্জননী আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি নারীগণের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন না করিলে ভাবিও না, তোমাদের অগ্রগতির অন্য কোন উপায় আছে।

অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা দুর্বল, খুব ক্ষীণজীবী। প্রথমেই আমাদের দৈহিক দুর্বলতা—ইহাই আমাদের দুর্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী! দেশের যুবকগণকে সর্বাগ্রে বীর্যবান্ হইতে হইবে। ধর্মের কথা পরে। তোমরা বলবান্ হও, ইহাই তরুণদের প্রতি আমার উপদেশ। বলবান্ শরীরে যখন তোমরা মানুষের মত ঋজু ও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারিবে তখন উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা বুঝিতে পারিবে।

আত্মপ্রত্যয় পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। তবেই দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আমরা নিজেরাই করিতে সক্ষম হইব। আত্মবিশ্বাসী হও, সেই বিশ্বাসের বলে অমিতবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াও। এই বিশ্বাসের বলেই তোমাদের মনুষ্যত্ব, এমনকি দেবত্ব প্রকটিত হইবে। বিশ্বাস কর, তোমরা প্রত্যেকেই বড় বড় কাজ করিবার জন্য জন্মিয়াছ।

গাম্ভীর্যের একান্ত অভাব! গুরু বা লঘু যে কোনও বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দিবার এক হাল্কা প্রবৃত্তি—আমাদের সমাজে অলক্ষিতে একটা উৎকট মানসিক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই ব্যাধি নির্মূল করিতে হইবে।

শিশুর মতো একটি অসহায় পরপ্রত্যাশী ভাব আমাদের গোটা জাতীয় চরিত্রকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলে তবেই সকলে খাদ্য উপভোগ করিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক জাতিকেই আত্মরক্ষার বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাহাই। অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করিও না।

সকলেই চায় হুকুম করিতে, আদেশ পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নয়। আদেশ-পালনে অভ্যস্ত হইলে আদেশ করিবার যোগ্যতা আপনিই আসিবে। প্রথমে সেবক হইতে শিখিলে তবেই পরে নায়ক হইতে পারিবে।

আমরা বাক্যবাগীশ, শুধু কথার ফুলঝুরি! আমাদের বাঁধা বুলি, 'আমরা বড়, আমরা মহৎ!'—বাজে কথা! আসলে আমরা হীনবীর্য—ইহাই আমাদের স্বরূপ। অনেক বিষয়ে তোতাপাখীর মতো কতগুলি বচন আওড়াই বটে, কিন্তু তাহার কোনটাই কাজে পরিণত করিতে পারি না। লম্বা লম্বা কথা বলা, অথচ কাজে কিছু না করাটাই আমাদের স্বভাব হইয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ আমরা অলস, কর্মবিমুখ, সংহতিসাধনে অক্ষম, ভ্রাতৃপ্রেম-বর্জিত স্বার্থান্ধ মানুষ। পরস্পরকে ঘৃণা বা হিংসা না করিয়া আমরা তিনটি ব্যক্তিও এক জোটে কাজ করিতে পারি না। বিশৃঙ্খল, অসংহত, অতীব স্বার্থপর এক বিশাল জনতা—ইহাই বর্তমানে আমাদের শোচনীয় স্বরূপ।

সংগঠন-ক্ষমতা আমাদের ধাতে একেবারেই নাই। কিন্তু উহা আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করাইতেই হইবে। ঈর্ষ্যাত্যাগই এই ক্ষমতালাভের প্রধান কৌশল। একচিত্ততাই জাতীয় শক্তির মূল। জাতির বহুধা বিক্ষিপ্ত সমগ্র ইচ্ছাশক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে, তাহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে তোমাদের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের কেমন একটা শৃঙ্খলাহীন অপরিচ্ছন্নতা দেখা যায়। বাণিজ্যের মূলনীতিগুলি আমরা এখনও আয়ত্ত করিতে পারি নাই। এই জন্যই এদেশে যৌথ কারবারের প্রচেষ্টা প্রায়ই নিষ্ফল হইতে দেখা যায়।

মিথ্যা অপেক্ষা সত্যের ওজন অনন্তগুণ বেশী, সততারও তাহাই। সত্য ও সততায় নিষ্ঠা যদি অচল থাকে, দেখিও প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারাই অগ্রগতির পথ করিয়া লইবে। প্রথম হইতেই বড় বড় পরিকল্পনা রচনা করিতে যাইও না। অল্প করিয়া কাজ শুরু কর, পরিবেশের আনুকূল্য অনুসারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও।

ধৈর্য পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের জয় হইবেই। কপট বা ভীরু না হইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া চলিবে। ছিদ্রান্বেষী সমালোচক না হইয়া গঠনমূলক চিন্তা কর।

চাই মানুষ। অপর সবই জুটিবে, অভাব শুধু মানুষের। চাই বলিষ্ঠ, বীর্যবান্, বিশ্বাসী, সম্পূর্ণ অকপট যুবকের দল। এরূপ একশত যুবক জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।

সামাজিক বা রাজনৈতিক যে কোন ব্যবস্থার মূলে থাকে ব্যষ্টি মানবের সততা। শাসন-সংসদে কোনও বিশেষ বিধান প্রবর্তন করার উপর কোনও রাষ্ট্রের মহত্ত্ব বা শক্তিমত্তা নির্ভর করে না, উহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণকর ও মহৎ চরিত্রের উপর। পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদ অপেক্ষা খাঁটি মানুষের মূল্য অনেক বেশী।

অপর কাহারও ফরমায়েস অনুযায়ী কোন প্রকার উন্নতির কিছুমাত্র মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। ধর, সরকার তোমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন সবই দিল, কিন্তু ঐ প্রার্থিত বস্তুগুলির সংরক্ষণে সক্ষম লোক কই? অতএব আগে মানুষ তৈয়ার কর।

যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য আমরা আজ লালায়িত, উহা ইওরোপে বহু যুগ ব্যাপিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে শত শত বৎসরের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ সত্ত্বেও ঐগুলির উপযোগিতা আশানুরূপ হয় নাই, এক একটি করিয়া রাষ্ট্রনীতিক পদ্ধতি—প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অশান্ত ইওরোপ এখন দিশাহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দুনিয়ার বর্তমান হালচাল দেখিয়া মনে হয়—সমাজতন্ত্রের বা অপর কোনও নামে পরিচিত কোন প্রকার গণতন্ত্রের যুগ আসিতেছে। জনসাধারণ অবশ্যই চাহিবে তাহাদের বৈষয়িক চাহিদার পরিপূর্তি। তাহারা চাহিবে লঘুতর কর্মভার, প্রচুরতর খাদ্যসংস্থান এবং সর্বপ্রকার অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ হইতে ঐকান্তিক মুক্তি। তবে এই অভীপ্সিত গণতন্ত্রের যুগ কতদিন স্থায়ী হইবে—কে জানে? বস্তুতঃ মানুষের সততার উপর, ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। মনে রাখিও, মানব সভ্যতার মূলে—ধর্ম।

সমাজ আইনকানুনের জোরে দাঁড়াইতে পারে না, দাঁড়ায় একমাত্র সুনীতি ও পবিত্রতার শক্তিতে। শাসন-পরিষদের কোনও বিধান দ্বারা কাহাকেও সজ্জন করা যায় না, এই জন্যই রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী। ধর্ম মানব-চরিত্রের গোড়ায় গিয়া তাহার আচরণের মূল সূত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত করে।

বিভিন্ন সমাজবিপ্লবীর দল—অন্ততঃ উহাদের নেতৃবৃন্দ—আজ বুঝিতে পারিতেছেন যে তাঁহাদের সাম্যবাদ বা সমানাধিকারজ্ঞাপক অন্যান্য মতবাদের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে। বেদান্তের তত্ত্বই সেই ভিত্তি! শুধু বলপ্রয়োগ, শাসন-পারিপাট্য বা আইনের কঠোরতায় জাতির উন্নতি সম্ভব হয় না, একমাত্র নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি অশুভ প্রবৃত্তিগুলিকে সংশোধন করিয়া জাতিকে শুভ পথে চালিত করিতে পারে।

জন্মাষ্টমী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আহ্বান

আর্তকণ্ঠে শোনো আহ্বান, নেমে এসো প্রভু ধরাতলে।
তোমার সাধের ব্রজ-বন হেথা দগ্ধ যে হয় দাবানলে।
কোথা প্রভু তব বরাভয়পাণি,
ঘরে ঘরে আজ ধর্মের গ্লানি—
সাধুজন হেথা পরাজয় মানি লাঞ্ছিত হয় পশুবলে॥
অবলে পীড়িছে প্রবল সবলে,
কাঁদিছে ধর্ম পাপের কবলে।
শক্তি-মত্ত সত্যেরে হেথা নিপীড়ন করে নানা ছলে॥
হেন দিনে যদি নেমে এসে তুমি
না বাঁচাও তব এ মরতভূমি,
তোমাব লীলাব ভুবন হে প্রভু ডুবে যাবে কাল-হলাহলে॥

আশ্বাস

জয় জয় ভগবান!
আসিছেন তিনি আর্ত জগতে করিতে পরিত্রাণ।
সত্যরক্ষা তাঁহারি ধর্ম
সত্য তাঁহার বচন কর্ম,
হবে অসত্য যা কিছু জগতে নিঃশেষে অবসান॥
জয় জয় ভগবান!
ভয় নাই, নাই ভয়!
লাঞ্ছনাহত যাদবেরা যত গাও তাঁর 'জয় জয়।'
বন্দিনী মাতা মোছ আঁখিজল,
খসিয়া পড়ুক সব শৃঙ্খল,
উল্লাস কর, নাচো বসুদেব, আর কেন ম্রিয়মাণ?
জয় জয় ভগবান॥

ভক্তি-কলা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য প্রভৃতি এক একটি কলাবিদ্যা যদি মানুষের সৃজনী প্রতিভার এক একটি বিকাশ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কলাবিদ্যার প্রধান সার্থকতা যদি স্রষ্টা এবং উপভোক্তাকে জাগতিক স্বার্থবর্জিত এক প্রকার অতীন্দ্রিয় আনন্দ (রস) পরিবেষণ হয় তাহা হইলে ভক্তি অর্থাৎ ভগবানকে ভালবাসাও একটি উচ্চশ্রেণীর কলা বলিয়া মনে করা বোধ করি ভুল নয়। কলাসৃষ্টির অপর একটি ফল স্রষ্টার নিজের ব্যক্তিত্বের প্রসার। শিল্পী তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে নিজের সত্তাকে অনুভব করেন, তাঁহার সৃষ্টি দিকে দিকে নানা গুণগ্রাহী ব্যক্তির নিকট যত সমাদৃত হইতে থাকে শিল্পীর নিজের ব্যক্তিত্বও তদনুপাতে যেন বৃহৎ পরিধি লাভ করে। শিল্পের মাধ্যমে শিল্পী তাঁহার শরীর-মনের আপাত ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করেন, এক ধরনের কালজয়ী অতি-জীবন লাভ করেন। ভক্তি ও ভক্তি-সাধককে এইরূপ একটি কালাতীত জীবনের আস্বাদ দেয়। এই দিক দিয়াও ভক্তি একটি সার্থক কলা।

গলা খুলিয়া চিৎকারই যেমন সংগীত নয়, হাত পা এলোমেলোভাবে ছুঁড়িলেই যেমন নৃত্য হয় না, কোন একটি বিশেষ ব্যাপৃতির কলার স্তরে পৌঁছিবার যেমন বিশিষ্ট লক্ষণ আছে তেমনি ভগবানের সহিত যে কোনও প্রকার সংযোগই ভক্তি-কলা নয়। কি প্রকার ভালবাসা ভগবানকে দিতে পারিলে ঐ ভালবাসা হইতে সাধনের শ্রেষ্ঠ সৃজনী প্রতিভা আশ্চর্যভাবে বিকশিত হয় এবং ঐ প্রতিভা জীবনের আধ্যাত্মিক স্তরে অত্যদ্ভুত সৃষ্টিকর্মে ব্যাপৃত থাকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ঐ ভালবাসার একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞ আচার্যগণ ঐ ভালবাসার নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট লক্ষণও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কোনও চাওয়া-পাওয়ার ভাব না রাখিয়া, ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন অভীষ্টসিদ্ধির কথা না ভাবিয়া প্রেমস্বরূপ ভগবানের প্রতি যে অহেতুক প্রগাঢ় প্রীতি তাহার নাম শুদ্ধা ভক্তি। এই শুদ্ধা ভক্তিই কলা। এই প্রকার ভালবাসা যাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হয় তিনি একজন আশ্চর্য শিল্পী হইয়া পড়েন। তাঁহার মানস-ধর্ম, চরিত্র-ধর্মের সহিত গুণী চিত্রকর, ভাস্কর, গায়কদের দৃষ্টি ও অনুভবের অনেক মিল দেখা যায়, অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। ভক্তি-কলার যিনি সাধক তাঁহার রসোপলব্ধি এবং সৃষ্টিকর্ম প্রচলিত অর্থে আমরা যাঁহাদিগকে শিল্পী বলি তাঁহাদের অনুভূতি ও সৃষ্টি হইতে বহুতর স্বচ্ছ ও চমৎকারী।

ভক্তিকলার সাধক কি কি সৃষ্টি করেন? *তাঁহার শিল্পকার্য প্রধানতঃ তিনটি: প্রথম—* ভগবান, দ্বিতীয়—সংসার, তৃতীয়—তিনি নিজে। একই সঙ্গে তিনি যেন এই তিনটি ছবি আঁকিয়া যান, তিনটি রাগিণী বিস্তার করিয়া চলেন, তিনটি মূর্তি গড়িতে ব্যাপৃত থাকেন। শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার নিষ্কাম ভালবাসা একটি স্বতঃস্ফূর্ত গতিবেগে রূপ পরিগ্রহ করিতে চায়, যেমন কবি-চিত্রকর-ভাস্কর-গায়কের শিল্পপ্রেরণা ছন্দে, বর্ণে, প্রস্তরে, সুরে অভিব্যক্তির জন্য উন্মুখ হয়, সেইরূপ। তখন ভক্তির সৃজন-উন্মেষ প্রথম অভিব্যক্তিত হয় ভগবানকেই গড়িতে। তাত্ত্বিকের তত্ত্বা-লোচনায়, পণ্ডিতের শাস্ত্রবিচারে ভগবানের অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু ভক্তের

মন সে পরিচয়ে তৃপ্ত নয়। তাই তিনি ভগবানকে নিজের মতো করিয়া গড়িতে চান। তাত্ত্বিকের ভগবান গম্ভীরদর্শন, ক্ষুরধার যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকেন। ভক্তি-কলার পুরোধা তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্য দিয়া ঐ ভগবানের চেহারা পালটাইয়া দেন। ভক্তের শিল্পিত ভগবানকে দেখিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি হয়তো তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা কলা-রসিক তাঁহারা এই অত্যদ্ভুত শিল্প দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান।

তুলসীদাস গাহিয়া উঠিলেন,—'ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈজনিয়া'। শিশু রামচন্দ্র হাঁটিতে শিখিয়াছেন, অযোধ্যার রাজ-অন্তঃপুরের আঙিনায় রাজমাতা কৌশল্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শিশু একটু একটু হাঁটিতেছে আবার পড়িতেছে, আবার উৎসাহভরে উঠিয়া চলিতেছে। পায়ে নূপুর বাজিতেছে। ভক্ত তুলসীদাসের চোখে এ দৃশ্য এমন অপরূপ লাগিয়াছে যে সারা ভুবনের সকল শোভা যেন ঐ শিশুর চলার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজিতেছে নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ। এমন মিষ্ট ধ্বনিও তুলসীদাস জীবনে শোনেন নাই। ভক্ত তুলসীদাস ঐ গানের মধ্যে যে বালক ভগবানকে গড়িয়াছেন, তাহা বাল্মীকির সৃষ্ট রামচন্দ্র নন—তাহা তুলসীদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। উহা একটি শিল্পকর্ম। এই শিল্পসাধনার স্রষ্টা তুলসীদাস যেমন সমাহিত পরবর্তীকালে যাহারা তুলসীর শিশু রামচন্দ্রকে দেখিয়াছে এবং দেখিতেছে, তাহারাও দেখিয়া রোমাঞ্চিত।

"কালো বরণ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য কালো"—ভক্ত কবি রামপ্রসাদের একটি গানের এই পঙ্‌ক্তিটির কথা ধরা যাক্‌। কালীর তাত্ত্বিক সত্য, তাঁহার দৈবী লীলা—কত পুস্তকে কত সুধী-জন কতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তো কলাদক্ষ রামপ্রসাদের প্রাণ ভরিল না। কালী-তত্ত্বকে তাঁহার নিজের ভাব-দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইল, দেখিয়া ভাবের রং দিয়া আঁকিতে হইল। রামপ্রসাদের কালী তাত্ত্বিক কালীর অতিরিক্ত কিছু, তাই 'আশ্চর্য কালো'। তথাপি একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র বা কবিতা বা সংগীত যেমন স্রষ্টার সৃজন-প্রতিভা হইতে নির্গত হইবার পর বহু দ্রষ্টা বা শ্রোতার উপলব্ধি-সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায় সেইরূপ রামপ্রসাদের কালীও শুধু তাঁহারই ব্যক্তি-মানসের উপভোগের বস্তু নন, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উহা বাংলার সহস্র সহস্র শক্তি-উপাসকের নিকট অনুপম রসানুভূতি যোগাইয়াছে, আরও বহু শত বৎসর যে যোগাইবে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

মধুসূদন সরস্বতী যেমন অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত। তাঁহার বেদান্ত-জ্ঞান ও মেধার ফলরূপে আমরা পাইয়াছি তাঁহার অপূর্ব বেদান্ত-গ্রন্থগুলি কিন্তু মধুসূদন সরস্বতী যেখানে ভক্তি-কলার রসিক সেখানে আমরা পাইয়াছি আশ্চর্য এক হৃদয়-মুগ্ধকারী কৃষ্ণকে। গীতা-টীকার মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

কালিন্দীপুলিনেষু যৎকিমপি তৎ নীলং মহোধাবতি।

—কালিন্দীপুলিনে এক নীল জ্যোতি ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই বর্ণনায় আলঙ্কারিক সৌন্দর্যই আসল কথা নয়, আসল কথা কলাদক্ষ ভক্তের কলাসৃষ্টি। মধুসূদন সরস্বতী এক অভিনব কৃষ্ণকে সৃষ্টি করিয়াছেন—কালিন্দীপুলিনে ধাবমান এক নীল জ্যোতি। এই কৃষ্ণ মধুসূদন সরস্বতীর সৃজিত কৃষ্ণ—রসোপভোক্তার আনন্দ-লোকের কৃষ্ণ। মীরাবাঈ যখন গাহিয়াছিলেন 'বসো মেরে নয়নমেঁ নন্দদুলাল' তখন নন্দদুলালকে তিনি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যে নন্দদুলাল মা যশোদার

ঘরে থাকিবেন না, না বৃন্দাবনে, না মথুরায়, না হস্তিনাপুরে, না দ্বারকা-প্রভাসে, তাঁহাকে বাসা বাঁধিতে হইবে আউলী মীরার চোখের মণিতে। এ কৃষ্ণ ভক্তিকলা-শিল্পীর ভাব-তুলিতে অঙ্কিত কৃষ্ণ।

নানক-সাহেবও তাঁহার ভগবানকে গড়িয়াছিলেন। বেদ-বেদান্তে সে ভগবানের পর্যাপ্ত পরিচয় নাই। অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া নানকের প্রেমের দেবতা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মন্দিরের কোথায় আদি, কোথায় অন্ত তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। সূর্য চন্দ্র তারকারাজি সে মন্দিরের প্রদীপ, মলয়ানিল ধূপের কাজ করিতেছে, ভুবনসঞ্চারী পবন আরতির চামর দুলাইতেছে, বিশ্বের যত বনের যত ফুটন্ত ফুল সব বিশ্বদেবতার কণ্ঠে শোভা পাইতেছে,আর অনাহত প্রণবধ্বনি সেই দেবতার আরতির বাদ্য।* নানক, কবীর প্রভৃতি সাধক তাঁহাদের ভক্তি-কলার প্রেরণায় ভগবানের এইরূপ আরও অনেক মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি একটি শিল্পকর্ম—স্বচ্ছ আনন্দব্যঞ্জনায় উহার সার্থকতা। ভক্তির ইতিহাসে যুগে যুগে দেশে দেশে ভক্ত-স্রষ্টারা এইরূপ কত শত ভগবান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। অনবদ্য শিল্পরূপে এই সব ছবি মানবচিত্তে স্নিগ্ধ আনন্দ ও উদ্দীপনা প্রদান করিতেছে ও করিবে। ভক্ত-শিল্পীরাও তাঁহাদের সৃষ্ট ভগবানের মধ্যে বাঁচিয়া রহিয়াছেন ও থাকিবেন। তাত্ত্বিক বিচারে দার্শনিকরা ভগবানের স্বরূপ-নির্ণয় সমাধা করিয়াছেন, কিন্তু কলা-সৃষ্টির দিক দিয়া ভক্ত-স্রষ্টাদের ভগবানকে গড়া কাজটির কখনও ইতি হইতে পারে না। ভক্তির সৃজন-প্রেরণা অফুরন্ত, ভক্ত-সৃষ্ট ভগবানের আকৃতি ও সংখ্যাও অনির্ণেয়। কিন্তু এই বহু ভগবানের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে দশ জন চিত্রকর দশ রকমে আঁকিতে পারেন। কোনও চিত্রটি অপরটির বিরোধী নয়, প্রত্যেকটি চিত্রে এক এক শিল্পীর সৃষ্টিভঙ্গী ব্যঞ্জিত এবং দর্শকরা সেই সৃষ্টিভঙ্গীরই বিচার করেন, মূল্য নিরূপণ করেন। ভক্ত-স্রষ্টাদের উপস্থাপিত ভগবানের বহুত্বও অনুরূপ-ভাবে সমর্থনযোগ্য। শাক্ত ও বৈষ্ণবে লড়াই থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্ত-সৃষ্ট কালী ও কৃষ্ণে কোন বিরোধ নাই। উভয়ই রসলোকের বস্তু—উভয়ের উপাদান এক, ধর্ম এক, সার্থকতা এক।

ভক্তি-কলার দ্বিতীয় সৃষ্টি এই পৃথিবী—এই পৃথিবীর জল-মাটি, আকাশ-বাতাস, নরনারী, পশুপক্ষী, আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি। ভগবানকে গড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তকে এই পৃথিবীটিকেও নূতন করিয়া নির্মাণ করিতে হয়। ভক্তের জগৎ যদু-মধু-মালতী-মাধবীর জগৎ নয়—ঐ জগতের উপর অতীন্দ্রিয় ভাবের অপরূপ বর্ণসুষমা ঢালিয়া নূতন করিয়া সৃষ্ট এক জগৎ। অবশ্য যদু-মধু-মালতী-মাধবীর পৃথিবীর সব কিছুই ভক্ত-শিল্পীর পৃথিবীতে আছে, কিন্তু অতিরিক্ত যাহা আছে তাহার শক্তি ও মূল্য অপরিসীম। যদু-মধুরা তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। এই অতিরিক্তই ভক্তি-কলার অবদান। ভক্ত যে ভগবানকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারাই অঙ্গজ্যোতিঃ ভক্তের জগতে প্রতিবিম্বিত। তাই এই জগৎ এক

---

* গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে, তারকামণ্ডল চমকে জ্যোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চৌরি করে, সকল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতি রে।
ক্যায়সে আরতি হোবে, ভবখণ্ডন তেরি আরতি অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে। ইত্যাদি

অভিনব সুন্দর জগৎ। এখানে একটুও দ্বন্দ্ব নাই, অসামঞ্জস্য নাই, কুশ্রীতা নাই। ইহার আকাশ মধুময়, বাতাস মধুময়, তরুলতা গিরি কান্তার মানুষ পশুপক্ষী সবই এক আশ্চর্য আলোকে ঝলমল করিতেছে। এমন একটি ঘর না হইলে ভক্ত বাস করিবেন কোথায়? তাই তাঁহাব জগৎ-ঘর তিনি নিজেই সৃষ্টি করিয়া নেন। ভক্তি-কলার সাধক যে-ভগবানকে সৃষ্টি করেন তাহা যেমন একটি শিল্প-সৃষ্টি, তাঁহার জগৎও তদ্রূপ একটি অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকর্ম। ভক্তের ভগবান এবং ভক্তের জগৎ এই দুইএর মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। একই শিল্পকর্মের যেন দুইটি পিঠ।

না, ঐ শিল্পকর্মের তো শুধু দুইটি পিঠ নয়, আরও একটি পিঠ আছে, তাহা ভক্ত নিজে। ভক্ত যেমন ভগবানকে গড়েন, জগৎকে গড়েন, তেমনি নিজেকেও গড়েন। তত্ত্বের ভগবানকে দিয়া ভক্তের যেমন প্রাণ ভরে নাই, প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্ট ত্রিভুবন যেমন তাঁহার বাসের অযোগ্য হইয়াছিল এবং সেইজন্য অন্তর্গূঢ় ভক্তি-রস দিয়া তিনি যেমন ভগবানকে সৃষ্টি করিলেন, নিজের বাসযোগ্য জগৎ রচনা করিলেন তেমনি এখন নিজের দিকে তাকাইবার পালা। তাকাইয়া দেখেন, ছি, ছি—এমন সুন্দর বিশ্বমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এমন রসময় বিশ্ব-দেবতার এ কী দীন পূজারী। এ দেহ যে একান্তই রক্তমাংসের দেহ, এ দেহ তো কৃষ্ণ-বিলাসের যোগ্য নয়। এ চোখদুটি তো শুধু ভৌতিক আলো প্রতিফলনের উপযোগী, চৈতন্যালোক ধরিবে কি করিয়া? এই মন, এই বুদ্ধি দিয়া শুধু শাক মাছ আলুর পার্থক্যবোধ ও মূল্যনিরূপণই চলে, ভাগবত বিভূতির উপলব্ধিতে তো ইহারা সমর্থ নয়। অতএব ভক্তের নিজেকে নূতন করিয়া নির্মাণ প্রয়োজন। নিজের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সবই ভক্ত পুনর্গঠন করেন। ইহা তাঁহার ভক্তি-কলার তৃতীয় কীর্তি, তাঁহার সমগ্র অখণ্ড শিল্পকর্মের তৃতীয় পিঠ। ভক্তের সৃষ্ট ভগবানের চিত্র যেমন একটি, দুটি, তিনটি নয়—অসংখ্য, তেমনি ভক্তের রচিত স্বকীয় আলেখ্যেরও সীমা নাই। কত বিচিত্রভাবেই না ভক্ত নিজকে কল্পনা করেন। ভক্ত বলেন,—ভগবান মহাসাগর, আমি একটি তরঙ্গ; ভগবান মহানদী, আমি তাঁহার বুকে ভাসমান একটি মৎস্য, ভগবান মহাকাশ, আমি তাঁহাতে বিহঙ্গ হইয়া উড়িয়া চলি। ভক্তের সাধ জাগে কৃষ্ণের পায়ের নূপুর হইয়া বাজিতে, ভগবানের মন্দিরে ধূপ হইয়া পুড়িতে, তাঁহার পূজার কুসুমকলিকা হইয়া ফুটিয়া থাকিতে। ভক্তিকলায় সাধকের যে নিজকে সৃষ্টি উহা ভক্তের নবজন্ম। তাঁহার 'আমি' চিরদিনের জন্য ভগবানের দাস আমি হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বিষয়-বাসনা, স্বার্থবুদ্ধি, দ্বেষহিংসা প্রভৃতি সব নিঃশেষে তিরোহিত হইয়াছে। কী পবিত্রতা, কী প্রশান্তি, কী শান্তি সারা চিত্তে ছাইয়া আছে! সে পুরাতন মানুষ আর নাই। ভক্ত নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। এই নবজন্ম ভক্তিকলার মহিমান্বিত সৃষ্টি।

কলাবিকাশের ও কলানুভূতির গূঢ় মর্ম কি? চিত্রে, কাব্যে, সংগীতে, নৃত্যে, ভাস্কর্যে কোন্ শক্তি সৃজন-ধর্মের প্রেরণা আনে? আবার ঐ প্রেরণা যখন সার্থক সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয় তখন সেই সৃষ্টি-সংপৃক্ত রসানুভূতি জাগে কোথা হইতে? রসধর্মটিই বা কি বস্তু? তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ প্রশ্নগুলির একটি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। জীব, জগৎ ও জগৎ-স্রষ্টা—তিনটি একই সত্য ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ধর্ম রস বা আনন্দ। আনন্দ হইতে সৃষ্টি, আনন্দে সেই সৃষ্টির স্থিতি, আবার আনন্দেই সেই স্থিতির লয়। কলা-প্রেরণা মূলতঃ সেই আনন্দস্বরূপ

ব্রহ্মেরই ব্যঞ্জনা। কলাবিকাশ ব্রহ্মবিকাশেরই নামান্তর। যাহা কলানুভূতি তাহা আখেরে ব্রহ্মানুভূতিই। কলাপ্রবৃত্তি ব্রহ্মাবিষ্কারে দুর্নিবার উদ্যম। প্রত্যেক মানুষকে একদিন না একদিন কলা-কার ও কলাবিৎ হইতে হইবে, কেননা মানুষকে একদিন ব্রহ্মে পৌঁছিতে হইবে।

জগৎ ও জীবনের গূঢ়তম সত্য—এই আনন্দাত্মা ব্রহ্মে যাঁহার প্রীতি জন্মিয়াছে রসধর্মের নিবিড়তম সান্নিধ্য ও উপলব্ধি তাঁহার নিকট সুকর। তাঁহার শুদ্ধ ব্রহ্মপ্রীতি বা ভক্তি ব্রহ্মসম্ভোগে ব্যাপৃত হইলে সেই সম্ভোগেরই রূপান্তর ঘটে তাঁহার আধ্যাত্মিক সৃজন-ক্রিয়ায়। তিনি তখন হন স্রষ্টা। স্রষ্টৃত্ব ব্রহ্মেরই বিভূতি।

প্রত্যেক কলার নিজস্ব সার্থকতা ও মূল্য আছে যদিও প্রত্যেক কলা ব্রহ্মেরই ব্যঞ্জনা। ভক্তি-কলায় ব্রহ্মের সর্বাধিক ব্যঞ্জনা। সেইজন্য ভক্তি-কলা শ্রেষ্ঠ কলা।

হৃদি মোর শ্যামময়

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

নবঘনদ্যুতি শ্যামের মূরতি,
হৃদি-মন্দিরে রাজে।
হাসে মধু হাসি, করে শোভে বাঁশী—
'রাধা রাধা' নামে বাজে।
কণ্ঠে দুলিছে বন-ফুল-হার,
চরণ-পদ্ম সুষমা-আধার,
চূড়া শিরোপরে বাঁধা ফুল-ডোরে,
মণ্ডিত নব-সাজে।
শ্যাম রাজে হৃদিমাঝে।

বিধু-লাঞ্ছিত মুখ সুস্মিত
বিকচ কমল সম,
বরষিছে সদা সিঞ্চিত সুধা
আনন্দ অনুপম।
নীল আঁখি দুটি নীল-উৎপল,
প্রেম-রস-ভরে করে ঢল ঢল,
তনুর জ্যোতিতে হিয়া আলোকিত,
বিদূরি' বিরহ-তম।
শ্যাম রাজে হৃদে মম।

দোলে কটিদেশে পীত রেশবাস,
শ্রুতি-মূল মণিময়,
মধুর রূপের মাধুরীতে ভরা
নিখিলের সমুদয়!
করুণায় ঘন অন্তরখানি,
অভয়-চরণে নিতে চায় টানি',
শরণাগতের চির-আশ্রয়—
বিলাইছে বরাভয়!
হৃদি মোর শ্যামময়!

'কথামৃতের' প্রথম আলো

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত

মধুর বসন্ত-সন্ধ্যা। এক তরুণ যুবক দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে এসেছেন—যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র—তাঁর চোখে মুখে প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ।

মন্দির-প্রাঙ্গণে ছোট একটি ঘরে দেখা হ'ল এক ব্রাহ্মণের সাথে, সেখানে শুনলেন: সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।

'আচ্ছা, ইনি কি খুব বই পড়েন?'—ঘরের পরিচারিকা উত্তর ক'রল, 'আর বাবা বই। সব ওঁর মুখে'। যুবকের ধারণার ভিত্তি পড়ছে ভেঙে, আর কথার ফাঁকে ফাঁকে অপূর্ব রহস্যময় ব্রাহ্মণ নিজেকে ফেলছেন হারিয়ে। গায়ত্রীর পরিণতি ওঁকার, কথার শেষ নীরবতা, আর পাণ্ডিত্যের সমাপ্তি নিরক্ষর পুরোহিতের সম্ভাভিলাষে! ব্রাহ্মণ বললেন, 'আবার এসো'।

*　　　*　　　*

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ডাকে ভক্ত শ্রী'ম' আবার এলেন। 'হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল। আমি কেশবের জন্য মার কাছে ডাবচিনি মেনেছিলুম। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম—বলতুম: মা, কেশবের অসুখ ভাল ক'রে দাও, কেশব না থাকলে আমি কলকাতা গেলে কার সঙ্গে কথা কবো?' নির্লিপ্ততার সাথে এত মমতা যে জড়িয়ে থাকতে পারে যুবক তা জানতেন না। একদিন যাঁর সন্ধ্যা ও গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়েছিল, এই কি সেই ব্রাহ্মণ? তবুতো এ মায়া বা মমতা নয়, এ ভক্তপ্রাণতা! মহামায়ার দুই সন্তানের মধ্যে একই সত্তার টান। ভাইকে বাদ দিয়ে মাকে ভালবাসতে ব্রাহ্মণ শেখেননি।

কথামৃতের ভগবান বলছেন, 'জমিদারবাবু তার জমিদারির সর্বত্র থাকতে পারেন, তবে সাধারণতঃ তিনি তাঁর বৈঠকখানাতেই থাকেন। ঈশ্বর সর্বভূতেই আছেন, তবে ভক্তহৃদয় তাঁর বৈঠকখানা'। ভক্তহৃদয় তাঁর মন্দির। তাই ভক্তরূপী ভগবানের প্রার্থনা, 'মা, তোমার মন্দির ভেঙে দিও না।'

দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের শাঁখ, ঘণ্টা বেজে উঠলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়, আর কুঠির ছাদের উপর উঠে তিনি ডাকেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! তোদের না দেখে যে আর থাকতে পারছি না।

ভক্তের জন্য ভগবানের এই চোখের জলের উপরেও মানুষের সংশয়। বিদ্যার পরপারে যদি ওঁকারের জ্ঞান, তাহলে তার সাথে এত ডাব-চিনি মানার সংস্কার মিশানো কেন? মনে পড়ে খৃষ্টের সেই মধুর বাণী—'আমি ভাঙতে আসিনি, পরিপূর্ণ করতে এসেছি'। ডাবচিনি মানার ভিতর অন্তরের যে সুষমা—শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

জ্ঞান ও মধুর সংস্কারের সাথে ফুটে ওঠে এক অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠা: 'প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজ-কর্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম স্ত্রী, ছেলে সব শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলে-পিলে। আমি বললুম, দেখ দেখি—ছেলেপিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ার লোক এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে। লজ্জা করে না?…অনেক বললুম; আর কাজকর্ম খুঁজে নিতে বললুম'।

সংসারীর সাধনা—সংসার থেকে পালানো নয়। সন্ন্যাসীর ত্যাগ চরিত্রের সবলতার পরিচায়ক, গৃহীর কর্মবিমুখতা তার কাপুরুষতা ও দায়িত্বহীনতার নামান্তর মাত্র। কর্তব্যজ্ঞান-হীনের ধর্মলাভ অসম্ভব।

* * *

'তোমার কি বিবাহ হয়েছে ?' শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন 'শ্রীম'কে। 'আজ্ঞে হাঁ'। ঠাকুর শিউরে উঠলেন—'ওরে রামলাল। যাঃ বিয়ে ক'রে ফেলেছে'। 'তোমার কি ছেলে হয়েছে ?' 'আজ্ঞে ছেলে হয়েছে'। ভগবান আবার আক্ষেপ করলেন, 'যাঃ ছেলে হয়ে গিয়েছে। দেখ তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল চোখ দেখলে বুঝতে পারি।'

এই মাত্র যিনি প্রতাপের ভাইকে গৃহস্থ-ধর্ম মেনে চলতে বলছিলেন, তিনিই এখন কৌমার্যের জয়গান করছেন। অন্তর্যামী ভগবান, 'শ্রীম'র মনের ছায়াখানি তাঁর বুকে।

পরম দেবতার লীলাসহচর 'শ্রীম'। সে কথা 'শ্রীম' ভুলতে পারেন, কিন্তু লীলাময় ভুলবেন কি ক'রে ? তিনি তো একদিন বলেছিলেন :

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

—তোমার ও আমার বহু জন্ম হয়ে গিয়েছে, বন্ধু। তুমি সে সব ভুলে গিয়েছ, আমি ভুলিনি। কথামৃতের ভগবান বলছেন, 'তোমার তো আমি সব জানি· তুমি পূর্বে কি ছিলে, পরে কি হবে—সব আমার জানা। তুমি এখানকার লোক'। 'সকলেই যদি বিবাহ না করে, তাহলে সংসার চলবে কেমন ক'রে ?' প্রশ্ন করলেন কোনও গৃহস্থ ভক্ত। উত্তর এল, 'তোমরা কর না· এ কথা তোমাদের জন্য নয়'।

প্রেমের ভগ্নাংশ হয় না। ভগবানের কাজ করতে যাঁর আসা, তিনি সাধারণভাবে সংসারকে ভালবাসতে পারেন না। 'শ্রীম' শ্রীভগবানের জন্ম-জন্মান্তরের সেবক। তিনি যদি সংসারী হন, তাহলে সংসারই বা তার দাবি ছাড়বে কেন ? এইমাত্র ভগবান নিজেই তো গৃহস্থকে সংসার করতে উপদেশ দিলেন। অথচ গৃহীর কর্তব্য ক'রে লীলাসহচরের ব্রত পালন করার সময় যে আর থাকে না। ভগবান যীশুর কথা মনে পড়ে : "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ—সে যেই হোক না কেন—আমার জন্য তার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে না পারে, তাহলে সে আমার শিষ্য হ'তে পারবে না"।

ভালবাসা ত্যাগের মন্ত্রপূত। সন্তানের সুখের জন্য মা কত ত্যাগ স্বীকার ক'রে বরণ করেন অশেষ দুঃখ। সর্বহারা সেই প্রেমেই সাধকও হন দীক্ষিত।

প্রেম স্বভাবতঃ একনিষ্ঠ। যে কারণে একজনের পক্ষে দুই প্রভুর সেবা করা সম্ভব নয়, সেই কারণেই ভক্তের পক্ষে একই সময়ে সংসারে ও ভগবানে আসক্ত হওয়া অসম্ভব।

'শ্রীম' বিবাহিত। তাঁর জীবনে নিরাশার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সে অন্ধকারে একমাত্র আশার আলো বিদ্যাশক্তি। 'আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন ? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি ?' উত্তর এলো, 'আজ্ঞে ভাল, কিন্তু অজ্ঞান'। কিন্তু উক্তিটি যে আরও অজ্ঞানের। পাণ্ডিত্যের সাথে চরম জ্ঞানের বিশেষ কোনও সম্বন্ধই নেই। চরম তত্ত্বকে না জানলে পণ্ডিতও অজ্ঞান, আর সেই সত্যকে লাভ করলে নিরক্ষর মূর্খও হয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

'পরিবার অজ্ঞান, আর তুমি জ্ঞানী ?' বিদ্বান শিক্ষককে প্রশ্ন করলেন পরীক্ষক—নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণ।

* * *

আবার প্রশ্ন !

'আচ্ছা, তোমার সাকারে বিশ্বাস না

নিরাকারে ?' পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত শ্রীম উত্তর করলেন—'আজ্ঞা, নিরাকার, একটি আমার ভাল লাগে'। 'তা বেশ, একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে—এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য'।

কিন্তু একথা যদি সত্য হয় তাহলে পরীক্ষার্থীর সমস্ত শিক্ষা মিথ্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রবঞ্চনা, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র অলীক—বিচারবুদ্ধি মনের ভ্রম। তর্কশাস্ত্রের একটি প্রধান নীতি—পরস্পরবিরোধী দুটি ভাব একই সাথে সত্য হতে পারে না, 'হতে পারে' বলা মারাত্মক ভুল। আর শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, এই ভুলটাকে সত্য ব'লে অনুভূতি হওয়ার নামই জ্ঞান।

'শ্রীম'র অহংকার ভেঙে পড়ে। বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রমাণ থাকে তার অস্তিত্বের অনুভূতির মধ্যে, যুক্তির মধ্যে নয়। সত্য অযৌক্তিক মনে হলেও মিথ্যা হয় না। ক্রমবিবর্তনের ফলে অপ্রাণ থেকে দেখা দেয় প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে আসে প্রবৃত্তিজাত বুদ্ধি (Instinct), আর সেই পশুবুদ্ধি থেকে দেখা দেয় মানুষের বিচার-শক্তি। (conceptual reason)' পশুর বুদ্ধি থেকে মানুষের ধারণাশক্তি অনেক বেশী। এই কম থেকে বেশী হওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আছে বলেই সত্য—কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে ব'লে নয়। মনে পড়ে হার্বার্ট স্পেন্সারের উক্তিটি: 'Explanation is the interpretation of the more developed by the less developed'—ব্যাখ্যা করা মানে একটি অপেক্ষাকৃত অপরিণত বস্তু দিয়ে অধিকতর পরিণত বস্তুকে বোঝানো!

বোধির অনুভূতি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, বরং উপেক্ষা করে। মানুষ সত্যকে বুঝতে চায় তার মস্তিষ্কজাত চিন্তার মাধ্যমে। কিন্তু বিচারের সাহায্য ছাড়াও এবং কখনও তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেও—সত্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমাদের মন, আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়—অতীন্দ্রিয় চরম সত্যকে জানবার যন্ত্রই নয়। কান দিয়ে দেখা যায় না, চোখ দিয়ে কিছু শোনা যায় না। বুদ্ধির যুক্তি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না।

এমনও হতে পারে যে এই আপাতবিরোধ একটা 'সৃজনী সমন্বয়ের' (Creative Synthesis) খেলা মাত্র। কবি ব্রাউনিংএর গানের দুটি লাইন মনে পড়ে:

'That out of three sounds he frames
not a fourth sound, but a star'.

—সেই সুরের ত্রিবেণী থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন চতুর্থ সুর নয়, শুধু একটি তারা ··। কে জানে সে কোন চিত্রশিল্পী সমস্ত তর্কশাস্ত্রকে উপেক্ষা ক'রে নিজেকেই একই সাথে সাকারে ও নিরাকারে রূপান্তরিত করেছেন!—ফুটিয়ে তুলেছেন নিজেরই মধ্যে যুক্তির অতীত এক মহাসমন্বয়ের রূপ।

অন্তরের মধ্যে যুক্তির কোন সীমারেখা টানা যায় না। দার্শনিক হেগেল বলছেন: 'Contradictions nestle in the very bosom of Eternity'—অনন্তের বুকে পরস্পর বিরোধী ভাব শান্ত সুখে জড়িয়ে আছে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মতে নিরাকার সমুদ্রের জল সাকার বরফ হতে পারে—অরূপ ভগবানও ভক্তের চোখে রূপময় হয়ে দেখা দিতে পারেন।

'কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন··' 'শ্রীম'র কথা সম্পূর্ণ হ'ল না। ঠাকুর বাধা দিলেন, 'মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা'।

যে বিশ্বচেতনার বাহ্য কোনও রূপ নেই অথচ যার সত্তায় আমাদের রূপ ফুটে উঠেছে তারই প্রকাশ প্রতিমায় হয়েছে ব'লে আপত্তির কোন হেতু থাকতে পারে না। মানুষও তো চৈতন্যের একটি রূপ। পঞ্চরাত্র-আগমশাস্ত্রে ভগবানের আবির্ভাব-রূপের, পুরাণে অবতার-রূপের এবং দ্রাবিড়প্রবন্ধম্-এ তাঁর বিগ্রহ-রূপের জয়গান আছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ দার্শনিক রামানুজ পর্যন্ত ভগবান বিষ্ণুর 'বিভাব-রূপের' (অবতার-রূপ) বন্দনা করেছেন। সর্বশক্তিমান সব হ'তে পারেন, অথচ প্রতিমায় আবির্ভূত হ'তে পারেন না—একথা নিশ্চয়ই যুক্তিপূর্ণ নয়। আর 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' যদি সত্যই হয়, তাহলে তো তিনি প্রতিমার মধ্যেও আছেন।

'আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ক'রে পূজা করা উচিত'—'শ্রীম' শ্রীরামকৃষ্ণকে ব'লে বসলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তা অস্বীকার ক'রে বললেন: 'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া'। ভগবানকে ঠিক বোঝানো যায় না। তাঁর কৃপা হ'লে নিজে বোঝা যায়। অধ্যাত্মজ্ঞান স্বসংবেদ্য—নিজের অনুভূতিসাপেক্ষ। একের অনুভূতি অন্যকে ধার দেওয়া চলে না। বিচার ক'রে উপলব্ধি সঞ্চার করা যায় না। পরম সত্য চরম রস। প্রবন্ধের আকারে তাকে পরিবেশন করাও অসম্ভব। সন্দেশের গবেষণা যতই মৌলিক হোক না কেন, তার বর্ণনা যতই নিখুঁত হোক না কেন, তাতে তার রসাস্বাদ হবে না।

পরকে বোঝানো দূরের কথা! "আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে?" উপনিষদের ঋষি গান করেছেন:

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

নিজের মূর্খতায় নিজেই মুগ্ধ। আর সেই মূর্খতার অন্ধকারে আপনাকেই মনে হয় সর্বজ্ঞ ধীমান্। আত্মসম্মানের রূপ নিয়ে দেখা দেয় যত আত্মপ্রবঞ্চনা। বেদনা যায় বেড়ে। তবু চলে, অন্ধ চলে অন্ধের হাত ধ'রে সে কোন গভীর অন্ধকারে!

অজ্ঞের হাতে বোঝাবার দায়িত্ব না রেখে বোধময়ের উপর নির্ভর করাই ভাল। কথামৃতের ভগবান বলেছেন, "যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন,—চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, জীব, জন্তু করেছেন—জীব-জন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা বাপ করেছেন—মা-বাপের স্নেহ করেছেন—তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না?" কুরুক্ষেত্রের প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি হ'ল: 'আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ—বন্ধু অর্জুন, তুমি আমাকেই আচার্য বলে জেনো।' তিনি অন্তরদেবতা। তাঁরই আলোতে ফুলের মত বিকশিত হয়ে ওঠে সত্য—মনোময়পুরে। বাইরে থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসে না। পাশ্চাত্য মনীষী ডীন্ ইঞ্জ বলতে বাধ্য হয়েছেন যে 'প্রচার ক'রে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায় না। মরমী সত্যের ছোঁওয়া লাগে প্রাণে।'

'যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না যে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে। তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন'। আর মানুষের বোঝাবার

বা কি দরকার? প্রয়োজন তো শুধু ভগবানকে ডাক শোনাবার। ভুল ডাকও ভগবান নিশ্চয় শুনতে পান, তাঁর যে 'দিশঃ শ্রোত্রে'। সে ডাকের অর্থও তার কাছে সুস্পষ্ট; তিনি যে 'ভূতান্তরাত্মা'—সকলের হৃদয়দেবতা।

"ছোট ছেলে বাবা ব'লে ডাকতে পারে না। শুধু বলে 'বা' কিংবা 'পা'। বাবা কি বুঝতে পারেন না যে ছেলে তাঁকেই ডাকছে? তিনি ঐ ডাকেই সন্তুষ্ট হন"। কি মধুর কথা! কি অমৃতপথের আলো।

নিজে অজ্ঞ থেকে অন্যকে শুধু অজ্ঞতাই দেওয়া চলে। তাই জ্ঞান দান করতে যাবার আগে জ্ঞান লাভ করাই ভাল।—'ওর জন্য তোমার মাথা ব্যথা কেন কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়—তার চেষ্টা কর'।

ভগবানের পূজার পদ্ধতি মানুষ রচনা করেনি—ভগবান নিজেই শিখিয়েছেন। এ বিষয়ে মানুষের পক্ষে ভুল ধরতে যাওয়া মারাত্মক ভুল। "নানা রকম পূজা ঈশ্বরই করেছেন"—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—ভক্তের কল্যাণের জন্য ভগবান নিজেই তাঁর রূপ কল্পনা করেছেন। সেই কল্পনার সাথে সৃষ্টির কোন পার্থক্য নাই। আদিপুরুষের চিন্তাই আমাদের চোখের সামনে রূপ হয়ে দেখা দেয়। দার্শনিক হেগেলের মতে এই ব্রহ্ম—যাঁকে তিনি Absolute (পরম) কিংবা Reason (যুক্তি) বলেছেন—শুধু চিন্তাই করেন না, চিন্তাকে কার্যে রূপায়িত করে তোলেন। তাঁর' কল্পনাই সৃষ্টি হয়ে আকার নিয়ে ভেসে ওঠে। "It is both a subjective faculty and an objective reality" (Weber on Hegel) তাই ভগবানের পূজায় মধ্যে প্রতিমা উপাসনারও স্থান আছে।

'তুমি মাটির প্রতিমা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজারও প্রয়োজন আছে। যাঁর জগৎ তিনিই এ সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন'। আর শুধু অধিকারের কথা নয়, এর মধ্যে রুচির প্রশ্নও জড়িত আছে। 'কারও জন্যে মাছের ঝোল, কারও জন্য মাছের চচ্চড়ি...যার যেটি ভাল লাগে, যেটি যার পেটে সয়। বুঝলে?'

ধীরে ধীরে সত্যের আলো ফুটে ওঠে 'শ্রীম'র মনে। তর্কের হয় অবসান। বোধির কাছে বুদ্ধির, অধ্যাত্মজ্ঞানের কাছে পুস্তকস্থ বিদ্যার হয় পরাজয়। সমস্ত প্রাণ ব'লে ওঠে—'শিষ্য আমি, শরণাগত আমি—প্রভু, আমাকে শিক্ষা দাও, শাসন কর।'—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"।

বিদ্বান্ শিক্ষক নতুন ক'রে পরিণত হলেন দীনতম শিষ্যে। বোধন-লগ্ন এল নবতম গীতার।

ভাগীরথী বয়ে যাচ্ছেন। পঞ্চবটী শীতের রোদে রঙিন হয়ে উঠেছে। · ··আর ভগবানের রাঙা ঠোঁটে মৃদু হাসি। কুরুক্ষেত্রে অজ্ঞান অথচ প্রজ্ঞাবাদী অর্জুনের আত্মসমর্পণের পরও এমনি করেই তিনি হেসেছিলেন। যে হাসিতে ফুটে উঠেছিল 'গীতা'—সেই হাসির আলোতেই ঝ'রে পড়ল 'কথামৃত'।

নিষ্কাম কর্ম কি সম্ভব?

স্বামী জীবানন্দ

'নিষ্কাম কর্ম' শব্দ দুটি শুনলেই মনে হয়, এর মধ্যে অসঙ্গতি বর্তমান,—পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব। কামনা থেকেই কর্মের উৎপত্তি, কামনা ব্যতিরেকে কর্ম সম্ভব নয়, অতএব নিষ্কাম কর্ম অসম্ভব এবং অর্থহীন।

মনে যে সঙ্কল্পের উদয় হয় তারই অপর নাম কামনা। সঙ্কল্পের রূপায়ণই কর্ম। অবশ্য ব্যাপক অর্থে সঙ্কল্প বা কামনাও কর্মের অন্তর্ভূক্ত। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের নিকট কর্মের সংজ্ঞা অধিকতর ব্যাপক। হাত দিয়ে কাজ করা তো বটেই—নড়া-চড়া, কথা বলা, এমনকি চিন্তা পর্যন্ত কর্মের গণ্ডির ভিতরে। কর্ম বলতে সাধারণতঃ যা বোঝা যায় তাতে হাতের যোগ থাকবেই থাকবে, আর 'কৃ' ধাতুর যোগও থাকা চাই।

মানুষ শরীর মন ও বাক্য দ্বারা যা কিছু নিষ্পন্ন করে সবই কর্ম। কর্ম ছাড়া ক্ষণকালও অবস্থান করা দুঃসাধ্য। কর্মহীন হ'লে জীবন-ধারণও অসম্ভব হয়। মন কর্মশূন্য হলেই মনের বিনাশ এবং মনের বিনাশেই সমাধি বা নির্বাণ।

আমরা যে কর্ম করি তার কারণ আছে। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। দেহধারণের পূর্বে মনের মধ্যে সংস্কাররূপে বহু কারণ বিদ্যমান থাকে। সংস্কারের বশেই আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই। অতি সূক্ষ্মই হোক বা অতি স্থূলই হোক, যে কোন চলন কম্পন বা গতিই কর্ম। সকল কর্মের মূলে পাঁচটি কারণ বর্তমান:

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥
—গীতা, ১৮।১৪-১৫

শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা যে কোন ধর্ম্য বা অধর্ম্য (অশাস্ত্রীয়) কর্ম কৃত হয় তৎসমুদয়ের কারণ: অধিষ্ঠান (দেহ), কর্তা (কর্তৃত্ববোধ), পৃথক্ পৃথক্ করণ বা ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা, দেবতার অনুগ্রহ। এই কারণ পাঁচটির একটির অভাব হলেও কর্ম হয় না। কর্ম করতে গেলে শরীর চাই এবং শরীরে 'আমি কর্তা' এইরূপ কর্তৃত্ববোধ থাকে, নতুবা মৃত শরীরের দ্বারা কর্ম করা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়গণ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) চাই, প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান) বায়ুর চেষ্টা চাই, বায়ুরোধপূর্বক যে সাধক সমাধিস্থ হন, তাঁর দ্বারা কর্ম হয় না, এবং দেবানুগ্রহও আবশ্যক, দেবতা অর্থে দ্যোতনশীল, প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণের রূপরসাদি বিষয়সকলের সহিত সম্মিলনেই কর্ম সম্ভব।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥

কর্মের ফল ত্রিবিধ: অনিষ্ট, ইষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট মিশ্র। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণই এই ত্রিবিধ কর্মের ফল ভোগ ক'রে থাকে. ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগী সন্ন্যাসিগণের ঐ ফলভোগ হয় না। শ্রেণিভেদে কর্ম তিন প্রকার: সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত কর্ম—অতীত পূর্ব পূর্ব জন্ম থেকে যে কর্মবীজ সঞ্চিত আছে। প্রারব্ধ কর্ম—সঞ্চিত কর্মের মধ্যে পরিপক্ব বা ঈশ্বরেচ্ছায় বর্তমান শরীরের আরম্ভক কর্মসমূহ। ক্রিয়মাণ কর্ম—জ্ঞানোদয়ের পূর্বে বা পরে বর্তমান দেহে মরণকাল পর্যন্ত যে কর্ম ক্রিয়াশীল। জ্ঞানের উদয়মাত্রই সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম নাশ বা নির্বীজতা প্রাপ্ত হয়।

নিষ্কাম কর্মের অর্থ সঙ্কল্পহীন কর্ম নয়। এখানে 'কাম' শব্দের অর্থ আসক্তি, 'নিষ্কাম' মানে অনাসক্ত। যে কর্মে আসক্তি নেই তাকে বলা হয় নিষ্কাম কর্ম। এখন প্রশ্ন আসে—কর্মে যদি আসক্তিই না রইল, তবে কর্ম করবার প্রবৃত্তি হবে কি ক'রে? ধরা যাক, কারও অর্থের প্রয়োজন, অর্থে যদি আসক্তি না থাকে তাহ'লে তার অর্থোপার্জনে স্পৃহা আসবে না। উত্তরে বলা যায়: প্রবৃত্তির মূলে—প্রয়োজন, আসক্তি নয়। প্রয়োজনের খাতিরেই লোকে অর্থোপার্জনে বাধ্য হয়। বেশ, তাহ'লে অর্থে আসক্তি থাকলে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও আয়াস ক'রে অর্থোপার্জন করা যায়, অর্থে আসক্তির অভাবে নিশ্চয়ই ততখানি পরিশ্রম ও প্রযত্ন নিয়ে অর্থোপার্জন সম্ভব নয়। এ কথাও অসমীচীন। আসক্তি উন্মাদনা আনতে পারে—সন্দেহ নেই, উন্মাদনার আবেশে অভিভূত হয়ে অসদুপায় অবলম্বনে প্রচুরতর ধনের অধিকারী হতে পারা যায় হয়তো, কিন্তু অনাসক্ত চিত্তের যে আনন্দ ও শান্তি, তার অধিকারী আসক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি কখনই নয়।

নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান নিম্নলিখিত চারভাবে আমরা আলোচনা করতে পারি:

(১) বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নিয়ে কর্মানুষ্ঠান
(২) স্বার্থশূন্য বা অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করা
(৩) পূজার ভাবে বা ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কর্ম
(৪) জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কর্ম।

রাসায়নিক যেমন সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন, তাঁর জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, নিষ্কাম কর্মযোগীও সেইরূপ কোন্ কর্ম করণীয়, কোন্‌টি অকরণীয়—ত্যাজ্য গ্রাহ্য বিচারের দ্বারা কর্ম করবার কৌশলটি আয়ত্ত করেন। সুষ্ঠুভাবে কর্ম-সম্পাদনের নব নব চিন্তা-ধারা তাঁর জীবনে নিত্য নূতন আলোক সম্পাত করে। জগদ্রূপী বিশাল পরীক্ষাগারে সদা সচেতন কর্মযোগীর পরীক্ষার আর শেষ নেই—সব থেকে ভালভাবে কি উপায়ে কর্ম করা যায়, এই আবিষ্কার-স্পৃহা বর্তমান থাকে তাঁর সমস্ত কর্মের পিছনে—সময়ের সঙ্গে পা ফেলে সমান তালে এগিয়ে চলেন তিনি, তাঁর কর্মের স্বচ্ছতা সাধারণ মানুষের চমক লাগিয়ে দেয়।

কর্মযোগী বেশী কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন না, যতটুকু আপনা থেকে আসে ততটুকু নিয়েই তাঁর সাধনা চলে। কোন কাজকে ছোট কাজ বা বড় কাজ ব'লে না ভেবে যথার্থ অনাসক্তির ভাব নিয়ে কর্ম করতে থাকেন তিনি, তাই নানা সংঘর্ষে ও বিফলতায় তাঁর চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে না। বাসনা ত্যাগ ক'রে কর্ম করতে পারলে অনন্ত গুণ ফলের অধিকারী হওয়া যায়। সাধারণতঃ মানুষ ফলের চিন্তায় অধীর হয় ব'লে আশানুরূপ ফল পায় না। সারাদিন লোকে কত কর্মই না করে, কিন্তু দুর্গতির শেষ নেই। তাদের কর্মযোগ হয় না, হয় কর্মভোগ! তারা তিলে তিলে সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ ক'রে ফেলেও শেষ পর্যন্ত কিছুই পায় না। নিষ্কামভাবে না করলে পূজাদি সৎ কর্ম ক'রেও অহঙ্কারেরই বৃদ্ধি হয়। কর্মের রহস্যে অনভিজ্ঞ সকাম কর্মী—রাজা, রাজকর্মচারী বা উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের সাধনায় ব্রতী নগণ্য ঝাড়ুদারও শ্রেষ্ঠ।

পৌর প্রতিষ্ঠানের ঝাড়ুদার ভোর রাত্রে উঠে শহরের রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যদি মনে করে আমি ভগবানের রচিত এই বিশ্বসংসারের একটি ক্ষুদ্র স্থানে একটি ক্ষুদ্র কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছি—ভগবানের বহু সন্তানের জন্য রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ধন্য হচ্ছি, আর পৌর প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ যদি তাঁদের উপর

স্তুত কর্মের ভার যথাযথ সম্পন্ন না ক'রে যেন তেন প্রকারেণ কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির দিকেই লক্ষ্য রাখেন, তবে কি ঐ অশিক্ষিত ঝাড়ুদার এই শিক্ষিত সভ্যগণ অপেক্ষা বড় নয় ?

অহংভাবশূন্যতাই নিষ্কাম কর্মের লক্ষণ, নিষ্কাম কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত যদি উত্তরোত্তর নির্মল হ'তে থাকে এবং বিভিন্ন কর্মে সাফল্যলাভ করেও মনে যদি অহংকারের উদয় না হয়, তবে বুঝতে হবে নিষ্কাম কর্মের সাধন ঠিক ঠিক হচ্ছে। কিন্তু কর্মের দ্বারা যদি অহংকারই বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে বোঝা উচিত সাধন তো হচ্ছেই না, উপরন্তু চিত্তও মলিন থেকে মলিনতর হয়ে যাচ্ছে, কারণ অহংকারই চিত্তের মলিনতা বা অশুদ্ধি।

অসীম শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে মানুষের মধ্যে —তাকে জাগিয়ে তোলাই কর্মের উদ্দেশ্য। সেই সুপ্ত শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করাই কর্মযোগীর সাধনা। যে কর্মযোগীর মধ্যে ভক্তিভাব থাকে, তিনি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের প্রীতির জন্য করেন, যা কিছু করেন সবই তাঁর পূজাজ্ঞানে, কর্মকে তিনি ভগবদুপাসনা-রূপেই গ্রহণ করেন। তাঁর ধারণা—ঈশ্বরই কর্তা, আমি অকর্তা, ঈশ্বর প্রভু, আমি তাঁর দাস। আবার, জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কর্মরত সাধকের মনে এই চিন্তা থাকে যে, শরীর-মন-ইন্দ্রিয়গণকে অবলম্বন ক'রেই সমস্ত হচ্ছে—আত্মা অকর্তা; অকর্তৃত্ব-বোধ নিজের উপর আরোপ করেন ব'লে তাঁরও বেচালে পা পড়ে না।

মানুষের অভাব ও অপূর্ণতার জন্যই স্বার্থপূর্ণ বা সকাম কর্ম, তার থেকেই নানা দুঃখ ভোগ। অভাব ও অপূর্ণতা পূরণের দ্বারা দুঃখ-নিবারণ ও সুখলাভের জন্য মানুষ নিরন্তর কর্মব্যস্ত। অভীষ্ট-লাভে কোন বাধা থাকলে ঐ বাধা দূর করার জন্য কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উদ্দেশ্যে সুখলাভ সত্য; কিন্তু প্রকৃত সুখ তো ক্ষণস্থায়ী সুখ নয়, তা চিরস্থায়ী। অপূর্ণতাই দুঃখের কারণ, জ্ঞান-লাভেই পূর্ণত্ব-উপলব্ধি ও দুঃখের নিবৃত্তি। তাই অভাব পূরণ ও জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত কর্মও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কর্মমাত্রই ফল প্রসব করে, সে ফল সুখকর বা দুঃখকর। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে সুখকেও ছাড়তে হবে, অতএব কামনা-প্রযুক্ত কর্ম ত্যাগ করাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। সকাম কর্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। সকাম কর্মীর কর্মের উদ্দেশ্য ফললাভ, নিষ্কাম কর্মীর কর্মের উদ্দেশ্য-চিত্তশুদ্ধি বা নিবৃত্তি। অসদুপায়ে উদ্দেশ্য সাধনের প্রবৃত্তি সকাম কর্মীরই হ'তে পারে, নিষ্কাম কর্মীর পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। সকাম কর্মী উদ্দেশ্য-লাভের পথে সর্বপ্রকার বাধাকে শত্রু জ্ঞান ক'রে যে কোন উপায়ে তাদের উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট থাকে। সকাম কর্ম কর্মীকে মোহান্ধ ক'রে অপরের অশেষ অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত করে, নিষ্কাম কর্মী প্রবল অন্তরায়কেও সহায় মনে ক'রে সাধনার পথে অগ্রসর হন।

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, শুদ্ধচিত্তেই জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম না ক'রে সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম করতে পারলে সিদ্ধিতে সুখ বা অসিদ্ধিতে দুঃখ আসে না। নিষ্কাম কর্মে লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ সবই সমান। সকাম কর্মে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে বিপদ। কর্ম অঙ্গহীন হ'লে সুফলপ্রাপ্তি বা সুখলাভ অসম্ভব, উপরন্তু প্রত্যবায়ের জন্য দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। সকাম কর্ম নির্দোষভাবে শেষ করতে না পারলে শুভ ফললাভ হয় না, নিষ্কাম কর্মে সমাপ্তির অপেক্ষা নেই, সুষ্ঠুভাবে স্বল্পমাত্র করলেও ফল চিত্তশুদ্ধি। নিষ্কাম কর্মী সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হন ব'লেই তাঁর চিত্ত নির্মল হয়। রজোগুণেই বিক্ষেপ। কর্ম বন্ধন, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে কর্ম দ্বারা

কর্মচ্ছেদ—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, বিষের দ্বারা বিষক্ষয়। ফলের বাসনায় সকাম ভাবে কৃত হ'লে যে কর্ম বন্ধনের কারণ, নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে সেই কর্মই মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। প্রকৃত পক্ষে কর্ম বন্ধন আনে না, আসক্তিই আনে বন্ধন। সকাম কর্ম আমাদের বহির্মুখী করে, ঈশ্বরবিমুখ করে।

ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার, আত্মার অভিমুখী হবার উপায় নিষ্কাম কর্ম। কর্ম করাই কর্মের উদ্দেশ্য নয়, কর্ম করতে করতে অন্তরে জ্ঞান-দীপ জ্বলে উঠলেই কর্মের সার্থকতা। নির্মল হওয়াতেই কর্মের পরিসমাপ্তি, শুধু কর্ম সম্পাদনেই নয়। কর্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ করতে পারলে আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় প্রকাশে জীবন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভগবানের মন্দিরে পৌঁছবার জন্যে নিষ্কাম কর্মের সোপান ধরে চলতে হবে। নিষ্কাম কর্মের সেতু দিয়ে যেন জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ হয়ে রয়েছে, সেই সেতু অতিক্রম করতে পারলেই জীব ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সমীর ফুলের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। জীবও যদি কর্মের মাধ্যমে ভগবদ্‌ভাব ছড়াতে পারে তবেই হয় কর্মের সার্থকতা। দৈনন্দিন প্রতিটি কর্ম, চালচলন, আচার ব্যবহার তদ্‌ভাব-ভাবিত হয়ে যায় নিষ্কাম কর্মের সাধনায়।

ঈশ্বর বিশ্বকর্মা, বিশ্বপালক, তিনিও চুপ ক'রে বসে নেই নিষ্ক্রিয় হয়ে। অতন্দ্রিতভাবে ক'রে চলেছেন তাঁর বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বপালনের কাজ। গতির উল্লাসে প্রকাশময় স্থিতি নিয়ে ঈশ্বর বিরাজমান। তবে আমরাই বা নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকব কেন? প্রেমের সঙ্গে প্রীতির রসে সিক্ত ক'রে কর্ম করলে কর্ম নীরস থাকবে না, সরস হয়ে উঠবে।

পরোপকারে নিজের স্বার্থবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা চলে যায়। বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ কর্মের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন প্রকৃত কর্মী। কর্মকে সেবার সুযোগ ব'লেই নিতে হবে। কাজ যতই নগণ্য হোক ফলাফল বিচার না ক'রে করতে পারলে অনাসক্ত হতে পারা যায়। কর্ম করতে করতে ক্লান্ত হলেই ঈশ্বর আর দূরে থাকবেন না, কাছে এসে ধরা দেবেন। নদী অবিশ্রান্তভাবে ছুটতে ছুটতে সাগরসঙ্গমে এসে শুব্ধ হয়ে যায়; আমাদের কর্মেরও অবসান হয় ঈশ্বরসান্নিধ্যে, তাঁর শান্তিভরা স্পর্শ সমস্ত ক্লান্তি দূর ক'রে দেয়।

ভগবান ভক্তি ছাড়া কিছুই নেন না, শুধু দিয়েই যান। আমরা শুধু নেবার জন্যেই সদা প্রস্তুত। নিতে নিতে নিজেদের সঙ্কুচিত ক'রে ফেলেছি। কেবলই হাত পেতে পেতে যা জমিয়েছি তার মূল্য কতটুকু? নেওয়ার বদলে নিজেদের নিঃস্বার্থভাবে উজাড় ক'রে দেওয়াই যেদিন কাজ হবে আমাদের, সেদিন কর্মের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে আমাদের কাছে।

পূর্ণস্বরূপে ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল ও নিষ্ক্রিয় হলেও তাঁর ব্যক্তাংশ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিবর্তনশীল ও নিয়ত কর্মচঞ্চল। আমরা সেই জগতের অন্তর্গত, তাই নিয়ত কর্ম করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। জগৎ এক মুহূর্তও স্থির নয়—নিরন্তর গতিশীল অর্থাৎ কর্মশীল। এ জগৎ কর্মশালা—সংগ্রামক্ষেত্র। কর্মই পূজা—উপাসনা, অর্থাৎ এই কর্মের সূত্র ধরেই আমরা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি।

শিবজ্ঞানে জীবসেবায় নিষ্কাম কর্মের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমেই বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় কর্মজীবনে। এক আত্মাই সর্বভূতে বিরাজমান। এক আত্মাই সমুদয় জীব-জন্তুর মধ্যে প্রকাশিত। বেদান্তের মূলতত্ত্ব: বহুত্বে একত্ব। একাত্মবোধই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব—সমস্ত সাধনার পরিসমাপ্তি একাত্মবোধে। সেবা ও প্রেমের ভাবে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা এই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের উপলব্ধি

হয়, তাই স্বামীজীর কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সমন্বয়-বাণী :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ব্যক্তিগত স্বার্থলিপ্সার বহু উর্ধ্বে, সূক্ষ্মতর ভোগবাসনা ও নামযশের আকাঙ্ক্ষা থেকে বহু দূরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই সেবার স্থান। নিঃস্বার্থভাবে অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে অভ্যস্ত হ'লে ক্রমে শুভ সংস্কার উৎপন্ন হয়। বিদ্যাহীনকে বিদ্যাদান, নিরন্নকে অন্নদান, স্বদেশ সমাজ বা আর্ত-পীড়িতের সেবা প্রভৃতি কর্মে যদি স্বার্থবুদ্ধি না থাকে তবেই সেগুলি নিষ্কাম কর্মে পরিণত হয়। এই সকল কর্ম তখন আর বন্ধনের কারণ না হ'য়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেয়। মনকে সংকুচিত না ক'রে বিকশিত করে।

যদি অন্তরে মান যশ ও প্রতিষ্ঠার বাসনা এবং বৈষয়িক সুখসুবিধার ইচ্ছা থাকে তবে নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব নয়। যিনি মনটিকে এ সবের উর্ধ্বে রাখতে পারেন তাঁর পক্ষেই নিষ্কাম কর্ম সম্ভব। শাশ্বতী শান্তি তাঁরই, অপরের নয়।

ঘোরাও চক্র তোমার

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

হে চক্রী, ঘোরাও চক্র তোমার।
দয়াহীন নগ্ন নিষ্ঠুরতা
সাধুবেশে মিষ্ট ভাষে কহে ধর্ম কথা।
জ্ঞানালোক লুপ্তপ্রায় ত্রিভুবনে আজ
ব্যাপিয়াছে দিকে দিকে ঘোর অন্ধকার।
সর্বনাশা পিশাচের দল,
রচিয়াছে পৃথিবীতে স্বীয় ক্রীড়াস্থল।
মন্দিরেতে পশি দেবতা-নৈবেদ্য
কাড়াকাড়ি করি খায় বুভুক্ষু কুক্কুর।
খর দন্ত বিকশিয়া অট্টহাস্য হাসিতেছে
স্বার্থমত্ত মানুষ-অসুর।

পাঞ্চজন্য বাজাও সঘনে
পুনর্বার ধরি করে চক্র সুদর্শনে—
ন্যায়-বলে নিষ্পেষিত করি অসাম্যেরে
জাগাও বিশ্বের বুকে তব শান্ত সুর—
চক্রধারী হে মুরারি, দানবের দর্প কর চুর।
যুগে যুগে ব্রত তব ভূ-ভার হরণ,
হে পার্থসারথি, আজ কর কর দুষ্কৃত-দমন।
স্থাপন করিতে ধর্ম এসো হে আবার!
নব বিবর্তন লাগি
হে চক্রী, ঘোরাও আজ চক্র সে তোমার!

শূদ্রজাতি ও বেদপাঠ

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

শূদ্রকর্তৃক অধ্যয়নস্থলেও বেদশব্দের মুখ্যার্থই গ্রহণ সম্ভব হওয়ায় গৌণার্থ গ্রহণ অন্যায্য

যাহা হউক, এতাবৎ পর্যন্ত বিচারে ইহা নির্ণীত হইল যে—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইত্যাদি শ্লোকে পঠিত 'বেদ' শব্দটির মুখ্যার্থ গৃহীত হইলেও শূদ্র কর্তৃক বেদাধ্যয়নে কোন প্রকার বিরোধ হয় না। সেই হেতু প্রস্তাবিত স্থলে 'বেদ'শব্দের মহাভারত ও পুরাণরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। শূদ্র মুখ্য বেদ অধ্যয়ন করিতে অধিকারী, তবে অধ্যয়ন বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষারূপ বেদাঙ্গে বিহিত স্বরাদিসহযোগে তাহা অধ্যয়ন করিবার অধিকার তাঁহার নাই, এইটুকুমাত্রই প্রভেদ। এই প্রকার গূঢ়ার্থ হৃদয়ে রাখিয়াই বেদবিদ্ আচার্য "শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্ বেদস্য অধ্যয়নম্" ইত্যাদি অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

ক্রম ও স্বরাদিহীন এতাদৃশ বেদপাঠ বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠ

এই প্রকার বেদব্রতহীন, গুরুর অনুচ্চারণহীন এবং ক্রম-ও স্বরাদিহীন যে বেদপাঠ তাহা বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠই হইয়া পড়িল। কারণ ইতিহাসাদির পাঠেও বেদব্রত এবং ক্রম ও স্বরাদির অপেক্ষা নাই। এই ব্রত ও স্বরাদিহীনতারূপ যে ধর্ম, তাহা শূদ্রের বেদপাঠ এবং ইতিহাস ও পুরাণ পাঠ উভয়ত্রই সমান। সেইহেতু ভগবান্ শারীরকভাষ্যকার শূদ্রের এতাদৃশ বেদপাঠকে ইতিহাস পুরাণপাঠরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্ (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।৪৯) ইতি চ ইতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যস্য অধিকারস্মরণাৎ" (উত্তরমীমাংসা, ১।৩।২৮ শঙ্করভাষ্য)। ভগবান্ ভাষ্যকারের এই বচনবলে ক্রম ও স্বরাদিরহিত বেদপাঠ যে বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠ, ইহা স্বীকার না করিলে মহাভারতের প্রস্তাবিত প্রকরণে (শান্তি পর্ব, ৩২৭ অধ্যায়ে) মুখ্যবেদ অর্থেই যে বেদ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার জানিতেন না, সুতরাং তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না—এই প্রকার অতি অসঙ্গত মূলনাশিকা কল্পনা করিতে হইবে, অত্যন্ত ঘৃণার সহিত উপেক্ষার যোগ্য।

ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের স্বরাদিহীন বেদপাঠও বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠ

ব্রত ও স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণপাঠই হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ও যদি তদ্রূপে বেদপাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষেও তাহা বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণ-পাঠই হইয়া পড়ে, ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ শূদ্র স্বরাদিহীনভাবে বেদপাঠ করিলে তাহা হইবে ইতিহাস ও পুরাণপাঠ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় তাহা তদ্রূপে করিলে উহা হইবে বেদের মুখ্যপাঠ—এইরূপ অসঙ্গত কল্পনার প্রতি কোন প্রমাণ নাই।

বেদে বর্ণিত উপাসনাসকলের অনুষ্ঠানেও শূদ্রের অধিকার, তবে তাহা হইবে পৌরাণিক

উপরোক্ত যুক্তিবলে ইহাও নির্ণীত হয় যে—স্বরাদিরহিত বেদধ্বনির দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি

কোনপ্রকার শ্রৌত কর্মের অনুষ্ঠান চলে না, সেইহেতু শ্রৌত যজ্ঞাদিক্রিয়াতে শূদ্রের অধিকার সিদ্ধ হয় না। 'শূদ্রঃ যজ্ঞে অনবক্লিপ্তঃ' (তৈঃ সং ৭।১।১।১৬) শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ইহাই তাৎপর্য। কিন্তু "শূদ্রঃ উপাসনায়াম্ অনবক্লিপ্তঃ"—এতাদৃশ কোন শ্রুতিবাক্য পরিদৃষ্ট হয় না। তাহার হেতু উপাসনানুষ্ঠানে মানসিক চিন্তারই আবশ্যকতা, স্বরাদিসহ বেদপাঠের নহে। এমনকি অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া বিষয়টি অধিগত হইয়াও উপাসনা করা চলে, "শ্রুত্বা অন্যেভ্যঃ উপাসতে"—গীতা ১৩।২৫। সেইহেতু এতাদৃশ স্বরাদিরহিত বেদপাঠের, বা স্বরাদিরহিত বা তৎসহিত পূর্বোক্ত প্রকার বেদশ্রবণের ফলে লব্ধজ্ঞান শূদ্র যদি অপ্রতিষিদ্ধ শ্রৌত উপাসনার অনুষ্ঠান করেন, তাহা তাঁহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ নহে। তবে তাঁহার তাদৃশ উপাসনাকে পৌরাণিক উপাসনারূপেই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তাঁহার তাদৃশ স্বরাদিবিহীন বেদপাঠ—ইতিহাস ও পুরাণপাঠরূপেই নির্ণীত হইয়াছে। এতাদৃশ ইতিহাস ও পুরাণাত্মক বেদালোচনা দ্বারা শূদ্রের নিগুর্ণব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তিতেও কোন বাধা নাই, ইহা উত্তরমীমাংসাতে (১।৩।৯) অপশূদ্রাধিকরণে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ স্বরাদিসহ বেদাধ্যয়নপূর্বক, তাঁহাদের সেই সেই বিদ্যাতে অধিকার নাই—"বেদপূর্বকস্তু নাস্তি অধিকারঃ শূদ্রাণাম্" উত্তরমীমাংসা ১।৩।৩৮ ভাষ্য—ইহাই ত্রৈবর্ণিক হইতে শূদ্রজাতির অধিকারের প্রভেদ।

কেহ কেহ বলেন, স্বরাদিসহ বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার শাস্ত্র হইতেই সিদ্ধ হয়, তাহা নিরাকরণ

এইরূপে আমরা দেখিলাম—ক্রম ও স্বরাদিবিহীন বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার থাকিলেও স্বরাদিসহযোগে অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ বেদপাঠে তাঁহাদের অধিকার নাই। কেহ কেহ কিন্তু নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাক্য সকলের বলে স্বরাদিসহ বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন। এই প্রসঙ্গে সেই বাক্যগুলিও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সেই বাক্যসকল এই :

(১) "তানি বা এতানি চত্বারি বাচঃ—এহীতি ব্রাহ্মণস্য, আগহ্যাদ্রবেতি বৈশ্যস্য রাজন্য-বন্ধোশ্চ, আধাবেতি শূদ্রস্য" (শতপথ ব্রাঃ ১।১।৪।১২), ইহার অর্থ—"সেই চারিটি বাক্যসম্বন্ধি রূপ (—প্রকার) এই : যজ্ঞকর্তা যদি ব্রাহ্মণ হন 'এহি' মন্ত্রে (অর্থাৎ 'ওঁ হবিষ্কৃদেহি' এই মন্ত্রে), যদি ক্ষত্রিয় হন, 'আদ্রব' (—ওঁ হবিষ্কৃদাদ্রব) এই মন্ত্রে, যদি বৈশ্য হন, 'আগহি' (—ওঁ হবিষ্কৃদাগহি) এই মন্ত্রে এবং যদি শূদ্র হন, 'আধাব (—ওঁ হবিষ্কৃদাধাব) এই মন্ত্রে হবিষ্কৃৎকে (যজ্ঞের পুরোডাশরূপ হবনীয় দ্রব্যের সম্পাদনকারিণী পত্নীকে) আবাহন করিবেন"।

(২) "যদি সোমং ব্রাহ্মণানাং সঃ ভক্ষঃ, যদি দধি, বৈশ্যানাং সঃ ভক্ষঃ অর্থ যদ্যপঃ শূদ্রাণাং সঃ ভক্ষঃ" (ঐতঃ ব্রাঃ ৩৫।৪।২৯)—যজ্ঞকালে যদি সোম আহৃত হয়, তাহা ব্রাহ্মণগণের ভক্ষণযোগ্য যদি দধি আহৃত হয়, তাহা বৈশ্যগণের ভক্ষণযোগ্য ; যদি জল আহৃত হয়, তাহা শূদ্রের ভক্ষণযোগ্য।

এই সকল স্থলে হবিষ্কৃদাবাহনে ও যজ্ঞশেষভক্ষণে শূদ্রের জন্যও ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে তাহার জন্য এই সকল ব্যবস্থা বেদে বিহিত হইত না। সুতরাং শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু স্বরাদিসহ বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিলে বৈদিক যজ্ঞে অধিকার সিদ্ধ হয় না। সেইহেতু শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণবলে শূদ্রের স্বরাদিসহ বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়। "নিমিত্তার্থেন বাদরিঃ" (পূঃ মীঃ ৬।১।২৭) ইত্যাদি সূত্রে আচার্য বাদরি শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, ইত্যাদি।

(৩) ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলে এই সূক্তটি পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"কারুরহং ততো ভিষক্ উপলপ্রক্ষিণী ননা" (ঋগ্বেদ সং ৯।১১২।৩)। সায়ণভাষ্যানুযায়ী ইহার অর্থ—[মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন,] আমি কারু (—স্তোমসকলের কর্তা অর্থাৎ সামগানকারী), তত (অর্থাৎ পিতা) হইতেছেন ভিষক্, আর ননা (—মাতা) হইতেছেন বালুকাতে যবভর্জনকারিণী"। এই ঋকের ব্যাখ্যাতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, "জাতিবিধি সৃষ্টি হইবার পর স্তোত্রকারের পুত্র (পিতা?) ভিষক্ হইতে পারিতেন না। ঋগ্বেদরচনার সময় [ইদানীন্তনকালের ন্যায়?] এত অস্বাস্থ্যকর বিধি ছিল না।" তাহাতে ইহার অভিপ্রায় এইরূপই মনে হয় যে, ইনি ঋষিকে বর্ণসঙ্কর মনে করিয়াছেন। ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকাতে (৪৫ পৃঃ) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন—"তাঁহার (—ঋষির) পিতামাতা কোনপ্রকার পাতিত্যদোষে দুষ্ট হইতে পারেন" ইত্যাদি। ফলে ইহাদের মতানুসরণকারী কেহ কেহ বলেন—পতিত পিতামাতার সন্তান, অথবা বর্ণসঙ্করও যখন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে পারেন, তখন সদ্বংশজাত শূদ্র যে বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইবেন, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? কারণ যাঁহার বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, বেদের সহিত পরিচয়ই নাই, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইবেন —ইহা কল্পনা করা যায় না।

(৪) "যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ।" (শুক্লযজুর্বেদ সং ২৬।২)। উবটাচার্য ও মহীধর-কৃত ভাষ্যানুযায়ী ইহার অর্থ এই: "যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ, রাজন্য (ক্ষত্রিয়), শূদ্র, অর্য (বৈশ্য), আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকল লোককে *এই কল্যাণী বাণী বলিতেছি, [সেই হেতু আমি দেবতাগণের প্রিয় হইব]*।" কেহ কেহ অত্রস্থ '*কল্যাণী* বাণী' শব্দের অর্থ করেন 'বেদ'। আর সেই বেদ যখন ঋষি স্বয়ং শূদ্রকে বলিতেছেন, তখন অবশ্যই শূদ্রের ক্রম ও স্বরাদিসহ বেদাধ্যয়নে অধিকার আছে, ইত্যাদি।

প্রাচীন আচার্যগণকে অনুসরণ করিলে উক্ত স্থলচতুষ্টয়ের একটিতেও শূদ্রের স্বরাদিসহ বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার স্বীকার করা যায় না। কেন স্বীকার করা যায় না? প্রদত্ত সংখ্যানুসারে ক্রমশঃ বলিতেছি:

১। কল্পসূত্রকার আপস্তম্ব "হবিষ্কৃদেহি ইতি ব্রাহ্মণস্য হবিষ্কৃদাবেতি শূদ্রস্য" (আপঃ শ্রৌঃ সূঃ ১।১৯।৯) ইত্যাদি সূত্রে "তানি বা এতানি চত্বারি বাচঃ" (শতপথ ব্রাঃ ১।১।৪।১২) ইত্যাদি শতপথবাক্যকে প্রায় কণ্ঠতঃ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিনিয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত শ্রৌত-সূত্রের ধূর্তস্বামী-ভাষ্যে ও রামাগ্নিচিতের বৃত্তিতে 'শূদ্র' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"নিষাদস্থপতি।" শ্রুতিতে "বাস্তুময়ং রৌদ্রং চরুং নির্বপেৎ, এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" (তৈঃ সং ২।২।৪) রুদ্র দেবতার উদ্দেশ্যে বাস্তুতে উৎপন্ন শাক দ্বারা চরু সম্পাদন করিবে, ইহার দ্বারা নিষাদস্থপতিকে যাগ করাইবে, ইত্যাদি বাক্যে নিষাদজাতীয় সঙ্করজাতি বিশেষের জন্য 'রৌদ্রেষ্টি' নামক যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে (পূর্বমীমাংসা ৬।১।১৩ অধিকরণ)। নিষাদ নামক সঙ্করজাতি শূদ্রধর্মা। উক্ত শতপথ ব্রাহ্মণবাক্যে 'শূদ্র' শব্দে এই নিষাদজাতিই যে গ্রহণীয়, ইহা ভগবান্ আপস্তম্বের বচন হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং উক্ত শতপথ বাক্যের বলে সাধারণ ভাবে শূদ্রজাতির বিধিসিদ্ধ বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয় না। নিষাদ 'রৌদ্রেষ্টি' যজ্ঞে অপেক্ষিত বেদাংশের অধ্যয়নে অধিকারী, সমগ্র বেদাধ্যয়নে তাঁহারও অধিকার স্বীকৃত হয় না।

২। "যদি সোমং ব্রাহ্মণানাং সঃ ভক্ষঃ · যজ্ঞপঃ শূদ্রাণাং সঃ ভক্ষঃ" (ঐতঃ ব্রাঃ ৩৫।৪।২৯) ইত্যাদি ঐতরেয়ক বাক্যের বিনিযোজক সাক্ষাৎ কোন শ্রৌতসূত্রে আমরা এখনও প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত বাক্যবলে শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার সিদ্ধ হইবে না; কারণ "শূদ্রঃ যজ্ঞে অনবক্লিপ্তঃ" (তৈঃ সং ৭।১।১।১৬)—"শূদ্র যজ্ঞে অনধিকারী" এইবার স্পষ্ট নিষেধ বচন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এতাদৃশ সাধারণ প্রতিষেধের সংকোচ রথকার বা নিষাদস্থপতি স্থলে হইতে পারে, কারণ শ্রুতিতে "বর্ষাসু রথকারঃ অগ্নীন্ আদধীত" (তৈঃ ব্রাঃ ১।১।২।৬) ইত্যাদি বিশেষ বিধিবলে রথকার (সূত্রধর জাতি ?) নামক সঙ্করজাতি বিশেষের জন্য (পূর্বমীমাংসা ৬।১।১২ অধিঃ) অগ্ন্যাধান এবং পূর্বোক্ত বচনবলে নিষাদের জন্য রৌদ্রেষ্টি বিহিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত আপস্তম্ব-বচনও এই প্রকার সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। অতএব "যজ্ঞপঃ শূদ্রাণাং সঃ ভক্ষঃ" ইত্যাদি একটিমাত্র বচনবলে সাধারণ ভাবে শূদ্র জাতির যজ্ঞ-ক্রিয়াতে ও বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার স্বীকার করা যায় না। "নিমিত্তার্থেন বাদরিঃ" (জৈঃ সূঃ ৬।১।২৭) ইহা পূর্বপক্ষ সূত্র মাত্র। ইহার দ্বারা কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তত্রস্থ ৬।১।২৮ সূত্রের শাবর ভাষ্যে আচার্য বাদরির মত নিরাকৃত হইয়াছে।

৩। "কারুরহং ততো ভিষক্" (ঋক্ সং ৯।১১২।৩) ইত্যাদি শ্রুতি বচনের বলে যাঁহারা শূদ্র জাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের শাস্ত্রতাৎপর্য নির্ণয়ের প্রণালী খুব অদ্ভুত বটে! উক্ত স্থলে শ্রুতির অর্থ নিরূপণ, তাঁহারা স্বমনীষা-বলেই করিয়াছেন, বেদব্যাখ্যাতা পূজ্যপাদ সায়ণাচার্যকে অনুসরণ করেন নাই। অত্রস্থ 'ভিষক্' শব্দটির অর্থ নিরূপণেই তাঁহাদের প্রমাদ হইয়াছে। ভিষক্ শব্দের অর্থ 'ভেষজকৃৎ' অর্থাৎ যিনি চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা যেমন শারীরিক রোগ বা অঙ্গবৈকল্যের জন্য হইতে পারে, তদ্রূপ যজ্ঞের অঙ্গবৈকল্যের জন্যও হইতে পারে। যজ্ঞের যদি কোন প্রকার অঙ্গবৈকল্য ঘটে, তবে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ বেদে বিহিত কোন উপায় দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করেন, এইজন্য ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্‌কে বলা হয় 'যজ্ঞের ভিষক্'—আচার্যপাদ সায়ণ এই প্রকার অর্থই করিয়াছেন, যথা—"ভিষক্ ভেষজকৃৎ, যজ্ঞস্য ব্রহ্মা ইত্যর্থঃ। 'সর্বং এয্যা বিদ্যয়া ভিষজ্যতি' ইতি শ্রুতেঃ।" ইহার অর্থ ভিষক্ শব্দের অর্থ ভেষজকৃৎ, যেহেতু "সকল প্রকার বৈগুণ্যকে বেদত্রয় বিহিত বিদ্যার দ্বারা চিকিৎসা করেন," এই প্রকার শ্রুতি আছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও এই প্রকার বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা "ভেষজকৃতো হবা এষঃ যজ্ঞঃ যত্র এবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি" (ছাঃ ৪।১৭।৮)—'যে যজ্ঞে এতাদৃশ বিদ্বান্ ব্রহ্মা থাকেন, সেই যজ্ঞ নিশ্চয়ই ভেষজকৃত হয় (উত্তমরূপে চিকিৎসিত হয়') ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে : ঋষির পিতা হইতেছেন যজ্ঞে ব্রহ্মানামক ঋত্বিকের কর্মানুষ্ঠানকারী, পুত্র ঋষি স্বয়ং হইতেছেন—'কারু' অর্থাৎ সামগান-কারী উদ্গাতা, আর গৃহকর্মে ব্যাপৃতা মাতা পুত্রকন্যাগণের জন্য বালুকাসহযোগে যব ভর্জন করেন। ইহা গৃহস্থ ঘরের সাধারণ ঘটনা। ইহার দ্বারা ঋষির বর্ণসঙ্করতা, অথবা তাঁহার পিতা-মাতার পাতিত্যদোষ কি প্রকারে হইবে, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠক স্বয়ংই বুঝিয়া লইবেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—এই ঋঙ্‌মন্ত্রটি হইতে শূদ্র ও বেদসম্বন্ধী কোন প্রকার প্রশ্নের উদয়ই হইতে পারে না। যাঁহারা বেদ হইতে আর্যজাতির প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের অনুসন্ধানের যদি ইহাই দৃষ্টান্ত হয়, তবে চিন্তার কথাই বটে!

৪। "যথেমাং বাচং কল্যাণীম্" (শুক্ল যজুঃ সং ২৬।২) ইত্যাদি স্থলে শ্রুতি বলিয়াছেন—"কল্যাণী বাণী।" ইহার অর্থ যে 'কল্যাণকারিণী বেদ', তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া গেল? "বিরূপ নিত্যয়া বাচা" (ঋক্ সং ৮।৬৪।৬) ইত্যাদি স্থলে 'বাক্' শব্দের বেদরূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহার হেতু সেই স্থলে 'নিত্য' বিশেষণটি আছে। বেদই নিত্য বাণী, ইহা এই প্রবন্ধের উপক্রমেই সামান্য ভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রস্তাবিত স্থলে এই প্রকার কোন 'বিশেষণ' নাই। আর এই মন্ত্রটি শুক্ল-যজুর্বেদ-সংহিতার 'খিল কাণ্ডে' (পরিশিষ্টে) পঠিত হইয়াছে। অন্য প্রকরণের সহিত এই মন্ত্রটির কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহার বলে ইহাকে 'বেদরূপ' অর্থে ব্যাখ্যা করা যাইবে। উবটাচার্য ও মহীধর প্রভৃতি পূজ্যপাদ বেদব্যাখ্যাতৃগণ এই মন্ত্রটির উক্ত প্রকার অর্থও করেন নাই। তাঁহাদের মতে "অনুদ্বেজিনীম্ দীয়তাং ভুজ্যতাম্ ইতি এবমাদিকাম্"—'দাও ও ভোজন কর, এতাদৃশ অনুদ্বেগকর বাক্যই' এই স্থলে 'কল্যাণী বাণী' শব্দের অর্থ। স্ব স্ব উদ্দাম কল্পনা সহায়ে 'গীতার্থসন্দীপনীকার' প্রভৃতি যাঁহারা এই বেদমন্ত্রটির বলে শূদ্রের বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। আমরা কিন্তু তাঁহাদিগকে সমর্থন করিবার মত কিছুই প্রাপ্ত হইতেছি না। শ্রুতি স্মৃতি ও প্রাচীন আচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা প্রথমেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই প্রকার সিদ্ধান্ত নিরূপণে কেনও প্রমাদ প্রদর্শিত হইলে অনুগৃহীত হইব। (সমাপ্ত)

সুইটজারল্যাণ্ডের পথে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

"সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই!"—এ কথাটাই বার বার অনুভব করতে লাগলাম। অনুভব করতে লাগলাম যখন আর্লবার্গ গিরিপথ অতিক্রম করতে যাচ্ছি। একটি উত্তুঙ্গ, বিশাল পাহাড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আশ্চর্যজনক উপায়ে এই পথ তৈরি করা হয়েছে।

তখন সকাল নটা। আমাদের বাস উঠতে লাগল পাহাড়ের শিখরচূড়ায়।

একটা জায়গায় নেমে ফটো তোলা হ'ল।

তারপর আবার পর্বতারোহণ।...

প্রায় ছ-হাজার ফুট উঁচুতে গিয়ে যখন ঠেকলাম, নিচের দিকে চাইতে পারা যায় না। বুক দুড়-দুড় করে। ভগবানের হাতে যে আমাদের জীবন—এ কথা ভাবাতে বাধ্য করে। মেঘ আর আমাদের গাড়ি—দুয়ে মিলে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে।

সেই সু-উচ্চ পাহাড়ের মাথা দিয়ে টেলিগ্রাফের তার গেছে—কোথাও লোহার, কোথাও কঠিন কাঠের পোস্ট। তাকেই অবলম্বন ক'রে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের মায়াসূত্র এই প্রসারিত টেলিগ্রাফের তার, দূরকে যে নিকট করেছে—বিশাল ধরিত্রীকে যে ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করেছে।

কত যে ফুল পাহাড়ের গা ভরে ফুটে আছে—তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতি পাহাড়কে অলঙ্কৃত করেছে এই সব মাধুর্যময় ফুলের মালা পরিয়ে। দেখলে চক্ষু সার্থক হয়।

উঁচু থেকে এবার নিচে নামতে লাগল গাড়ি।

অত্যন্ত ঢালু পথ। কোথাও জোরে একটার বেশি গাড়ি যেতে পারে না। উত্তাল হয়ে ঝরনা নামছে পাহাড় থেকে। কোথাও মেঘলা, কোথাও সামান্য রোদ। সে-রোদ আবার ঢেকে যাচ্ছে বড় বড গাছের পাতার আড়ালে।

ভোরালবার্গের অপূর্ব সুন্দর পথ আমরা অতিক্রম করতে লাগলাম ধীরে ধীরে।

বেলা এগারটার সময় একটা হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া হ'ল। এক কাপ ক'রে কফি, তারপর সুপ, আলুসিদ্ধ, মাংস, টমেটো, কপি-পাতা আর কেক। সুইস-সীমান্তে এসে পাসপোর্ট দেখাতে হ'ল। টাকা বদল ক'রে নিলাম।

ঢুকলাম লিচটেনস্টাইন শহরে। একটু এগিয়ে একটা দোকান, নানা রকমের জিনিস রয়েছে সে-দোকানে। সুন্দর সুন্দর সচিত্র কার্ড, খেলনা, বাসন, মনোহারী দ্রব্যসামগ্রী, বল, গয়না, ঘড়ি। সুইটজারল্যাণ্ডে ঘড়ি খুব সস্তা। দলপতি আলফ্রেডকে দাঁড করিয়ে দলের অনেকেই ঘড়ি কিনল। দোকানের মালিক এবং কর্মচারী—সব মেয়ে। একটি মেয়ের বাড়ি ইংলণ্ডে। সে ইংরেজীতে কথা বলায় অনেকেরই সুবিধা হ'ল। ঐ দোকানেরই আর একটি মেয়ে আমার পাশপোর্টে ছাপ মেরে দিল। লিচটেনস্টাইনে ঢোকবার স্বীকৃতির ছাপ। ছাপটি খুব সুন্দর।

আবার বাসে উঠলাম। আবার চলা শুরু হ'ল।

কাঠের বাড়ি, অদূরে পাহাড, উঁচু-নিচু পথের তরঙ্গ অতিক্রম করতে করতে এগিয়ে চললাম। প্রকৃতি যেন তার দ্বার মুক্ত ক'রে দিয়েছে, কোথাও কৃপণতা নেই—প্রবঞ্চনা নেই—এমনই নিখুঁত সৌন্দর্য চারিপাশের।

ইলেকট্রিক ট্রেন চলে গেল পাশ দিয়ে। কোথাও হ্রদ—পাশে পাহাড, চমৎকার শস্যক্ষেত্র, অবারিত ঝরনাস্রোত।

'ভাদুজ' পার হয়ে এগিয়ে চললাম। চললাম সুইটজারল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়ে।

যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই পাহাড। কালো, দুর্ধর্ষ পাহাড়ের প্রাচীর-প্রদর্শনী।

জুরিখের পথে এগিয়ে চলেছি।

সরু পথের পাশে লোহার বেড়া। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গিরিপথ। বড় বড ওক গাছ, নাম-না-জানা কত বৃক্ষবীথিকা দেখতে দেখতে চক্ষু সার্থক হ'ল।

একটি পার্বত্য হ্রদকে নিচে ফেলে রেখে ফের পাহাডে উঠতে লাগলাম। কত কপি-ক্ষেত, পালং শাকের ক্ষেত আর কত হোটেল যে পথে পডল, তার ঠিক নেই।

আলফ্রেড বলে যেতে লাগলেন :

এক হাজার পাঁচশো ফুট উপরে উঠলাম··

এবার দু'হাজার ফুট উঁচুতে

দু'হাজার ফুট উঁচুর উপরেও দেখলাম—কয়েকখানা বাড়ি। এক বাড়ির দরজায় একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে হাত নেড়ে ডাকল। আমরাও হাত নেড়ে সাড়া দিয়ে এগিয়ে চললাম। দুপাশে সবুজ শ্যামল বনরাজি। নিভৃত অরণ্যের সুশীতল সান্ত্বনা।

—এবার দু'হাজার পাঁচশো ফুট উঁচুতে :

আলফ্রেড চীৎকার ক'রে উঠলেন।

আকাশ আর মৃত্তিকা আমাদের কাছে সমান হয়ে গেছল। আর কোন বিকার ছিল না। আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় বাসের মধ্যে বসে রইলাম। বসে থেকে থেকে উপভোগ করতে করতে লাগলাম দুপাশের ঘন বনজঙ্গল, সুন্দর রোদ, সুমিষ্ট ঠাণ্ডা, মাথার উপর মেঘ, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাহাড় কেটে যারা পথ রচনা করেছে তাদের অপরিমিত কৃতিত্ব। শুধু পথ নয়, আবার "কেবল্ কার"। শূন্যে শুধু তারের

উপর ভর ক'রে গাড়ি যাচ্ছে, অনভ্যস্ত চোখে এ একটা অপা.থব বিস্ময়!

উঠে গিয়েছিলাম দু'হাজার ফুট উচ্চে—দেবলোকে। নেমে আসতে হ'ল তেমনি দূরত্ব বজায় রেখে মর্ত্যভূমিতে।

জুরিখের পথে চলেছি।

একটা রেলস্টেশন পার হলাম। কাঠের গুঁড়িতে সেই টেলিগ্রাফের তার। একটা হ্রদ পড়ল আমাদের পথ ছুঁয়ে। নাম 'রালা' হ্রদ।

চমৎকার শহর জুরিখ।

সুন্দর ট্রাম, সুন্দর বাস, বিরাট সৌধপুঞ্জ, হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, পার্ক—কী নেই!

নয়নরঞ্জন হ্রদ। হ্রদের উপর পুল।

স্টীমার চলেছে বিলাসভ্রমণে রত যাত্রীদের নিয়ে। হ্রদটিকে কেন্দ্র করেই যেন শহরের উদ্দীপনা, প্রাণ-স্রোত। মার্বেল স্ট্যাচু, ফুলের বাগান, স্কুল, মনুমেন্ট—সব মিলিয়ে যেন এক অপর্ব প্রাণচাঞ্চল্য।

বাড়ির লনে ছেলেমেয়েরা টেনিস খেলছে। চৌরঙ্গীর মতো প্রসারিত রাস্তায় মোটরের ভিড়। কোথাও ঘিঞ্জি নয়। জায়গার প্রাচুর্য সর্বত্র।

বহু লোককে দেখলাম, টাই না পরে চলেছে।

হ্রদের পাশে রাস্তার নাম লক্ষ্য করলাম।

নীল রঙের ট্রাম অতিক্রম ক'রে আমরা এগিয়ে চললাম, পেলাম ফুটবল গ্রাউণ্ড। ফুলের গ্লাস-হাউস। অদূরে পাহাড়। তখন বেলা সাড়ে চারটে। সহসা অন্ধকার ক'রে এল পৃথিবী। আকাশে মেঘ। একটা ট্রেন দেখলাম—ইলেকট্রিক ট্রেন। হ্রদের পাশ দিয়ে বনজঙ্গল ভেদ ক'রে চলেছে। আবার দেখা দিল গ্রাম্য সৌন্দর্য।

পিচের নির্জন সমতল পথ। দু'পাশে জঙ্গল। মেঘলা আকাশকে হাত তুলে আহ্বান জানাচ্ছে সেই গম্ভীর জঙ্গল।

অনেক কাঠের কুটির পার হলাম—অনেক কাঠগোলা। এক জায়গায় রাস্তা মেরামত হচ্ছে। হারিকেন জ্বলছে। সাবধান করবার জন্য এই হারিকেন। পরিব্রাজকের দল মোটর বাইক হাঁকিয়ে তীরবেগে চলে যাচ্ছে।

একটা হোটেলের ধারে রয়েছে দোলনা। তাতে কয়েকটি শিশু দুলছে।

এখানে খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। দেখলাম, পথ আর্দ্র। ছাতি হাতে বৃদ্ধদম্পতি চলেছেন। গাছের পাতায় জল। আর একটা শহরতলী পার হলাম।

'লাকেস্ ভালেন্স্টাট্' (হ্রদ) দেখা দিল। ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গার মতো প্রসারিত। আকাশ আরও অন্ধকার ক'রে এল। দেখি, আপেল ফলের বাগানগুলি কাঁপতে শুরু করেছে। বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। "উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপার" ঘুরতে লাগল ড্রাইভারের চোখের সামনে। বাসের মাথায় স্কাইলাইটের ঢাকাটা আলগা ছিল, সেটাকে চেপে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। যাতে ভিতরে না জল আসে। একটু যেতেই কিন্তু রাস্তা শুষ্ক, আর জল নেই। চার ধারে আলো ফুটে উঠেছে। আর সে আলোর মধ্যে সাক্ষাৎ অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিরাট আকাশচুম্বী গিরিবর। জায়গাটার নাম ভাল্স্ভি।

পথে একবার কফি খাবার জন্য নামতে হ'ল। একটা 'রেস্তোঁরা'য় ঢুকলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি হল্লা করছে লোকজন। এ যেন বাগবাজারের এক চায়ের দোকান,—বিলেতের বলব না। কারণ তারা বড় সতর্ক, বড় বেশি হিসেবী। চুপচাপ খায়, আস্তে আস্তে কথা বলে। তারপর সরে পড়ে।

বিকাল তখন ছ'টা। এক পাশে পাহাড়, আর এক পাশে লুসার্ন হ্রদ। মাঝখানে রাস্তা।

সেই মনোরম রাস্তা অতিক্রম ক'রে আমাদের নির্ধারিত হোটেলে এসে উঠলাম।

হোটেল তো হোটেল। পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ হোটেলের সমকক্ষ। হোটেলের এত বড় বাড়ি আমি আর দেখিনি। একটা চারতলার সমান পাহাড়ের উপর এই ছ-তলা অট্টালিকার গঠনকার্য। আর আমার ঘর হ'ল সেই শেষ উপরতলায়—একেবারে ছাদের নিচে।

লিফ্‌টে ক'রে উঠে ঘরে পৌঁছে যখন নিচের মাটির দিকে তাকালাম—সঙ্গে সঙ্গে পেছিয়ে আসতে হ'ল। জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকালে—সাহস ব'লে কিছু থাকে না। লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার পক্ষে স্থানটি অব্যর্থ। নিচের মানুষগুলো যেন ছোট ছোট পুতুল হয়ে বেড়াচ্ছে। আর উপরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা নিশ্চয় দেবলোকের অধিবাসী। দেবলোকে থাকার সুবিধা এই যে মরবার ভয় নেই। যাঁরা দেবতা—অমৃতভাণ্ডের অধিকারী, তাঁদের জন্যই দেবলোক। কিন্তু মরলোকের মানুষ হয়ে—দুটি অন্নের কাঙাল—কী অধিকারে আমি এই দেব-লোকে থাকতে পারি? হার্ট যদি কারও দুর্বল থাকে, হলফ ক'রে বলতে পারি, এ ঘরের জানালা খুলে দাঁড়ালে তার আর চিকিৎসার দরকার হবে না। আমার হার্ট যে ইতিমধ্যে এত সবল হয়েছে, এটা ঠিক জানা ছিল না। সবল নিশ্চয় হয়েছে, নইলে এমন পরীক্ষাস্থলে এসে না মরে জানালাটাকে বন্ধ ক'রে দিলাম কেমন ক'রে?

কিন্তু বন্ধ করলে তো চলবে না। যাকে বন্ধ করতে যাব সে তো বন্ধনের নয়, মুক্তির। জানালাটার একটা অসাধারণ আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। নিচের দিকে না চাইলেই হ'ল। নিচের দিকে না চেয়ে জানালাটা খুলে রাখবার অবোধ্য এক প্রয়োজন স্বীকার করলাম। সোজা চেয়ে থাকো। তাহলেও পূর্ণতা। অসীমের এই বিশ্বরূপ জীবনে আর দেখিনি। সৌন্দর্যের এই নয়নানন্দকর মূর্তি আর কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। সামনেই হ্রদ। ক্রুনেনের লুসার্ন হ্রদ। মানস সরোবরে যাইনি, চাক্ষুষ দেখিনি তাকে। দেখেছি অবশ্য বুদ্ধবসুর 'কৈলাস ও মানস সরোবর' ছবিতে—সেও বহুদিন আগে। সে সব স্মৃতি এর কাছে ম্লান হয়ে গেল। এ হ্রদের কোথায় সুরু আর কোথায় শেষ—জানি না। দু'পাশে অপূর্ব পাহাড—পাহাড়ের মাথা গিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে আকাশে। মাঝখানে নদীর মতো হ্রদটি বিরাজমান। পাহাডের উপর আবার বাড়ি। সে সব বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতির উজ্জ্বল স্বাচ্ছন্দ্য। পাহাডের এক পাশ থেকে পড়ন্ত দিবালোকের নিরুপম দীপ্তি! তাতে জলের শোভা বেড়েছে বৈ—কমেনি। মাঝে মাঝে জল কেটে কেটে দ্রুত চলে যাচ্ছে মোটর লঞ্চ, ছোট স্টীমার।

সুইটজারল্যাণ্ডের হৃৎপিণ্ড থেকে উত্থিত সে এক অপূর্ব উপভোগ—অপরূপ রোমাঞ্চ।

ক্যামেরাটায় নতুন ফিল্ম্‌ ভরে নিলাম। আজ নয়, আগামী কাল সকালবেলা ছবি তুলতে হবে।

আমার দেখাই তো সব নয়! অপরের দৃষ্টিপ্রদীপও জ্বালাতে হবে। আমার এ আলোর ছোঁয়া পেয়ে শত শত বর্তিকা যদি না জ্বলে ওঠে—তবে আর আনন্দ কই?

তারই জন্য তো আগামীকালের প্রত্যূষ—আগামীকালের প্রস্তুতি।

মহাপ্রভু-চরণে রূপ-সনাতন

শ্রীমতী সুধা সেন

মহাপ্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর নীলাচলে আসিয়াছেন মায়ের আদেশে। জননী জন্মভূমি হইতে বেশী দূরে নয় নীলাচল, মাত্র বিংশতি দিবসের পথের ব্যবধান।

নীলাচলের দারুব্রহ্ম ব্রহ্মগোপালরূপেই দর্শন দান করেন প্রভুকে , কিন্তু তবুও প্রভুর মন পড়িয়া রহিয়াছে ব্রজধামে, কানে আসিতেছে বাঁশীর সুর। কৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধুরী পানের আশায় দুই বৎসর পরে প্রভু চলিয়াছেন বৃন্দাবনের পথে। যে রূপের এক কণামাত্র সমস্ত ত্রিভুবনের স্থাবর-জঙ্গম ও সর্বপ্রাণীকে আকর্ষণ করে, আনন্দসুধারসে স্নান করাইয়া আনন্দী করিয়া তোলে, সেই রূপমাধুর্যের নিত্যলীলা, নিত্যপ্রকাশ ঘটিতেছে ব্রজের কুঞ্জে কুঞ্জে, ব্রজবধূর বক্ষে, সেইখানেই আছেন বৃন্দাবন-নন ব্রজবল্লভ।

গৌড়ে জননী ও ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন করিয়া অথবা দর্শন দান করিয়া প্রভু বৃন্দাবনের পথে চলিলেন, সঙ্গে অগণিত জনতা। চলিতে চলিতে প্রভু রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গৌড়ের অধিপতি হুসেন শাহ এত লোক দেখিয়া কেশবছত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই সন্ন্যাসী, ইঁহার সহিত এত লোক কেন? কেশবছত্রী সত্য গোপন করিলেন, পাছে বা হিন্দু সন্ন্যাসীর কোনও লাঞ্ছনা ঘটে।

বলিলেন, ইনি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র—সঙ্গের লোকজনের কেহ কেহ ইঁহার শিষ্য আর দুইচারি জন দর্শনার্থী আসে যায়, বেশী লোক কোথায়?

এই উত্তরে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বিশ্বস্ত কর্মচারী দবীরখাসকে ডাকাইয়া আনিলেন—সত্য কথা বল তো দবীরখাস? বিনা বেতনে, বিনা অন্নে এত লোক যাঁহাকে অনুসরণ করে, তিনি কে?

দবীরখাস অর্থাৎ শ্রীরূপ বলিলেন—বাদশাহ! আপনি শাহান্ শাহ। সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নরাধিপ, সুতরাং বিষ্ণুর অংশ, আপনি নিজের মনের মধ্যে সত্যের কোনও আভাসই কি পান নাই? জগৎপতি ঈশ্বরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইনিই তিনি।

গৌড়েশ্বর সহজেই তাহা মানিয়া লইলেন, তাঁহার অন্তরেও এমনি একটু ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। দবীরখাস—শ্রীরূপ উচ্চ রাজকর্মচারী, আর সাকরমল্লিক—শ্রীসনাতন রাজমন্ত্রী। পরম পণ্ডিত পরম মানী দুই ভাই গোপনে গভীর নিশীথে প্রভুর দ্বারে দীনাতিদীন-বেশে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ দিনের গোপন মিলন-প্রতীক্ষা, দীর্ঘ দিনের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আজ সফল হইবে কি? বৃন্দাবনের ধন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা তাঁহারা শুনিয়াছেন, মন প্রাণ সেই অবতার-পুরুষকে দর্শনের আশায় অধীর ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। কতবার দৈন্য জানাইয়া পত্র পাঠাইয়াছেন প্রভুর পায়ে—আমাদের ডাকিয়া লও, দেখাও তোমার কমল-চরণ, ওগো দয়াল! দয়া কর, দয়া কর। তোমার দয়ায় আমাদের মলিন জীবন ধৌত কর।

প্রভু দূর হইতে সাড়া দিয়াছেন—ধৈর্য ধর, প্রতীক্ষা কর সেই নারীর মতো, যে বহুবিধ গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও পূর্বাস্বাদিত প্রিয়-মিলনের সুখ মনে মনে আস্বাদন করে। ভগবানে একবার যাহার মন লাগিয়াছে

সে সংসারের শত বন্ধনে থাকিলেও মনকে সেই আনন্দ-সুধারসাস্বাদনের সুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারে না। তোমাদের মনেও তো লাগিয়াছে প্রেমের ছোঁয়া, তাহা লইয়াই থাকো, সংসার হইতে চলিয়া আসিবার সময় এখনও হয় নাই।

দুর্দিন আজ সুদিন হইয়াছে। দুই ভাই শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসের পায়ে পড়িলেন—'একবার সেই দেবদুর্লভকে দর্শন করাও গো তোমরা!'

নিত্যানন্দ দুইজনকে প্রভুর কাছে উপস্থিত করিলেন। গভীর রজনীর মধ্যযামে—বাহিরে অন্ধকারের মৌন স্তব্ধতা, আর গৃহের ভিতরে 'আলো যে আজ গান করে গো'। দীর্ঘ তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ সন্ন্যাসী বসিয়া—পায়ের কাছে শত শত ভক্ত।

দুই ভাই দীর্ঘ দণ্ডের মতো সেই প্রভুর পদতলে পড়িলেন—অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতে লাগিল সেই দুটি পাদপদ্ম।

নিত্যানন্দ বলিলেন—প্রভু! দবীরখাস (রূপ) ও সাকরমল্লিক (সনাতন) তোমাকে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহাদের দৈন্যে প্রভুও যেন আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলেন না, দুই ভাইকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন—দৈন্য ছাড়, 'তোমাদের দৈন্যে ফাটে মোর মন', তোমরা দীন নও, অধম নও, আমার অন্তরের অন্তরঙ্গ তোমরা। শুধু তোমাদের দেখিবার জন্যই আমার এই রামকেলি গ্রামে আসা! তোমরা আর সাকরমলিক-দবীরখাস নও, আজ হইতে তোমরা সনাতন ও রূপ নামেই পরিচিত হইবে। রূপ-সনাতনকে এইবার গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন প্রভু। ভগবানের পরমবক্ষে আশ্রয় লাভ করিলেন ভক্ত। ভক্ত কি হীন হইতে পারেন? তাঁহাকে লইয়াই ভগবানের পূর্ণতা।

ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কৃতকৃতার্থ হইয়া দুই ভাই উঠিলেন—জনে জনে সকল ভক্তের চরণ বন্দনা করিয়া যাওয়ার সময়ে বলিয়া গেলেন—প্রভু! বৃন্দাবন যাওয়ার এই রীতি নয়, তীর্থযাত্রায় বিশেষতঃ বৃন্দাবনে—যেখানে শুদ্ধ ব্রজরস আস্বাদন করিবার জন্য প্রভু যাইতেছেন সেখানে—এই লোকসংঘট্ট লইয়া গেলে কোনক্রমেই তাহা সুখকর হইবে না।

প্রভু একথা বুঝিয়া বলিলেন:

একাকী যাইব, কিংবা সঙ্গে একজন,
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেতে গমন।

মহাপ্রভু আবার গৌড়পথে শান্তিপুর হইয়া, জননীকে প্রণাম করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন—শীঘ্রই একা বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া।

শ্রীরূপ-সনাতন গৃহে অস্থিরচিত্তে দিনযাপন করিতেছেন, কবে প্রভুর কার্যে বাহির হইবেন—কবে পূর্ণাহুতি দিবেন নিজেদের! দর্শন স্পর্শন হইয়াছে, কিন্তু ব্যাকুলতা তাহাতে বাড়িয়াছে শুধু—পাণ্ডিত্য, রাজমর্যাদা, ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকার জমিদারি মান যশ সব বিষের ন্যায় মনে হইতেছে। 'রাজা মোরে প্রীতি করে—সে মোর বন্ধন'।

কি করিয়া সমস্ত বন্ধনের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন সেই চিন্তাই সনাতন করিতে লাগিলেন রাত্রিদিন। গৃহত্যাগের অনুকূলে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গেল।

কথিত আছে—ঘন বর্ষার এক গভীর দুর্যোগের রাত্রি! সমস্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ, বিশ্ব যেন কিসের আশঙ্কায় উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে—বাহিরে প্রবলধারাবর্ষণ—একটি জনপ্রাণী নাই। রাজ-প্রয়োজনে এই দুর্যোগের মধ্যেও রাজমন্ত্রী সনাতনকে বাহির হইতে হইল। এক ছোট্ট কুটীরের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে তাঁহার শিবিকা—জলে বাহকদের পদশব্দ হইতেছে। সেই কুটীরে থাকে দীনহীন সাধারণ দুইটি মানুষ, স্বামী-স্ত্রী।

জলে পদশব্দ শুনিয়া স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—এই ঘোর দুর্যোগে গভীর রাত্রে শৃগাল কুকুরও যখন বাহির ছাড়িয়া গর্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তখন কে এই দুর্ভাগা মানুষ চলিয়াছে পথ বাহিয়া? স্বামী বলিল—কে আর হইবে, নিশ্চয়ই কোনও রাজ-কর্মচারী। সনাতনের অন্তর ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল, বিষয়ী রাজ-কর্মচারী কি কুকুরেরও অধম? মন বলিয়া উঠিল—'ঠিক তাই'। রূপেরও জীবনে পরিবর্তনের উপলক্ষ্য-রূপে ঘটিল আর একটি ঘটনা।

এক গভীর নিশীথে গৃহে আরাম শয্যায় শায়িত রূপ, হঠাৎ যেন কিসে দংশন করিল—ভয়ে বেদনায় জাগিয়া উঠিলেন। পাশেই স্ত্রী ছিলেন, ডাকিলেন—আলো। আলো জালাও শীগ্‌গির।

অন্ধকারে স্ত্রী হাতড়াইয়া দীপাধার পাইলেন না—সম্মুখেই ছিল স্বামীর স্বর্ণখচিত মহামূল্য পরিচ্ছদ, তাহাতেই আগুন জ্বালাইয়া দিলেন, গৃহ আলোকিত হইল—দেখা গেল, সামান্য কীটের দংশন মাত্র, খুব তীব্র নয়। কিন্তু যাহার আলোকে গৃহ আলোকিত হইল, রূপ চাহিয়া দেখেন—তাহা তাঁহারই মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ। স্ত্রীকে বলিলেন, কি সর্বনাশ করিলে তুমি, স্বামীর এই মূল্যবান পরিচ্ছদটি নষ্ট করিয়া ফেলিলে? স্ত্রী বলিলেন, তোমার চেয়ে সোনা মুক্তার দাম বেশী নয়—আমার কাছে।

বিস্মিত স্বামী বলিয়া উঠিলেন—ঠিক, ঠিক। আমার কাছে তো এর চেয়ে তাঁর দাম কম? স্ত্রীর কাছে হইতে সদ্যোলব্ধ এই শিক্ষা মর্মে গিয়া আঘাত করিল: প্রিয়ের কাছে, স্বামীর কাছে ঐশ্বর্য তো কিছু নয়—তুচ্ছাতিতুচ্ছ!

গৃহত্যাগের সংকল্প দৃঢ়তর হইল, কিন্তু উপায় কি? রাজবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মন্ত্রী সনাতন রাজ-দরবারে যাওয়া বন্ধ করিলেন। রাজা ডাকিলে খবর পাঠান—তিনি অসুস্থ। বাদশাহ রাজবৈদ্য পাঠাইলেন—তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বৈদ্য সনাতনের দেহে কোনও রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না, পারিবার কথাও নয়।

একদিন বিনা খবরে অকস্মাৎ স্বয়ং বাদশাহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন সনাতনের গৃহে, দেখেন সভায় বসিয়া ভাগবত আলোচনা করিতেছেন তাঁহার মন্ত্রী—যিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ, যাঁহাকে ছাড়া তাঁহার রাজ্য চালানো এক প্রকার অসম্ভব। সনাতন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—বাদশাহের উপযুক্ত আসন দিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি তোমার অভিপ্রায় সনাতন? অসুখের কথা বলিয়া গৃহে বসিয়া আছ, অথচ তোমার কোনও অসুখ নাই, ডাকিলেও দরবারে যাওনা—খুলিয়া বলিবে কি?

বিনীত সনাতন বলিলেন—মহারাজ! আর আমি আপনার কার্যভার বহন করিতে পারিব না, আমাকে মুক্তি দিন, আমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাই।

বাদশাহ বিস্মিত ও আহত হইলেন—কেন সনাতন! তোমার এই বুদ্ধি হইল? আমি তো তোমাকে ছাড়িতে পারিব না—উড়িষ্যা জয় করিতে যাইতেছি, তুমি ছাড়া কে আর এত বড় সহায় আছে আমার?

সনাতন দৃঢ়সংকল্প—তাই নির্ভয়, বলিলেন—আপনি দেবতা-ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিতে যাইবেন—আমি তাহার ভাগী হইব না, আমাকে দয়া করুন।

বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইলেন। কিন্তু অন্তরের অন্তরে সনাতনের জন্য যে স্নেহটুকু সঞ্চিত ছিল তাহাও তো কম নয়। তাই সেই স্নেহের বশে, ভবিষ্যতের আশায়—বাদশাহ সনাতনকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন—পাছে বা সনাতন চিরতরে চলিয়া যান।

বাদশাহ উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন। শ্রীরূপ

এদিকে নিজেদের বহুমূল্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অর্থাদিসহ দেশে গেলেন, পরিবার-পোষণের খরচ রাখিয়া দান-দক্ষিণা প্রভৃতি সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন, সেইখানেই তিনি প্রভুর সঙ্গে মিলিবেন! দশ সহস্র মুদ্রা এক মুদীর কাছে রাখিয়া গেলেন, —সনাতনের মুক্তিপণ।

প্রভু বৃন্দাবনে গেলেন—কিছুকাল থাকার পরে যখন ফিরিতেছেন তখন শ্রীরূপ কনিষ্ঠ অনুপমকে লইয়া প্রয়াগে গিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাদের দুই ভাইকেই অঙ্গীকার করিলেন।

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া রূপকে স্বয়ং শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, প্রভু জগতে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম প্রচার করাইবেন তাঁহাকে দিয়া, যোগ্য আধার তাই পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন।

বলিলেন—কোটী কোটী কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ জীবের মধ্যে কেহ যদি সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে কোনরূপে ভক্তিলতার বীজ পান, তবে তিনি মালী হইয়া সেই বীজ রোপণ করেন—শ্রবণ-কীর্তন জল সিঞ্চন করিতে করিতে সেই লতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যদি তাহাতে আবরণ না থাকে, তবে অপরাধ-হস্তী আসিয়া সে গাছ ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া দেয়। আবার ভুক্তিমুক্তি যশমান বাঞ্ছারূপ উপশাখার উদ্গম হইয়া যাহাতে শুদ্ধা অমলাভক্তির সর্বনাশ না করে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হয়। কখন যে এই সমস্ত উপশাখা বাড়িয়া যায়, মূল লতার গতি থাকে স্তব্ধ হইয়া তাহা টেরও পাওয়া যায় না। তাই সকল দিকে সতর্ক থাকিয়া এই ভক্তি-লতাকে বাড়াইতে হয়, তবেই তাহা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পৌঁছায়—এবং সেখান হইতে প্রেমফল পাকিয়া পড়িলে, "তবে মালী আস্বাদয়"।

অন্য সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া সর্ব ইন্দ্রিয় ও মন প্রাণ দিয়া কৃষ্ণানুশীলন—ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। সেই ভক্তি হইতে প্রেম—সেই প্রেমই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ভাব মহাভাব পর্যন্ত মূর্ত হয়। মধুর রসেই সকল রসের পূর্ণতা, ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলা রতি ইহার ধর্ম—ইহাতে নিজের সুখ-কামনার এতটুকু স্থান নাই।

শ্রীরূপের কাছে দশ দিন ধরিয়া ভক্তিরসের সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়া প্রভু রূপকে বিদায়ালিঙ্গন করিলেন। প্রভুর শক্তি রূপে সঞ্চারিত হইল।

একবার নীলাচলে আসিবার আদেশ দিয়া প্রভু রূপকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। নিজে চলিয়া আসিলেন বারাণসী।

* * *

এদিকে সনাতন কারারক্ষীকে সাত সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়া, তাহার সাহায্যে পলায়নের পথ করিয়া লইলেন। গঙ্গা পার হইয়া, পাতরা পর্বত পার হইয়া হাজিপুরে উপস্থিত হইলেন—সেখানে থাকেন ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, রাজকর্মচারী—সুতরাং মানী লোক। শ্রীকান্ত সনাতনের দশা দেখিয়া 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন—বহু যত্নে ও তাঁহাকে কাছে রাখিতে পারিলেন না—এমন কি জীর্ণ শ্রীহীন বস্ত্রটি পর্যন্ত পরিবর্তন করিলেন না সনাতন। শ্রীকান্ত বহু দুঃখে অবশেষে একটি ভোটকম্বলই সনাতনের গায়ে জড়াইয়া দিলেন।

বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহদ্বারে পথক্লান্ত জীর্ণবেশ সনাতন আসিয়া বসিলেন—প্রভু গৃহের মধ্যে চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—দ্বারে কে বৈষ্ণব আসিয়াছে, তাঁহাকে আমার কাছে আনো। চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া দেখিয়া গিয়া বলিলেন —বৈষ্ণব নহে, এক দরবেশ দ্বারে বসিয়া। প্রভু বলিলেন—তাঁহাকেই আনো। গৃহে প্রবেশ করিলেন সনাতন, আপনাকে উজাড় করিয়া দিলেন প্রভুর পায়ে। প্রভু তাঁহাকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধরিবার জন্য ব্যাকুল, আর সনাতন ব্যগ্র প্রভুকে

ধরা না দিতে, 'মোরে না ছুঁইহ আমি হীন'। প্রভু তবুও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন—তারপর? 'দুইজনে গলাগলি, রোদন অপার'। দীর্ঘপথকষ্টে সনাতনের মলিন দেহ প্রভু স্বহস্তে মার্জন করিয়া দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে কি সমস্ত মলিনতাই ধুইয়া গেল না সনাতনের?

শুচিস্নাত হইয়া সনাতন আসিয়া বসিলেন প্রভুর পায়ের নীচে, কিন্তু গায়ে সেই ভোট-কম্বল—প্রভু তাহার 'পানে চাহে বার বার।' সনাতন বুঝিলেন, ইহা 'প্রভুরে না ভায়'। এক গৌড়ীয়কে বহু অনুনয় করিয়া আপনার মূল্যবান কম্বলখানি দিয়া তাহার ছিন্ন কন্থাটি লইয়া গায়ে জড়াইয়া যখন প্রভুর কাছে আসিলেন, তখন প্রসন্ন হাস্যে প্রভু বলিলেন—কৃষ্ণ দয়াময়, বিষয়-বিষ্ঠা হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, তিনি আর তোমার ঐটুকু ভোগ রাখিবেন কেন?

এইবার সনাতনের শিক্ষা আরম্ভ হইল—সূত্রটি সনাতনই ধরাইয়া দিলেন। প্রভুকে তিনটি প্রশ্ন করিলেন তিনি। সনাতনের জিজ্ঞাসা সেই অনাদি অনন্ত জিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি—'কে আমি?' অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি? কোথা হইতে এই 'আমি'র উদ্ভব?

এই চির-রহস্যের জবাব দিলেন প্রভু—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস,
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।'
'ঈশ্বরের শক্তি হইছে জলিত জলন,
জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।'

ব্রহ্ম অগ্নিরাশি—জীব তাহারই ক্ষুদ্র এককণা; সৎ চিৎ ও আনন্দাংশে জীব ব্রহ্মেরসহিত অভেদ; তবে ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃষ্ট। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ—তাই স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও ঈশ্বর ও জীবে ভেদ। ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব—দীর্ঘকাল ধরিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে প্রভু জীব-ব্রহ্মের এই সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন।

সনাতন দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন—(আমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই তবে) 'মোরে কেন জারে তাপত্রয়?' প্রভু বলিলেন—জীব আপনার নিত্য-স্বরূপত্ব ভুলিয়া যখন ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, তখনই মায়া তাহাকে সংসারের কর্মের বন্ধনে ও দুঃখের আবর্তে ফেলিয়া দুঃখ দেয়।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নরকে চুবায়।"

মায়ার আবর্তে পড়িয়াই স্বরূপতঃ আনন্দময় জীব অশেষ দুঃখ পায়, তবুও স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস—ভগবদ্দাসত্ব করাই জীবের পরম আনন্দ। জীব সেই আনন্দ ভুলিয়াছে বলিয়াই ত্রিতাপদহনে দগ্ধ হইতেছে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন তৃতীয় প্রশ্ন—তবে "কেমনে হিত হয়?" প্রভু উত্তর দিলেন:

'সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়,
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়।'
'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।'

সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে বহির্মুখ জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপে জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।

জীব যদি শুধু শরণাগত হয়, যদি একবার মাত্র বলে, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার—তবেই কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করেন।

জীবতত্ত্ব বলিতে বলিতে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন প্রভু। কৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ পরমতত্ত্ব।

সনাতন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতেছেন আর প্রভুর কণ্ঠ হইতে ঐশ্বর্যের কথা যেন মূর্তিমতী বাণীরূপে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য কহিতে গিয়া প্রভুর

মন কৃষ্ণ-মাধুর্য বর্ণনার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাধারসে জারিত তনুমন গৌরাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণের মদনমোহন-রূপসাগরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন।

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন,
যে রূপের এককণ ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন
যত প্রাণী করে আকর্ষণ।'

সেই রূপকমলে একবার যাহার নয়নভৃঙ্গ আকৃষ্ট হইয়াছে—তাহার কাছে ঐশ্বর্য? সে যে কত তুচ্ছ তাহা জানো কি সনাতন? তবে শোন তাঁহার রূপমাধুর্যের আকর্ষণের কথা—এমনি তাহার মোহনিয়া শক্তি, পুরুষ-যোষিত স্থাবর-জঙ্গম তো দূরেরই কথা, তাহা পতিব্রতা সাধ্বী সতী-লক্ষ্মীরও মন হরণ করে, এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত তাহা লুব্ধ করিয়া তোলে। সেই জন্যই তো নরলীলা—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নর-লীলার হয় অনুরূপ।

আনন্দঘন সেই কৃষ্ণ তাঁহাকে পার্থিব প্রেমে, সকাম প্রেমে লাভ করা যায় না। বিহ্বল হইয়া প্রভু বলিতেছেন—সেই কৃষ্ণপ্রেম কি তোমার আমার হয় সনাতন? 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম—সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।' দুইমাসে সনাতনের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রভু সনাতনকে বিদায় দিলেন। সনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন—প্রভু নীলাচলের পথে।

* * *

ততদিনে গৌড় বৃন্দাবন হইয়া শ্রীরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন নীলাচলে, নিজেকে সকলের পশ্চাতে, সকলের নীচে রাখিয়াই আনন্দ; তাই উঠিলেন শ্রীহরিদাসের কুটীরে, হরিদাস যবন, আর রূপ যবনসেবী।

কিছুক্ষণ পরেই প্রভু যথানিয়মিত হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দীঘল হইয়া রূপ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন—প্রভু প্রগাঢ় আলিঙ্গনে রূপকে হৃদয়ে বদ্ধ করিলেন। হরিদাসের কুটীরে আনন্দস্রোত বহিল, প্রভু প্রতিদিনই আসিয়া দুইজনের সঙ্গে কাটাইয়া যান বহুক্ষণ।

এক মধ্যাহ্নে রূপ হরিদাস-গৃহে নাই—প্রভু আসিয়াছেন, অকস্মাৎ গৃহের চালার নীচে একটি যেন ভূর্জপত্র দৃষ্টিতে পড়িল, কৌতূহলী হইয়া প্রভু তাহা খুলিয়া দেখেন এক অপূর্ব শ্লোক:

'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ
তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

কুরুক্ষেত্রে শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্মিলিতা হইয়াছেন, সেই সঙ্গে সুখই পাইতেছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যে বিপিনে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার মুরলীর মধুর পঞ্চম স্বর বাহির করিতেন, যমুনাপুলিনস্থ সেই বিপিনের জন্যই রাধার মন ব্যাকুল হইতেছে।—পড়িতে পড়িতে প্রভুর দীপ্ত বদনে আনন্দের জ্যোতি খেলিয়া যাইতে লাগিল। রূপ গৃহে আসিলেন—তাঁহার গোপন চুরি ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া যেন লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া রূপকে ধরিয়া বলিলেন, 'গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে?' কিছুদিন আগে মাত্র রথযাত্রায় লক্ষ ভক্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাধাভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দর রথে অধিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের দিকে পদ্মনয়ন দুটি মেলিয়া ধরিয়া অশ্রুধারার যে গোপনে অর্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন—সে তো স্বরূপই শুনিয়াছিলেন শুধু! আর কেহ নয়। প্রভু তো স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই, শুধুই বলিয়াছিলেন অভিমানের একটি কথা—নায়কের প্রতি নায়িকার অভিমান:

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ
তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥
—প্রভু বিস্মিত হইলেন, স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অন্তরের গোপন বার্তাটি রূপ কেমন করিয়া জানিলেন?

স্বরূপ বলিলেন—বুঝিলাম, তুমি রূপকে কৃপা করিয়াছ, প্রভু তখন প্রয়াগে রূপের দেহে মনে তাঁহার শক্তি সঞ্চারের কথা স্বীকার করিলেন।

রথযাত্রায় লক্ষ লোকের মাঝে রূপও দাঁড়াইয়া দূর হইতে তৃষিত নয়নে ধূলিলুণ্ঠিত প্রিয়তমের দিকে চাহিয়া আছেন—তাঁহার বিরহ-ব্যথার প্রত্যেকটি তীব্র প্রকাশে রূপের হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাই গৃহে আসিয়াই যেন রাধারসজারিত তনু মন তাঁহার আরাধ্যের হইযাই তিনি এই শ্লোকটি রচনা করিলেন, লুকাইয়া রাখিলেন গৃহের কোণে। কিন্তু যাঁহার ধন তিনিই যখন তাহা হাতে করিয়া গ্রহণ করিলেন—তখন লজ্জার ছায়ার সঙ্গে গভীর আনন্দের আলোও কি রূপের মুখে খেলে নাই?

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা নাট্যাকারে লিখিবেন রূপ, বৃন্দাবনে ও পথেই দুই চারিটি শ্লোক মনে মনে গাঁথিতেছিলেন, নীলাচলে আসার পথে সত্য-ভামাপুরে স্বপ্নে দেখিলেন—যেন অপূর্ব রূপের জ্যোতিতে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া অভিমানিনী সত্যভামা আসিয়া রূপকে বলিলেন—'আমার নাটক তুমি পৃথক রচনা করিও।' রূপ চমৎকৃত হইলেন—কিন্তু ঠিক কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নীলাচলে প্রভু একদিন নাটক সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদের পর বলিলেন, পুরলীলা ও ব্রজলীলার দুইটি পৃথক নাটক রচনা কর—'কৃষ্ণকে বাহির নাহি কর ব্রজ হোতে'। সত্যভামার আদেশের সঙ্গে প্রভুর প্রত্যক্ষ আদেশ মিলাইয়া লইয়া রূপ 'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নাম দিয়া পৃথক নাটক রচনা আরম্ভ করিলেন। একদিন রূপ নাটক লিখিতেছেন, হঠাৎ প্রভু আসিয়া 'কাঁহা পুঁথি লেখ?' বলিয়া পুঁথির একটি পাতা টানিয়া লইলেন। রূপের অক্ষর দেখিয়াই প্রসন্নহাস্যে প্রভুর বদন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—'রূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি' আর সেই মুক্তার অক্ষরে লেখা যে শ্লোক তাহা নয়নের সুখ, কর্ণের রসায়ন, আত্মার আনন্দ।

'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী'॥
—যাহা তুণ্ডাগ্রে (মুখস্থ জিহ্বাগ্রে) নৃত্য আরম্ভ করিয়া তুণ্ডাবলী লাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যাহা কর্ণপথে অঙ্কুরিত হইয়াই অর্বুদসংখ্যক কর্ণেন্দ্রিয় লাভের ইচ্ছা উৎপাদন করে, এবং যাহা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হইয়াই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে বহিত করে, এতাদৃশ 'কৃ' ও 'ষ্ণ', অক্ষরদ্বয় যে কিরূপ অমৃতে রচিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না'। এই শ্লোক একা আস্বাদন করিয়া প্রভুর আনন্দ পূর্ণ হইল না, তিনি একদিন রায় রামানন্দ, সর্বভৌম, স্বরূপ প্রভৃতি পণ্ডিত রসজ্ঞ ভক্তদের লইয়া রূপের নাটক শুনিতে আসিলেন। এত সুধীসজ্জন সমাগমে রূপ যেন আপনাকে কোথায় লুকাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রভুর আদেশ—'নাটক শোনাও রূপ'। রূপ বাধ্য হইয়াই মুখ খুলিলেন, পঠিত হইল 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী'র শ্লোক—রায়, সার্বভৌম স্বরূপ স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া গেলেন—এত ভক্তি, এত মাধুর্য, এত কবিত্বের প্রকাশ প্রতি ছত্রে ছত্রে। শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিলেন রূপ, নান্দী মঙ্গলাচরণ. স্থানপাত্র নির্বাচন। সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলেন রায়, সমস্তই নিখুঁত অপূর্ব! প্রভু চাহিয়া

দেখিতেছেন একবার বিদগ্ধগুলীর প্রদীপ্ত মুখের দিকে, একবার রূপের কুণ্ঠিত মুখের দিকে—নিজের মুখে বাৎসল্য, আনন্দ ও কৌতুকের হাসিটি আছে লাগিয়া।

রায় বলিলেন—এবার ইষ্ট-বন্দনাটি পড় দেখি ভাই! রূপ প্রভুর সম্মুখে সঙ্কোচে এবারে আরও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন; প্রভু বলিলেন—বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থ শোনাও রূপ।

একবার প্রভুর দিকে কুণ্ঠিত সলাজ দৃষ্টি মেলিয়া ধরিলেন রূপ, কিন্তু তার পরে পরিষ্কার সুরে পড়িলেন—ইষ্টবন্দনার সেই অপূর্ব শ্লোক:

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিপুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

—বহুকাল পর্যন্ত যাহা অর্পিত হয় নাই, উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত যিনি করুণাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন—স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতি-সমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন।

প্রভু বলিয়া উঠিলেন—ইহা অতি-স্তুতি, ভক্তগণ কৃতকৃতার্থ হইয়া শ্রীরূপকে বন্দনা করিলেন। সমস্ত কাব্যের মধ্যমণি স্বরূপ এই শ্লোক ভক্তগণের হৃদয়ের ধন হইয়া রহিল।

এবার দ্বিতীয় নাটকের (ললিত মাধব) নান্দী, মঙ্গলাচরণ প্রভৃতিও ভক্তগণ শুনিতে চাহিলেন, রূপ সবই শুনাইলেন। রায় বলিলেন, 'দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি শুনি?' আবার বিপদে পড়িলেন রূপ। সম্মুখেই যে তিনি বসিয়া, যাঁহার বন্দনায় তাঁহার কাব্য মুখর! তবুও পড়িতেই হইবে, ভক্তের আদেশ, প্রভুর আদেশ। রূপ পড়িলেন—(অনুবাদ) যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ প্রেমসুধা বিতরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতে অজ্ঞান-রূপ তমোরাশিকে নষ্ট করিয়াছেন, এবং সমস্ত জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসুতাখ্যশশী অনির্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন।

প্রভু দুইটি ইষ্ট-বন্দনা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, এ কি রূপ!

'কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস-কাব্যসুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেনে মিথ্যা স্তুতি-ক্ষারবিন্দু?'

পরম রসজ্ঞ পণ্ডিত রায় নির্ভীক, বলিলেন—

রূপের কবিত্ব অমৃতের পুর
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।

প্রভু কহিলেন—ছিঃ ছিঃ রায়, ইহাতে তোমার উল্লাস? 'শুনিতেও লজ্জা, লোকে করে উপহাস।' রায় প্রভুর লজ্জায় এতটুকুও লজ্জিত হইলেন না, বলিলেন—প্রভু তুমি ইহার কি বুঝ? লোকের উপহাস না আনন্দ, সে আমরাই বুঝিব ভালো। শুধু রায় নহেন, সার্বভৌম স্বরূপ সকলেই রূপের পক্ষে, প্রভু নীরব হইলেন।

ভক্তগণ রূপকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে পরম অন্তরঙ্গরূপে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

কয়েক মাস নীলাচলে বাস করার পর প্রভু রূপকে বিদায় দিলেন। প্রভুর চরণে মাথা লুটাইয়া পড়িলেন রূপ, চরণধূলি লইলেন সারা-জীবনের পাথেয়! আর তো দেখা হয় নাই! তার পরে চলিয়া গেলেন, ব্রজে লুপ্ত তীর্থ ও প্রেম প্রকাশ করিতে; প্রভু বলিয়া দিলেন,

'বৃন্দাবন যাহ তুমি, রহিও বৃন্দাবনে
একবার ইহা পাঠাইও সনাতনে।'

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[শ্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত মূল মারাঠী 'ভাবার্থ-দীপিকা'র পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[মহারাষ্ট্রদেশের পরম জ্ঞানী-ভক্ত শ্রীজ্ঞানদেব বা সন্ত জ্ঞানেশ্বরের জীবনকথা উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা গত বৎসর পড়িয়াছেন। ওবি ছন্দে নয় হাজার শ্লোকে রচিত তাঁহার গীতাভাষ্য 'ভাবার্থ-দীপিকা' মহারাষ্ট্র দেশে 'জ্ঞানেশ্বরী গীতা' নামেই সুপ্রসিদ্ধ। হিন্দী ও ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ বহুল প্রচারিত। বহুদিন পূর্বে প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয় এই অপূর্ব গ্রন্থের অনুবাদে হাত দেন এবং দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশ করেন, তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। বহু আয়াস স্বীকার করিয়া বর্তমান লেখক ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে অনুবাদ আরম্ভ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৬০০ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ 'উদ্বোধনে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইবে।

প্রস্তাবিত পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাগুলি উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাদিগকে বিষয়-প্রবেশে সহায়তা করিবে: 'ভাবার্থ-দীপিকা' পুস্তকে সাধু জ্ঞানদেব যে প্রবন্ধাকারে তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত করিয়াছেন তাহা যেমন সুপাঠ্য উপাদেয় ও রসপূর্ণ তেমনি গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ। তাঁহার রচনা শৈলীও উপভোগ্য, উপমাগুলি চমৎকার, পড়িতে পড়িতে মনে হয় দর্শনের পুস্তক পাঠ করিতেছি, না—কাব্য-সাহিত্য পড়িতেছি? একটি উপমা দিয়া বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিয়া জ্ঞানদেব ক্ষান্ত হন নাই। উপমার পর উপমা দিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কবিসুলভ মনোবৃত্তি দর্শনের ভাষাকে রূপ দিয়াছে—এজন্য ইহা সুখপাঠ্য। এই অদ্বৈতবাদী সাধু তাঁহার 'ভাবার্থ-দীপিকা'য় নীরস তত্ত্ব পরিবেশন করেন নাই, যেন ভক্তির প্রবাহ ছুটাইয়াছেন। অপূর্ব এই গ্রন্থ, এবং মহারাষ্ট্রদেশে ইহার খ্যাতি সুবিস্তৃত, কিন্তু ইহা বড় কথা নহে; এই গ্রন্থ জগতের ধর্মসাহিত্যে একটি অমূল্য অবদান। উঃ সঃ]

[সদ্‌গুরুপূজন]

এখন আমার পরিষ্কৃত হৃদয়াসনে শ্রীগুরুদেবের চরণযুগল স্থাপন করিতেছি, ঐক্যভাবের অঞ্জলি সর্বেন্দ্রিয়রূপ কুসুমকলিতে ভরিয়া সেই পুষ্পাঞ্জলি আমি অর্ঘ্যরূপে গুরুদেবের চরণে অর্পণ করিতেছি, যে একনিষ্ঠ বাসনা অনন্যা ভক্তিরূপ বারিতে স্নাত হইয়া শুদ্ধ হইয়াছি তাহাকে চন্দনরূপে ব্যবহার করিয়া শ্রীগুরুদেবের অঙ্গে তিলক দিতেছি, শুদ্ধ প্রেমের স্বর্ণ নূপুর গড়াইয়া তাঁহার সুকুমার চরণযুগলে পরাইতেছি, নির্মল, অব্যভিচারী ও দৃঢ়ভক্তি (প্রেম) রূপ অঙ্গুরী তাঁহার অঙ্গুলীতে পরাইতেছি, আনন্দের সুগন্ধিতে আমোদিত অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের অর্ঘ্য প্রস্ফুটিত অষ্টদলবিশিষ্ট কমলপদ্মরূপে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিতেছি, তারপর অহংকারের ধূপ জ্বালাইয়া নিরভিমানের দীপধারা তাঁহার আরতি করিয়া সমরসে নিরন্তর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছি; আমি আমার শরীর ও প্রাণকে পাদুকা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের নীচে রাখিতেছি এবং তাঁহারই চরণে ভোগ ও মোক্ষকে আরতি করিতেছি; যে গুরুচরণ সেবাদ্বারা সর্বার্থ (মোক্ষ) প্রাপ্তি হয় ভাগ্যবলে আমি সেই সেবা করিবার যোগ্য হইব, জ্ঞানের উন্মেষ দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপের বিশ্রান্তিধামে পৌঁছিবে এবং বাক্যে সুধাসিন্ধুর মধুরতা আসিবে। (১০)

আমার ভাষণের প্রতি অক্ষর এত মধুরতা প্রাপ্ত হইবে যে কোটি পূর্ণচন্দ্রের মাধুর্য হার মানিবে; পূর্ব গগনে সূর্যের উদয় হইলে যেমন সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয় তেমনি আমার বাণী শ্রোতৃ-

সমাজকে দীপাবলীর ন্যায় আলোকিত করিবে; যে সৌভাগ্যের উদয় হইলে মুখ হইতে এমন বাণী বাহির হয় যাহার সম্মুখে স্বয়ং শব্দব্রহ্ম (বেদ)-ও খর্ব হইয়া যায় এবং যাহার সহিত কৈবল্যতত্ত্ব প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয় না, যে সৌভাগ্য দ্বারা বাণীর লতা এমন সরস ও সজীবভাবে বাড়িতে থাকে, যে শ্রবণসুখরূপ মণ্ডপের নীচে সারা বিশ্বে বসন্তশোভার সৌন্দর্য অনুভূত হয়, যে সৌভাগ্য বাণীকে এমন চমৎকার ক্ষমতা প্রদান করে, যাহা দ্বারা পরমাত্মা গোচরীভূত হন—যে পরমাত্মাকে না পাইয়া মন ও বাক্য নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, যে সৌভাগ্য উদিত হইলে ইন্দ্রিয়াতীত (অগোচর) ব্রহ্মতত্ত্বকে শব্দদ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব হয়—যাহা সাধারণ জ্ঞানের অগম্য ও ধ্যানের অসাধ্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মপরাগের এককণা প্রাপ্ত হইলে বাণীর সেই পরম সৌভাগ্য লাভ হয়। ইহার অধিক আর কি বলিব? এই সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি; তাহার কারণ এই যে আমি আমার গুরুদেবের একমাত্র সন্তান, সুতরাং আমি একলাই তাঁহার কৃপার পাত্র, দেখুন মেঘ তাহার সমস্ত জলরাশি চাতকের জন্য ঢালিয়া দেয়, তেমনি গুরুদেব আমার মস্তকের উপর তাঁহার কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছেন। (২০)

ইহার ফলে আমার মুখ হইতে ব্যর্থ বাক্যসকল বাহির হইলেও মধুর গীতার্থ প্রকট হইয়াছে, যদি ভাগ্য অনুকূল হয় তবে বালুকণাও রত্ন হইয়া যায় এবং যদি আয়ু থাকে তবে ঘাতকও দয়া করে, শ্রীজগন্নাথ যদি কাহারও ক্ষুধা মিটাইতে চাহেন তবে প্রস্তরখণ্ড জ্বাল দিলেও তাহা অমৃততুল্য তণ্ডুলে পরিণত হয়; ঠিক ঐ প্রকার যদি শ্রীগুরুদেব অঙ্গীকার করিয়া লন, তবে সারা সংসার মোক্ষময় হইয়া যায়, দেখুন—শ্রীনারায়ণের অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি পুরাণে পাণ্ডবগণের অপূর্ণতাসত্ত্বেও তাহাদের বিশ্ববন্দনীয় করেন নাই? তেমনি, শ্রীনিবৃত্তিনাথ মহারাজও আমার অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানের যোগ্যতা আনয়ন করিয়াছেন, পরন্তু যথেষ্ট হইয়াছে, বলিতে বলিতে আমি প্রেমে অভিভূত হইয়াছি, গুরুগৌরব বর্ণনা করিবার সময় কাহার জ্ঞান থাকে? এখন ঐ গুরুদেবের প্রসাদে আমি গীতার অর্থ প্রকট করিয়া সন্ত শ্রোতা আপনাদের চরণের সেবা করিতেছি। এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে যে চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তে কৈবল্যপতি শ্রীকৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, যেমন শত যজ্ঞ করিলে স্বর্গের সম্পত্তি (ইন্দ্রত্ব) লাভ করা যায়, তেমনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে সে মুক্তিলাভে সমর্থ। (৩০)

কিংবা শতজন্ম ধরিয়া যে ব্রহ্মকর্ম সম্পাদন করে সেই অন্তে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হয়, অন্য কেহই ব্রহ্মা হইতে পারেনা, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই যেমন সূর্যের নানা প্রকাশ অনুভব করিতে পারে তেমনি মোক্ষের পরমানন্দ কেবল জ্ঞানী পুরুষের ভাগ্যেই মিলে; এখন এই জ্ঞানপ্রাপ্তির যোগ্যতা কাহার হইতে পারে, ইহার বিচার করিলে জগতে কেবল একটিমাত্র পুরুষকেই ইহার" যোগ্য দেখা যায়। চক্ষুতে অলৌকিক দৃষ্টি থাকিলে পৃথিবীর অন্তঃস্থলে গুপ্তধন দেখা যায়, কিন্তু শুধু 'পায়াসু' মনুষ্যই (জন্মকালে যাহার পদদ্বয় অগ্রে বাহির হয়) এইপ্রকার দিব্য চক্ষু পায়; তেমনি ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু মন অত্যন্ত শুদ্ধ না হইলে সেখানে জ্ঞানের উদয় হয় না, আর ভগবান বিচারপূর্বক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৈরাগ্য বিনা জ্ঞান স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; আর কি প্রকারে মনে বৈরাগ্য আসিতে পারে—সর্বজ্ঞ শ্রীহরি তাহারও বিচার করিয়াছেন। ভোজনকারী যদি বুঝিতে পারে যে পকান্নের সহিত বিষ মিশানো আছে, তবে সে

অন্নের থালা সরাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়ে। ঠিক ঐপ্রকার যখন এই সারা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হয় তখন বৈরাগ্যকে দূরে সরাইয়া দিলেও উহা সাধকের পশ্চাদনুসরণ করে।

অনিত্য সংসার-বৃক্ষ

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একটি বৃক্ষের উপমাদ্বারা সংসারের অনিত্যতা বুঝাইতেছেন। (৪০)

সাধারণতঃ একটি বৃক্ষ উপড়াইয়া ফেলিয়া উল্টাইয়া দিলে শীঘ্রই শুকাইয়া যায়, এই সংসার-রূপ বৃক্ষ সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না, এইভাবে এক রূপকের কৌশল দ্বারা ভগবান এই সংসার-চক্রের গতি নিবৃত্ত করিতেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান এই সংসারের অনিত্যতা বুঝাইবার জন্য এবং আত্মভাব দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতেছেন। এখন এই গ্রন্থের গূঢ় রহস্য আমি আপনাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝাইব, আপনারা মন দিয়া শুনুন, তখন মহানন্দের সমুদ্র, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন :

হে পাণ্ডুকুমার অর্জুন, আমার স্বরূপপ্রাপ্তির পথে যে বিশ্বাভাস প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় তাহা এই 'জগদম্বর' নহে, পরন্তু এই সংসার বস্তুতঃ একটি প্রকাণ্ড বর্ধনশীল বৃক্ষ ; কিন্তু অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় ইহার মূল (শিকড়) নিম্নদিকে অবস্থিত নহে এবং শাখাপ্রশাখা উর্ধ্বদিকে প্রসারিত নহে, এজন্য ইহাকে বৃক্ষ বলিয়া জানিতে পারা যায় না। ইহাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে বা কুঠারের দ্বারা ছেদন করিলেও মরে না, উপরন্তু আরও বেশী বাড়িয়া যায়, অন্য বৃক্ষের শিকড় ছেদন করিলে শাখাগুলি উল্টাইয়া পড়ে, কিন্তু ইহার তাহা হয় না। ইহা সাধারণ বৃক্ষ নহে। (৫০)

হে অর্জুন, এই অলৌকিক সংসার-বৃক্ষের অদ্ভুত ও বিচিত্রকথা এই যে, ইহা নীচের দিকেই বাড়িয়া যায় ; সূর্য যেমন অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত এবং তাহার কিরণজাল নিম্নাভিমুখে প্রসারিত, ঐ প্রকার এই সংসাররূপী বৃক্ষের চমৎকার বৈশিষ্ট্য, প্রলয়কালের জলরাশি যেমন সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া যায়, তেমনি এই সংসাররূপী বৃক্ষ বিশ্বের যেখানে যাহা আছে সে সমস্ত ব্যাপিয়া আছে, সূর্য অস্ত গেলে যেমন চারিদিক অন্ধকারে ভরিয়া যায়, ঐ প্রকার সারা আকাশ এই বৃক্ষদ্বারা পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে ; ইহার কোনও ফল নাই যাহা ভক্ষণ করা যায়, কোনও ফুল নাই যাহার ঘ্রাণ লওয়া যায়, পাণ্ডুসুত, ইহা কেবল বৃক্ষই, ইহার শিকড় (মূল) উর্ধ্বদিকে প্রসারিত, কিন্তু ইহা কোনও উন্মূলিত বৃক্ষ নহে, সুতরাং ইহা সর্বদা সতেজ ও সজীব থাকে, এইজন্যই ইহাকে উর্ধ্বমূল বলা হয়, পরন্তু নীচের দিকেও ইহার অসংখ্য শিকড় আছে, বট ও পিপুল বৃক্ষ যেমন চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে, তেমনি ইহার অধোগামী শিকড়গুলি মাটিতে লাগিলে অসংখ্য ঝাড় বাহির হয়, আর, হে ধনঞ্জয়, শুধু নীচের দিকেই ইহার ঝাড় বিস্তৃত হয় না, উপরের দিকও ইহার অগণিত শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত হইয়া থাকে। (৬০)

ইহাকে দেখিলে মনে হয় যে আকাশই পল্লবিত হইয়াছে, অথবা বায়ুই বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে অথবা অবস্থাত্রয় (উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়) এইভাবে উদিত হইয়াছে, এইভাবে বিশ্বরূপী প্রকাণ্ড 'উর্ধ্বমূল' বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে জানিবে ; এখন উর্ধ্ব কি, ইহার মূলের লক্ষণ কি, ইহা অধোমুখ হইয়া কেন অবস্থিত, ইহার শাখা কি প্রকারের, অথবা এই বৃক্ষের অধোভাগে যে শিকড়-

গুলি অবস্থিত তাহা হইতে কোন উর্ধ্বমুখ শাখা কি করিয়া উৎপন্ন হয়, আর এই বৃক্ষ অশ্বত্থ নাম কি করিয়া প্রাপ্ত হইল—আত্মজ্ঞানিগণ ইহার নির্ণয় করিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয় যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে পার—এইজন্য স্পষ্ট ভাষায় নিরূপণ করিয়া বলিতেছি, হে ভাগ্যবান অর্জুন, তুমিই এই প্রসঙ্গ শুনিবার যোগ্য, সুতরাং সর্বাঙ্গ কর্ণে পরিণত করিয়া একাগ্রচিত্তে অন্তঃকরণ দিয়া শ্রবণ কর, যাদববীর শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমরসে এইসব কথা বলিতে লাগিলেন তখন অর্জুনও মনোযোগের প্রতিমূর্তি হইলেন (অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন), আকাশ যেমন প্রসারিত হইয়া দশদিককে আলিঙ্গন করে তেমনি অর্জুনের শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা এত অধিক বাড়িল যে ভগবানের ব্যাখ্যান তাঁহার নিকট পরিমাণে অল্প মনে হইল, যদিও শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ সমুদ্রের মত অনন্ত ও অসীম ছিল, অর্জুনও দ্বিতীয় অগস্ত্য মুনির মতো ভগবানের ঐ সমস্ত বচনসাগর এক গণ্ডূষে পান করিতে চাহিলেন। (৭০) তখন অর্জুনের হৃদয়ের উৎকণ্ঠা এমন সীমাহীনভাবে বাড়িয়া গেল যে তাহা দেখিয়া ভগবান সুখী হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১৫।১

ভগবান বলিলেন: হে ধনঞ্জয় এই বৃক্ষের ঊর্ধ্বে যে ব্রহ্ম আছেন, তাহা হইতেই এই বৃক্ষমূল ঊর্ধ্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে, বাস্তবিক যাহাতে মধ্য ঊর্ধ্ব বা অধঃ এই প্রকার কোনও ভেদ নাই, যাহা হইতে অদ্বৈতের ঐক্যভাব হয়, যাহা সেই শব্দব্রহ্ম, যাহা কর্ণে শ্রবণ করা যায় না, সেই মকরন্দের সুগন্ধ যাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, সেই স্বরূপানন্দ যাহা কোনও বিষয়ের সংস্পর্শ বিনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা 'এপারে' এবং 'ওপারে' 'অগ্রে' ও 'পশ্চাতে' স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা অদৃশ্য—পরন্তু দৃষ্টি বিনাই দেখা যায়, যাহা উপাধির সংযোগে নামরূপাত্মক বিশ্বরূপে প্রতিভাত, যাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিনাই জ্ঞান, যাহা আনন্দে পূর্ণ হইলেও শূন্য আকাশ সদৃশ, যাহা কার্যও নহে—কারণও নহে, যাহা দ্বৈতও নহে—অদ্বৈতও নহে, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ—সেই সত্য শুদ্ধ 'বস্তু' ব্রহ্মই এই সংসাররূপ বৃক্ষের ঊর্ধ্বভাগ, তাহা হইতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন মনে হয় তাহাকে 'মায়া' আখ্যা দেওয়া হয়, ইহা বন্ধ্যার সন্ততি বর্ণনার ন্যায় মিথ্যা বা অলীক (৮০), যাহা সৎ নহে অসৎও নহে, যাহা বিচারের আলো সহ্য করিতে পারে না (জ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না), এমনি যাহার প্রকার, যাহাকে 'অনাদি' বলা হয়, যাহা নানা তত্ত্বের সিন্দুক, যাহা জগৎরূপ মেঘের আকাশ (আধার) এবং যাহা বিশ্ব-রূপ বস্ত্রের (ভাঁজ করা) সমষ্টি, যাহা সংসাররূপ বৃক্ষের বীজ প্রপঞ্চের ভূমিকা (প্রপঞ্চের চিত্র অঙ্কিত করিবার চিত্রপট) ও বিপরীত জ্ঞানের দীপিকা (প্রকাশ), এই মায়া নির্গুণ ব্রহ্মে এমনভাবে অবস্থিত যে মনে হয় উহা নাই, কিন্তু উহাদ্বারা যেসব ব্যাপার ঘটিয়া থাকে তাহা ব্রহ্মেরই প্রভাব (তেজ) প্রকট করে, নিদ্রা আসিলে আমরা যেমন স্বয়ং আপনাকে জ্ঞানশূন্য করি অথবা দীপ যেমন কজ্জল উৎপন্ন করিয়া আপনার প্রভা মন্দ (ক্ষীণ) করে; অথবা যেমন কোনও পুরুষ আলিঙ্গন বিনাই স্বপ্নে তরুণী দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া কামবিকার প্রাপ্ত হয়—ঠিক ঐ প্রকার হে ধনঞ্জয়, নির্গুণ ব্রহ্মে যে মায়া উৎপন্ন হয় এবং

যাহা মূলস্বরূপের বিস্মৃতি আনয়ন করে—তাহাই এই সংসার-বৃক্ষের প্রথম জড় বা শিকড়, মূলবস্তুর যে আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি হয় তাহাই এই বৃক্ষের উর্ধ্বদেশে অবস্থিত প্রধান কন্দ (মূল), যাহাকে বেদান্তে 'বীজভাব' বলিয়াছে—পূর্ণ অজ্ঞান সুষুপ্তির অবস্থাকে 'বীজাঙ্কুর' ভাব কহে, বেদান্তের নিরূপণে এইসব পরিভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে, পরন্তু এখন ইহা থাকুক, জানিয়া রাখ অজ্ঞানই এই সংসার-বৃক্ষের মূল (৯০), ইহার উর্ধ্বভাগই নির্মল আত্মা, অধোর্ধ্বভাগে যে শিকড় বাহির হইয়াছে তাহারা বৃক্ষের পাদদেশে মায়াদ্বারা প্রস্তুত গর্তের জলে পুষ্ট হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; নিম্নভাগে অনেক প্রকার অসংখ্য দেহ উৎপন্ন হয় যাহার চতুর্দিকে অঙ্কুর বাহির হইয়া বাড়িতে থাকে, এইভাবে এই সংসার-বৃক্ষের মূল (শিকড়) উর্ধ্বভাগে ব্রহ্ম হইতে বলপ্রাপ্ত হয় এবং অধোভাগে অসংখ্য অঙ্কুর উৎপন্ন করিতে থাকে; ইহার প্রথম অঙ্কুর জ্ঞানরূপবৃত্তি, যাহা মহত্তত্ত্বের বিকশিত কোমলপত্র, ইহার নিম্নভাগে তিনটি পত্রবিশিষ্ট একটি অঙ্কুর বাহির হয়, ইহা সত্ত্বরজতমাত্মক ত্রিবিধ 'অহংকার', এই অহংকার হইতে বুদ্ধিরূপ শাখা বাহির হয় এবং নানারূপ ভেদভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মনরূপ শাখাকে পুষ্ট ও সতেজ করে, এইভাবে মূলের সামর্থ্যে—বিকল্পরসে ভরা চিত্ত চতুষ্টয়ের (বুদ্ধি, মন, অহংকার ও চিত্ত) কোমল পত্রবিশিষ্ট শাখা উৎপন্ন হয়; তৎপরে ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতরূপে পাঁচটি সুন্দর ঋজু শাখা সতেজে বাহির হয়; ইহা হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়গুলি অনেক প্রকার বিচিত্র ও কোমলপত্র-বিশিষ্ট প্রশাখারূপে বাহির হয়, তৎপরে শব্দাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে শ্রোত্রের (কর্ণেন্দ্রিয়) অত্যধিক বৃদ্ধি হয় এবং শুনিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। (১০০)

অঙ্গরূপী লতা ও ত্বকরূপী পল্লবে স্পর্শজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং তাহা হইতে অনেক প্রকার নব নব বিকার উৎপন্ন হয়, ইহার পর রূপের পল্লব উৎপন্ন হয় এবং তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় মোহ ও ভ্রমের বশবর্তী হইয়া তাহার মাধুর্যের পশ্চাতে অনেকদূর পর্যন্ত ধাবমান হয়, যখন রসের শাখা বেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন জিহ্বার উপর লালসার অসংখ্য পল্লব বাহির হয়, এই প্রকার গন্ধের অঙ্কুরোদ্গম হইলে ঘ্রাণরূপী শাখা বাড়িয়া বলপ্রাপ্ত হয় এবং আনন্দে লোভের তলদেশে যায় (অর্থাৎ লোভের বৃদ্ধি করে), এইভাবে মহত্তত্ত্ব মন অহংকার বুদ্ধি ও পঞ্চ মহাভূত এই সংসাররূপী বৃক্ষকে পল্লবিত করিয়া বাড়াইতে থাকে।

কিংবহুনা, এই বৃক্ষ এই (মহত্তত্ত্বাদি) অষ্টাঙ্গে অধিক বাড়িতে থাকে, পরন্তু শুক্তি দেখিয়া যখন রৌপ্যের ভ্রম হয়, তখন রৌপ্য শুক্তির আকারেই দেখা যায়; অথবা সমুদ্র যতদূর বিস্তৃত দেখা যায় তরঙ্গের বিস্তারও ততদূর পর্যন্ত হয়, তেমনি অদ্বৈত ব্রহ্মও এই অজ্ঞানপ্রসূত সংসার-বৃক্ষের রূপ ধারণ করেন; যেমন স্বপ্নের মধ্যে কেহ একাকী থাকিলেও নিজেই তাহার পরিবারবর্গ হইয়া যায়, তেমনি এই সংসার-বৃক্ষের ততদূর বিস্তার যতদূর ইহা প্রসারিত; যথেষ্ট বলা হইল। এই প্রকারে এক বিচিত্র বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আর ইহার মহদাদি অঙ্কুরোদ্গম হওয়ায় নীচের দিকে শাখাসমূহ বাড়িতে থাকে; এখন জ্ঞানিগণ ইহাকে 'অশ্বত্থ' কেন বলেন, তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। (১১০)

'শ্ব' (শ্বঃ) ইহার অর্থ 'উষা' বা প্রভাতকাল, এই প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষ যে পরদিন প্রভাতকাল পর্যন্ত একভাবে টিকিবে তাহা অনিশ্চিত, ক্ষণে ক্ষণে যেমন মেঘের রং বদলায় অথবা বিদ্যুৎ যেমন

এক নিমেষ মাত্রও অখণ্ড বা শান্ত থাকে না; অথবা কম্পমান কমলপত্রের উপর যেমন জল দাঁড়াইতে পারে না কিংবা ব্যাকুল মনুষ্যের চিত্ত যেমন কখনও স্থির থাকিতে পারে না তেমনি ইহার স্থিতি, প্রতিক্ষণে ইহার নাশ হয় এইজন্যই ইহাকে 'অশ্বত্থ' বলে, কেহ কেহ 'অশ্বত্থ' বৃক্ষকে ব্যবহারিক ভাবে পিপুল বলে, কিন্তু ইহা ভগবান শ্রীহরির অভিমত নহে; পরন্তু ইহাকে 'পিপুল' বলিলেও এই প্রসঙ্গে অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করা যায়, কিন্তু লৌকিক মতামত থাকুক, এখন আপনারা এই অলৌকিক গ্রন্থ শ্রবণ করুন; ইহার ক্ষণভঙ্গুরতার জন্য এই বৃক্ষকে 'অশ্বত্থ' বলা হয়, আর এই সংসার-বৃক্ষের 'অব্যয়ত্বে'র জন্য (নিত্য বলিয়া) বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে, পরন্তু তাহার গূঢ় অর্থ এইরূপ: যেমন সমুদ্রের জল একদিকে মেঘদ্বারা বাষ্পরূপে শোষিত হয়, তেমনি মেঘবর্ষণ হইলে নদনদী ভরিয়া যায় (এবং তাহাদের জল সমুদ্রে গিয়া পড়ে), সমুদ্রের জল কমেও না, বাড়েও না, পূর্ববৎ পরিপূর্ণ দেখায়,—কিন্তু তাহা মেঘ ও নদীর ক্রিয়া বন্ধ না হওয়ার উপর নির্ভর করে। (১২০)

এই প্রকার এই সংসাররূপ বৃক্ষের উৎপত্তি ও লয় এত তাড়াতাড়ি হইতে থাকে যে লোকে তাহা বুঝিতে পারে না এবং এইজন্য ইহাকে 'অব্যয়' বলে; দানশীল পুরুষ যেমন নিজের ধন ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন, তেমনি এই বৃক্ষও সর্বদা আপনাকে ব্যয় করিতে থাকে বলিয়া (উৎপত্তি স্থিতি ও লয় দ্রুতবেগে সম্পূর্ণ হয় বলিয়া) 'অব্যয়' রূপে প্রতিভাত হয়; রথের চক্র অতিবেগে ঘুরিতে থাকিলে মনে হয় যেন নিশ্চল হইয়া আছে অথবা ভূমিতে লাগিয়া আছে, তেমনি কালের প্রভাবে এই বৃক্ষের কোন শাখা শুকাইয়া পড়িয়া গেলে তাহার স্থানে অসংখ্য অন্য অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, পরন্তু যেমন আষাঢ়ের মেঘ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কখন একটি মেঘ সরিয়া যায় এবং তাহার স্থানে অন্য অনেক মেঘ আসিয়া জমা হয়, তেমনি এই সংসার-বৃক্ষ সম্বন্ধেও জানা যায় না—কখন ইহার একটি শাখা স্খলিত হয়, কখন তাহার স্থানে অনেক শাখা উৎপন্ন হয়, মহাকল্পান্তে দৃশ্যমান সারা সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনেক নূতন সৃষ্টির অরণ্য উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে; প্রলয়ের অন্তে যেমন ধ্বংসকারী প্রচণ্ড বায়ুর প্রভাবে বিশ্বরূপ বৃক্ষের ত্বক্ ভস্ম হইয়া যায় তখনই নবীন কল্পের সূচনাকারী নব নব পত্রপল্লব উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইক্ষুর কাণ্ড হইতে যেমন অনেক নূতন নূতন ইক্ষুকাণ্ড উৎপন্ন হয় তেমনি এক মনুর (মন্বন্তরের) পর অন্য মন্বন্তর আসে, এক বংশের পর দ্বিতীয় বংশ উৎপন্ন হইয়া ক্রমপরম্পরায় বিস্তার লাভ করে, কলিযুগের অন্তে যেমন যুগচতুষ্টয়ের শুষ্ক ছাল পড়িয়া যায়, অমনি কৃত (সত্য) যুগের নূতন ছাল উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে—প্রচলিত বর্ষের অন্তে যেমন আগামী বর্ষের আমন্ত্রণ হয়,—দিন আসিল কি গেল যেমন জানা যায় না। আজিকার দিন গত হইয়া কল্যকার দিন আসিতেছে—ইহা যেমন স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় না, (১৩০)—

অথবা বায়ুর প্রবাহে যেমন সন্ধিস্থল দেখা যায় না তেমনি এই বৃক্ষের কত শাখা উঠিল বা পড়িল তাহা বুঝিতে পারা যায় না, একটি শরীরের অঙ্কুর বিনষ্ট হইলে অনেক নূতন শরীরের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এইজন্যই এই ভবতরুকে (সংসাররূপ বৃক্ষকে) অব্যয় বা নিত্য বলিয়া মনে হয়, প্রবহমান জল যেমন বেগে সম্মুখে চলে এবং পশ্চাতের জল আসিয়া তাহার স্থান লয় তেমনি এই জগৎ অসৎ (নশ্বর) হইলেও সৎ (শাশ্বত, নিত্য) বলিয়া মনে হয়; চক্ষের নিমেষে সমুদ্রের বুকে

কোটি তরঙ্গ উঠে এবং নাশপ্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানবশতঃ মনে হয়, ঐ তরঙ্গ নিত্য—তেমনি অজ্ঞানবশতঃ সংসারকে নিত্য মনে হয় ; [পুরাণ প্রসিদ্ধি-অনুসারে] কাকের চক্ষু দুটি, কিন্তু অক্ষিগোলক একটি, তাহাকে একই সময় দুদিকে দুটি চক্ষুর মধ্যে দ্রুতবেগে চালায় বলিয়া মনে হয় তাহার দুইটি অক্ষিগোলক, তেমনি জগৎ অনিত্য হইলেও ভ্রমবশতঃ তাহাকে নিত্য বলিয়া মনে হয় ; লাটিম খুব জোরে একস্থানে ঘুরিতে থাকিলে মনে হয় যেন ভূমির উপর নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; এইভাবে বেগাতিশয়ই ভুলের কারণ হয়, আর বেশী উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। একটি জ্বলন্ত মশাল হাতে ধরিয়া ঘুরাইলে একটি চক্রাকার রেখার মত দেখায়, তেমনি সংসার-বৃক্ষের শাখা সহসা ভাঙে এবং উৎপন্ন হয়—তাহা না বুঝিয়া মূঢ়ব্যক্তিগণ ইহাকে অব্যয় বলিয়া মনে করে। পরন্তু, এক নিমেষে ইহার কোটি শাখা বিনাশপ্রাপ্ত ও উৎপন্ন হইতে দেখিয়া যাঁহারা ইহার তীব্র গতিবশতঃ ইহাকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বুঝেন এবং যাঁহারা পূর্ণভাবে বুঝিতে পারেন যে এই সংসার-বৃক্ষের মূল অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং ইহার অস্তিত্ব মিথ্যা, (১৪০) হে পাণ্ডুসুত অর্জুন, আমি তাঁহাদের সর্বজ্ঞ বলিয়াই জানি, তাঁহারা বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অবগত আছেন, তাঁহারা আমার নমস্য, এই প্রকার জ্ঞানীই যথার্থ যোগী, এবং ইহাও বলা যায় যে ইঁহারাই জ্ঞানকে জীবন্ত রাখেন, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; যিনি বুঝিতে পারেন যে এই সংসার-বৃক্ষ ক্ষণভঙ্গুর তাঁহার মহিমা বর্ণনা কে করিতে পারে ?　　　(ক্রমশঃ)

পথ চলি

'অনিরুদ্ধ'

পথ চলি পথশেষে যাব বলে নয়,—
শেষ যদি নাহি থাকে তবু নাহি ভয়।
ভালবাসি কাহাকেও নহে তো বাঁধিতে,
আপনারে দিয়ে যাওয়া—কিছু নয় নিতে।
কাজ করি, লাভক্ষতি হিসাব রাখি না—
গাহি গান, জানি না তো কেহ শোনে কিনা।
সুখ তরে নাহি ছুটি, নহি দুঃখত্যাগী—
জীবনের তৃষ্ণা নাই, মৃত্যু নাহি মাগি।

জানি না কে মোর পর, কাহারা আপন
জানি না কোথায় গৃহ—কামনার ধন।
আমার আপন সত্য যদি সঙ্গে রয়
পলকে সংশয় মিটে, ঘুচে দ্বন্দ্বচয়।
সেই সত্যালোক ধরি তাই পথ চলি—
সবখানে সদা দেখি পূর্ণ তো সকলি।

গোপী

শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর 'মীরা' ভজনের অনুবাদ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কেন গান সখী আর গাও—উদাস স্মৃতিচারণে ?
গেছে ফুরিয়ে যে-প্রেম কী হবে তায় রেখেই বা মনে ?

ভালো বেসেছিলাম কারে সেদিন হায় মধুবনে,
তনু মন প্রাণ সব স'পেছিলাম কার শ্রীচরণে,
বাঁশি শুনে ছিলাম সে কার আমরা অবলা ?
শিরে শিখিচূড়া, কণ্ঠে মালা দেখে সরলা,
ছিল মধুর প্রতি রাত ও প্রভাত কার আরাধনে ?
কেন আজও ওঠে প্রাণ উজিয়ে সে-সব স্মৃতিচারণে ?

যেদিন নন্দদুলাল হ'য়ে গোপাল ধেনু চরাত,
ক'রে আড়ি—ফিরে বাজিয়ে বাঁশি সে মন ভোলাত,
ভুলেও আমরা তাকে ডাকিনি তো বিশ্বরাজ ব'লে,
ছিল কৃষ্ণ কানু শ্যামল আমাদের সে ভূতলে,
মাথায় উঠিয়ে দিত গাগরি যে হাসির ভাষণে,
কেন আজও ওঠে প্রাণ উজিয়ে সে-সব স্মৃতিচারণে ?

সখী আমরা তাকে পাইনি তো জ্ঞান ধ্যান কি তপস্যায়,
হতাম মনের মতন তার সরল প্রেমে ও সেবায়।
রবে জন্ম জন্ম সাথী—কথা দিয়েছিল যে,
বাঁধন টুটবে না এ প্রেমের কভু—গেয়েছিল রে,
মীরা সেই গোপালের গায় গুণ আজ জীবনসাধনে,
তাই ভুলতে গিয়েও উজিয়ে ওঠে স্মৃতিচারণে।

চির-শ্যামল

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

আষাঢ়ে আনত মেঘ মাঠের সবুজে,
হৃদয়ের সার্থকতা পেতে চায় খুঁজে।
কী দেখে সে ভালোবেসে পৃথিবীর দিকে,
সারাদিন চেয়ে থাকে মুগ্ধ অনিমিখে।

তারপর দিনশেষে নামে অন্ধকার।
হাওয়ায় হাওয়ায় ফেরে অজস্র কান্নার
বাণীহীন ব্যাকুলতা। বলে যেন চুপে,
'প্রেম আসে বিরহের চিরশ্যামরূপে।'

দশবিধরূপধারী হোক তব জয়

[কবি জয়দেবের দশাবতার-স্তোত্র-অবলম্বনে]

কাজী নজরুল ইসলাম

১

প্রলয়-পয়োধিজলে চারি বেদ যবে ভেসে যায়
তুমি নাথ মৎস্যরূপে অনায়াসে উদ্ধারিলে তায়।
মীনরূপী হরি লীলাময়,
জয় হোক, হোক তব জয়॥

২

যবে মহাকূর্মরূপ ধরেছিলে ওহে নীলমণি,
চক্রচিহ্নে পৃষ্ঠে তব সুরক্ষিত ছিল এ ধরণী।
হে কচ্ছপরূপী লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

৩

দশনশিখরে ধরা ছিল ধরা, লুকানো আদরে—
কলঙ্ক বিলুপ্ত যথা জ্যোতি-মাঝে পূর্ণ শশধরে।
হে বরাহরূপী লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

৪

তব করকমলের কেশর নখর খর দিয়া
হিরণ্যকশিপু ভৃঙ্গ আপনাতে ফেলিলে দলিয়া
নরসিংহরূপী লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

৫

ধরণী পবিত্র তব চরণনখ-চ্যুত সলিলে,
ত্রিপাদ-বিক্রমে তুমি গর্বিত বলিরাজে ছলিলে।
হে বামনরূপী লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

৬

ধরি ভৃগুপতিরূপ তুমি ক্ষত্রিয়-রুধির-জলে
স্নাত করি, তাপ হরি পাপহীন করিলে ভূতলে।
ভৃগুরূপী ওহে লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

৭

রামরূপে রাবণের দশ মুণ্ড করিয়া ছেদন
দশদিক্‌পতিগণে উপহার করিলে প্রেরণ
রামরূপী ওহে লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

৮

ধরি হলধরমূর্তি সুনীল বসন পর অঙ্গে
যেন হলাঘাত-ভয়ে যমুনা মিলেছে দেহ-সঙ্গে।
বলরামরূপী লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

৯

সদয় হৃদয় তব কেঁদেছিল জীবের ব্যথায়,
পশুবধ-বেদবিধি তাই তুমি নিন্দ করুণায়।
বুদ্ধরূপী ওহে লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

১০

ম্লেচ্ছ-নিধন তরে ধূমকেতু-সম অসি হাতে
কলিতে আসিবে প্রভু, নাহিক সংশয় কভু তাতে।
কল্কিরূপী তুমি লীলাময়,
হোক জয়, হোক তব জয়॥

জয়দেব-রচিত এ উদার উচ্ছ্বাস শোন সবে
ধরার মঙ্গলে হরি দশবিধরূপে এল ভবে।
দশরূপধারী লীলাময়,
জয় হোক, হোক তব জয়॥

সমালোচনা

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম—(তৃতীয় সংস্করণ) প্রণেতা শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী, প্রকাশক—শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী, ৫এ বারাণসী ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ১৬+২০৫; মূল্য তিন টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের যথাযথ সমাবেশ রহিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং উপনিষদ্ হইতে সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই বইখানি সর্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা গোস্বামিপাদগণের সমস্ত বই পড়িতে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অতুলনীয়। গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং সুখবোধ্য। গ্রন্থকার বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত এবং সুপরিচিত। তাঁহার লেখা শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, অনুভূতিমণ্ডিত হওয়ায় লোককল্যাণ সাধন করিবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—মৈথিল্যানন্দ

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর নাটক (চিত্রনাট্য উপযোগী) (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী প্রণীত। ভাগবতভবন—১০২।৩, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা+দেড় টাকা।

প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে নাটকটি রচিত। ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপ মধুর ও বিস্তৃত ভাবে বিবৃত আছে এমন আর কোথাও নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভক্ত গ্রন্থকার আলোচ্য নাটকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অবিকৃত করিয়া যে ভাগবত লীলারস পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গী ও রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হইতে বিপ্রপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ ও গোবর্ধন-পূজার উদ্যোগ হইতে মথুরাযাত্রা পর্যন্ত কথোপকথনচ্ছলে নাট্যাকারে বিবৃত। পুস্তকখানি শ্রীকৃষ্ণলীলারস-পিপাসু ভক্তবৃন্দের আদরণীয় হইতে পারে, তবে একটি জিনিস খুবই দৃষ্টিকটু মনে হইল, 'বস্ত্রহরণ' দৃশ্যটি নাটকে সন্নিবেশিত না হইলেই সমীচীন হইত, যাহার তাৎপর্য অনুধাবন করা ভক্ত সাধকের পক্ষেও দুষ্কর, তাহা সর্বসাধারণের কাছে নাটকের মাধ্যমে—বিশেষতঃ চিত্রনাট্য-উপযোগী পুস্তকে তুলিয়া ধরার কোন সার্থকতা নাই।

একটি প্রসন্ন সুর—শান্তশীল দাশ। প্রকাশক: তুলি-কলম, ৫৭এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃঃ ৩১, দাম এক টাকা।

কবি শান্তশীল দাশের এই কবিতা-সংগ্রহটি সার্থকনামা। কবিহৃদয়ের অনুভূতি ও আদর্শ শান্ত সংহত বাণীরূপ লাভ ক'রে এ সংগ্রহের সর্বত্র বিমল প্রসন্নতার সুরটি বজায় রেখেছে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রকাশ বিরল ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের পরে এই অনুভূতির রূপায়ণে যাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন, তাঁরা খুব কম ক্ষেত্রেই বাণী বা ভাবের নূতন আস্বাদ দিতে পেরেছেন। আলোচ্য কবিতাসংগ্রহের মধ্যেও একটু লক্ষ্য করলেই রবীন্দ্ররীতির প্রভাব যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির একটি নিজস্ব অনুভূতিগত বক্তব্য রয়েছে এবং সে বক্তব্য কবিতা হয়ে উঠেছে—এইখানেই এ গ্রন্থের সার্থকতা। আধুনিক জীবনধারার সহস্র কলরোলের মধ্যে একটি প্রসন্ন সুরের কবিকে সহৃদয় পাঠকমাত্রেই সাগ্রহ অভিনন্দন জানাবেন।

শ্রীপ্রণব ঘোষ

স্বামী দেবাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৮ই আগষ্ট রাত্রি ১০-৪৫ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে ৫৮ বৎসর বয়সে রক্তের চাপ-জনিত ব্যাধিতে (high blood pressure) স্বামী দেবাত্মানন্দ (ইন্দু) দেহত্যাগ করিয়াছেন। দুই ঘণ্টা পূর্বে রাত্রের আহার গ্রহণ করিবার সময় হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া যান—এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসে এবং দক্ষিণ অঙ্গও স্বাভাবিক হইয়া যায়। কথাবার্তায় বা মুখভাবে আর রোগজনিত কোন কষ্ট দেখা যায় নাই। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া ডাক্তারও চলিয়া যান। কিন্তু রাত্রি ১০-৩০ মিঃ সময় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, পরে নাড়ী স্তিমিত হইতে থাকে ; ১৫ মিনিটের মধ্যে জীবন দীপ নির্বাপিত হয়। বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে রাত্রে তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৯১৬ খৃঃ ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর হইতেই ইন্দ্রকুমার (ডাক নাম ইন্দু) রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম (Calcutta Students' Home)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯২০ খৃঃ বিদ্যার্থী আশ্রমের অন্তেবাসীরূপে বি.এ. পাশ করেন। তারপর গতানুগতিক ভাবে চাকরি অন্বেষণ না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের জন্য তিনি কিছু দিন কৃষিকার্য করিয়াছিলেন। বিদ্যার্থী আশ্রমে থাকা কালেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের সংস্পর্শে আসেন এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।

মিহিজামে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ (দেওঘর) আরম্ভ হওয়ার সময় যে কয়েকটি ত্যাগী যুবক ঐ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

১৯২২ খৃঃ ২২ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান করেন। ১৯২৩ খৃঃ জয়রাম-বাটিতে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তরুণ ইন্দ্রকুমার পূঃ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খৃঃ পূঃ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন।

১৯২৬ খৃঃ তিনি বিদ্যাপীঠ হইতে মাদ্রাজ মঠে প্রেরিত হন, ৪ বৎসর সেখানকার কাজ করিয়া ১৯৩০ খৃঃ স্বামী দেবাত্মানন্দ আমেরিকার কাজের জন্য নির্বাচিত হন।

সেখানে তিনি প্রথমে নিউ ইয়র্ক কেন্দ্রে কার্য করেন, অল্প কিছু দিন পরে তাঁহারই চেষ্টায় পোর্টল্যাণ্ডে (ওরিগন) একটি নূতন বেদান্তকেন্দ্র স্থাপিত হয়, এবং দেবাত্মানন্দ এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৯ বৎসর কাল যোগ্যতার সহিত আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া ১৯৪৯খৃঃ সেপ্টেম্বরে স্বামী দেবাত্মানন্দ একবার ভারতে আসেন, এবং ৬ মাস পরে পোর্টল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান ; কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে ১৯৫৩ খৃঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায়। ১৯৫৪ ডিসেম্বরের প্রথম হইতেই আমেরিকার অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন—দুরারোগ্য রক্তচাপ (malignant hypertension) বলিয়া তাঁহারা রোগ নির্ণয় করেন। যথেষ্ট চিকিৎসার পর জন্মভূমির জলহাওয়ায় রোগ কিছুটা লাঘব হইবে ভাবিয়া অসুস্থ অবস্থাতেই প্লেনে দেবাত্মানন্দ ভারতে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতা পি.জি হাসপাতালে সুদীর্ঘ চিকিৎসার পর ১৯৫৬ খৃঃ ফেব্রুআরি হইতে তিনি মঠেই ছিলেন এবং অনেকটা ভাল ছিলেন।

ইণ্টালি অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল তিনকড়ি দত্ত। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

লণ্ডন : ১৮ই মার্চ ক্যাক্সটন হলে লণ্ডনের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রী মাননীয়া শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন, আজ পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতি ও সমন্বয়ের শিক্ষার বড় প্রয়োজন। স্বদেশের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের বর্তমান নেতৃবৃন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষারই উত্তরাধিকারী।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যাশাম (Prof. A. L Basham) শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : তাঁহাদের প্রকৃত মহত্ত্ব এই যে তাঁহারা ভারতবাসীর প্রাণে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার প্রেরণা জাগাইয়াছেন। অধ্যাপকের মতে : যদি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ আবির্ভূত না হইতেন তবে গান্ধীকেও পাওয়া যাইত না। এই ধর্মগুরুগণ ব্যতিরেকে স্বাধীনতার পথে ভারতের অগ্রগতি ভারতের পক্ষে ও শাসক-শক্তির পক্ষে আরও অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইত।

ভারতের জীবনব্যাপী বন্ধু ও ভূতপূর্ব ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স বেলুড় মঠ সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত স্মৃতি-কথার উল্লেখ করিয়া বলেন, বৈদিক-নীতি আয়ত্ত করিতে তাঁহার কখনও কোন কষ্ট হয় নাই। উপসংহারে তিনি বলেন, 'যে তার চোখে-দেখা ভাইকে ভালবাসে, সে কি চোখে-না-দেখা ভগবানকেও ভালবাসে না ?'

বিখ্যাত লেখক ও অস্ত্র-চিকিৎসক (Surgeon) মিঃ কেনেথ ওয়াকার বলেন, মন ও আত্মার সূক্ষ্ম রহস্য অনুসন্ধানে ভারতপ্রতিভা ক্রিয়াশীল। পাশ্চাত্ত্য জগতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুগে যুগে রাজনীতিকগণ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার করেন—এ বিষয়ে স্বামীজী আমাদের সাবধান করিয়া গিয়াছেন। মিঃ ওয়াকার পরিশেষে বলেন : ধর্মের সহিত মাত্র একটি প্রকারের রাজনীতি খাপ খায়, মানুষের ভ্রাতৃভাবের রাজনীতি এবং সকল জাতির বন্ধু-ভাবাপন্ন সহ-অস্তিত্ব।

সকলকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দ অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও পরস্পর বন্ধুত্বের কথা বলেন। সভায় উপস্থিত প্রায় ৫০০ ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের অনুরাগী ইংরেজ, এতদ্ব্যতীত ফরাসী কন্সাল জেনারেল, নেপালের রাজপ্রতিনিধি, ভারতীয় হাই কমিশনের অনেকে, তা ছাড়া ভারত ও ইওরোপের গণ্যমান্য আরও অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-জন্মোৎসব

ময়লাপুর (মাদ্রাজ) : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৪ই জুলাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ৯৬তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আশ্রমের ঠাকুর-ঘর পত্রপুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতির পর বিদ্যার্থিভবনের ছাত্রবৃন্দ উপনিষৎ আবৃত্তি করে এবং সাধুগণ গীতা, চণ্ডী ও বিষ্ণু-সহস্রনাম পাঠ করেন। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিশেষ পূজার পর দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৯৫০ জন ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পুণ্য জীবন আলোচনা করেন স্বামী পবিত্রানন্দ।

২০শে জুলাই বৈকালে 'হরিকথা'র পর দেওয়ান বাহাদুর কে. এস্. রামস্বামী শাস্ত্রীর

সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। শ্রীআর. এস. দেশিকন্ তামিল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অবতারলীলা বিবৃত করেন। তিনি বলেন: যখন নাস্তিক্যবাদের প্রাবল্যে ভারত দিশাহারা হইয়াছিল তখন আস্তিক্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, মধুরকবি আলোয়ার তাঁহার গুরু নমালওয়ার ছাড়া অন্য দেবতা জানিতেন না, শশী মহারাজও সেইরূপ গুরুগতপ্রাণ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামটি দিয়াছিলেন, তিনিও জীবনে এই নাম সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সমস্ত কর্মের মধ্যে তিনি রামকৃষ্ণময় হইয়া থাকিতেন।

ডক্টর টি এম্ পি মহাদেবন্ ইংরেজীতে বলেন: স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অন্তরে গভীর জ্ঞান ও বাহিরে অপূর্ব ভক্তি ছিল, গুরুভক্তিই অধ্যাত্ম জীবনে উন্নতিলাভের মূলে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-রচিত 'শ্রীরামানুজ-চরিত' একখানি অমূল্য গ্রন্থ। মহীশূরে প্রদত্ত দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতভাবের সামঞ্জস্য-মূলক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সংস্কৃত বক্তৃতাগুলি অতুলনীয়।

সভাপতি মহোদয় বলেন, ১৮৯৩ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বামীজীকে দর্শন করিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শাস্ত্রব্যাখ্যা-ক্লাসে ও আলোচনা-সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন।

ভিত্তিস্থাপন

নরেন্দ্রপুর—গত ২১শে জুলাই সোমবার বেলা ১১টা ৯ মিনিটে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আবাসিক ডিগ্রী কলেজ ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। মঠের সন্ন্যাসী ও বিদ্যোৎসাহী সজ্জনগণের উপস্থিতিতে শুভকার্য সুসম্পন্ন হয়।

ভ্রাতৃবরণ-উৎসব

বিদ্যামন্দির: বেলুড়—গত ১৭শে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে ভ্রাতৃবরণ-উৎসব সম্পন্ন হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ প্রমুখ প্রবীণ সন্ন্যাসিবৃন্দ, ছাত্রগণের অভিভাবক ও বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মঙ্গলারতি ও বেদপাঠের পর শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ভজনদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পূজা ও বিদ্যার্থী-হোম অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমবর্ষের ছাত্রবৃন্দ মিলিতকণ্ঠে বিদ্যার্থিব্রত-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে। বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দ মহারাজ আচার্যের আসন গ্রহণ করেন। তদনন্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রগণ প্রথমবর্ষের প্রত্যেক বিদ্যার্থীর ললাটে চন্দনতিলক দিয়া হস্তে রাখী বাঁধিয়া দেয়।

অপরাহ্নে খেলার মাঠে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রগণ এক প্রীতিমূলক ফুটবলখেলায় সমবেত হয়। প্রথমবর্ষ-দল জয়লাভ করে। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ-মিশন সারদাপীঠের আনুকূল্যে কলেজের নবনির্মিত ব্যায়ামগারের প্রেক্ষা-হলে "মীরা" (হিন্দী) চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

এতদুপলক্ষে পরদিবস রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ হলে কলেজের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে বিদ্যার্থিসম্মেলনে উদ্বোধন-সঙ্গীতান্তে অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ বিদ্যামন্দিরের আদর্শ ও বিদ্যার্থিব্রতের গম্ভীর তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রগণকে প্রকৃত মানুষ হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। সভাপতি মহারাজ বিদ্যামন্দির গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্য, মঠ মিশনের সাংস্কৃতিক আদর্শ ও ছাত্র-জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন। ছাত্রগণ-কর্তৃক সমবেত সঙ্গীতের পর সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

কার্যবিবরণী

পাটনা : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮,৮৪৭ (নূতন ৮,২৩৪) এবং ৪৪,৪১৩ (নূতন ৬,৪৫৬)।

এ বৎসর অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬৮ জন।

লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের নীচের তলায় 'সভাগৃহে'র দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ২৫.৩.৫৭ তারিখে।

লাইব্রেরীতে বর্তমানে ৩২৮৬ খানি পুস্তক আছে, অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগারে পরিণত করা হইতে পারে।

১৯৫৭খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়, বর্ষশেষে ১৩টি ছাত্র ছিল।

আশ্রমে ধর্মবিষয়ে হিন্দী ও বাংলায় নিয়মিত অধ্যাপনা হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা ও উৎসব, বুদ্ধ-জয়ন্তী, দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বলরাম-মন্দির :

সাধারণতঃ প্রতি মাসে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শনিবার নিম্নলিখিত ক্রমে গ্রন্থালোচনা হয় :

গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	„ দেবানন্দ
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ	„ জীবানন্দ

শনিবার সন্ধ্যায় নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থাও হইয়াছিল :

মাস	বিষয়	বক্তা
মার্চ :	মাতৃসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী পূর্ণানন্দ
	ভাগবত অবলম্বনে জীবের স্বধর্ম	পণ্ডিত বিশ্বপদ গোস্বামী
এপ্রিল :	শান্তির সন্ধানে	„ সম্বুদ্ধানন্দ
মে :	বিষ্ণুপ্রিয়া	ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
	শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী ওঁকারানন্দ
	বুদ্ধদেব	„ সম্বুদ্ধানন্দ ও জীবানন্দ
	উপনিষদের বাণী	„ বোধাত্মানন্দ
জুন :	পাশ্চাত্য বিজয়ে বিবেকানন্দ	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
	সংসার জীবনে উপনিষদের সার্থকতা	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
	আমাদের সভ্যতা ও ধর্ম	স্বামী যুক্তানন্দ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা-সফর

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ধর্মপিপাসু নরনারীর আহ্বানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা-সফরে বাহির হইয়া অধিকাংশ স্থলে ইংরেজীতে, কয়েকটি স্থানে বাংলায় উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন, কোথায় কি বিষয়ে বলিয়াছিলেন—তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

জানুআরি : বোম্বাই : বিশ্বশান্তি

ফেব্রুআরি : জব্বলপুর : স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজসেবা
„ ও শিক্ষা
„ ও ভারতের জাতীয়তা।

এপ্রিল : কলিকাতা : শান্তির সন্ধান (বলরাম-মন্দির)

সিউড়ী : শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম
যুবক ভারতের প্রতি স্বামীজীর বাণী।

মে : দমদম : সনাতন ধর্ম (গান ফ্যাক্টরী ক্লাব)

মে :	কলিকাতা :	ভারতে নারীর স্থান (নিবেদিতা বিদ্যালয়)
	কৃষ্ণনগর :	সনাতন ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ
	নাগতলা :	মানব-প্রকৃতি উন্নয়ন (আনন্দ আশ্রম)
	নরেন্দ্রপুর :	সমাজ-সেবা
জুন :	মালদহ :	আত্মনির্ভরতা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী
	কলিকাতা :	পাশ্চাত্য-বিজয়ে স্বামীজী (বলরাম-মন্দির)

আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার

নিউ ইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার —কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ, সহায়ক স্বামী ঋতজানন্দ। বহিরাগত বক্তারূপে ১৮ই এপ্রিল পুরী গোবর্ধন মঠের জগদ্গুরু শ্রীশংকরাচার্য ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ 'বেদান্তের সারসিদ্ধান্ত' সম্বন্ধে বলেন, সম্প্রতি তিনি আমেরিকায় ব্যাপক বক্তৃতা-সফরে সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের উপর জোর দিয়া বক্তৃতা দিতেছেন। ২৬শে মে নিউ ইয়র্কে ভারতীয় কন্সাল জেনারেল মাননীয় শ্রীগোপাল মেনন 'হিন্দুর দৃষ্টিতে জীবন-দর্শন' বিষয়ে এবং ২০শে জুন ডক্টর কে. এম. মুন্সী 'ভারতীয় কৃষ্টির বিশ্বজনীন উপাদান সম্বন্ধে বলেন।'

রবিবারের নিয়মিত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল :

মে : বুদ্ধের শান্তিবাণী, আধ্যাত্মিক জীবনের নীতি, বিফল প্রার্থনার সমস্যা, মানুষ কতটা স্বাধীন?

জুন : হিন্দুধর্মে নীতি ও ব্যক্তি, আচার্য শংকরের জীবন ও বাণী, যোগ : ইহার বিপদ ও উপকার, সিদ্ধির উপায়স্বরূপ কর্ম। নিঃশব্দতার নিরাময়শক্তি।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবার স্বামী ঋতজানন্দ গীতা এবং প্রতি শুক্রবার স্বামী নিখিলানন্দ উপনিষদ্ অধ্যাপনা করেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জয়ন্তী

আমেদাবাদ : গত ৩০শে জুন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির প্রচেষ্টায় স্থানীয় প্রেমাভাই হলে ভারতের সাংস্কৃতিক বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের অধ্যক্ষতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক কবীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সত্যনিষ্ঠা মানবপ্রেম ত্যাগ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বক্তৃতাটি বেতারকেন্দ্র হইতে প্রচারিত হয়।

গত ১লা ফেব্রুআরি স্থানীয় অখণ্ডানন্দ হলে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ন্তী উৎসবে মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী শ্রীপ্রকাশ স্বামীজীর জীবন ও উপদেশ প্রসঙ্গে ভ্রাতৃভাব ও অখণ্ড ভারতের উপর জোর দেন। উভয় উৎসবেই বিভিন্ন বক্তা অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত : গত ১৯শে জুন রথদ্বিতীয়া দিবসে বারাসতস্থ "শিবানন্দ-ধামে" শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন-অনুষ্ঠান যথোচিত ভাব-গাম্ভীর্যে সম্পন্ন হইয়াছে। দিবসব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে পূজা, চণ্ডীপাঠ, শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন, ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণ-

পুঁথিপাঠ ও পালাকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যাকালে স্বামী সংশুদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে সমবেত সাধু ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্বামী পুণ্যানন্দ ও কলিকাতা এবং স্থানীয় বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

ডিব্রুগড়ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন গত ২৯শে জুন শ্রীনন্দেশ্বর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে সম্পাদক শ্রীসুবোধ ঘোষাল উপস্থিত সভ্যগণকে সমিতির বিভিন্ন কর্মধারার পরিচয় দিতে গিয়া বলেন: মাতৃ ও শিশুমঙ্গল-কেন্দ্র, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ ও বিতরণ, ছাত্রনিবাস-পরিচালন, দুর্গত ভ্রাতা ও ভগিনীদের সময়োপযোগী যথাসাধ্য সাহায্য-দান, কৃষ্টি ও ধর্মসভার অনুষ্ঠান ছাড়া এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রে ১৪,৫৫৪ জন ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করানো হইয়াছে। স্থায়ী সভাপতি শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়ের বদান্যতায় সমিতির সংলগ্ন এক বিঘা নূতন জমিতে সম্প্রতি 'বিবেকানন্দ হল' নামে একটি বৃহৎ সভাগৃহ নির্মিত হওয়ায় বহুদিনের অভাব দূর হইয়াছে।

বঙ্গদেশে সংস্কৃতচর্চার ক্রমোন্নতি

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ৫ই—১১ই জুলাই সপ্তাহব্যাপী উৎসবের প্রথম দিনে পরিষদধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষণ দেন তাহাতে অল্প কথায় সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা ব্যক্ত করিয়া তিনি বলেন: এ শিক্ষার অনির্বাণ দীপশিখা চিরকাল ভারতবর্ষে দেদীপ্যমান। আজ তাই ভাষাতত্ত্বে, ধর্মতত্ত্বে তুলনামূলক আলোচনা যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই বিশ্ববরেণ্য মনীষিবৃন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা মর্মে মর্মে অনুভব করছেন।

তাঁর ভাষণ থেকে জানা যায়: ১৯৫৭খৃঃ সাংখ্যতীর্থ-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন জার্মান পণ্ডিত Herr Klans Camman আরও জানা যায়: বাংলা দেশের মুসলমান ছাত্রেরাও সংস্কৃত-শিক্ষায় ব্রতী, মেদিনীপুর জেলায় সেখ তাজমহল হোসেন—পর পর বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সংস্কৃত সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হচ্ছেন। সমাজের অনুন্নত স্তরেও যাতে সংস্কৃত শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করে তারও চেষ্টা চলেছে। পার্বত্য অঞ্চলেও সংস্কৃত শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত। সর্বত্র নারীসমাজেও সংস্কৃতবিদ্যার চর্চা ক্রমবর্ধমান।

এতদুপলক্ষে ১১ই জুলাই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুট হলে সন্ধ্যা ৬॥ টায় ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত 'শক্তিশারদম্' (শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবন অবলম্বনে) সংস্কৃত নাটক অভিনীত হয়। বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের ভাবগম্ভীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করে। সরল সংস্কৃত সংলাপ এবং সহজ সুন্দর অভিনয়ভঙ্গী সকলকে মুগ্ধ করে।

ব্রিটেনে কমনওয়েলথ ছাত্র

১৯৫৭-৫৮ ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পুরা সময়ের জন্য অধ্যয়নরত কিংবা গবেষণারত বৈদেশিক ছাত্রদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (১০,৮৮৯র মধ্যে ৬,৯৭১) কমনওয়েলথ হইতে আগত; ভারতবর্ষের ছাত্রসংখ্যাই এই সময় সর্বাধিক হয়—১,৫১১। মহাদেশ হিসাবে বিচার করিলে এশিয়ার ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৪,১২১। অর্থাৎ মোট বৈদেশিক ছাত্রসংখ্যার দুই-পঞ্চমাংশ। এই তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ খৃঃ অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১০,৪৩৩ এবং ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ ছিল ৯,৭২৩। বৈদেশিক ছাত্রগণ কলা, শিল্প, কারিগরী বিদ্যা, ভেষজবিজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্পর্কেই বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রাবণ সংখ্যা ৩৯০ পৃঃ 'চিকাগো সংবাদে' শেষের দিকে 'জিতেন্দ্র' স্থলে পড়িবেন 'যতীন্দ্র'।

শ্রীশ্রীদুর্গা — শিল্পী : শ্রীনিতাই চন্দ্র পাল

বীডন স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসবে পূজিত মৃন্ময়ী মূর্তির ফটো হইতে গৃহীত :
শিল্পীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

আনন্দময়ীর আগমন

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

[উদ্বোধনের প্রথম বর্ষ—১৮শ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত]

মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট স্নেহভরে ধেয়ে আসছেন।—স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভ'রে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী! কত স্নেহময়ী! প্রতি বৎসরেই আমাদিগকে দেখতে না এসে থাকতে পারেন না। বেশীদিন ছেলেকে না দেখে কি মা থাকতে পারেন? তাই মায়ের সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা না হ'লে কি এ সকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক ক'রে দিতে পারেন? মায়ের নিকট হ'তেই এত অবিরত ধারায় স্নেহ পাইয়া ত আমরা অপরকে কিঞ্চিৎ স্নেহের চোখে দেখতে শিখেছি।

মাকে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি—কিছুই আশ্চর্য নয়; মা ছেলেকে কখনই ভুলতে পারেন না। মা নিজে জানেন—ছেলে কি বস্তু। ছেলে জানে না, 'মা' কি বস্তু,—মায়ের কত গুণ, মায়ের কত মহিমা; যদি জানতুম, আজ আমাদের এরূপ অবস্থা হ'ত? মা নিজে ছেলেকে গর্ভে ধরেছেন, প্রসব করেছেন; ছেলে কি বস্তু মা খুবই জানেন। না থাকতে পেরে, এত হামেশা ছেলেকে মা দেখতে আসেন! এসে ভালবেসে, কত ভক্তি বিশ্বাস, কত ভালবাসা, উদারতা, কি অদ্ভুতরূপে অন্তরে অন্তরে শিখাইয়া যান। আহা! মায়ের সে ভালবাসার সে ক্ষমাশীলতার এক কণাও যদি পাই, মায়ের ছেলে ব'লে নিজেকে একদিনের তরেও সাধ মিটিয়ে পরিচয় দিই।

আমাদের মাকে ভাল ক'রে ঠাউরে ঠাউরে দেখেছেন? মার চোখ কত স্নেহে ভরা, জলে ছলছল; মা কত আনন্দে ভরা, কাছে দাঁড়ালেই যেন শরীর মন হৃদয় সমস্ত এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়। মা আসবেন,—কত শত লোকে কত আনন্দ অনুভব করছেন; মাকে দেখবো,—কত লোকে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে ঝেলে দেশ দেশান্তর হ'তে চলে আসছেন। মাকে প্রাণ ভ'রে পূজা ক'রব—কত লোকে কত প্রকারের দ্রব্যাদি দূর দূর দেশ হ'তে সংগ্রহ ক'রে আনছেন। আজ ঘরে মা আসবেন—কতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত নূতন নূতন বেশভূষা, কতই পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ, কত প্রকারেরই আনন্দ-উল্লাস হচ্ছে। কত লোকে ঘরের মলা, বস্ত্রের মলা, শরীরের মলা, মনের মলা সব দূর ক'রে দিচ্ছেন। মা আসবেন;—দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হচ্ছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্নেহ, দরিদ্রেরও প্রতি মায়ের তেমনি স্নেহ। ধনীরও কথা যেমন শোনেন, গরীবের কথাও মা তেমনি শোনেন। গরীব মায়ের কানে কানে ব'লে দিলেন, "মা, আবার আমার ঘরে এসো"।" আমার গরীব ছেলের আমি ছাড়া আর কেহই নাই"—ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা

আবার স্নেহভরে এসে উপস্থিত। গরীব খেতে পায় না, তত্রাচ—মায়ের এমনি কৃপা—গরীব, মায়ের সাধের পূজা—কেমন সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন।

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন, "আমাদের মা—এত ছোট মা নয়! আমাদের মা সর্বব্যাপী। তাঁর আবার আগমন, আবাহন ও বিসর্জন কি? তাঁর আর চালকলা দিয়ে পূজা কি?"

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সব রকমই হ'তে পারেন। "তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, এবং এ ছাড়া আর কি হ'তে পারেন তা কে জানে?" তিনি অনন্ত, তাঁর গুণ অনন্ত, মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও অনন্ত। তিনি ভক্তবৎসল। অপার তাঁর করুণা। যে ছেলে যেরূপে তাঁকে পেলে আনন্দ পায়, তার নিকট সেইরূপেই তিনি প্রকাশিত হন। তিনি না কৃপা ক'রে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হ'লে আমাদের সাধ্য কি, সে অনন্তের স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি। আমরা যখন বড় হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মার্জিত হবে, হৃদয় যখন দর্পণের ন্যায় নির্মল হবে—তখন মা আমাদের নিকট তাঁর অত গম্ভীর ভাব, অত উচ্চ অবাঙ্‌মনসোগোচর ভাব ধারণ করলে কিছু তত ক্ষতি হবে না। এখন আমরা অতি শিশু, এখন থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের হৃদয়ে মায়ের ছবি অঙ্কিত হ'য়ে যেতে থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব অন্তরে অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে। বাল্যকালে যা করা যায়, শোনা যায়, তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে, এ সময়ে অনন্ত অসীম ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমনকি অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না, এদিকে নানা প্রকারের পার্থিব অনিত্য ভাবসকলের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'তে লাগল, বড় হ'য়ে দেখলুম মনের ভিতর কতই আবর্জনা এসে জুটেছে—সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুজে দু'দণ্ড ধ্যান করতে গেলুম—একপ্রকার অন্ধকারই দেখি। বড় হলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস-ভক্তিতে বালকের মতো—এমনকি সেই নির্মলবুদ্ধি বালকের অপেক্ষাও অধম—রইলাম। আবার বালকের মতো 'মা' ব'লে যখন কিছু জিনিস চোখে দেখতে, হাতে স্পর্শ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অনেক কষ্টে একটু উন্নতি বোধ করতে লাগলুম। ক্রমশঃ বুঝলুম মায়ের মূর্তিপূজা দুর্বল মনকে কত সাহায্য করে, অল্পেই কত ফলপ্রদ হয়।

আমাদের মা তো খালি মাটির বা খেলাঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন বিশ্বাসও হয়েছে—আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের মা সর্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিনী, সর্বশক্তিমতী, সর্বশক্তিস্বরূপা। একটি সাধক গেয়েছিলেন:

"আমার মা যদি কালো হ'ত, তবে কি ডাকতাম এত?
যার কালো তার কালো শ্যামা, আমার সে ভাল।
যদি কালো, তবে কেন হৃদিপদ্ম করে আলো?"

আমার মাকে ডেকে, আমার মাকে পূজে আমার হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে—কি ক'রে অস্বীকার করি। মায়ের কাছে যেটা জোর ক'রে অন্তরের সহিত বলি, সেটা যে খেটে যায়—কি ক'রে তা না মানি। "জাননারে মন পরমকারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।" মা কি আমার অমনি যে সে, আমি কি অমনি যাকে তাকে মা বলি? দেব্যুপনিষৎ বলেছেন—

"সর্বে বৈ দেবা দেবী উপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবি। সাব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যঞ্চাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী·· ···।"

অর্থাৎ দেবীর নিকট গিয়া দেবতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাদেবি ?" দেবী বলিলেন, "আমি ব্রহ্মস্বরূপা, আমা হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন, আমি শূন্য অশূন্য, আনন্দ নিরানন্দ, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান, আমিই ব্রহ্মা অব্রহ্মা ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বৈদিক দেবীসূক্তে দেবী বলেছেন—

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং　চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা　ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি　যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি　শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্　মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা ॥

অর্থাৎ আমিই জগদীশ্বরী, সকলকে আমি ধন দিয়া থাকি, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি, যাবতীয় যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ, আমি সকল স্থানেই বাস করি—সকলের দেহেই অবস্থান করি, দেবগণ যেখানে যাহাই করুন, আমারই উপাসনা করেন। আমারই দ্বারা, অর্থাৎ সকলের ভিতর আমার শক্তি থাকার দরুনই সকলে আহারাদি করিতে পারে, দেখিতে শুনিতে পারে, আমারই শক্তির দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। আমাকে যিনি মানেন না তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন। আমিই কারণের কারণ। পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থে চৈতন্য এবং মায়ারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি।

বহ্বৃচোপনিষৎ প্রচার করিতেছেন—

"তস্যা এব ব্রহ্মা অজীজনৎ বিষ্ণুরজীজনৎ
রুদ্রো অজীজনৎ সর্বমজীজনৎ সর্বং শাক্তমজীজনৎ।"

অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন। এই শক্তিই নিরাকার সর্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের হিতার্থে সাকার রূপ ধারণ করিতেছেন, যথা—সামবেদীয় কেনোপনিষৎ বলিতেছেন :

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং"—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বহু-শোভমানা স্ত্রীমূর্তি ধারণ পূর্বক 'উমা হৈমবতী' রূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন।

মেধস্ ঋষি সুরথ রাজাকে বলিতেছেন :

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ সেই জগন্মূর্তিস্বরূপ সর্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই

ভক্তদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হন। যখন এইরূপ আবির্ভূত হন, তিনি নিত্য হইলেও তখন তাঁহাকে 'উৎপন্ন' অথবা 'অবতার' বলা হয়।

শিশু গর্ভধারিণীকে 'মা' ব'লে ডাকে, 'মা যে কি বস্তু' তা কি বুঝিয়া ডাকে? 'মা' ব'লে ডাকতে হয়,—ডাকে। জোর মেরে কেটে 'মা' ব'লে ডাকলে, মার কাছে গেলে, মার কোলে উঠলে একরকম শান্তি পায়, তাই 'মা' ব'লে ডাকে। যখন বড় হয় তখন 'মা যে কি বস্তু তা ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে বুঝতে পাবে। তেমনি আমরাও আগে যখন দশভুজা আনন্দময়ী 'মা' বলে ডাকতুম তখন মাকে বুঝতুম না। একটু বড় হলুম, শুনলুম সেই মা হচ্ছেন—মা দুর্গা, মা হচ্ছেন—ভগবতী ঈশ্বরী, মাকে নমো করতে হয়, পূজো করতে হয়।

আরও একটু বড় হলুম,—জানলুম—সেই দশভুজা মা আমাদেব দুঃখ মোচন করেন, বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন, অন্তরেব সহিত ডাকলে কথা শোনেন। একটু জ্ঞান হয়েছে—সেই দশভুজা দুর্গা সম্বন্ধে বুঝছি, "কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী।

সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী ॥
কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী ॥"

আরও যখন বড়ো হব তখন হয়তো এও উপলব্ধি করতে পারব—

"যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়।
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়, সকলি মা তুমি ত্রিলোকব্যাপিনী ॥"

আমাদের মা, অপরেব চোখে মাটির মা হ'তে পাবে, ভক্তেব চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিদঘনমূর্তি। মা সর্বব্যাপী,—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতবে থাকতে পারেন, গাছের ভিতবে, ইটকাঠেব ভিতরে এমনকি ক্ষুদ্র বালুকণাব ভিতরেও থাকতে পারেন, আর আমার মা আমার হাতের গড়া এত সাধের প্রতিমায থাকবেন না—এ কখনই হ'তে পারে না। আমাব যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে, আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি, প্রাণেব সহিত মার কাছে কেঁদে বলি, মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছটফট করে, মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি, প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়—নিশ্চয় বলছি—মা আসবেনই আসবেন, এই মাটির প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে ব'লব সেইখানেই আসবেন। যেমন ক'রে হ'লে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পাববে, তেমনি ক'রেই তিনি আমার কাছে আসবেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন, মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্তবৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী। ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আসবেনই আসবেন, কোনও সন্দেহ নেই। মা সর্বশক্তিমতী, আমার ক্ষুদ্র আধারের মতো হয়েই মা আমার নিকট প্রকাশিত হবেনই হবেন।

"এস মা এস মা ও হৃদয়রমা পরাণ-পুতলি গো।
হৃদয়-আসনে একবার হও মা আসীন নিরখি তোমায় গো ॥
জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে, আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে,
(তাত জান গো)
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ' তাহে আনন্দময়ী গো ॥"

স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

স্বামী রাঘবানন্দ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ

[শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) বাল্যকাল হইতেই কঠোর তপস্বী ; গীতা ও বেদান্তের ভাবগুলি দৈনন্দিন জীবনে কার্যে পরিণত করাই ছিল তাঁহার সাধনা। ১৮৯৯ খৃঃ দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, 'হরি ভাই, ঠাকুরের কাজে তিলে তিলে আমি আমার জীবন দিচ্ছি, তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে না ?' গুরুভ্রাতার এই আবেদনে স্বামী তুরীয়ানন্দ নির্জন সাধনা স্থগিত রাখিয়া স্বামীজীর সহিত ইংলণ্ড হইয়া আমেরিকার উপস্থিত হন। 'বেদান্তের জীবন্ত মূর্তি'—তুরীয়ানন্দের এই পরিচয় স্বামীজী দিয়াছিলেন আমেরিকাবাসীদের নিকট। বেদান্ত-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বামীজীরই নির্দেশে আমেরিকায় প্রথম নির্জন সাধনার কেন্দ্র কালিফর্নিয়ার 'শান্তি-আশ্রম' স্থাপ স্বামী তুরীয়ানন্দের এক অপূর্ব কীর্তি। পাশ্চাত্যে বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ করিয়া ১৯০২ খৃঃ তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং উত্তরভারতের নানাস্থানে নির্জন তপস্যায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। পরে কয়েক বৎসর আলমোড়া শহরে অবস্থান করিয়া নিগূঢ় আধ্যাত্মিক আলোচনা ও স্বীয় জীবনাদর্শ দ্বারা বহু জিজ্ঞাসু ভক্ত ও আশ্রমস্থ সন্ন্যাসিগণকে ধর্মজীবনে অনুপ্রাণিত করিতেন। যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের পক্ষে সহায়ক হইবে ভাবিয়া আমরা তাঁহার অমূল্য কথাগুলির কতকাংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছি। উঃ সঃ]

স্থান : মোহনলাল সাহার বাটী, চিক্কাপেটা, আলমোড়া

৭ই জুন, ১৯১৫

স্বামী শিবানন্দ—হাজার সমাধি ও ধ্যান হোক না, তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধটা যেন থাকে ; এটা যেন না যায়, আর তা না হলে দেহ যাক্।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—এ বলতেই হবে, 'দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽহং জীববুদ্ধ্যা অংশোঽহং আত্ম-বুদ্ধ্যা সোঽহম্।' যে মানুষ গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালের পায়ে পড়ে, সে ভগবানকে মানবে না ?

'কথামৃত' পাঠ হইতেছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আহা! দক্ষিণেশ্বর যেন কৈলাস ছিল। সকাল থেকে একটা পর্যন্ত ঠাকুরের কাছে অনবরত ভগবৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে, আর লোক বসে আছে। Atmosphere-এ (আবহাওয়াতে) ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। যা ফষ্টি নষ্টি তাও তাই নিয়ে। প্রসঙ্গ-শেষে তাঁর সমাধি হচ্ছে। তিনি কেবল খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করতেন অল্প সময়ের জন্য। তা ছাড়া সব সময় ভগবৎপ্রসঙ্গ। সন্ধ্যাবেলা কালীঘরে গিয়ে মাকে দর্শন ও ব্যজন করতেন ও খুব নেশার মত (ভাবস্থ) হয়ে টলতে টলতে ফিরে আসতেন। যারা সাধন ভজন ক'রত তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'হ্যাঁ রে, সকাল সন্ধ্যা কি একটু নেশার মত হয় ?' রাত্রে তাঁর ঘুম তো ভারি! একটু পরেই উঠে পড়তেন। যারা তাঁর ঘরে থাকত, তাদের 'ওরে এত ঘুম কিরে ? ওঠ্, ধ্যান কর্' বলে উঠিয়ে দিতেন। তারপর একটু শুতেন, পরে ভোর হলেই উঠে পড়তেন ও মধুরকণ্ঠে ভগবানের নাম করতেন। তখন আর সকলে উঠে জপ-ধ্যান করতে লেগে যেত। তিনি মাঝে মাঝে কাউকে একটু সোজা ক'রে বা উঁচু ক'রে বসিয়ে দিতেন।

১০ই জুন

আত্মার সাক্ষাৎ কর। তার জন্য you have to ascend the highest peak of renunciation (ত্যাগের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে হবে)।

১১ই জুন

চিত্তকে সব জিনিষ থেকে উপরত করা কি সহজ ব্যাপার ? এটি বীরের কাজ। বাইরের

জিনিষ তো খালি মনের ভিতর প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, এবং জোর ক'রে তোমায় পেড়ে ফেলতে চাইছে। মনের ভিতর কত রয়েছে—স্তবকের পর স্তবক। বাইরে চোখ কান বুজলে কি হবে?

১৩ই জুন

স্বামী তুরীয়ানন্দ—(বেড়িয়ে এসে) অমুক 'রাজ-যোগ' পড়ে তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায়। আমরা ওতে প্রাণ বের করেছি। ছেলেবেলা থেকে তো ওই করছি। তবু কই চিত্তশুদ্ধি হ'ল? কই রাগ-দ্বেষাদি গেল? তব দাসঃ—দাসস্য দাসঃ কুরু মাং প্রভো। অভিমান কি ভাল? ভারি খারাপ। 'অভিমানং সুরাপানং', জ্ঞান হারিয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, নিচু জায়গায় জল জমে, সব গুণ 'সুনীচ' জনে প্রকাশ পায়। 'শুষ্কং কাষ্ঠং মূর্খবং বিদ্যতে, ন তু নমতে।' অহংকার ঘাড় উঁচু ক'রে রাখে। যেটা steel (ইস্পাত)-এর মত elastic (নমনীয়) অথচ ভাঙবে না, সেটাই strength (শক্তি)। সেই রকম যে compromising (আপোষী), অনেক লোকের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারে, সেই strong (শক্তিমান)। তাঁর (ঈশ্বরের) হয়ে গেলে আর কি ভয়? স্বামীজী বলতেন, 'যদি জন্মালে, একটা দাগ রেখে যাও।' বরাহনগর মঠে বলেছিলেন, 'দেখবি আমাদের নাম historyতে (ইতিহাসে) পর্যন্ত উঠবে। যোগীন স্বামী প্রভৃতি ঠাট্টা করতে লাগলেন। স্বামীজী বললেন, 'যা শালারা, পরে দেখবি। আমি বেদান্ত সকলকে convince করাতে (বুঝিয়ে দিতে) পারি। তোরা না শুনিস, আমি হাড়ী পাড়ায় গিয়ে শুনাব।'

প্রচার করতে হ'লে কিছু দেওয়া চাই। এ তো ক্লাশ পড়ানো বা বই পড়ানো নয় যে পড়িয়ে যাবে, কিছু দিতে হবে না। সেইজন্য আগে কিছু জমাতে হবে, পরে প্রচার। 'আমি কিছু রিপু দমন করেছি' বলে অহংকার করতে নেই। তখনই তারা জেগে উঠবে। বলতে হয়, 'হে ভগবান্, আমায় ওসব থেকে রক্ষা কর।'

'ধ্যান-বিঘ্নানি' চারটি। যথা—লয়, বিক্ষেপ, কাষায় ও রসাস্বাদ। লয়ে' মন enters into (প্রবেশ করে) তামস—ঘুমিয়ে পড়ে, consciousness (বাহ্যজ্ঞান) থাকে না। বেশীর ভাগ লোকই এতে আটকে যায়। 'বিক্ষেপে' মন নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়ে। 'কাষায়ে' ধ্যান করা তিক্ত বোধ হয়, ভাল লাগে না। তখনও persist (জেদ) করতে হয়, আবার মনকে ধ্যানে লাগাতে হয়। 'রসাস্বাদে' কোন ভগবৎরূপে আনন্দ বোধ হয়, মন আর উপরে উঠতে পারে না। শম হচ্ছে equilibrium, balance of mind (মনের সাম্যাবস্থা)। 'শমং প্রাপ্য ন চালয়েৎ।' যতদিন শরীর থাকে ততদিন রিপু থাকে। তবে তাঁর কৃপায় তারা দেবে থাকে, মাথা তুলতে পারে না।

১৫ই জুন

খালি কাজ করলে কি হবে? ভাব ব্যতীত ও তো মুটেগিরি, drudgery (মুটেগিরি)-তে অভাব 'স্নেহের'—যার দ্বারা মাখবে। উপনিষদে আছে, শুক্র অনুস্যূত—একেবারে গুম হয়ে রয়েছে।

১৬ই জুন

'কথামৃত' পড়া হ'ল। এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন: কাজের দ্বারা যে তাঁকে পাওয়া যায়, তা নয়। তবে কাজ করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাঁর জন্য ব্যাকুলতা আসে। সেই ব্যাকুলতা হ'লে তাঁর কৃপা হয়। তখন তাঁর দর্শন হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—অমনি একটু পড়লে, একটু ধ্যান করলে কি তাঁকে পাওয়া যায়? তাঁর জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই, প্রাণ আটুপাটু করবে। ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, 'দেখ

আমার ব্যাকুলতা ছিল ব'লে মা সব জোগাড় ক'রে দিলেন। এই কালীবাড়ী ও মথুরবাবু—জুটে গেল। এখানে (হৃদয়ে) ব্যাকুলতা থাকাই আসল। তাহ'লে সব জুটে যায়।' ভক্তি ছাড়া উপায় কই ?

স্বামী শিবানন্দ—আবার কি ? তাঁর পাদ-পদ্ম ধ্যান করতে বসলে ইন্দ্রিয় সব অন্তর্মুখী হ'যে যায়, মন গিয়ে তাঁতে তন্ময় হয়। রাম-প্রসাদের কথা, ভক্তি সবার মূল। রামপ্রসাদ ঠাকুরের ideal (আদর্শ)। ঠাকুর বলেছিলেন, 'রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিবিনে ?' ঠাকুরের এবার শিক্ষাই হচ্ছে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

২০শে জুন

স্বামী তুরীয়ানন্দ—(স্বামী শিবানন্দের প্রতি) 'যখন হরি বলতে ধারা বইবে, এমন দিন কবে বা হবে।' আপনার কি কান্না পায় ? কি অবস্থা বলুন দেখি, হরিনাম করতেই অশ্রু পড়বে।

স্বামী শিবানন্দ--ঠাকুরের কাছে যখন যেতাম খুব কান্না পেত। একদিন রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে পোস্তার উপর দিয়ে (বকুলতলার কাছে) খুব খানিকটা কাঁদলুম। ঠাকুর এদিকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন, তারক কোথায় গেল। তার-পর যখন তাঁর কাছে ফিরে গেলাম, ঠাকুর বললেন, 'ব'স্। দেখ্, শ্রীভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়। আর জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়। তাঁর কাছে কাঁদা খুব ভাল।'

—আর একদিন পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান ক'রছি, খুব জমেছে। এমন সময়ে ঠাকুর ঝাউতলার দিক থেকে আসছেন। যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন, অমনি হু হু ক'রে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, আর আমার বুকের ভিতর সুড়সুড় ক'রে উঠল এবং আমার এমনি কাঁপুনি হ'ল যে, তা আর থামে না। ঠাকুর জনান্তিকে বলছেন, কান্না এমনি এমনি নয়, এ একটা ভাব হয়েছে। একটু পরে তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁর ঘরে বসলাম, তিনি কিছু খেতে দিলেন। কুণ্ডলিনী জাগরণ টাগরণ তাঁর হাতের ভিতর ছিল, না ছুঁয়ে কেবল কাছে দাঁড়িয়েই ক'রে দিতেন।

২১শে জুন

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামীজী যেখানে 'আমি' বলছেন, সেখানে সেই তাঁর সঙ্গে এক হ'য়ে বলেছেন। মানুষ নিজে সুখী হবার জন্য কত চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি না কৃপা করলে কি কিছু হয় ? Freedom (স্বাধীনতা) এক আছে, তাঁর সঙ্গে এক হ'য়ে থাকা। আর এক প্রকার হচ্ছে, তাঁর শরণাগত হ'য়ে থাকা। তা থেকে আলাদা হ'য়ে Freedom of will (ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য) কখনও নেই। আমি 'যন্ত্র'—এইটার উপর বিশ্বাস নিজেকে ডুবাবার একটি উপায়। আমি সব জানি, এ ভাবটা বড় খারাপ। আত্ম-বিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় মানে সেই পরমাত্মার উপর বিশ্বাস। 'আমি যা আছি তা আছি। আমি যা বুঝেছি, আমায় কেটে ফেল, মেরে ফেল, তবুও কিছু বদলাচ্ছি না।'—নিজেকে এইরূপ important (বড) ভাবা খুব খারাপ।

—কথার ঠিক ঠিক জবাব দেবে। যে কথাটা 'হাঁ' বলবে সেটা 'হাঁ' হ'য়ে যাবে। একটার জন্য তিন চারটে কথা বলবে কেন ? সাধুর সরলতা থাকবে, সাধু বালকের মত হ'য়ে যাবে।

২২শে জুন

ভালবাসার শক্তি চাই। আমরা ছেলেবেলায় কি ভালবাসতুম—উন্মত্তের ন্যায়। ভাইদের প্রতি এত ভালবাসা ছিল যে, সন্ন্যাসী হ'য়ে তাদের ছাড়তে হবে বলে কাঁদতুম। তারপর ঠাকুর সব পটপট ক'রে কেটে দিলেন। ঠাকুর শ—কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুই কাকে ভালবাসিস্ ?' সে বললে, 'মহাশয়, আমি কাউকে ভাল-বাসিনে।' ঠাকুর বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'দূর। শুকনো শালা।'

ঈশ্বর আছেন কিনা, এ সন্দেহ আমার কখনও হয় নাই।

কথাপ্রসঙ্গে

শারদীয়া

আবার আশ্বিন আসিযাছে। দিনেব নীল আকাশে শুভ্র কাশেব মতো মেঘেব সাবি, ও যেন আনন্দেব আভাস! বাত্রিব স্বচ্ছ আকাশে নীহারিকাময় ছায়াপথ, সে যেন অনন্তের বহস্যময় ইঙ্গিত! দুঃখদ্বন্দ্বপূর্ণ স্বার্থসংঘাতজীর্ণ জৈব জীবন হইতে তাহাবা যেন মানুষকে উর্ধ্বতর এক জীবনেব দিকে আহ্বান কবে, মৃত্তিকাবদ্ধ দৃষ্টিকে অবাবিত আকাশেব দিকে আকর্ষণ কবে!

কি আছে সেখানে? কালচক্র ঘুরিযা চলিযাছে—জ্যোতিশ্চক্রেব অবিবাম ঘূর্ণনে প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি অণুপবমাণুব—গ্রহনক্ষত্রেব পবিবর্তন সাধন কবিযা। মানুষের মনও কি সেই পবিবর্তন দ্বাবা প্রভাবিত হইতেছে না? তথাপি চিৎ-কণা মানব-মন জড় জগতেব নিত্যনিযত পবিবর্তনের মধ্যে সন্ধান করিযাছে এক নিত্য অপবিবর্তনীয সত্তাব, খুঁজিযাছে কালেবও কলযিত্রী এক অপবাজেয শক্তিব, সে চাহিযাছে এক অভয় আশ্বাস, এক নিশ্চিন্ত আশ্রয! তাহাবই আভাস সে পাইযাছে আশ্বিনেব আকাশে!

কালচক্র ঘুবিযা আসে—বৎসবান্তে দেখা দেয ছাযাপথ, জ্যোতির্ময দেবলোকের পথ—ঐ পথেই উজ্জ্বল আলোকেব রথেই দেবতাশক্তিব আবির্ভাব হইবে মর্ত্যলোকে! বর্ষাব বারিধারা পৃথিবীকে সিক্ত কবিযা শস্যপূর্ণ কবিয়াছে, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয। মহাজননী বিশ্বপ্রকৃতির এই শস্য-সমৃদ্ধি সকলে সমভাবে ভোগ কবিতে পাবে না, স্বার্থপর ভোগপরায়ণ দানবপ্রকৃতি মানব সবল দুর্বল ভ্রাতাকে বঞ্চিত কবিযা নিজেবই আধিপত্য-বিস্তারে প্রযাসী! ইহাও প্রকৃতিব নিয়ম।

তাইতো পবাপ্রকৃতিব আবির্ভাব—সামঞ্জস্য বিধানেব জন্য! স্বীয় পবাক্রমে অসুব-বীর্য নির্জিত কবিয়া সকল সন্তানের সুখশান্তি বিধান করিয়া অন্তর্যামিনী অন্তর্হিতা হন! দুর্বৃত্তের দুষ্ট প্রবৃত্তি দমন করিয়া, স্বীয় সন্তানের অসুবভাব বিনষ্ট করিয়া, তাহাকে দেবভাবে পরিপূর্ণ কবিয়া ভয়ার্ত সন্তানদের তিনি ভবিষ্যতেব প্রতিশ্রুতি দিয়া যান:

> ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
> তদা তদাঽবতীর্যাহং করিষ্যাম্যবিসংক্ষয়ম্॥
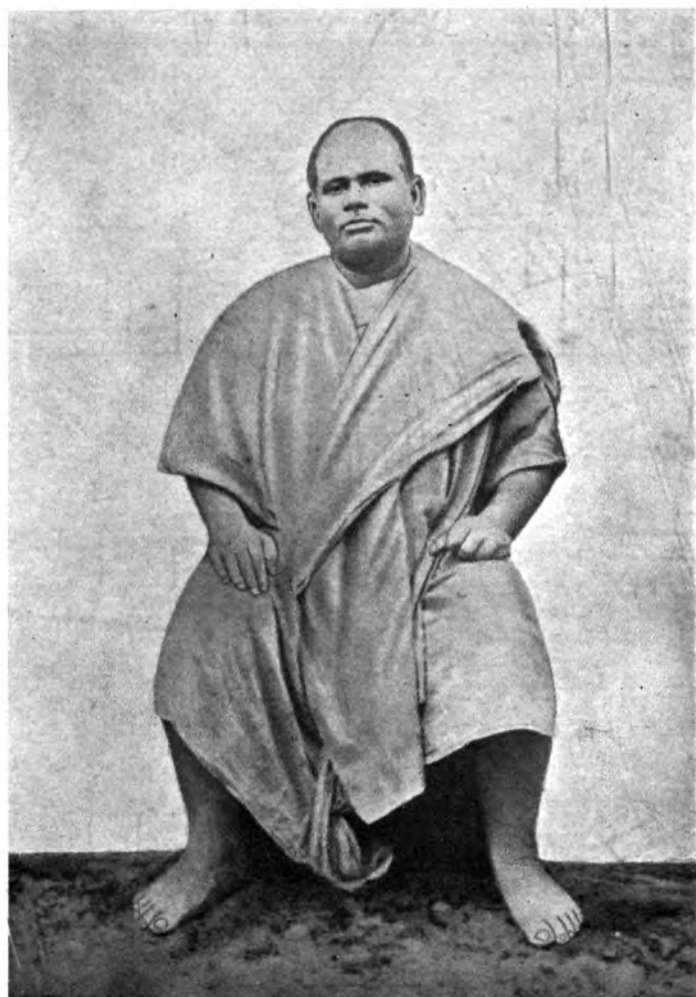
স্বামী ত্রিগুণাতীত

উদ্বোধনের ষাট বৎসর

স্বামী জীবানন্দ

সেই শুভ দিনটি অতীতের গর্ভে বিলীন হলেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে—যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। দু'এক বৎসর নয়—দীর্ঘ ষাট বৎসর কালস্রোতে ব'য়ে গেছে সেই পুণ্য দিনটি থেকে। এই সময়ের মধ্যে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে—একটি নিদ্রিত মহাজাতি জেগে উঠেছে, পরাধীন ভারত শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে; জাতির মোহনিদ্রা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি, পরানুকরণস্পৃহা পরমুখাপেক্ষা এখনও দূর হয়নি, ভারতবাসী এখনও ত্যাগ ও পবিত্রতা সহায়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন ক'রে সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠতে পারেনি। জাতির ইতিহাসে ষাটটি বছর কিছুই নয়, কাল অনন্ত। অন্তরের মানুষটিকে জাগাবার এবং ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার পবিত্র দায়িত্ব বহন ক'রে 'উদ্বোধন' যেমন চলেছে অতীতে—ভবিষ্যতেও তেমনি চলবে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ও উপনিষদের সার্বভৌম উদার ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা 'যত মত তত পথ', শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের যথার্থ সমন্বয় এবং মানুষের সর্ববিধ ও সর্বাধিক কল্যাণ কিভাবে হ'তে পারে, —এই সব নব ভাব প্রচারের জন্য বাংলা ভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেন। উদ্বোধনের প্রস্তাবনায় তিনি লিখে গেছেন :

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্ত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।

স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন সত্ত্বগুণের নামে ঘোর তামসিকতা, পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিন্দিত মূর্খতা, বৈরাগ্যের নামে অকর্মণ্যতার এবং তপস্যার নামে নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয়দান আদৌ কল্যাণকর নয়, তাই তিনি অকুণ্ঠচিত্তে পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শ থেকে "উদ্যম, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, আত্মনির্ভরতা, অটল ধৈর্য, কার্যকারিতা, একতাবন্ধন, উন্নতিতৃষ্ণা···শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ" গ্রহণের কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে তাঁর বিশ্বাস ছিল—ভারতীয় ধ্যান-জ্ঞান-প্রসূত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্ত্য জগতের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিতেছে।

কেবল মোক্ষমার্গ প্রদর্শনের জন্য স্বামীজী 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠা করেননি, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই ছিল তাঁর নবযুগ-ধর্মের মূল নীতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র ক'রে কোন পৃথক্ সমাজ বা ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে তিনি আসেননি। ভারতের উদার সার্বভৌম অধ্যাত্ম-সাধনাকে বহু শতাব্দীর বিকৃতি থেকে মুক্ত ক'রে অদ্বৈতবেদান্তের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং জাতীয় জীবনে ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের ভয়াবহ বৈষম্য দূর করবার জন্য বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বগুলি দৈনন্দিন কর্মজীবনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এই সকল ভাবধারা যথাযথ প্রণালীতে প্রবর্তনের জন্যই 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামীজীর ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে 'উদ্বোধন' বর্তমান যুগের জাগরণের বাণী-প্রচারের যন্ত্ররূপে নিজস্ব প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারি (বাংলা ১লা মাঘ, ১৩০৫)। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের সম্পাদনায় পাক্ষিক পত্ররূপে উদ্বোধনের প্রথম আত্মপ্রকাশ। পাক্ষিক উদ্বোধনের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩২ (ডিমাই), বার্ষিক মূল্য ছিল মাত্র ২৲। প্রতি বৎসর সাধারণতঃ গ্রীষ্মাবকাশের সময় একমাস 'উদ্বোধন' প্রকাশ বন্ধ থাকত, অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে পাক্ষিক উদ্বোধনের দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হ'ত না, মোট ২২টি সংখ্যা বেরুত। উদ্বোধনের প্রথম কার্যালয় কম্বুলিয়াটোলার গিরীন্দ্রলাল বসাকের বাটীতে স্থাপিত হয়, ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা থেকে ৪র্থ বর্ষের ১৮শ সংখ্যা পর্যন্ত এখান থেকেই প্রকাশিত হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজ ছিলেন সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক।

স্বামীজী ত্রিগুণাতীত মহারাজের উপর 'উদ্বোধন প্রেস' ও 'উদ্বোধন-পত্রিকার' গুরু দায়িত্ব-ভার অর্পণ করেন। স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য ক'রে কঠোর তপস্যার ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজ স্বামীজীর ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন এই পত্রিকায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে। উদ্বোধনের মুদ্রণ, সম্পাদনা ও পরিচালনার জন্য তাঁকে অহোরাত্র চিন্তা করতে হ'ত, খাটতে হ'ত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কতদিন তিনি অর্ধাহারে, কখনও বা অনাহারে থেকে পত্রিকা ও প্রেসের কাজ দেখাশুনা করতেন। কেবল পরিদর্শক হিসাবে নয়, কম্পোজিটর ও প্রেস-ম্যানের সন্ধান করা, প্রেসের উপকরণ সংগ্রহ করা, লেখক ও প্রবন্ধাদির ব্যবস্থা করা—প্রথম অবস্থায় সব কাজ তাঁকে একা করতে হ'ত। কর্মীদের কেহ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করাও ছিল তাঁর কাজ। এত কাজের মধ্যেও তিনি সর্বদা প্রফুল্ল থাকতেন।

প্রথম বর্ষের শেষ সংখ্যায় বার্ষিক সূচীপত্রের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অনুকৃতি অনেক পরিচয় বহন ক'রে আনে:

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

বাঙ্গালা-পাক্ষিক-পত্র

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান,
কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ
প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক।

প্রথম বর্ষ

১৩০৫-মাঘ হইতে ১৩০৬-পৌষ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—২৲

কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনস্থ
উদ্বোধন প্রেস হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ	লেখক
উদ্বোধনের প্রস্তাবনা	স্বামী বিবেকানন্দ
রাজযোগ	স্বামী বিবেকানন্দ
[মূল ইংরেজীর অনুবাদ	স্বামী শুদ্ধানন্দ]
পরমহংসদেবের উপদেশ	স্বামী ব্রহ্মানন্দ
শ্রীশ্রীমুকুন্দমালা-স্তোত্রম্ [অনুবাদ]	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন সভায় বক্তৃতার সারাংশ	স্বামী সারদানন্দ

উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'লে স্বামীজী ও তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কথোপকথন আমাদের এক নতুন আশার ইঙ্গিত দিয়ে যায়ঃ

স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত ক'রে পরিহাসচ্ছলে) "উদ্বন্ধন" দেখেছিস্?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী। এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাংলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) কল্লে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verbএর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। ··

শিষ্য। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করেছেন—তা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে কচ্ছিস্, ঠাকুরের এই সব সন্ন্যাসী সন্তান কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে ব'সে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক্ হবে। এদের কাছে কাজ কি ক'রে করতে হয় তা শেখ্। ·· * * *

শিষ্য। মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বার হবে, আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী। তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হ'লে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে, রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনা মূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে। * * *

স্বামীজী। 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (সকল বিষয় গড়ে তোলবার আদর্শ) দিতে হবে। Negative thought (নেই-নই-ভাব) মানুষকে weak (নির্জীব) ক'রে দেয়। Positive idea (জীবন গড়ার ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হ'য়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প—সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয় কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে কর'ত পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে।···বেদ-বেদান্তের উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে।

* * *

উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠাকালে পত্রিকা-মুদ্রণের জন্য 'উদ্বোধন প্রেস' নামে উদ্বোধনের একটি নিজস্ব প্রেসের ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসটি গিরীন্দ্র বসাকের বাড়ীতেই স্থাপিত হয়েছিল। প্রেসের কম্পোজিটর প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বস্তিতে বস্তিতে অনুসন্ধান করতে হ'ত—এই দেখে গিরিশচন্দ্র স্বামীজীকে প্রেসটি বিক্রয় করবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রেস পরিচালনায় নানা অসুবিধার জন্য স্বামীজী থাকতেই এটি বিক্রয় করা হয়।

ত্রিগুণাতীত মহারাজের ঐকান্তিক যত্ন, অপরিসীম কর্তব্যনিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে 'উদ্বোধন' নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। মফস্বলের ভক্তমহলে ও কলিকাতায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে

উদ্বোধনের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর সাধনা 'উদ্বোধনে'র ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ত্রিগুণাতীত মহারাজ শুধু গঠনশীল কর্মী ছিলেন না, তাঁর চিন্তার নূতনত্ব এবং প্রকাশভঙ্গী ও ভাষার নূতনত্ব লক্ষণীয়। 'জাতীয়ত্ববোধ' সম্বন্ধে (২য় বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা) উদ্বোধনে লিখছেন :

পাশ্চাত্ত্য দেহতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, জীবন ধারণের—তিনটি একান্ত আবশ্যকীয় বস্তু, যথা, রেসপিরেশন (অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ক্রিয়া), নর্ভাস সিস্‌টেম অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলী, এবং ব্লড সার্কুলেশন অর্থাৎ শোণিতপ্রবাহ। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে পরস্পর সুন্দর সম্বন্ধ। একটির অভাবে অপর দুইটি অনর্থক, এবং মৃত্যু অনিবার্য। জীবনধারণ করিতে হইলে ভারতের পক্ষে তদ্রূপ তিনটি ব্যাপারের প্রধান প্রয়োজন,—আত্মীয়তা, একতা ও সম্মিলন। একতা—যেন ভারতের প্রাণবায়ু, আত্মীয়তা—যেন ইহার স্নায়ুমণ্ডলী, এবং পরস্পর সম্মিলন—যেন ভারতের শোণিত প্রবাহ! এই তিনটির মধ্যে কোন একটির বিশেষ ক্ষতি হইলেই জানিবেন—ভারতের জীবন সংশয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বার্তাবাহী উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ থেকেই 'উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী'র সূচনা হয়। পাক্ষিক উদ্বোধনের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অনুসন্ধান করলে আমরা পাব—তখনকার চিন্তা ও চেষ্টার এক দানাবাঁধা রূপ।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় আমরা দেখেছি স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রস্তাবনা', স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'পরমহংসদেবের উপদেশ', রামকৃষ্ণ মিশন সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সারাংশ, স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় স্বামীজীর প্রসিদ্ধ কবিতা 'সখার প্রতি', তৃতীয় সংখ্যায় তাঁর লিখিত 'জ্ঞানার্জন', চতুর্থ সংখ্যা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরামানুজচরিত', পঞ্চম সংখ্যায় স্বামীজীর 'ম্যাকস্‌মুলর-কৃত—রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি', ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত', নবম সংখ্যা থেকে শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', দশম সংখ্যা থেকে স্বামীজীর 'ভাববার কথা', পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে স্বামীজীর 'বিলাত-যাত্রীর পত্র', পরে যা 'পরিব্রাজক' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত। প্রথম বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় কলিকাতা প্লেগ রিলিফ ও মুর্শিদাবাদ অনাথাশ্রমের কার্য-বিবরণী বাহির হয়।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় স্বামীজীর কবিতা 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'বাংলা ভাষা' এবং দশম সংখ্যায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর মূল বাংলা রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা,' 'বর্তমান ভারত', পরিব্রাজক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পর বাঙালী পাঠক নূতন প্রেরণা লাভ করেছিল।

তৃতীয় বর্ষের একাদশ সংখ্যা থেকে উদ্বোধনের প্রচ্ছদপটে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সীল-মোহর (emblem) মুদ্রিত হ'তে থাকে, এটি স্বামীজীরই ধ্যান-মানসে উদ্‌ভাসিত। চিত্রের তরঙ্গায়িত জলরাশি নিষ্কাম কর্মের, কমলগুলি ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্য জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্প-পরিবেষ্টনীটি যোগ এবং জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব চিত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ : কর্ম, ভক্তি জ্ঞান ও যোগের সহিত সম্মিলিত হলেই পরমাত্মা লাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন, তেমনি জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্ম এই সাধন-প্রণালীচতুষ্টয়ের সমবায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও ছিলেন। সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র গঠনের জন্য এই সাধনপ্রণালীই একমাত্র উপায়। স্বামীজীর জীবন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনালোকে উদ্ভাসিত, তিনি এই সব যোগের সমবেত সাধনতত্ত্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার করে-

ছিলেন এবং ঐ সাধনার আচার ও প্রচারই তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্য ব'লে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

উপনিষদের ওজঃপ্রদায়িনী মহাবাণী 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' —ওঠ জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নিকট গিয়ে জ্ঞান লাভ কর—এই বাণীকেই স্বামীজী নবজাগরণের মহামন্ত্ররূপে দিয়ে যান। এই মন্ত্রটিকেই উদ্বোধনের মর্মবাণীরূপে স্বামীজী উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় ও প্রচ্ছদপটে মুদ্রাঙ্কিত ক'রে দেন. তদবধি উদ্বোধনের প্রতিটি সংখ্যা এই বাণী বক্ষে ধারণ ক'রে আসছে।

পরবর্তীকালের প্রবন্ধাবলীতে বিষয়ের নূতনতায় ও লেখকদেব ব্যক্তিত্বে 'উদ্বোধন' ক্রমশই সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায় স্বামীজীব 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ,' একাদশ সংখ্যায় ত্রিগুণাতীতানন্দের 'ব্রহ্মচর্য' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পঞ্চমবর্ষে স্বামী সারদানন্দেব 'ভারতে শক্তিপূজা' ও 'গীতাতত্ত্ব' (বিবেকানন্দ সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী), স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'গুরু', স্বামী শিবানন্দের 'সাধন-প্রাণায়াম,' ষষ্ঠ বর্ষে স্বামী অখণ্ডানন্দেব 'তিব্বতে তিন বৎসর' প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর নব নব ভাব-বিকীরণে বঙ্গ-গগন তখন আলোকিত। সপ্তম বর্ষ থেকে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীব 'স্বামিশিষ্য-সংবাদ' শুধু উল্লেখযোগ্য রচনা নয়, যুগান্তরকারী ভাববন্যা। স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, এঁদের সুচিন্তিত সুলিখিত অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধে উদ্বোধন অলংকৃত হয়েছে। খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায়ই লিখতেন।

পাক্ষিক উদ্বোধনে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ-কৃত গীতাব শংকরভাষ্যেব বঙ্গানুবাদ ও পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন ও মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী প্রমুখ পণ্ডিতগণেব পাণিনীয় মহাভাষ্যের বঙ্গানুবাদ আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায, কিরণ চন্দ্র দত্ত, চারুচন্দ্র বসু প্রভৃতি নিযমিতভাবে লিখিতেন।

* * *

১৩০৯ সালের কার্তিকমাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির কর্মভার গ্রহণ ক'রে আমেরিকা চলে গেলে স্বামী শুদ্ধানন্দের উপর পাক্ষিক উদ্বোধনের ভার পড়ে, প্রথম থেকেই তিনি উদ্বোধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা নির্বাচন অনুবাদ, প্রুফ দেখা, প্রেসের তত্ত্বাবধান—সকল কার্যেই তিনি ত্রিগুণাতীত মহারাজকে সাহায্য করতেন।

আজকাল স্বামীজীর যে সব বাংলা বই আমরা পড়ি, তাঁর অধিকাংশই স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী বক্তৃতা ও পত্রাবলীর এরূপ সুন্দর অনুবাদ তিনি করেছেন যে, পাঠের সময় মনে হয় যেন স্বামীজীর মৌলিক রচনাই পড়ছি। স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ যেমন সরল তেমনি মূলের মতই তেজোগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক। শব্দবিন্যাসের কী অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। স্বামীজীর রচিত 'Song of the Sannyasin' ইংরেজী কবিতার অনুবাদ 'সন্ন্যাসীর গীতি' স্বামীজীর মূল লেখা বলেই মনে হয়। স্বামীজীর প্রেরণা অনুবাদের প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট। বাংলায় স্বামীজীর ভাবপ্রচারে স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ-সাহিত্য

বিশেষ সহায়তা করেছে। অসংখ্য নরনারী এই অনুবাদ পাঠ করেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন। এই অনুবাদ-সাহিত্য বঙ্গ-সাহিত্যে যুগপ্রবর্তনের সূচনা করেছিল।

স্বদেশীযুগে তরুণের দল দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের হাতে দেখা যেত গীতা ও 'পত্রাবলী'। স্বামীজীর 'Indian lectures from Colombo to Almora'-র বঙ্গানুবাদ 'ভারতে বিবেকানন্দ' তাদের কম অনুপ্রাণিত করেনি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'উদ্বোধন' গ্রন্থাবলীর চাহিদাও খুব বেড়ে যায় এবং 'উদ্বোধনের' গ্রন্থ-প্রকাশনাও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রেই যেন স্বামী শুদ্ধানন্দ এই কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। একবার সারারাত্রি 'উদ্বোধনে'র প্রুফ দেখে তিনি বলেছিলেন, 'আমার মনে হচ্ছে—যেন সারা রাত কালীপূজা করেছি।' নিষ্কাম কর্ম যে চিত্তশুদ্ধির কারণ—এটি তিনি জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর কর্মপ্রণালীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাও বুঝতে পারতেন, এই শুদ্ধ চিত্তের সরল আনন্দ। তিনি যেন ছিলেন বাংলা ভাষায় স্বামীজীর ভাবপ্রচারের জন্য স্বামীজীরই চিহ্নিত সেবক।

স্বামীজীর লেখার অনুবাদ ছাড়াও স্বামী শুদ্ধানন্দের মৌলিক প্রবন্ধ ও কবিতা প্রথম থেকেই উদ্বোধনের পৃষ্ঠা অলংকৃত করত। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁর সারগর্ভ মৌলিক রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, বিবেক বৈরাগ্য, আদর্শ ও বাস্তব, মস্তিষ্ক ও শিক্ষা, বৈরাগ্য ও উন্মত্ততা, আসল ও নকল, সমাজ সংস্কার, উদাসীর ধর্মসূত্র, প্রাণের কথা, দীনতা সাধন বিষয়, আমাদের কর্তব্য, জগৎ সত্য কি মিথ্যা? ধর্মবিরোধ ভঞ্জনের কয়েকটি উপায়, স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি, ধর্মের প্রাণ, বেদান্ত ও ভক্তি, সাধনভজন ও জীবসেবা, মানুষ, আত্মবোধানুসন্ধান ও মায়াবাদ, ইষ্টনিষ্ঠা তপস্যা, 'আমি'র সন্ধানে, অদ্বৈতবাদ ও পূজা অর্চা, মানবসমাজে ধর্মের প্রয়োজন, আশ্বাসবাণী, বিভূতচিন্তা, জীবনসমস্যা ও তাহার সমাধান, আদর্শ কর্মজীবন।

বাংলা সাহিত্যে শুদ্ধানন্দ মহারাজের দান অতুলনীয়। বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষা তাঁর নিকট চির ঋণী। তাঁর মৌলিক রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লে এক অমূল্য গ্রন্থ হবে, যা পথহারা মানুষকে চিরদিন পথ দেখাবে।

* * *

পূর্বে সম্পাদকের নাম-মুদ্রণ বাধ্যতামূলক ছিল না, গিরীন্দ্রলাল বসাক ৮ম বর্ষের ১৮শ সংখ্যা (কার্তিক, ১৩১৩) পর্যন্ত প্রকাশক ছিলেন। ১৩১৩ সনের প্রায় মধ্যভাগে কলিকাতা বাগবাজার ৩০ নং বোসপাড়া লেনে উদ্বোধন-কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। ৮ম বর্ষের ১৯শ সংখ্যা থেকে (১৩১৩-অগ্রহায়ণ) ব্রহ্মচারী অমূল্যচরণ (বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ) কর্তৃক ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, 'সারদা প্রেস' হ'তে এবং ৯ম বর্ষ (১৩১৩-মাঘ) থেকে কিশোরীমোহন রায় কর্তৃক ৯৩নং দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট 'সারদা প্রেস' হ'তে পাক্ষিক উদ্বোধন প্রকাশিত হয়।

দশম বর্ষ (১৩১৪-মাঘ) থেকে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। মাসিক উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক হন স্বামী শুদ্ধানন্দ, উদ্বোধনের নব রূপায়ণের মূলে ছিল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম। উদ্বোধন-কার্যাধ্যক্ষ স্বামী সত্যকাম 'হাওড়া বি আই প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে দশম বর্ষের উদ্বোধন প্রকাশ করেন।

এই বৎসর থেকে 'উদ্বোধন কার্যালয়' বাগবাজার ১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন, [পরে ১নং মুখার্জি লেন—বর্তমানে ১নং উদ্বোধন লেন] নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয়। খড়ের ব্যবসায়ী কেদারচন্দ্র দাস (খোড়ো-কেদার) গোপাল নিয়োগী লেনে তিন কাঠা চার ছটাক জমি ১৯০৬ খৃঃ ১০ জুলাই বেলুড় মঠকে দান করেন। কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অবস্থানের জন্য এই স্থানে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ একটি ছোট পাকা বাড়ী নির্মাণ করান। এই বাড়ীর দোতলাই শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির। এখানে মায়ের সঙ্গিনী গোলাপ-মা ঠাকুরের পূজা ও মায়ের সেবা নিয়ে থাকতেন এবং যোগীন-মা নিত্য এসে সব দেখাশোনা করতেন। এই গৃহেই ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধি হয়। ভক্তবৃন্দের নিকট এই ভবনটি 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' ব'লে পরিচিত। মায়ের বাড়ীর নিচের তলায় উদ্বোধন-কার্যালয় অবস্থিত।

উদ্বোধন মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর আয়তনও বৃদ্ধি করা হয়—ডিমাই ৬৪ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য পূর্ববৎই নির্ধারিত থাকে। দশম বর্ষের একাদশ সংখ্যা থেকে স্বামী সারদানন্দের অমূল্য গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' প্রকাশিত হ'তে থাকে। ভক্তবৃন্দ বহু দিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, এখন তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না। একাদশ বর্ষ (১৩১৫, মাঘ) হ'তে 'উদ্বোধন' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ 'লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'-এ স্বামী সত্যকাম কর্তৃক এবং চতুর্দশ বর্ষ (১৩১৮, মাঘ) হ'তে ব্রহ্মচারী কপিল (স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ) কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৩১৪ সন থেকে ১৩১৮ পর্যন্ত পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ উদ্বোধনের সম্পাদনা করেন। ১৩১৮ থেকে ১৩২৩ পর্যন্ত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সম্পাদক ছিলেন। 'ভারতের সাধনা' তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা-রচনা। ভারতের ধর্মজীবন-সম্বন্ধে তাঁর লেখা কালোত্তীর্ণ সাহিত্যে পরিগণিত হবার দাবি রাখে। আমরা সামান্য একটু উদ্ধৃত করলাম :

> পরমহংসদেবের আবির্ভাবে আজ যে মহা সমন্বয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া পরমার্থ-সাধনার আদর্শগুলি পূর্ণাঙ্গ হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছে। তুমি জ্ঞানমার্গী, ভক্তিমার্গী বা কর্মমার্গী হও,—তুমি অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও,—তুমি হিন্দু মুসলমান বা খ্রীশ্চান হও,—তুমি বৈষ্ণব হও বা শাক্ত হও,—তুমি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হও না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার মধ্য দিয়া তুমি অপর সমস্ত সম্প্রদায়ের সহিত অবিচ্ছেদ্য মিলন-সূত্রে আবদ্ধ।

১৩২০ সন থেকে ১৩২২ সন পর্যন্ত ব্রহ্মচারী নির্মল (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ) এবং ১৩২২ থেকে ১৩২৬ পর্যন্ত ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য (স্বামী দয়ানন্দ) ও ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) মাসিক উদ্বোধনের সম্পাদক ছিলেন।

২১শ বর্ষ পর্যন্ত উদ্বোধন 'লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এ' এবং ২২শ বর্ষ (১৩২৬, মাঘ) থেকে 'ইউনিয়ন প্রেস'-এ এবং এই বর্ষের সপ্তম সংখ্যা থেকে 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস'-এ মুদ্রিত হয়।

১৩২৬ থেকে ১৩২৯ শ্রাবণ সংখ্যা পর্যন্ত স্বামী বাসুদেবানন্দ একা সম্পাদকের কার্য পরিচালনা করেন। ২৩ বর্ষের (১৩২৭-মাঘ) প্রথম সংখ্যা থেকে উদ্বোধনের বার্ষিক মূল্য ধার্য করা হয় ২৷৷০ টাকা। ২৪শ বর্ষের অষ্টম সংখ্যা (১৩২৯-ভাদ্র), থেকে স্বামী সারদানন্দের নাম যুগ্ম-সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হ'তে থাকে। এই সময় থেকে সম্পাদকের নাম-মুদ্রণ আইনতঃ বাধ্যতামূলক হয়।

*　　*　　*

১৩৩৪ সনের ১লা ভাদ্র পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের 'উদ্বোধন' ভবনে মহাসমাধি লাভের পর স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ যুগ্ম-সম্পাদক হন। ৩১শ বর্ষের অষ্টম সংখ্যা (১৩৩৬, ভাদ্র) হ'তে স্বামী আত্মবোধানন্দ উদ্বোধনের কার্যাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ৩১ বর্ষের নবম সংখ্যা থেকে উদ্বোধন 'আর্ট প্রেস' হতে এবং ৩২শ বর্ষ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং' হতে মুদ্রিত হয়।

উদ্বোধনের সহিত স্বামী বাসুদেবানন্দের সুদীর্ঘ সংযোগ এই পত্রিকার ইতিহাসে স্মরণযোগ্য। ১৩২৬ সন থেকে ১৩৪২ সনের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ষোল বৎসর উদ্বোধন সম্পাদনা-কার্যে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। সম্পাদনাকালে এবং পরেও ধর্ম-দর্শন-মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ দ্বারা তিনি উদ্বোধনকে অলংকৃত করেছিলেন।

৩৮ বর্ষের (১৩৪২) ফাল্গুন সংখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যারূপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হ'তে আরম্ভ ক'রে বহু প্রসিদ্ধ মনীষীর কবিতা প্রবন্ধ কবিতা ও চিত্রে সুসজ্জিত হয়ে বৃহদাকার বাহির হয়। পাঠকগণের চাহিদার জন্য এই সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৪৩-আশ্বিন থেকে স্বামী সুন্দরানন্দ উদ্বোধনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনাকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা প্রভৃতি বিচিত্র পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। ৩৮ বর্ষ (১৩৪৩ সন) থেকে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উদ্বোধনের সচিত্র শারদীয়া সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধবিরতির পর থেকে উদ্বোধনের শারদীয়া সংখ্যাগুলি যথারীতি আত্মপ্রকাশ ক'রে পাঠকগণের আনন্দ বর্ধন করছে।

কাগজ ও মুদ্রাব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪৯শ বর্ষে (১৩৫৩-মাঘ) 'উদ্বোধনে'র মূল্য ৩৲ এবং পর বৎসর ৪৲ নির্ধারিত হয়। ৫৬ বর্ষ থেকে ৫৲ চলছে। প্রতি সংখ্যা রয়াল অক্টাভো - ৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। ১৩৫৪ সনে ৫০তম বর্ষে উদ্বোধনের সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। ৩১ ফর্মার সুবৃহৎ এই পত্রিকাখানি বহু খ্যাতনামা লেখকের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী ও বহু চিত্রে সুসমৃদ্ধ হয়ে পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করেছিল।

৫৪তম বর্ষ (১৩৫৯) বৈশাখ থেকে ৫৮তম বর্ষ (১৩৬২) পৌষ পর্যন্ত উদ্বোধনের সম্পাদনা করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। তাঁর সম্পাদনাকালে বহু সুলেখক সাহিত্যিকগণের লেখা প্রকাশিত হ'তে থাকে, এবং নূতন লেখকগণও উদ্বোধনে লেখা প্রকাশ করার সুযোগ পেতে থাকেন। কথা-প্রসঙ্গে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ আলোচনা এই সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জয়ন্তী-সংখ্যা সমৃদ্ধাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৬১ সনে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমেরিকার কাজের জন্য নির্বাচিত হ'লে ৫৯তম বর্ষ (১৩৬২-মাঘ) থেকে সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হয় বর্তমান সম্পাদকের উপর। কয়েক বৎসর 'উদ্বোধন' ২০এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট, এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স থেকে মুদ্রিত হয় এবং বর্তমানে মুদ্রণকার্য হচ্ছে ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এস আই প্রেসে।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বাংলা ভাষার অন্যতম প্রাচীন মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ষাট বৎসর অতিক্রম করতে চলেছে। ষাট বৎসরে 'উদ্বোধন' জাতির জাগরণে কি করেছে তা অনুধ্যানের বিষয়। এখনও তার অনেক কাজ বাকী। যে পর্যন্ত না জাতির মধ্য থেকে সর্বপ্রকার হীনতা নীচতা সংকীর্ণতা স্বার্থপরতা তিরোহিত হচ্ছে সে পর্যন্ত 'উদ্বোধনে'র ঘুম ভাঙানোর গান থামবে না—সে শান্ত সংযত বলিষ্ঠ ভাষায় মহাজাগরণের বাণী—ত্যাগ ও সেবার বাণী বহন ক'রে চলবে, আত্মার সঙ্গীতে জাতীয় জীবন মুখরিত ক'রে সে চলতে থাকবে সম্মুখে প্রসারিত অনন্তের পথে।

অরুণোদয়*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

সে অনেক দিনের কথা—১৯০৩ সাল, আমার তখন বয়স ১৯।২০ বছর। হাবড়ায় থাকতাম, পড়াশোনার দিকে খুব ঝোঁক ছিল, তাই প্রায়ই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যেতাম—পড়তে। তখনকার দিনে স্ট্র্যাণ্ড রোড আর জেনারেল পোষ্ট অফিসের রাস্তার মোড়ের ওপর 'মেটকাফ্ হলে' ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, সেখানকার অধ্যক্ষ তখন ছিলেন ম্যাক্ফারলেন সাহেব, পড়াশোনার ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ খাতির হয়েছিল। সেটা বোধ হয় গ্রীষ্মকাল, একদিন অনেকক্ষণ বই পড়তে পড়তে মাথাটা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই একটু পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছি টানা-পাখাটার নীচে, পায়ের শব্দে যাতে পাঠকদের কোন অসুবিধা না হয়—সে জন্য মেঝেয় মাদুর পাতা, আপন মনেই ঘুরছি, চারিদিকে বই আর বই। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একদিকে আমার নজর পড়তেই কি জানি কেন মনটা আমার চঞ্চল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি সেই শেলফটায় নির্দিষ্ট বইটার দিকে এগিয়ে গেলাম। মাঝারি আকারের একটি বই, নাম—'The Life & Sayings of Ramakrishna Paramahansa', লেখক—Maxmuller দেখবামাত্র ঠিক ক'রে ফেললাম, ঐ বইটি আমার চাই। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বেয়ারাকে স্লিপ দিয়ে বইটি আনিয়ে নিলাম। মন স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেল দুপাতা ওল্টাতেই, এই-ই আমি খুঁজছিলুম এতো দিন ধরে। প্রথম দর্শনেই বইখানি আমার মন-প্রাণ জয় ক'রে নিল। জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সব পড়ে রইল একদিকে, শুধু ঐ বইটি নিয়ে পরমানন্দে দিন কাটতে লাগল। ম্যাক্সমুলার সাহেবই আমায় পথ দেখালেন নূতন যুগতীর্থের—'Dakshineswar is situated about four miles north of Calcutta' কি অদ্ভুত ব্যাপার। কোন্ হাজার হাজার মাইল দূরের লেখক আমাকে পথ দেখালেন, জানিয়ে দিলেন, আমার ঘরের পাশের ঠাকুরটিকে॥ ব্যস্, রাস্তা জেনে গেলাম। ঐ শুভ মুহূর্তটির প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ আমার জীবনের শুভ মুহূর্তের উদয় হ'ল, দৈব, কাল ও পুরুষকারের একত্র মিলন হ'ল। নূতন পথের সন্ধান পেয়ে প্রাণে দারুণ উত্তেজনা ও আনন্দ নিয়ে ১৯০৩ খৃঃ একদিন শেয়ারের গাড়ীতে বরাহনগর পর্যন্ত এসে, সেখান থেকে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পৌঁছলাম।

ভূ-স্বর্গ দক্ষিণেশ্বর। দেখলাম প্রত্যক্ষ জাগ্রত সব দেবতা, ঠাকুর সব জাগিয়ে রেখে গিয়েছেন কিনা। মধ্যে দেবী ভবতারিণীর অপূর্ব বিগ্রহ—জাগ্রত জীবন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের বহু লীলার সাক্ষি-স্বরূপা। একপাশে রাধা-শ্যামের যুগলবিগ্রহ—সামনে দ্বাদশ শিবের মন্দির, তারপর চাঁদনীর ঘাট। চাতালে ঢুকবার ডানদিকে এককোণে ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতিমাখানো ঘরখানি দিব্য ভাবে ভরপুর॥ খুব ভালো লাগল। ওদিকে সাধন-কুটিরের পাশে পঞ্চবটী, বেলতলা—ঠাকুরের অপূর্ব সাধনার সাক্ষ্য দিচ্ছে—মৌন শান্তভাবে। সমস্ত মন আমার ভরে গেল আনন্দে। তখন অল্প-লোকই যেত সেখানে, একবার ঐ হাওয়ার মধ্যে ঢুকলে মন বদলে যেত।

* ২.৫.৫৮ তারিখে সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর ধর্মপ্রসঙ্গ—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত।

এই ভাবে ক্রমশঃ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন ক'রে যেতে শুরু করলাম দক্ষিণেশ্বরে, ক্রমে রামলালদাদার সঙ্গে আলাপ হওয়ায়, রাত্রেও কোন কোন দিন থেকে যেতাম সেখানে। তিনি ঠাকুরের ঘরে মশারি খাটিয়ে দিতেন। দিনে ও রাত্রে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করি, আর রাত্রে পঞ্চবটীতে প্রায় ১১টা পর্যন্ত জপধ্যান ক'রে এসে ঠাকুরের ঘরে শুয়ে থাকি। তার কিছু আগে 'কথামৃত'-কার 'শ্রীম'র সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আমার দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার কথা শুনে একদিন বললেন, "দেখ, তুমি দক্ষিণেশ্বরে প্রসাদী অন্ন দু-বেলা গ্রহণ করো কেন? ঐ প্রসাদ যারা সাধু ফকির ভিখারী—তাঁদেরই জন্যে। তুমি কেন ওঁদের অন্নের ভাগ নিচ্ছ? এক কাজ করো —যেদিন রাত্রে থাকবে, সেদিন চার পয়সাতেই পেট ভরাতে পারো—এই দু পয়সার চিঁড়ে, এক পয়সার চিনি আর এক পয়সার পাতি নেবু, এই নিয়ে যাবে। একটা কাপড়ে চিঁড়ে বেঁধে গঙ্গার জলে ভিজিয়ে নেবে—ফুলে অনেকটা হবে, তখন তার সঙ্গে চিনি আর নেবুর রস দিয়ে আনন্দ ক'রে খাবে।" তাঁর এই কথা শোনার পর থেকে সেই মতো করতে লাগলাম। ছোট থেকেই খাওয়ার দিকে আমার কোন লোভ ছিল না। মঠে ভয়ে যেতাম না—সেখানে সব বড় বড় সাধুরা রয়েছেন, আমার মত সামান্য লোক সেখানে গিয়ে কি করবে? এই ভাবতাম।

* * *

রাত্রে প্রায়ই ১১টা পর্যন্ত পঞ্চবটীতে বসে থাকতাম—একদিন রাত্রে একটা শব্দ পেয়ে চোখ খুলে দেখি কি ভয়ানক এক বিরাট দীর্ঘকায় লোক আমার সামনে। আমি বাঁধানো বেদীর উপরে আর লোকটি নীচে—কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বাক্। আমার তখন অল্প বয়স, ঐ দৃশ্য দেখে আমি তো ভয়ে কাঠ! গলা শুকিয়ে এসেছে—যাই হোক, অনেক কষ্টে প্রশ্ন করলাম—কে আপনি? উত্তর এল—'বেলতলা থেকে আসছি'। উত্তর শুনে আমি তো হতভম্ব। আবার প্রশ্ন করলাম, রোজই কি আসেন?—'না, বিশেষ বিশেষ দিনে আসি—গঙ্গা পেরিয়ে আসি—বালি থেকে। বেলতলা তন্ত্রসাধনার যোগ্য ক্ষেত্র বিবেচনায়—সেখানে জপধ্যান ক'রে নৌকায় ফিরে যাই।' —যাক্ বাঁচা গেল। উত্তর শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

* * *

আমার মনে পড়ে মথুরবাবুর আমলের এক ৭৬।৭৭ বছরের বুড়ো মালীর কথা। আমি যখন তাকে দেখি তখন সে একখানি খুরপি নিয়ে ঠাকুরের ঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত পথটি পরিষ্কার করছে—একমনে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে শরীর, কিন্তু লক্ষ্য করতাম ঐ কাজটিতে তার অদ্ভুত ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ঝাউতলা পর্যন্ত পথটি প্রতিদিন পরিষ্কার করা চাই। আমার খুব কৌতূহল হ'ল—তাকে রোজ ঐ এক কাজ করতে দেখে। একদিন থাকতে না পেরে তাকে প্রশ্ন ক'রে ফেললাম। "তুমি ঠাকুরকে দেখেছ?" সে খুরপিটি রেখে দিয়ে অবাক্ হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "তাঁরই আদেশ পালন করছি, তিনি বলেছেন—কত লোক আসবে, তাই তাদের পথ পরিষ্কার করছি।"—এর বেশী আর সে কিছু বলতে রাজী হ'ল না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ি করাতে ২।৩ দিন পর বলতে শুরু করলে এক অপূর্ব ঘটনা—একদিন গ্রীষ্ম-কালে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না—বাগানে বেড়াচ্ছি। দেখলাম এতো রাত্রে বেলতলার দিক থেকে আলো আসছে কেন? খুব কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—তিনি বেলতলায় সমাধিস্থ। আর তাঁর সারা শরীর থেকে একটা কি রকম আলোর মতো বেরোচ্ছে। দূর থেকে ঐ চেহারা দেখে আমি তো ভয়ে অস্থির! সেখানে আর থাকতে

না পেবে পালিয়ে এলাম। পরদিন সকালে চুপিচুপি তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে তার পা জড়িয়ে ধরে পড়ে রইলাম, তিনি বলে উঠলেন, "কি রে! ব্যাপাব কি? তোর এত ভক্তি কেন?" আমি কিছু ভেবে না পেয়ে বলেছিলাম, "আমায় কৃপা করবেন"। তিনি আমাকে তুলে ধরে বললেন, 'কাল যে মূর্তি দেখেছিস্, সেই মূর্তি ধ্যান কর্। আর রাস্তাটি পরিষ্কার করবি, কত ভক্ত আসবে।" নির্দেশ মতো সেই মূর্তি ধ্যান করি, আব রাস্তাটি সাফ করি।

এতদিন পরে ঐ কথা মনে হয়ে কি আনন্দ হচ্ছে—মালীব কি ভাগ্য দেখ। ঠাকুব কি অপূর্ব জ্যোতির্ময রূপ দেখালেন সামান্য এক মালীকে। কাকে যে তিনি তুলবেন, তা কি কেউ বুঝতে পারে? মালীর মতো পা জড়িয়ে ধরে পড়তে হবে। একমাত্র শরণাগতি ছাড়া উপায় নেই। এই বিচিত্র সংসারে তিনি—'ভ্রামযন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া'—সকলের হৃদযে থেকে সকলকে ঘোরাচ্ছেন, এর থেকে উদ্ধারেব পথও তিনিই বলে দিচ্ছেন: 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।'—এই শরণাগতি চাই। ছোট ছেলেদের মতো পূর্ণ নির্ভরতা চাই। ঐ বালকভাবটিই আসল জিনিস। আমরা আমাদের 'আমি'টিকে নিয়ে বড়ই বিপন্ন। তাই ঠাকুব বলতেন, 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' মন্দিরের দুয়াবে একটা মোটা গুঁড়ি পড়ে আছে। ঐটা সরাতে না পারলে মন্দিবে ঢোকা যায় না। ঐ মোটা গুঁড়িটাই আমিত্বেব অহংকার। উচুঁ জমিতে জল জমে না, তাই জমিকে নীচু করতে হয়। তখনই প্রেম-ভক্তি-অনুরাগ জল তাতে জমে,—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। তাঁকে পেতে হ'লে অহংকার ছাড়তে হবে। পূর্ণ নির্ভরতা চাই, সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে তাঁর চরণে। আমার বলতে আর কিছু নেই, সব 'তোমার' ক'রে দিতে হবে। ঐ মালীর মতোই অভয় চরণে শরণ নিতে হবে।

আবার একদিন রামলাল দাদার কাছে রসিক মেথরের কথা শুনলাম, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরকে তিনি জানতেন, ঠাকুরও তাঁকে চিনতেন। দূর থেকে কুশল প্রশ্ন বিনিময় হ'ত। পূর্বজন্মের কত শুভ সংস্কার ছিল রসিকের। সমাজের বিধানে কাছে যেতে পারতেন না রসিক,—জানতেন তিনি। ঠাকুরের কাছে কত ভক্ত আসছে কত নৃত্য-গীত হচ্ছে। কিন্তু নিজ অদৃষ্টের দোষে নীচ জাতের জন্য রসিক সে বসে বঞ্চিত। এই ভেবে তিনি নিজের ভাগ্যকে ধিকার দিতেন। বুকে আঘাত করতেন দুঃখে। ভেতরে চলত দারুণ ঝড, মনে তোলপাড়, ঐ আনন্দেব এক কণাও কি তিনি পাবেন না? এই বকম কিছুদিন চলার পর ঠিক ক'রে ফেললেন, দেখা তিনি করবেনই। অবশেষে সেই শুভদিন এসে উপস্থিত। ঠাকুর ঝাউতলা থেকে ফিরছেন, পেছনে গাড়ু-হাতে রামলাল-দা। ঠাকুরের ঘর আর রাস্তার মাঝে এক ফুলের ঝোপেব আড়ালে বসিক নিজেকে লুকিয়ে বেখেছে। সামনে ঠাকুর আসতেই রসিক ছুটে এসে ঠাকুবের দুটি পা জড়িয়ে ধরে মাটিতে পড়ে অসহায়ভাবে বললেন, 'আমার কি হবে?' এই মুহূর্তটিব জন্যই সে যেন সারা জীবন অপেক্ষা করছিল। গীতায় ভগবান বলেছিলেন, 'অহং ত্বা' সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'। ঠাকুর বললেন, 'কে রসিক।' বলেই তিনি সেই অবস্থায়ই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। রামলালদাদা বলেছেন, ঐভাবে ঠাকুর এক ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন, আর রসিক প্রেমাশ্রু দিয়ে তাঁর চরণ ভিজিয়ে দিয়ে-ছিলেন। একঘণ্টা পরে ঠাকুরের সমাধি ভাঙবার পর তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে রসিকের মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, "যা তোকে সকল বন্ধন থেকে

মুক্ত করলাম। যে কটা দিন বাঁচবি, পরমানন্দে থাকবি।" এই না শুনে রসিক দেড়হাত এক লাফ দিয়ে উঠেছিল।

সব সাধনার ইতি হ'ল। গত জন্মের সব শেষ হ'ল—'মামেকং শরণং ব্রজ'—এই তার ফল। রসিককে আমি দেখিনি, কিন্তু ঐ মালীটি —যাকে আমি দেখি, সে রসিককে দেখেছিল।

এই ভাবে প্রায় দুবছর আড়াই বছর যাতায়াত করছি দক্ষিণেশ্বরে, হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক এসে রামলালদাদাকে প্রশ্ন করলেন, 'মা কেমন আছেন?'—প্রশ্নকর্তা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা। সেটা ১৯০৫ সাল। প্রশ্নটা কানে আসতেই মনে হ'ল—তাইতো মা তো এখনও আছেন। মা-নাম শোনা মাত্র ব্যাকুল হয়ে উঠলাম যেন। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ।' ভাবলাম মার শ্রীচরণ দর্শন করা চাই। একবার তিনি মাথায় হাত বুললে সব হয়ে যাবে। মার নাম শোনামাত্র যেন নূতন জীবন পেলাম। পথের নিশানা পেলাম রামলালদাদার কাছ থেকে—তারপর চললো প্রস্তুতি মাতৃচরণ-দর্শনের।

'ভ্রান্তিরূপেণ'

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

[যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা]

"কুহকের লীলা সবি, এই বিশ্বে সবি মায়াময়,
দারা পুত্র পরিবার সবে পর, কেহ কারো নয়।"
জ্ঞানিগণ এই বাণী কতবারই করেছে ঘোষণা,
"মুক্তি নাই না ত্যজিলে এই মুগ্ধ সংসার-বাসনা।"
পালি তবু গৃহিধর্ম, ভুলে যাই তাঁহাদের বাণী।
ভালবাসা স্নেহপ্রেমে মায়াঘোরে সত্য বলি জানি।
ভুলে যাই শোক দুঃখ, ভুলে যাই বাদ প্রতিবাদ।

অতীতেরে ভুলে যাই, ভুলে যাই নিজ অপরাধ।
কে কবে হরিল শান্তি, কেবা কবে মর্মে দিল ব্যথা।
কে করিল প্রবঞ্চনা, ভুলে যাই এই সব কথা।
কাল লোকক্ষয়কৃৎ আয়ু হরি চলে পলে পলে।
ভুলে যাই ভবিষ্যৎ, অর্ধ অঙ্গ মৃত্যুর কবলে।
ভুলিনিক মাগো,
সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে মহামায়া চিরদিন জাগো।

মার্কিন মুলুকে বিবেকানন্দ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রোমাঁ রলাঁ (Romain Rolland) স্বামী বিবেকানন্দকে তুলনা করেছেন ঈগলের সঙ্গে, আর তাঁর গুরুদেবকে তুলনা করেছেন রাজহংসের সঙ্গে। স্বামীজীর লেখা, বক্তৃতা, জীবনকাহিনী পড়লে ঈগলের কথাই মনে পড়ে যায়। মুক্তপক্ষ আকাশচারী বিরাট বিহঙ্গম, যার আনন্দ অবারিত গগনের মুক্তিতে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল দিকেই যার অবাধ গতি এবং সকল দিকই যার আপন, যার কাছে বন্ধনের মতো দুঃখ আর নেই। কোন একটা বাঁধা-ধরা মতবাদের আতপ্ত কোটরের মধ্যে আবদ্ধ থাকা তাঁর স্বভাবের একান্ত বিরোধী ছিল। সকলকে একই ধর্ম-বিশ্বাসের আওতায় আনতে হবে, নইলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে—এই গোঁড়ামি থেকে তাঁর মন ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের স্বভাবের বৈচিত্র্যে, রুচির স্বাতন্ত্র্যে। তিনি বলতেন, সবাই এক পথে চলবে, একই মত পোষণ করবে, একজনের আচরণের সঙ্গে আর একজনের আচরণের কোনই পার্থক্য থাকবে না—এ রকমের একঘেয়েমি বরদাস্ত করতে প্রকৃতি একান্ত নারাজ,—'because oneness of mental temperament all over the world be death,' [কারণ সারা পৃথিবীতে মনোভাবের একরূপতা মৃত্যুরই নামান্তর]—ইংরেজী কথাগুলি স্বামীজীর। স্বামীজীর মতো এমন স্বাধীনচেতা পুরুষ দুর্লভ, দুর্লভ কেন—সুদুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঈগলের সঙ্গে এখানে তাঁর মিল আছে।

ঈগলের মতো শক্তিমানও ছিলেন তিনি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা মানুষটা আগুনের শিখার মতো জ্বলছে, ভাষায় বারুদের গন্ধ। স্বামীজী ক্ষাত্রতেজের জ্বলন্ত প্রতীক। ঠাকুর যাদের বলতেন 'ভ্যাদভেদে চিঁড়ের ফলার' স্বামীজী ছিলেন তাদের একদম বিপরীত। With him life and battle was synonymous [তাঁর কাছে জীবন ও যুদ্ধ ছিল সমার্থক]—কথাটা রোমাঁ রলাঁর। লাখ কথার এক কথা। ঠাকুরের কাছে নিঃশেষে আত্ম-নিবেদন করতে ছটি বছর লেগেছিল তাঁর। প্রথম সাক্ষাতেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে করযোড়ে বলেছিলেন, 'আমি জানি, প্রভো, তুমি সেই পুরাতন ঋষি—এবার জন্ম নিয়েছ পৃথিবীর দুঃখ মোচন করতে।' স্বামীজীর মনে হ'ল—ঠাকুর পাগল। কিন্তু পাগল মানুষটি যখন সকলের মাঝে গিয়ে বসলেন, তখন তাঁর আচরণের মধ্যে পাগলামির লেশমাত্র নেই। একটু আগেই নরেন্দ্রনাথের সামনে হাত জোড় ক'রে যিনি কাঁদছিলেন তাঁর মুখচ্ছবিতে কী অনির্বচনীয় প্রশান্তি। ভরসা পেয়ে স্বামীজী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'মশাই, আপনি ভগবান দেখেছেন।' উত্তর এল, 'হাঁ দেখেছি তাঁকে—এই তোকে যেমন দেখছি। তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে আলাপও করা যায়, এই তোর সঙ্গে যেমন আলাপ করছি।' সংশয়ের পর সংশয় জয় ক'রে ক'রে অবশেষে নরেন্দ্র দীর্ঘ ছ'বছর পরে রামকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিজেকে উজাড় ক'রে দিলেন। সংশয়ের অন্ধকারের পারে গিয়ে যখন তিনি পৌঁছলেন, ঠাকুরকে ঠিক ঠিক চিনতে পারলেন, মনের মধ্যে সন্দেহের আর লেশমাত্র রইল না—আহা,

কী অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর বিশ্বাসের গভীরতা এবং দৃঢ়তা।—"যে এই মহাসন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। * * * তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন—এই ভজন, এই সাধন—এই সিদ্ধি।" যে বিশ্বাস প'ড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো অনায়াসলভ্য তার কি সত্যই খুব বেশী মূল্য আছে? নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সংশয়ের সাগরের পর সাগর পার হ'য়ে হ'য়ে যেখানে একটা স্থির বিশ্বাসের কূলে গিয়ে আমরা পৌঁছাই, সেখানে সেই বিশ্বাস আর ভাঙবার নয়, টলবার নয়। সে তখন পর্বতের মতোই সুদৃঢ়।

আমেরিকায় স্বামীজীর অদ্ভুত সাফল্যের পিছনেও তাঁর কি অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। এখানেও স্বামীজীর সেই যোদ্ধার তেজোদৃপ্ত মূর্তি। মিশনারী সাহেবরা এই তরুণ সন্ন্যাসীর উদ্দীপ্ত ভাষণ শুনে ঘাবড়ে গেছে। ভারতবর্ষ বর্বরের দেশ, ভারতবাসীর ধর্ম বর্বরের ধর্ম, ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিছক বর্বরতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নেই—এ কথা প্রতিপন্ন করবার জন্যে চারিদিকে শুরু হ'ল মিথ্যার এবং অর্ধ সত্যের নিষ্ঠুর অভিযান। আমেরিকার কাগজে কাগজে কুৎসা রটনার সে কী ধুম। ভয় পেলে মানুষের আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না। সে তখন কী বলে, আর কী না বলে। আমেরিকার পাদ্রী সাহেবদের পায়ের তলা থেকে তখন মাটি সরতে আরম্ভ করেছে। স্বামীজীর এক একটা বক্তৃতা যেন এক একটা বোমার বিস্ফোরণ। মিথ্যার সমস্ত শক্তি ধূলিসাৎ হ'য়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। ভারতবাসীরা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে, সেই অন্ধকার থেকে তাদের আলোতে নিয়ে যাবার বিপুল দায়িত্বভার বহন ক'রে চলেছে ইংরেজ-জাত। ইংরেজ-শাসনের কল্যাণে ভারতবর্ষ সভ্যতার আলো দেখতে পাচ্ছে। এই ধরনের মিথ্যার বিরুদ্ধে স্বামীজীর রসনায় সত্যবাক্য ঝ'লে উঠেছে খরখড়্গের মতো। বলছেন মার্কিন-মুলুকের একটি ঘরোয়া বৈঠকে: You look about India, what has the Hindoo left? Wonderful temples, everywhere What has the Mohammedan left? Beautiful palaces What will the Englishman leave behind? Nothing but mounds of broken brandy bottles! অর্থাৎ হিন্দুরাজ্য চলে গেছে—পড়ে আছে সর্বত্র আশ্চর্য সব মন্দির। মুসলমান রেখে গেছে সুন্দর সুন্দর সৌধ। আর ইংরেজরা কি রেখে যাবে? ভাঙা ব্রাণ্ডি বোতলের স্তূপের পর স্তূপ। এই ধরনের মন্তব্য শুনে এবং সংবাদপত্রে পড়ে মিশনারীদের মনে কী রকম ভাবের তরঙ্গ খেলে যেত—আমরা সহজেই তা অনুমান করতে পারি। আর একটা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন: English used three B's—Bible, Brandy and Bayonets—in civilising India.—অর্থাৎ ইংরেজরা ভারতবর্ষকে সভ্য করবার জন্যে ব্যবহার করেছে তিনটি 'ব'—বাইবেল, ব্রাণ্ডি আর বেয়নেট। এসব কথা তখনকার দিনে মার্কিন মুলুকের মিশনারীদের কানে নিশ্চয়ই মধু বর্ষণ করেনি।

মেরী লুই বার্ক (Marie Louise Burke) আমেরিকায় স্বামীজীর জীবনের একটি নিখুঁত ইতিহাস দিয়েছেন হালে-প্রকাশিত 'Swami Vivekananda in America, New Discoveries' বইখানিতে। এই বইখানি পড়লে বুঝতে পারা যায় আমেরিকার মনকে জয় করবার জন্যে তখনকার দিনে স্বামীজীকে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল! সভার পর সভা,

বৈঠকের পর বৈঠক। এই সব সভায় লোকে লোকারণ্য—তিল-ধারণের জায়গা নেই। পাগড়ীপরা হিন্দু সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে আগ্নেয়-গিরির 'লাভা'স্রোতের মতো নিঃসৃত হচ্ছে এমন সব তিক্ত সত্য যা শ্রোতাদের মনকে দিচ্ছে ভূমিকম্পের মতো নাড়া। বলছেন তিনি : "খ্রীষ্টান জাতিরা পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়েছে বজ্রপাতে আর অত্যাচারে। তোমরা হত্যা করো, মানুষ মারো আর আমাদের দেশে মাতলামি আর দুষ্ট ব্যাধি ছড়িয়ে দাও। তারপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দাও খ্রীষ্টের কথা শুনিয়ে—কেমন ক'রে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। মাতৃদুগ্ধ-পানের সঙ্গে তোমরা ধারণা ক'রে বসে আছ, আমরা শয়তান আর তোমরা স্বর্গের দেবদূত। সূর্যের আলো থাকলেই যথেষ্ট হ'ল না। সেই আলো দেখবার মতো তোমাদের চোখও থাকা চাই।" একেই বলে, 'Bearding the lion in his own den'—সিংহের গুহায় গিয়ে তার সঙ্গে মুখোমুখি। খ্রীষ্টানদের দেশে গিয়ে শ্বেতকায় জাতিদের জগৎজোড়া অপকর্মের কথা এমন জোরালো ভাষায় বলতে পারা স্বামীজীর মতো পুরুষসিংহের পক্ষেই সম্ভব। তিনি সাধারণ অর্থে একজন সন্ন্যাসী মাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন যোদ্ধা, তিনি মুখ ফুটে মনের কথা বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না, সমস্ত পৃথিবী বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও সত্যকে অনুসরণ করতে তিনি একটুও ভয় পেতেন না। ভালো মানুষ অনেক আছে পৃথিবীতে, শক্তিমান্ মানুষেরই অভাব আমরা অনুভব করি।

এ কথা ঠিক যে তিনি রাজনীতির মধ্যে নিজেকে কখনও জড়িয়ে ফেলেননি; কিন্তু ইংরেজ শাসন বেয়নেটের ছায়ায় দেশকে কী রকম নির্জীব ক'রে রেখেছে, জাহাজ-ভর্তি মদের বোতল আমদানি ক'রে ফিরিঙ্গীরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে কিভাবে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে, ইংরেজ-মিশনারীরা বাইবেল হাতে কী ভাবে একটা প্রাচীন মহাজাতির আত্মাকে নিত্য অপমানিত করছে—এ দৃশ্য দেখে তাঁর স্পর্শকাতর চিত্ত নিশ্চয়ই ক্ষোভে দুঃখে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতোই ফুলে ফুলে উঠত।

কন্যাকুমারীতে পরিব্রাজক স্বামীজীর মনের অবস্থা—আমরা বেশ অনুমান করতে পারি। কতদিন আগে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে এক গৈরিক-পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসীর ধ্যাননেত্রে ভেসে উঠেছিল স্বদেশের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। কী মহিমাময় আলো-ঝলমল সেই অতীত। জ্ঞানে, কর্মে, ধর্মে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সেই অতীত গরিমাময় হয়ে আছে! আর বর্তমান? পদব্রজে আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে আসতে আসতে দেশময় কী দেখতে পেলেন স্বামীজী? লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন চলন্ত নরকঙ্কাল। সমাজের একপ্রান্তে একান্ত অবহেলার মধ্যে অস্পৃশ্যেরা জীবন্মৃত হয়ে আছে। সন্ন্যাসীর কোমল হৃদয় বেদনার বোঝা আর বইতে পারলো না। ভারতবর্ষের কোটী কোটি নগ্ন, অর্ধ নগ্ন, বুভুক্ষু নর-নারায়ণের চরণপ্রান্তে সেই তরঙ্গমুখর সমুদ্রতীরে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিলেন তিনি।

দূর করতে হবে এই দিগন্তপ্রসারী অজ্ঞতার অন্ধকার, মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জনসাধারণকে যারা অপমানে অসম্মানে হারিয়ে ফেলেছে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ! এ কাজ করতে হ'লে আগে দরকার মানুষ, তারপর অর্থ।

স্বামীজী বললেন: আমরা সন্ন্যাসীরা ঘুরে ঘুরে জনসাধারণকে শোনাচ্ছি আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা। পাগলামি—নিছক পাগলামি। আমাদের গুরুদেব কি শোনাননি, 'খালি পেটে

ধর্ম হয় না ?' অতএব সন্ন্যাসীরা সমস্ত কামনা দূরে রেখে পরিভ্রমণ করুক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, আচণ্ডাল সকলকে টেনে তুলুক কল্যাণের মধ্যে, তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করুক শিক্ষার আলো দিয়ে। সন্ন্যাসীরা মঠের ও মন্দিরের নিভৃতে বসে ধ্যানধারণা করবে পারলৌকিক কল্যাণের আশায়—এইতো ছিল তখনকার দিনের ধারণা। স্বামীজী সন্ন্যাসীদের সামনে রাখলেন এক নূতনতর আদর্শ—দরিদ্র-নারায়ণের সেবার আদর্শ। সংসারত্যাগী বৈরাগীদের কাছে শোনালেন কর্মবাদের শঙ্খনাদ।

মনে রাখতে হবে, স্বামীজী আমেরিকায় গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের বাণী শোনাবার জন্যে ততখানি নয়, যতখানি মার্কিনদেশে অর্থ সংগ্রহ করবার জন্যে—যাতে সেই অর্থের দ্বারা তাঁর দুর্ভাগা স্বদেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। একথাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, দরিদ্রনারায়ণের সেবার কথা শুনিয়ে তিনি পরবর্তী গণবিপ্লবের পথকে প্রশস্ত ক'রে যান। আজ আমরা উঠতে বসতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কথা বলছি, ধনী দরিদ্রকে একজায়গায় মিলিয়ে দেবার আদর্শ প্রচার করছি, casteless classless (বর্ণহীন শ্রেণীহীন) সমাজের স্বপ্ন দেখছি। এর মূলে স্বামীজীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রেরণা। তিনিই তো আমাদের দৃষ্টিকে ফেরালেন তাদের দিকে—যারা ধূলায় ছিল অবলুণ্ঠিত। দরিদ্রকে সেবা করতে শেখালেন নারায়ণ ব'লে। তাঁকে প্রণাম।

অন্তিম আকূতি

শ্রীমতী দিব্যপ্রভা ভরালী

[স্কন্দ-পুরাণোক্ত 'শবরী'র প্রার্থনার ভাবানুবাদ]

আমার ইন্দ্রিয়গণ হউক কুসুমদল তোমার পূজার,
সুগন্ধি অগুরু ধূপ হোক তব বেদীমূলে এ তনু আমার।
হৃদয় আমার আজি নিবেদিনু তব পদতলে—দীপসম,
প্রাণ মোর হবি রূপে, অক্ষত স্বরূপে যত কর্মেন্দ্রিয় মম।
তোমার পূজায় আজি করিনু অর্পণ, ওগো জীবের জীবন।
লভুক বাঞ্ছিত ফল এ জীব এবার—ওই চরণে শরণ।

বাঞ্ছা নাহি করি আমি পার্থিব বৈভব, সর্ব ঐশ্বর্য সম্ভার,
অনন্ত স্বর্গের সুখ, অবিচল আনন্দ সম্ভোগ, পদ বিধাতার।
এ সংসারে আরবার আসি যদি ফিরি আমি নব দেহ ধরি,
তব পাদপদ্মমধুপানরতা হই যেন আমি মধুকরী।

শতাধিক জন্ম যদি লভি এ ধরণীতলে আমি অতি দীন
আমার এ চিদাকাশ থাকুক নির্মল সদা মায়ামেঘহীন।
এ শুধু মিনতি মোর জগদীশ। যদি কৃপা কর অধমারে—
হৃদিপাত্রখানি মোর পূর্ণ করো পূত প্রেমভক্তি-অশ্রুধারে,
ওই তব চরণকমল হ'তে আমার এ মন-মধুপের
না হোক বিচ্ছেদ কভু ক্ষণার্ধও—এই মোর বাঞ্ছা অন্তিমের।

দুর্গাপূজা—সেকালে ও একালে

শ্রীমতী শোভা দুই

বাঙালীর দুর্গোৎসবের ন্যায় এত বড উৎসব আর নাই—এ একটি জাতীয় মহোৎসব। ধনী, দরিদ্র সকলেই পূজার আনন্দে মাতোয়ারা, পূজা আসছে, আমাদের মা আসছেন—এ আনন্দের গুঞ্জন চলে বহু দিন থেকে। বেশ কিছু দিন পূর্ব থেকেই পূজার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়, সমস্ত দেশ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

সেকালে সাধারণতঃ জমিদাররাই দুর্গাপূজা করতেন। এই পূজাকে কেন্দ্র ক'রে সমস্ত গ্রাম মেতে উঠত। প্রত্যেকেই ভাবত তাদের নিজের পূজা, আর প্রত্যেকেই যোগ দিত সেই ভাবে। প্রতিমা গড়া থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সকলেই পূজার আয়োজনে ব্যস্ত থাকত।

পূজা মাত্র তিনদিন। এই তিনদিনই সকলের মহা আনন্দ, মহা শান্তি, মহা সুখের দিন। সারা বছরের দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়ে তারা সুখী হ'ত, শান্তি পেত। নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছেলেমেয়েদের আনন্দের সীমা থাকত না।

মায়ের অপূর্ব মহিমান্বিত রূপ: মস্তকোপরি মহাদেব—বামে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, দক্ষিণে ধনাধিষ্ঠাত্রী কমলা ও সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ, পদতলে রণোন্মত্ত অসুর। পশুরাজ সিংহ মায়ের বাহন। মা দশভুজা, দশ হস্তে দশ প্রহরণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকল দেবতা এই মহাশক্তির সঙ্গে বিরাজিত। মা আমাদের ষড়ৈশ্বর্যময়ী। এমন পূর্ণাঙ্গ সুসমঞ্জস ঐক্যবদ্ধ রূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

পূজা হ'ত মহাসমারোহে, সকলেই অতিশয় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মাকে আরাধনা ক'রত। শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী অতি নিষ্ঠার সহিত মাকে পূজা করবার চেষ্টা ক'রত প্রত্যেকেই, যাতে মা সন্তুষ্ট হয়ে পূজা গ্রহণ করেন। মায়ের তুষ্টিতে সকলের তুষ্টি, মায়ের আনন্দে সকলের আনন্দ।

দিনে পূজা, রাত্রিতে যাত্রা অথবা কথকতা কিংবা কীর্তন—যা হোক একটা ব্যবস্থা থাকতই। তাছাড়া প্রসাদ-বিতরণ, ভূরি-ভোজন তো ছিলই। বিশেষ ক'রে সেকালের দুর্গাপূজা 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'-এর ব্যাপার। পূজার ঐ তিন দিন পবিত্র চিত্তে মায়ের ধ্যানে বিশুদ্ধ আনন্দে সকলের কেটে যেত। অনাবিল শান্তিতে প্রত্যেকের মন ভরে উঠত। মানুষ সারা বছরের দুঃখ কষ্ট শোক তাপ গ্লানি—সব ভুলে যেত।

মেতে ওঠে মানুষ একালেও পূজার আনন্দে। তবে সেকাল আর একালের পূজার আয়োজন ও প্রয়োজন এবং আনন্দ ও ব্যবস্থার হয়েছে অনেক তফাৎ, সেকালে আর একালে মানুষের জীবন-যাত্রা, আনন্দ-বোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর হয়েছে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দুর্গাপূজা—রাজসিক পূজা, ধনী ছাড়া করতে পারে না, কিন্তু এখনকার ধনীদের মনোভাব পূজার অনুকূলে নয়। সেকালে ধনীরা দোল, দুর্গোৎসব, ঠাকুরসেবা বারো মাসের তেরো পার্বণ—অবশ্য-কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে অতি নিষ্ঠার সহিত দেব-সেবা করতেন। এই পূজাকে কেন্দ্র ক'রে তখন বহু লোক প্রতিপালিত হ'ত।

একালের ধনীরা পূজাকে ঝামেলা এবং অর্থের অপব্যয়—দুইই ভাবেন। এসব ঝঞ্ঝাটের চেয়ে বরং চেঞ্জে যাওয়া অনেক ভালো। শরীর মন দুইই ভালো থাকে। কাজেই তাঁরা স্ত্রী,

পুত্র, কন্যাকে নূতন বসন-ভূষণে সজ্জিত ক'রে যান স্বাস্থ্যান্বেষণে।

কাজেই মা এখন আসেন বারোয়ারির চণ্ডী-মণ্ডপে। পূজার প্রায় একমাস পূর্ব থেকে ছেলেরা বাড়ীতে বাড়ীতে চাঁদা আদায় করে, থিয়েটারের রিহার্সেল দেয়, আলোকসজ্জা আর সামিয়ানা নিয়ে মাথা ঘামায়। আধুনিক ডিজাইনের প্রতিমা অর্ডার দেয়। প্রতিমার সৌন্দর্যের বিচার চলে, আলোকসজ্জার চলে প্রতিযোগিতা। দৈনিক কাগজে মায়ের ছবি ওঠে—রূপে এবং অঙ্গসৌষ্ঠবে কোন্ প্রতিমা প্রথম, কোন্ প্রতিমা দ্বিতীয়—ইত্যাদি আলোচনা হয়। এখানে নেই ভক্তি, নেই নিষ্ঠা, নেই শাস্ত্রানুযায়ী পূজা। কেবল দিবারাত্র মাইকের চিৎকার আর হিন্দি-বাংলা সিনেমার গান। পূজার উপকরণের আয়োজন অত্যন্ত শোচনীয়—কারণ প্রচুর টাকা ব্যয় হয় সামিয়ানায়, আলোকে এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামে। বারোয়ারি পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রতিমাকে কেন্দ্র ক'রে সকলে মিলে আনন্দ করা। মায়ের পূজা আরাধনা, স্তব, স্তুতি, এখানে গৌণ। অবশ্য পুরানো বনেদী বাড়ীর পূজার কথা এখানে হচ্ছে না।

একালের প্রতিমাও শাস্ত্রানুযায়ী তৈরী হয় না। যার যেমন খুশি, যেমন অভিরুচি তৈরী করে। একালের প্রতিমায় মায়ের সেই মহিমান্বিত মাতৃরূপের প্রকাশ নেই। প্রতিমার পশ্চাতে দেব-দেবী-আঁকা চালচিত্র আর দেওয়া হয় না। তার পরিবর্তে এখন পাহাড়, পর্বত, ঝরনা, নদী, অথবা ঘূর্ণায়মান সূর্য-চক্র তৈরী করা হয়। অবশ্য এখনও বারোয়ারি চণ্ডীমণ্ডপে মা পুত্রকন্যা-সমভিব্যাহারে আসেন, কিন্তু একালের ন্যায় তাঁরাও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঈষৎ দূরে অবস্থিত। চণ্ডীমণ্ডপে নাই ভাব-গম্ভীর প্রশান্ত সমাহিত ভাব, নাই উদাত্ত-কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ, নাই সুললিত সুরে মায়ের স্তব-গান, নাই কীর্তন, নাই কথকতা—কেবল মাকে ঘিরে আনন্দে মাতামাতি। নিরানন্দ দেশে আনন্দময়ীর আগমন। জীবন-যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত বাঙালী, বিপর্যস্ত বাঙালী, বেকার বাঙালী মায়ের নামে যে তিন দিন আনন্দ-সাগরে ভাসে, তার মূল্যও জীবনে বড় কম নয়।

আনন্দময়ী মা আমাদের স্নেহময়ী, কিন্তু শক্তিরূপিণী—যে শক্তিতে সৃষ্টি ও প্রলয়, উত্থান ও পতন অনন্তকাল ধরে হয়ে আসছে। আবার এই শক্তিই চৈতন্যময়ী, কল্যাণময়ী। এই শক্তিই মৃত্যুকে প্রতিহত করে, জীবনকে রক্ষা করে। এই শক্তিই অমঙ্গলকে ধ্বংস ক'রে মঙ্গলকে স্থাপন করে, জগৎকে সংরক্ষণ করে। তাই নতমস্তকে মায়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

তুমি প্রণতগণের প্রতি প্রসন্না হও, বিশ্বের আর্তি হরণ কর, ত্রৈলোক্যবাসিগণের নিকট বরদা মূর্তিতে প্রকটিত হও।

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

(—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৩৩)

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা

ব্রহ্মচারিণী আশা

মনীষী সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ যুগের বাঙ্গালী সন্তানকে নিবেদিতার অপূর্ব আত্মনিবেদনের কথা ভাল করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য কোনরূপ স্মৃতিপূজার আয়োজন হয় না। এত স্মৃতি-উৎসব বারো মাসে চুরাশি পার্বণের মত ছোট বড় মাঝারি কত জনের উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, কই ভগিনী নিবেদিতাকে তাহার কোনটাতেই তেমন করিয়া আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি না।"

স্বাধীন ভারতে বোধ করি এ আক্ষেপ বেশী করিয়াই খাটে। স্বাধীনতার বেদীমূলে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তাঁহাদের প্রতি নিত্যই আমরা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকি—অথচ স্বাধীনতার আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার দান কতখানি তাহা কয়জন জানি? সে যুগে স্বাধীনতার উপাসকেরা সকলেই যে এই মহীয়সী নারীর দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন, সে কাহিনী কি আজ সকলে সত্যই বিস্মৃত হইয়াছেন? অথবা স্বর্গীয় মোহিতলালের কথা অনুসরণ করিয়াই বলিব, "জানি তাহাতে সেই কল্যাণময়ী তপস্বিনীর—সেই সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনীর জন্য কিছুমাত্র আক্ষেপের কারণ নাই, যে নিজেই 'নিবেদিতা' তাহাকে নিবেদন করিবার ত কিছুই নাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা—উভয়েরই জীবনকাল অতি সংক্ষিপ্ত। একজনের ৩৯ বৎসর, অপরের ৪৪ বৎসর মাত্র। ইহার মধ্যে আবার স্বামীজীর সহিত নিবেদিতার পরিচয়-কাল মাত্র কয়েক বৎসর—১৮৯৫ হইতে ১৯০২, সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বৎসর মাত্র। অথচ এই কয়েকটি বৎসর নিবেদিতার জীবনে কি বিরাট পরিবর্তনই না আনিয়াছিল! প্রথম দর্শনেই নিবেদিতা স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব—তেজঃপূর্ণ আকৃতি, প্রাচ্যবৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাত্ত কণ্ঠস্বর এবং উদার বেদান্ত-মতের দ্বারা ধর্মের সমন্বয়-ব্যাখ্যা—সমস্ত মিলিয়া নিবেদিতার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অথচ সেই তীক্ষ্ণধী, বিদুষী, বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিতা মহিলাটি তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত না হইবার জন্য কত সতর্কতাই না অবলম্বন করিয়াছিলেন। 'স্বামীজীর কথাগুলি নিঃসন্দেহে অভিনব, উহা সমগ্র চিন্তাধারার উপর নূতন আলোকপাত করে সত্য, তথাপি সেগুলি নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নহে, অন্ততঃ পরীক্ষা দ্বারা যতক্ষণ না তাহাদের সত্যতা নিরূপণ করা যাইতেছে'—মার্গারেট নোব্‌লের মনোভাব স্বামীজীর সহিত পরিচয়ের প্রথমে এইরূপই ছিল। স্বামীজীকে তিনি আচার্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্বেই। 'এই যে আনুগত্য স্বীকার ইহা শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই, কিন্তু তাঁহার প্রতি-পাদ্য বিষয়গুলিকে হাতে-কলমে প্রমাণিত না করা পর্যন্ত আমি উহাদের চরম সত্যতার নিকট আত্মসমর্পণ করি নাই।'—একথা তিনি নিজেই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।

র‍্যাটক্লিফ্ লিখিয়াছেন, "The message of Swami Vivekananda went to the mark, little as she realised this at that time. She disputed his assertions, fought him in the dis-

cussion class, provided indeed the strongest antagonism which he had to meet at any of his London gatherings But it is clear that from the first his influence was winning.

আসল কথা নিবেদিতা ছিলেন মনে-প্রাণে প্রচণ্ড আদর্শবাদী। একথা সত্য, স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তাঁহার জীবনের গতি সাধারণ খাতেই প্রবাহিত ছিল। তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা ও অপূর্ব লেখনী-প্রতিভা তাঁহাকে লণ্ডন-সমাজে কেবল সুপরিচিত নহে—সুপ্রতিষ্ঠিতও করিয়াছিল, তথাপি ইহাও স্বীকার্য স্বামীজীকে দেখিবার পূর্বে কোন অসাধারণ জীবন-যাপনের কল্পনা তিনি করেন নাই। এমনকি অপর পাঁচজনের মতই সংসার রচনা করিবার স্বপ্নও তিনি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শবাদী মন—যতদিন না আদর্শকে খুঁজিয়া পাইয়াছিল, ততদিনই সাধারণের মত পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে পরিতৃপ্তি অনুসন্ধান করিয়াছিল। আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার তখন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু ইহা যে গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনের উর্ধ্বে তাঁহার অবচেতন মনে তাহার আভাস ছিল।

'Light of Asia' তাঁহাকে সত্য সম্বন্ধে একটা অস্ফুট ধারণা জন্মাইতে সাহায্য করিয়াছিল মাত্র, সুনিশ্চয়তা দান করে নাই। পিতা এবং পিতামহের নিকট উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি লাভ করিয়াছিলেন ধর্মের প্রতি দুর্নিবার অনুরাগ, অথচ বহু আচার-অনুষ্ঠান-নিয়মবদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে তাঁহার বিচারশীল মন সত্যকার ধর্ম খুঁজিয়া পায় নাই, ফলে সংশয়ের গুরুভারে পীড়িত তাঁহার অপরিতৃপ্ত হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল। সে ধর্ম কোথায়—যে ধর্ম কাহাকেও ফিরায় না, উদারতায় অকপটে সকলকে গ্রহণ করে? যে ধর্মে মুক্তি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পন্থাবলম্বী কয়েকজনের পক্ষেই মাত্র সম্ভব নয়, পরন্তু জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই জন্য, দুর্লভ—কিন্তু সাধন-সাপেক্ষ। স্বামী বিবেকানন্দের 'Message of Vedanta' (বেদান্তের বাণী) মার্গারেটের নিকট ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বহন করিয়া আনিল। যখন লণ্ডনে প্রশ্নোত্তর-ক্লাসে স্বামীজী বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, '—আজ জগতে কিসের অভাব জানো? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী যাহারা সদর্পে পথে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের আর কিছুই নাই। কে কে যাইতে প্রস্তুত? কিসের ভয়? ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অন্য কিছুতে আর কি প্রয়োজন? আর যদি ইহা সত্য না হয়, তাহা হইলে বা জীবনে কি প্রয়োজন?' তখন সত্যের আহ্বান নিবেদিতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। বুঝিলেন, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব পাইবার জন্য অন্তরাত্মার আকুল ক্রন্দনই ধর্ম। বুঝিলেন—সত্যের পথ অতি কঠোর।

আমাদের অনেকের হয়তো আদর্শের বা সত্যের প্রতি অনুরাগ আছে, কিন্তু আদর্শকে জীবনে লাভ করিতে গেলে যে মূল্য প্রয়োজন তাহা দিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আমাদের নাই। নিবেদিতার অলোকসামান্য চরিত্রের সহিত সাধারণের এইখানেই পার্থক্য। যে মুহূর্তে নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আদর্শকে মূর্ত দেখিলেন, সেই মুহূর্তে সর্বস্ব পণ করিলেন আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করিতে, তাই বিনা দ্বিধায় করিলেন আত্মসমর্পণ। তাঁহার জীবনে স্বামীজীর এই পরম আবির্ভাবকে স্মরণ করিয়া পরে তিনি লিখিয়াছিলেন :

Suppose Swami had not come to London that time! Life would have been like a headless torso For I always knew that I was waiting for something. I always said that a call would come, and it did.

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—এই মন্ত্র প্রাণে প্রাণে গ্রহণ করিয়া ১৮৯৮ খৃঃ জানুয়ারি মাসে দৃঢ়পদে তিনি যে যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন তাহার সমাপ্তি ঘটে ১৯১১ খৃঃ ১৩ই অক্টোবর হিমালয়ের শীতল ক্রোড়ে। অনন্তকালের কোলে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বৎসর। কিন্তু এই কয় বৎসরের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত কি অনলস নিঃস্বার্থ কর্মেই না কাটিয়াছে। তাহা দ্বারা এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

তাহারে অন্তরে রাখি'
জীবন-কণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী—
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি বিরলে মুছিয়া অশ্রুআঁখি
প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরল সথাকি'
সুখী করি সর্বজনে।"

কবির এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিবেদিতার জীবনে সার্থক হইয়াছিল। 'দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল'—নিবেদিতার হৃদয়ে সম্বল ছিল, তাই তাঁহার দানের পাত্র উপচাইয়া পড়িয়াছে একান্ত ধারায়, তাহার পরিমাণ নিরূপণ করা সহজ নহে। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, ভাস্কর, বিপ্লবী—নিবেদিতার দানে কে পুষ্ট হয় নাই? আর কিছুর জন্য না হইলেও কেবলমাত্র The Master as I saw Him এবং Notes on some wanderings with the Swami Vivekananda—এই দুই-খানি পুস্তক রচনা করিবার জন্যই কী সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ নহে? যে মহান্ জীবন অবলম্বন করিয়া ভারতের শাশ্বত সনাতন আত্মা প্রকটিত হইয়াছিল সেই স্বামী বিবেকানন্দের পরম আবির্ভাবকে কে এমন অনুপম লেখনীর সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়াছে? উত্তরভারত-ভ্রমণে নিবেদিতা ছাড়া আরও অনেকে স্বামীজীর সহিত একত্র থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী এই সময়ে যে দিব্যভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন, এমনকি সময়ে সময়ে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেন, অগণিত লোকের কাছে তাহা আর কে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন? অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল পটভূমিকায় অধ্যাত্মবাদ ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, রাজনীতি—কোন্ বিষয় স্বামীজী আলোচনা করেন নাই? আলোচিত প্রত্যেক বিষয়ের উপর তাঁহার গভীর জ্ঞান ও অপূর্ব বর্ণনার গুণে অতীত ভারত তাহার সমস্ত গরিমা লইয়া শ্রোতৃবর্গের সামনে প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিত, কিন্তু কে সেই বিবরণ শত শত নরনারীর নিকট অপূর্ব লেখনীর সাহায্যে পৌঁছাইয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল? বক্তাও আশ্চর্য, লব্ধাও কুশল। নিবেদিতার ধারণা করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও ছিল তেমনি অতুলনীয়।

বাস্তবিক নিবেদিতার কর্মময় জীবনের যথাযথ বিবরণ দেওয়া কঠিন। জীবনী অপেক্ষা জীবন অনেক বড়, তাই নানাদিক দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিলেও সব কথা বলা হয় না।

স্বাধীন ভারত স্বভাবতই গৌরবময় বিপ্লব-যুগের কাহিনী কীর্তনে মুখর। পরাধীন ভারতে যে সকল বিপ্লবী ধন, জন, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহ্য করিয়া দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে জীবন আহুতি দিয়া গিয়াছেন তাঁহারা জাতির চিরস্মরণীয়, চিরনমস্য। তথাপি একথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে কোন দেশেই বিপ্লবীর কার্য অথবা দানের পরিধি সীমাবদ্ধ। দেশের একটি বিশিষ্ট সঙ্কটসময়ে পরাধীনতার পরিবেশেই তাঁহার বাণী অথবা জীবন অপরকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু যে বাণী সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বলোককে অনুপ্রেরণা দেয় সে বাণী বিপ্লবের বাণী নহে, সে বাণী সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব

লাভ করিবার তপস্যার। স্বামী বিবেকানন্দ সেই বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। তাই পরাধীন ভারতের বিপ্লব-যুগে তাঁহার বাণী যেভাবে বিপ্লবীকে গৃহছাড়া করিয়া আকুল আবেগে দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে আহুতি দিবার অনুপ্রেরণা দিয়াছে স্বাধীন ভারতে যাহার বিন্দুমাত্র দেশাত্মবোধ আছে তাহাকে সেই ভাবেই উহা অনুপ্রেরণা দেয় তিল তিল করিয়া নিজেকে দেশের সংগঠন-কার্যে আত্মদান করিবার। স্বামীজীর নিকট নিবেদিতা যদি সে বাণী গ্রহণ না করিয়া থাকেন, যদি জীবনব্যাপী সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া থাকেন, তবে বৃথাই তিনি স্বামীজীর শিষ্যা ও কন্যা বলিয়া গর্ব করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতার সকল কার্যের, সকল আচরণের একটিই উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য হইল —গুরুর প্রীতি-সম্পাদন। নিবেদিতা এই দেশকে এত ভালবাসিয়াছিলেন এবং এই দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সেই গুরুরই প্রীত্যর্থে। তাঁহার এক বন্ধুকে একবার লিখিয়াছিলেন :

Shall I be allowed to see that I was of some use to Swamijee? I only want, I shall always only want to be allowed to carry his burden.

স্বামীজী তাঁহাকে যে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে স্বদেশপ্রেমের বীজ তাঁহার অন্তরে বপন করিয়াছিলেন তাহারই বলে তিনি নিজেকে অকপটে এই দেশের সর্ববিধ কল্যাণে ব্রতী করিতে পারিয়াছিলেন। স্নেহময়ী জননীর হৃদয় যেমন সন্তানের সর্বপ্রকার কল্যাণ-কামনায় অহরহ ব্যাকুল হইয়া থাকে, নিবেদিতা তেমনি জননীর অতন্দ্র স্নেহ-সজাগ দৃষ্টি লইয়া ভারতের জীবন-যাত্রার প্রতিটি দিক পুষ্ট করিয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেন। এই স্বপ্নে বিভোর হইয়াই তিনি বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে বিনা দ্বিধায় অযাচিত সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তরুণদলকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলেন। এই স্বপ্নই তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল পরাধীন দেশের বৈজ্ঞানিককে সর্বপ্রকার বাধার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সাহায্য করিতে। দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে পরীক্ষামূলক কার্যে উৎসাহিত করিয়াছেন, পুস্তক প্রণয়নে তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন। দেশাত্মবোধ তাঁহাকে ভারতীয় শিল্পের কেবল মহিমা-কীর্তনে মুখরিত না করিয়া নিযুক্ত করিয়াছিল শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণকে অনুপ্রেরণা-দানে—যাহাতে তাহাদের সুপ্ত কলাপ্রতিভা আত্মপ্রকাশ করে। যে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় তিনি রাজনৈতিক বন্দীর জামিন হইতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, সেই দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই তিনি নির্ভীক চিত্তে প্লেগাক্রান্ত রোগীর মাতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। দিনের পর দিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়াছেন, ভারতবাসী যাহাতে স্বামীজীর বাণীর মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হয়। নাগরিক কর্তব্যবোধ জাগাইবার জন্য বাগবাজার পল্লীতে ঘরে ঘরে গিয়া তিনি সানুনয় পরামর্শ দিয়াছেন। স্বয়ং রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে মুহূর্তে অনুভব করিয়াছেন বক্তৃতা অপেক্ষা লেখনী-শক্তি দ্বারা তিনি আদর্শকে বহুগুণ পরিস্ফুট করিতে পারিবেন সেই মুহূর্তে সর্বশক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায়। Modern Review, Prabuddha Bharata, Indian Review, New India প্রভৃতি যে পত্রিকাগুলি দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের লেখা যোগাইবার ভার নিবেদিতা

হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছেন। একসময়ে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করিয়া দীনেশচন্দ্র সেনের রচনার অনুবাদে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কতলোকের কত প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন, কত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন তাহার কোন হিসাব নাই। আবার এই অসংখ্য কাজের মধ্যে যে কাজের ভার স্বামীজী বিশেষ করিয়া তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন সেই নারীজাতির শিক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার বিদ্যালয়টির কথা একদিনের জন্যও তিনি বিস্মৃত হন নাই বা অবহেলা করেন নাই। অসংখ্য কাজের মধ্যে প্রতিদিন তিনি ইতিহাস, অঙ্কন-বিদ্যা প্রভৃতির ক্লাস লইতেন। গাড়ী করিয়া মেয়েদের নানা জায়গায় বেড়াইতে লইয়া যাইতেন, তাহাদের সভা-সমিতিতে লইয়া যাইতেন, প্রসিদ্ধ বক্তাদের বক্তৃতা শুনিয়া যাহাতে তাহাদের মনে দেশাত্মবোধ জাগে। আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ছাত্রীর সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁহার মাতার ন্যায় মমতা-দৃষ্টি সতত সজাগ থাকিত। বিস্মিত মনে প্রশ্ন জাগে একজন মানুষে কি করিয়া এত শক্তি সম্ভব হয়? রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, নিবেদিতা ছিলেন 'লোকমাতা'।

তাঁহার এই দেশাত্মবোধের উৎস কোথায়? নিবেদিতা তাঁহার বান্ধবীকে লেখেন—"ভারতবর্ষের কাছে আমি কি পরিমাণেই না ঋণী! পরোক্ষভাবে অথবা অপরোক্ষভাবে ভারতের কাছে আমি কি না পেয়েছি!"

ভারত তাঁহাকে কি দিয়াছিল যাহার জন্য এই স্বীকারোক্তি? ভারত তাঁহাকে দিয়াছিল জীবন-রহস্যের মূল মন্ত্র, এ মন্ত্র তিনি লাভ করিয়াছিলেন ভারতেরই এক সন্তান স্বামী বিবেকানন্দের নিকট। জীবনের চরম অর্থ যে অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই সমগ্র জীবনটিকে তিনি একটি অখণ্ড সাধনায় পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন এবং নিঃশেষে নিজেকে দিতে পারিয়াছিলেন—যাহা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই'। দীনেশ সেন বলিয়াছেন—'এরূপ নিঃস্বার্থ আত্মপর-ভাব-বিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে—একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম।'

নিবেদিতার এই আধ্যাত্মিক সাধনায় ভারতমাতা জগৎ-জননীর সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার কোন কাজই ক্ষণিক উত্তেজনা-প্রসূত ছিল না। নিবেদিতার জীবনের এই গভীর উৎস এই আধ্যাত্মিক জীবন-দর্শনের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবলমাত্র যদি রাজনীতিক পটভূমিকায় তাঁহার রণচণ্ডী মূর্তি আঁকিয়া বৈপ্লবিক কার্যে সক্রিয় ভূমিকায় দেখাইতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে আবেগ, উত্তেজনা ও অগ্নিগর্ভ বাণীপ্রচারের দ্বারা একটা ক্ষণিকভাবের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের যথার্থ বিচার হইবে না—একথা অতি সত্য।

যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র শিক্ষাকে স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র দুইটি শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন: 'Renunciation and Service' ত্যাগ ও সেবা। ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে সেই ত্যাগ ও সেবা কি অপূর্ব রূপেই না ফুটিয়া উঠিয়াছিল!

নিবেদিতা-চরিত্র সত্যই অতুলনীয়। তাঁহার জীবিতকালে যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, ঐ প্রবল ব্যক্তিত্বে তাঁহারা

কেবল মুগ্ধ ও অভিভূত হন নাই, সারা জীবনের মত তাঁহার আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যাহারা নিকটে আসে নাই তাহাদেরও জীবনে তাঁহার সহিত মুহূর্তের পরিচয় একটি বড় স্থান অধিকার করিয়াছিল। একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ভুলিয়া যাওয়া ছিল অসম্ভব। আর আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই, আমাদের নিকট তাঁহার চরিত্র অনুধ্যানের বিষয়।

ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন—"যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে তুমি প্রস্তুত হয়ে থাক, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ কর। কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের না শুনতে হয়। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে লয়, সে জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে। তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না, তার কারণ এ নয় যে জগতে পাপ নেই, প্রত্যুত তার কারণ এই যে সে উহা নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছে—স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।"

নিবেদিতা একথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। একদিনের জন্য তাঁহার মুখ হইতে কেহ এদেশের নিন্দা বা সমালোচনার বাণী শ্রবণ করে নাই।

আজ এই স্মৃতিপূজার অবসরে আমরাও যেন প্রার্থনা করি তাঁহারই মত সমগ্র মন প্রাণ আত্মা দিয়া এদেশকে ভালবাসিতে পারি। যেন তাঁহারই মত বিন্দুমাত্র সমালোচনা না করিয়া, একটিও নিন্দার বাণী উচ্চারণ না করিয়া প্রতি শোণিত বিন্দু দিয়া ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুযায়ী সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিতে পারি, যেন তাঁহারই মত দিবারাত্র তন্ময় হইয়া জপ করিতে পারি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ। মা, মা, মা। *

* রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের "নিবেদিতা দিবসে" (২৮.১০.৫৭) পঠিত।

চিরজয়ের মন্ত্রখানি

শ্রীরবি গুপ্ত

জীবন-তলে দিলে তোমার চিরজয়ের মন্ত্রখানি,
তাই তো সকল আঁধার-কালো লভে অনল-উষার বাণী।
তাই তো উপল পথের বাঁধন
দিল উছল স্রোতের সাধন
দিগন্তহীন কোন নীলিমার ধারায় আসি হারায় জানি,
জীবন-তলে দিলে তোমার চিরজয়ের মন্ত্রখানি।

জানি তোমার বহ্নি-পরশ জাগায় আমায় গহন-পুরে,
তাই তো শুনি বাঁশি তাহার—কাছে থেকেও যে জন দূরে।
কোন্ গভীরে সে যে জাগে
কোন্ স্বপনের পাবক রাগে,
নিবিড় তারি অমলতায় লয় আমারে কেবল টানি,'
জীবন-তলে দিলে তোমার চিরজয়ের মন্ত্রখানি।

পুণ্য স্মৃতি

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ-স্বামীকে আমি প্রথম দর্শন করি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, আলমবাজার মঠে। তাঁর সরল বালকের মত ব্যবহার ও কথাবার্তা—তাঁহাকে লইয়া গুরুভ্রাতাদের হাসি ও আনন্দ করা, এবং সেই আনন্দে তাঁহার সানন্দচিত্তে যোগদান দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম, বিশেষ মুগ্ধ করিত তার অপূর্ব সরলতা—সাধারণ মানুষে যা দুর্লভ। তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন, লামার মতন পোষাক পরা দেখিয়া ইংরেজ রাজ-পুরুষেরা গুপ্তচর মনে করিয়া কাশ্মীরে তাঁহাকে আটক বন্দী রাখে—এই সকল কথা পূর্বেই শুনিয়া-ছিলাম, পরে কথাবার্তায় আলাপ আলোচনায় তাহার কিছু কিছু আমাদের কাছে তিনি আরও বলিতেন।

তাঁহার ভ্রমণকাহিনী যখন তিনি বর্ণনা করিতেন তখন তাহার ছবি শ্রোতার হৃদয়ে উজ্জলভাবে অঙ্কিত হইত,—তাঁহার কথা বলার এইটি ছিল বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও তাঁহার নিকট উপনিষদের আবৃত্তি শুনিতাম, বাংলাদেশে বেদ-প্রচারের জন্য তিনি আগ্রহশীল ও উৎসাহী ছিলেন। কি আলমবাজার মঠে, কি বলরাম-মন্দিরে সেই সময়ে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইত। তাঁহার মুখে স্বামীজীর জীবনকাহিনী, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার কি অপূর্ব অনুরাগ ও আকর্ষণ এবং ঠাকুরও স্বামীজীকে কিরূপ অনির্বচনীয় প্রেমে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, সেই সব কথা এবং তাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা ও গভীর ভাবপূর্ণ আচরণের কথা আমরা তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতাম।

মুর্শিদাবাদে মহুলা গ্রামে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন দুর্ভিক্ষ মোচন-কার্যে ব্যাপৃত হন, তাহার কয়েকদিন পূর্বে—১লা মে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় আসিয়াই বলরাম-মন্দিরে এতদুদ্দেশ্যে সভা আহ্বান করেন। ১৫ই মে মহুলায় স্বামীজীর প্রদত্ত ১৫০৲ টাকা ও তাঁহার প্রেরিত দুইজন সেবক লইয়া দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য আরম্ভ হয়। গোড়া হইতেই আমি মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগ দিতাম। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বসু মহাশয় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, অনাগারিক ধর্মপাল মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিলে তিনি তাহার সদস্য হন, এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। মিশনের অধিবেশন শেষ হইলে আমরা পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ মহারাজদ্বয়ের নিকট বসিয়া তাঁহাদের আলাপ আলোচনা ও উপদেশ শুনিতাম। একদিন অর্থাৎ তিন চারটি অধিবেশনের পরেই শ্রীশ্রীমহারাজ মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ ও অখণ্ডানন্দ মহারাজের কথা উত্থাপন করিলে চারুবাবু বলিয়া উঠিলেন যে তিনি ধর্মপালকে বলিয়া মহাবোধি সোসাইটী হইতে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ চারুবাবুকে এই বিষয়ে অবিলম্বে চেষ্টা করিতে

বলিলেন। মিশনের অন্যান্য সভ্যেরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া যদি এই বিষয়ে সাহায্য করেন তবে ইহা মিশনের উত্তম কার্য হইবে বলিয়া মহারাজ মত প্রকাশ করিলেন। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম এবং চারুবাবুর সঙ্গেও আমার এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তাঁহার বাড়ীটি আমাদের বাসভবনের সন্নিকটেই ছিল। এই কার্যে সহায়তার জন্য স্বামীজী শ্রীশ্রীমহারাজকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন এবং কার্য সম্বন্ধে পত্রের দ্বারা তিনি সকল সংবাদ লইতেন। এই বিষয়ে স্বামীজী ও মহারাজ উভয়ে নানা উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিতেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ-প্রবর্তিত দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য রামকৃষ্ণ মিশনকে সরকারের এবং জনসাধারণের নিকট লোক-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান-রূপে পরিচিত করে। বলিতে কি প্রথম প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যপ্রণালী দুর্ভিক্ষ-মোচনেই প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী অখণ্ডানন্দই সর্বপ্রথম সেবাধর্মকে বাস্তব ভাবে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

একবার রামকৃষ্ণ মিশনের অধিবেশনে স্বামী অখণ্ডানন্দ সেবাধর্ম সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষণে একটি গল্প বলিয়াছিলেন, তাহা আমার আজও মনে আছে। একজন রাজা—মন্ত্রী এবং সেনাপতির ষড়যন্ত্রে রাজ্যহারা হন। রাজা ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেন। একদিন ভিক্ষায় তিনি কিছু পান নাই। নদীতীরে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া নির্জনে ভগবৎচিন্তা করিতেছিলেন—কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় কিছুতেই মনকে সম্পূর্ণভাবে ভগবদ্-ধ্যানে নিমগ্ন করিতে পারেন নাই। জলপান করিয়া তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই। এমন সময় বৃক্ষ হইতে একটি সুপক্ব বেল তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইল। তিনি যাই উহা ভাঙিয়া খাইতে যাইবেন—এমন সময়ে একজন কুষ্ঠরোগী রাজার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। সেও কয়েকদিন উপবাসী রহিয়াছে বলিয়া রাজাকে জানাইল। ক্ষুধার কি ক্লেশ রাজা তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। তিনি অতি প্রীতির সহিত অগ্রে ঐ বেলটির অর্ধাংশ কুষ্ঠরোগীকে দিলেন। পরমানন্দে সে তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। কিন্তু বিস্মিত রাজা দেখিলেন—তাঁহার ইষ্টদেবতা সশরীরে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন, এমন সময়ে শুনিলেন তাঁহার ইষ্টদেবতা বলিতেছেন: আমি তোমাকে রাজ্যহারা করিয়াছি—ঘোর দুর্দশায় ফেলিয়াছি এবং কুষ্ঠরোগীরূপে তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছি। যে ক্ষুধার্তকে আহার দেয়, রুগ্ণকে সেবা করে—দুঃখীর দুর্দশা মোচন করিতে চেষ্টা করে সেই আমার যথার্থ সেবা করে, প্রকৃত উপাসনা করে। এইরূপ সেবা আমিই লইয়া থাকি। যাহারা আমাকে এই সব আর্ত বুভুক্ষু দুঃখীর মধ্যে দেখিতে পায় না তাহারা আমার যথার্থ সেবা জানে না। তুমি যে প্রেমভরে নিরভিমান হইয়া অনন্ত ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া কুষ্ঠরোগীকে যত্ন করিয়া নিজ খাদ্যের অর্ধাংশ দিয়াছ—তাহাতেই আমি তুষ্ট হইয়া তোমার ইষ্টদেবতার রূপে তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছি। এই বলিয়া শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেন। আশ্চর্য, সেই সময় মন্ত্রী ও সেনাপতি অনুতপ্ত-হৃদয়ে রাজাকে সিংহাসনে বসাইতে আসিলেন। কিন্তু রাজা আজ যে অপূর্ব আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া আবার বিষয়-গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তিনি লোক-সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিলেন। রাজ-সিংহাসন তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইল।

পূজ্যপাদ স্বামীজী অখণ্ডানন্দ-মহারাজকে

অত্যন্ত ভালবাসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে নীলাম্বরবাবুর বাগানে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। একটি একমণ ওজনের প্রকাণ্ড লেডিক্যানি বা পানতুয়া আর একটি প্রায় সেইরূপ ওজনের শাঁকআলু লইয়া আসিয়াছিলেন। স্বামীজী এবং উপস্থিত সকলেই উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আমরাও সেদিন প্রসাদে উক্ত দুইটি দ্রব্যের অংশ পাইয়াছিলাম।

একদিন স্বামী অখণ্ডানন্দ বলরাম-মন্দির হইতে বাহির হইতেছেন, ঠিক সেই সময় আমি উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে বলিলেন, চল আমার সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহারাজ, আপনি কোথায় যাইতেছেন?' তিনি বলিলেন, 'বাদুড় বাগানে অনাথ-আশ্রম দেখিতে।' আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম। স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া অনাথ বালকদের সেবা করিতেন। আশ্রমের বালকদের কিভাবে শিক্ষা দেন ও লালনপালন করেন—তাহা মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, 'আপনি উত্তম কাজ করিতেছেন—ইহাই যথার্থ ভগবানের সেবা। আমাদের সমাজে কত অনাথ বালক রাস্তায় রাস্তায় পড়িয়া আছে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহা কেহ একবার চক্ষু মেলিয়া দেখে না। দেখুন, খৃষ্টান মিশনরীরা এই সব অনাথদের লইয়া আশ্রম খুলিয়াছে এবং প্রতি বৎসরে তাহাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতেছে। এইরূপে আমাদের সমাজ দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে।' প্রাণকৃষ্ণবাবু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহারা স্বামীস্ত্রী মিলিয়া উভয়ে যে অনাথ-আশ্রমটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। আশ্রম হইতে বাহির হইয়া তিনি আমার নিকট ইহাদের উদারতা এবং পরার্থপরতার কথা বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম অনাথ বালকদের জন্য তাঁহারও অন্তর কিরূপ ব্যথিত।

কয়েক বৎসর পরে আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুরে যাই। তথায় দেখিলাম তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ নানা মিথ্যা কথা রটনা করিতেছে। স্থানীয় সংবাদপত্রেও কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় জঙ্গীপুরে আসেন—তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল এবং তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহার নিকট স্বামী অখণ্ডানন্দের কথা তুলিলাম। তিনি বলিলেন, "ভাল কাজ করিতে গেলে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা নানা মিথ্যা রটনা করে। তাহার উপর তিনি গ্রামে গিয়া কাজ করেন। দুর্ভিক্ষে তিনি কত লোককে সাহায্য করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে অনেক নিমকহারাম ব্যক্তি স্বামীজীকে গ্রাম হইতে সরাইবার চেষ্টায় আছে। আমি তাঁর সম্বন্ধে সবই জানি—এইরূপ নিঃস্বার্থ উদার পরহিতব্রতী সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। আমি স্থানীয় কাগজওয়ালাদের সাবধান করিয়া দিয়াছি। স্বামীজী প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসেন। তাঁর পিছনে যারা লাগিয়াছে তারা সবাই স্বার্থপর নীচ লোক। স্বামীজীর কোন অনিষ্ট করিবার সাধ্য তাদের নাই। মুর্শিদাবাদের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে ভাল করিয়াই জানে—সবাই তাঁহাকে ভক্তি করে।"

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠবাবু অখণ্ডানন্দ-স্বামীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে বলিলেন, "দেখ,—গ্রাম্য লোকেরা পুকুর-ডোবা কি রকম নোংরা রাখে। পুকুরের পাড় তো সাধারণ লোকের পায়খানা, আর পুকুরেই শৌচাদি করে। স্বামী অখণ্ডানন্দ একদিন গ্রামবাসীদের বলেন, 'এই পুকুরের জল নিয়ে তোমরা রান্নাবান্না কর—পান

কর, আর সেই জলকে এই রকম নোংরা করছ।' এই কথায় কতক লোক তাঁর বিরুদ্ধে দল বাঁধে. লজ্জাশীলতার হানি করা হয়েছে বলে ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানায়, আর স্থানীয় কোন কোন কাগজে নানা মিথ্যা কথা ছাপায়। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ রাজ-পুরুষেরা সকলেই তাঁকে ভক্তি করেন—তাঁরা সকলেই তাঁর সাধু চরিত্র ও নিষ্কাম সেবায় মুগ্ধ। সুতরাং ওরা অনিষ্ট তো করতেই পারেনি, পরন্তু 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী'তে কয়েকটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা ও আদর্শ চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ঐসব হীন ব্যক্তিরা আমাদের কাছেও এসেছিল —কিন্তু বকুনি খেয়ে পালিয়ে যায়।" গ্রামোন্নতির কাজে ইনিই সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।

লালগোলার স্বনামধন্য বদান্যবর স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তিনি আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি তথায় গিয়া তাঁহার অতিথি-ভবনে থাকি—সেখানে বৈকুণ্ঠবাবুও ছিলেন এবং উহার অপরাংশে কয়েকটি অনাথ বালক লইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন। অনাথ বালকদের মধ্যে কয়েকটি গুর্খা বালকও ছিল। দেখিলাম মহারাজই তাঁহাদের পিতামাতার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। লালগোলার মহারাজ তখন 'রাও সাহেব' ছিলেন—তাহার অনেক পরে 'মহারাজ' উপাধি সরকার হইতে পান। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার মুখেই শুনিলাম যে লালগোলার মহারাজ এই অনাথ বালকদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। মহারাজ অনাথ বালকদের তথায় আনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন —তাই তিনি ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। প্রাতঃকালে ছেলেদের মুখে স্তোত্র পাঠ শুনিয়া ও তাহাদের শান্ত স্বভাব এবং হাস্যানন দেখিয়া সকলেই আনন্দলাভ করিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দও জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিশেষে অনাথ বালক লইয়া আশ্রমকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি আমাকে তখন বলিয়াছিলেন—স্কুলে লেখাপড়া, কিছু কারিগরি-শিল্প-শিক্ষা আর প্রাথমিক বিজ্ঞান শিখিবার জন্য কিছু সাজ-সরঞ্জাম থাকবে। আশ্রমে হিন্দু মুসলমান অনাথ বালক থাকবে—ভজন-মন্দিরে তারা নিজের নিজের ধর্ম স্বাধীন-ভাবে পালন করতে পারবে।

অনাথাশ্রমে শিক্ষাপ্রচার, কারিগরি কাজ, কুটীর-শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও ভাব যাহাতে বাল্যকাল হইতে তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়—ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। ভাবতা মহুলায় যখন তিনি অনাথাশ্রমের প্রথম উদ্যোগ করেন তখন 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র স্তম্ভে অনাথাশ্রমের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য আবেদন প্রকাশিত হইত। মাঝে মাঝে কোন কোন দর্শক অখণ্ডানন্দস্বামী-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র অনাথাশ্রমের কার্যপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ইংরেজী দৈনিক 'মিরর' ও বাংলা 'বসুমতী' প্রভৃতি সংবাদপত্রে শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আদেশ পাইয়াই তিনি মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ত্যাগ করেন নাই। কতবার দেখিয়াছি পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ সারদা-নন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে মঠে আসিয়া থাকিতে বলিয়াছেন, কারণ কঠোর পরিশ্রমে অস্বাস্থ্যকর ম্যালেরিয়া-প্রবণ গ্রামে একাদিক্রমে বাস করিয়া এবং আহারাদি সময়মত না করায় দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছিল। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ঐখানেই ছিলেন, আমাকে তিনি একদিন বলেন, "তুমি

সারগাছি আশ্রমে যাওনি—কি সুন্দর স্থান—চারদিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর, আর সুজলা সুফলা জমি—গাছপালা ফলফুলে কি মনোরম!" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ গঙ্গাতীরে এই বেলুড় মঠও কত সুন্দর, চারদিকে ফলফুলের গাছ দিয়ে মহারাজ কত যত্নে সাজিয়েছেন। আমাদের তো এখানে এলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "সারগাছিতে এলে আরো প্রাণ জুড়াবে। সেখানে কলের চিমনির ধোঁয়া নেই—শহরের গোলমাল নেই—নির্জন নিস্তব্ধ। সাধনভজনের পক্ষে খুব চমৎকার স্থান। তুমি যদি যাও তো ভুলতে পারবে না।"—আমি নিরুত্তর রহিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, "এও খুব ভাল স্থান—স্বামীজী এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজা-মহারাজ এর কত যত্ন করেছেন—ফলফুলের নানাবিধ গাছ এনে সাজিয়েছেন। কলকাতা শহরের হট্টগোলের চেয়ে খুব ভাল। এতগুলি সাধু-ব্রহ্মচারী রয়েছেন, এঁদের সমবেত ধ্যান-ধারণা ও তপস্যায় জায়গাটি পবিত্র তীর্থ হয়ে গিয়েছে। তবে এখানে জল তত ভাল নয়, আমার শরীর সারগাছিতে ভাল থাকে। সে জায়গাও কলকাতার নিকটে। কয়েক ঘণ্টার পৌছান যায়। তুমি একবার যেও।"

তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসুমতীতে আমার যে লেখা বেরুচ্ছে তা পড়েছ?" আমি উত্তরে বলিলাম "আজ্ঞে না, আপনি যে বসুমতীতে লিখছেন—তা তো আমি জানি না। উদ্বোধনে আপনার যা লেখা বেরিয়েছিল তা পড়েছি।" তিনি বলিলেন, "বসুমতীতে আমার স্মৃতিকথা লিখছি—তাতে অনেক পুরানো কথা জানতে পারবে।" আমি বলিলাম, "মহারাজ, আপনার তিব্বত ভ্রমণ অসমাপ্ত হয়ে রয়েছে। ঐটি শেষ হ'লে অনেক বিষয় জানা যেত। আপনার রচনা ও বলবার ধরন বেশ সুন্দর—মনে একটা সুস্পষ্ট ছবি পড়ে।" তিনি বলিলেন, "আমার লেখা তোমার ভাল লাগে?" আমি বলিলাম, "আপনার রচনায় বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে। অতি প্রাঞ্জল—অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষা আর ভাব।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বটে! কি জান—আমরা সেকেলে লোক—সেকেলে ভাষা। এখনকার আধুনিক ভাষা ব্যাকরণের বালাই নেই। শুদ্ধাশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ নেই।—আমাদের কাছে তা ভাল লাগে না। শুদ্ধ-শব্দ হ'লে না ভাষা। দেখনা আজকাল ছেলে-মেয়েদের গান: 'প্রলয়-নাচন নাচলে যখন' এই সব গান প্রলয়কে ডেকে আনছে। আমি যখন শুনি—তখন মনে হয় এইসব ছেলেমেয়ের কণ্ঠে এই প্রলয়ভাবের গান সত্যি সমাজে প্রলয়কে—বিপ্লবকে ডেকে আনবে। এ তো ভক্তির আবাহন নয়।"

পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজের এই বাণী আজ সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। সমাজে সর্বত্র আজ প্রলয় উপস্থিত। গঠনের চেয়ে ভাঙাই আজ প্রবল। যুদ্ধ, মহামারী, ভূমিকম্প, সমাজ বিপ্লব জগৎকে তোলপাড় করিতেছে। তাই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জগতের দুর্দশার ভাবছবি দেখিয়াই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "প্রলয়-তাণ্ডবকে আবাহন করা হচ্ছে—এতে ভক্তির আবাহন নাই।"

*　　*　　*

ধ্যানজপ তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল। একদিন বেলুড় মঠে তিনি সহজভাবেই বসিয়া আছেন, আমি তাঁর পাদবন্দনা করিয়া প্রণাম করিতেছি—তিনি যেন চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'আমি জপ করছি, এমন সময়ে পাদস্পর্শ ক'রে

প্রণাম করতে নেই।' এই বলিয়া তিনি অনেকক্ষণ নীরবে সেইভাবে বসিয়া রহিলেন। বাহ্য ভাবে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না যে তিনি ধ্যানজপ করিতেছেন। খুব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান লোক বুঝিতে পারিত যে তিনি ধীর স্থির গম্ভীর প্রশান্তভাবে বসিয়া কোন ভাব-রাজ্যে রহিয়াছেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, 'সাধুকে দেখলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয়। সহসা পাদস্পর্শ করতে নেই। কেননা সাধু কোন্ সময়ে কোন্ ভাবে থাকেন তা বাইরে থেকে সব সময় বোঝা যায় না। mood (ভাব) দেখে প্রণাম করতে হয়। যখন আলাপ-আলোচনা বা বাইরে আনন্দ করছেন তখন পাদস্পর্শ ক'রে সাধুকে প্রণাম করতে হয়। চুপ ক'রে সাধু বসে আছেন দেখেই সাধারণ লোকের মত আলাপ করতে নেই। যখন সাধু কুশলাদি প্রশ্ন করেন—তখন কথাবার্তা প্রণামাদি সব করতে পারা যায়।' পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজের এই কথাগুলি আজও হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

তুর্যগা গতি—সে কি দিবে মোরে?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

দুঃখ কোথায়? সবি আনন্দ দেবতার গানে গানে,
অনাসক্তিতে সাত্ত্বিকী ধৃতি এনেছে শান্তি প্রাণে।
আকাশ-বীণায় সুরে আলাপন
কান পেতে শুনি, করি আরাধন,
বর্তমানের ভেসে যাওয়া দিন আগামী কালের তীরে
রেখে দেবে মোর প্রাণের পূজার অর্ঘ্যপুষ্পটীরে।

অযুত বরষ ধরিয়া আমার তারি সাথে লীলা খেলা,
ভেদের ভিতরে অভেদ হবো কি সাধনায় এই বেলা?
তুর্যগা গতি সে কি দিবে মোরে?
জ্ঞানের ভূমিতে মোরে জয়ী ক'রে
মায়াময় অবগুণ্ঠন খুলে নেবে কি আমারে কাছে?
কত সাধ মোর, নির্বাক্ হয়ে মিশিতে তাহারি মাঝে।

নিত্যলীলার স্বরূপ প্রকাশ জীব-ঈশ্বর সাথে
অহরহ আনে প্রেম-উল্লাস নিবিড় দৃষ্টিপাতে।
তপে জপে আর ধেয়ানে মননে
ব্রহ্ম-বিহার চলে উদয়নে,
ভাবে অনুভাবে স্পন্দন জাগে তুরীয় ভূমির স্তরে,
জড় পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা দূরে যায় ক্ষণ তরে।

চিৎপ্রদীপের আলোক-শিখায় হৃদয় দেউল জ্বলে,
ধ্যানের অর্ঘ্য পাদপীঠে শোভে চিত্তকুসুম দলে।
নীরবে পুড়িছে জীবনের ধূপ,
রূপের ঘরেতে এলো কি অরূপ।
এলো কি আমার পরমাত্মাতে বন্দনা লভিবারে,
করেছি তাঁহার পূজা আয়োজন আমারে যে সঁপিবারে।

সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রভাব

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

পৃথিবীর ইতিহাস অনুধ্যান করিলে দেখা যায় যে ধর্মাচার্যগণের জীবনের ঘটনাবলী সমগ্র মানবজাতির সমাজগত কল্যাণে স্বল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সকলকে স্বধর্মপালনের উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এখনও সমগ্র ভারতের সমাজগত জীবনে সাম্যবাদ প্রচার করিতেছে।

ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং বিশ্বমৈত্রী প্রচার করিয়া জীবহিংসার প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রায় এক সহস্র বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতে সমাজগত জীবনের উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ভগবান যীশু আত্মবিসর্জনের দ্বারা এবং মানবপ্রেমের দ্বারা ইহুদী সমাজে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম এখনও সমগ্র জগতের সমাজগত জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ভগবান বুদ্ধদেবের পর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীরামানুজই প্রথমে ভারতের তথাকথিত নিম্নবর্ণের উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাদের জন্য মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। পরের শতাব্দীতে শ্রীরামানন্দ ও কবীর সকলকে সাম্যসূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কবীর বলেন:

> জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ ঔর মুলুক কেহি কেরা।
> তীরথ মূরত রাম নিবাসী বাহর করে কো হেরা।
> পূরব দিসা হরিকৌ বাসা পশ্চিম অলহ মুকামা।
> দিলমে খোজ দিলহিমে খোজ ইহৈ করীমা রামা।
> জেতে ঔরত মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্হারা।
> কবীর পোংগড়া অলহ রামকা সো গুরু পীর হমারা।

—যদি খোদা থাকেন মসজিদে, তবে বাকি জগৎটা কার? তীর্থ, মূর্তি সব রামের মধ্যেই রহিয়াছে। বাহিরে কে খুঁজে মরে? পূর্বদিকে হরির বাস, আর পশ্চিমে নাকি আল্লার মোকাম। অন্তরে খোঁজ, কেবলমাত্র অন্তরেই খোঁজ, এখানে আছেন করীম, এখানেই আছেন রাম। হে রাম, যত নরনারী সব তোমারই রূপ। কবীর আল্লা রামের ছেলে। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

শ্রীরামানন্দ ও কবীর কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া ভারতের সমাজগত জীবনটি পারস্পরিক প্রেম ও সম্মানের ভিত্তিতে গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর আদিতে বঙ্গদেশে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার জাতিধর্মনির্বিশেষ প্রেম ও ঈশ্বরভক্তির দ্বারা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমাজগত সাম্য ও ঐক্য আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উক্ত শতাব্দীতেই পাঞ্জাবে গুরু নানক আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ধর্মকে ঔপনিষদ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া—জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্ম বিচার না করিয়া সমাজগত জীবনের বৈষম্য ও অত্যাচার বিদূরিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদ মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যে তাঁহার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সামাজিক সাম্য মহম্মদীয় ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাই সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রাণ। উহা না থাকিলে কোন ধর্মই মানবসমাজকে উন্নীত করিতে পারে না। এই প্রাণশক্তির দ্বারাই সকল ধর্ম জগতে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। যে কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মের কষ্টিপাথর এই যে সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়া কত ব্যক্তি প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। যে ধর্ম কেবল পুঁথি, পদ্ধতি, ও প্রচারের উপর দাঁড়ায় তাহার দ্বারা মানবজাতির সমাজগত জীবনের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ধর্ম সব সময় মানুষকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য করে, মানুষকে ধরিয়া রাখে, রক্ষা করে, এবং কখনও নেতিমূলক ও ধ্বংসানুকূল নয়। ধর্মের ইতিহাসে যে সব অন্যায়, অত্যাচার, রক্তপাত, সামাজিক বিদ্বেষ ও অনৈক্যের কথা পাই—উহার মূলে হৃদয়হীন অজ্ঞানমূলক মনুষ্যের বুদ্ধি থাকিয়া ধর্মের বিপর্যয় সাধন করিয়াছে।

কিছুকাল পূর্বে রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা জাতিগত (national) ছিল, এখন আর জাতিগত ভিত্তিতে (national grounds) সেগুলির সমাধান হইবে না। কারণ, বর্তমান জগতের পরিস্থিতি প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক (international) হইয়া উঠিতেছে। সেগুলি এখন কোন বিশেষ জাতির সমস্যা না হইয়া মানবের সমাজগত জীবনের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব মানবের সমাজগত জীবন এখন মানবের অন্তর্নিহিত সুখ বা বেদনার উপর দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইতেছে। এ অবস্থায় মানবের আত্মাকে ধরিয়া মানবসমাজ গঠিত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্যক্তিগত, বর্ণগত, সম্প্রদায়গত ও বিশিষ্ট দেশগত আত্মার সুখ বা বেদনা এখন নিখিল মানবাত্মার অগাধ সমুদ্রে বিলীন হইতে চলিয়াছে। যাঁহারা জগৎকল্যাণে সমুৎসুক, যাঁহারা মানবের সমাজগত সমগ্র জীবনটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ করিতে চাহেন না, তাঁহাদের মনে জগতের বর্তমান পরিস্থিতি নানা উদ্বেগের সৃষ্টি করিতেছে। আত্মোপলব্ধির দ্বারাই নিখিল মানবাত্মার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃত ধর্ম আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভর করে, এবং আধ্যাত্মিকতাই নিখিল মানবাত্মার উপলব্ধি বিষয়ে সহায়ক। অতএব নিখিল মানব-সমাজের সমাজগত জীবন আধ্যাত্মিকতার উপরই নির্ভর করিতেছে। এইজন্য ধর্মের আধ্যাত্মিক প্রভাব জগতে থাকিবেই থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন: যদি জগতে সর্বজনীন ধর্ম কখনও হয়, তাহা হইলে উহা কোন বিশিষ্ট স্থান বা কালের উপর দাঁড়াইবে না। উহা বিশ্বাত্মা ভগবানের ন্যায় অনন্ত স্বরূপে স্থির থাকিবে। সে ধর্মের সূর্য কৃষ্ণ-ভক্ত এবং খ্রীষ্ট-ভক্ত, পাপী এবং পুণ্যাত্মা, সকলের উপর সমভাবে কিরণ বর্ষণ করিবে। উহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম বা মহম্মদীয় ধর্ম হইবে না। উহা সকল ধর্মের সমষ্টি হইবে, অথচ উহার বিকাশের জন্য অসীম স্থান থাকিবে—যাহাতে উক্ত ধর্ম সকলকে অনন্ত বাহুর দ্বারা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে। এইরূপ ধর্মে নিকৃষ্টতম অসভ্য মানুষ হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহামানবের স্থান থাকিবে।

সমগ্র বিশ্বের, সমগ্র মানবসমাজের, এবং সমগ্র জীবনসমষ্টির মূলীভূত ঐক্য অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার দ্বারাই সম্ভব। অতএব সমাজজীবনে ধর্মের প্রভাব অনিবার্য।

মধ্যযুগের ইওরোপে সন্ন্যাসী-সংঘের প্রসার

অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সূচনা

ইওরোপের ধর্মনৈতিক ইতিহাসে সন্ন্যাস-ব্রতের সূচনা হয় আজ থেকে প্রায় ১,৫০০ বৎসর পূর্বে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রোমান সম্রাট কন্স্টান্টাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে রোমান চার্চ রাষ্ট্রানুকূল্য লাভ করে এবং তার পর থেকেই শুরু হয় এর গৌরবময় জয়যাত্রা। চার্চের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ধন-ভাণ্ডারও স্ফীত হ'তে থাকে এবং সেই ধনের আকর্ষণে এমন বহু লোক চার্চে প্রবেশ করে, যাদের প্রেরণা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ছিল না বলেই মনে হয়। বিশেষ ক'রে যখন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ আইন ক'রে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ বাধ্যতামূলক ক'রে তোলেন (সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াসের বিধান —৩৯২ খৃঃ) তখন এই ধর্মে তথাকথিত বিশ্বাসী-দের মধ্যে অনেকেরই যে আন্তরিকতার অভাব দেখা গিয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শুধু তাই নয়, চার্চের বহু উচ্চ পদেও তখন এমন সব লোক দেখা যায়—যাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ছিল পবিত্রতার নামগন্ধহীন।

এক দিকে যেমন জনচিত্তের উপর রাষ্ট্রের প্রভাবের চেয়ে চার্চের প্রভাব বড় হয়ে ওঠে, অপরদিকে তেমনি সাধারণ অভিজাতদের তুলনায় চার্চের যাজকদের ঐশ্বর্যের খ্যাতি বেশী ছড়িয়ে পড়ে। চার্চের এই ঐশ্বর্যের কিছুটা অবশ্য অনাথ-আতুরের সেবায় এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যে ব্যয়িত হয়েছিল, কিন্তু এর অধিকাংশই গিয়েছিল চার্চের বাহ্য আড়ম্বর প্রকাশের চেষ্টায় এবং তার নেতাদের বিলাস-ব্যসনে। এই ঐশ্বর্যবৃদ্ধির আর একটি কুফল দেখা গিয়েছিল চার্চের সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষের সংযোগ-বিলোপে। ধনগর্বিত রোমান চার্চ ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে তার বহুদিনকার সংগ্রাম প্রায় বন্ধ ক'রে দেয় এবং ব্যভিচারপূর্ণ রোমান অভিজাত সমাজের সঙ্গে আপোষ করে। চার্চের এই আদর্শচ্যুতি, আড়ম্বরপ্রিয়তা ও আচার-সর্বস্বতা, এবং তার নেতাদের এই বিলাস-ব্যসনের আধিক্য স্বভাবতই বহু সত্যকারের ধার্মিক খৃষ্টানকে ব্যথিত করে, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে এই সব গোলযোগের মূলে রয়েছে চার্চের বিরাট সংগঠন-প্রচেষ্টা।

বিরাট সংগঠন মাত্রই আর্থিক সমৃদ্ধির অপেক্ষা রাখে এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সাধনায় রত হ'লে বিলাস-ব্যসন এবং নৈতিক কলুষ এসে পড়তে বাধ্য। অতএব তাঁরা সমস্ত সংগঠন প্রচেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে জাগতিক বৈভব থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেন বিশ্বাসীদের এবং সত্যকারের আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনের জন্য সংসারত্যাগ এবং সন্ন্যাসব্রত-গ্রহণের আবশ্যকতা প্রচার করেন।

এইভাবেই প্রথম ব্যাপকরূপে সন্ন্যাসব্রতের সূচনা হয় ইওরোপের ধর্মনৈতিক ইতিহাসে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে সন্ন্যাসের আদর্শকে শুধুমাত্র চার্চের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ব'লে ব্যাখ্যা করলে সে ব্যাখ্যা নিতান্তই আংশিক ও একদেশদর্শী হবে। কারণ খৃষ্টধর্ম ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এই সন্ন্যাসের আদর্শ এবং সন্ন্যাসী-সংঘ গঠনের প্রচেষ্টা দেখা যায়, এবং ঈশ্বরলাভের জন্য সংসার পরিত্যাগ ক'রে নির্জনে ধ্যানধারণা

ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়াসকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের একটি সাধারণ আদর্শ ব'লে মনে করা যেতে পারে। এই সন্ন্যাসের আদর্শ খৃষ্টধর্মের আদিরূপটির মধ্যেও বীজাকারে নিহিত ছিল, পরে সম্ভবতঃ প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রভাবে এ আদর্শ দ্রুত অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। ভোগসর্বস্ব ঐহিক জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সে জীবনকে অতিক্রম করার চেষ্টা যে প্রথম প্রাচ্যদেশেই দেখা দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং পরে সেই চেষ্টা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করে ও খৃষ্টধর্মকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। খৃষ্টধর্ম রাজধর্মে পরিণত হবার পূর্বেই ইওরোপে সন্ন্যাসব্রতের সূচনা হয়, যদিও চার্চের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তিবৃদ্ধি এই আন্দোলনকে নিঃসংশয়ে আরও শক্তিশালী ক'রে তোলে।

প্রথম বিকাশ

খৃষ্টধর্মের গণ্ডির মধ্যে সন্ন্যাসের আদর্শ প্রথম বিকাশ লাভ করে মিশরে। সেখানে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই আদর্শের প্রথম প্রকাশ হয় এবং পরবর্তী শতাব্দীতে মিশর থেকে এই আদর্শ প্রসারিত হয় পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন দেশে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম ইওরোপও এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতে আরম্ভ করে এবং আরও একশত বৎসরের মধ্যে সন্ন্যাস-আন্দোলন সমস্ত পশ্চিম ইওরোপে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র জীবন যাপনের চেষ্টা, দীর্ঘকালব্যাপী প্রার্থনা এবং উপবাস,—এই ছিল প্রথম যুগের সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসব্রতের অঙ্গ। কিন্তু শীঘ্রই মিশরে 'অ্যাঙ্কোরাইট' বা 'হার্মিট' নামধারী সন্ন্যাসীরা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য সম্পূর্ণভাবে সংসার ত্যাগ এবং লোকালয় বর্জন করতে আরম্ভ করেন। শরীর-ধারণের জন্য যেটুকু আহার, নিদ্রা বা বেশবাস প্রয়োজন মাত্র সেইটুকুই তাঁরা গ্রহণ করতেন এবং দেহ ও মনের পাপ দূর করার জন্য যতদূর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সম্ভব তা তাঁরা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে করতেন। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুপরিবর্তন অগ্রাহ্য ক'রে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা উপেক্ষা ক'রে সঙ্কীর্ণ পর্বতগুহায় বা ধূসর মরুভূমির মধ্যে দিনের পর দিন তাঁরা ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকতেন। এই ধরনের সন্ন্যাসীদের মধ্যে আমরা প্রথমেই সাধু অ্যাটনির নাম করতে পারি, যাঁর জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ২৫০ খৃষ্টাব্দে। এঁদের অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আজকের সংশয়বাদীদের কাছে ধর্মোন্মত্ততা বা ধর্মবাতিক বলেই মনে হবে, কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধনের বিনিময়ে এঁরা যে প্রগাঢ় মানসিক শান্তি বা অন্তরের প্রসন্নতা লাভ করতেন তা আমরা এঁদের রচনা পাঠে স্পষ্টই বুঝতে পারি।

এদেরই একজন—সাধু জেরোম (খৃঃ ৩৪০-৪২০) তাঁর সন্ন্যাস জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, এবং জেরোমের এই কাহিনী থেকেই আমরা সিরিয়ার মরুভূমিতে তাঁর পাঁচ বৎসরব্যাপী কঠোর তপস্যা ও তাব শান্তিময় পরিসমাপ্তির কথা জানতে পারি। এই জেরোমের সম্পাদিত ল্যাটিন বাইবেল আজও ক্যাথলিক চার্চে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গণ্য হয় এবং জেরোমের এই রচনা ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যকে যে বিশেষ প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লোকশ্রুতি অনুসারে এই সন্ন্যাসীদের অনেকেই কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি লাভ করেছিলেন, বিশেষতঃ রোগ-নিরাময়ের ব্যাপারে; তবে এইসব লোকশ্রুতি কতটুকু সত্য তা বলা কঠিন। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে এই সময় আর একদল সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়, যাঁরা কৃচ্ছ্রসাধনে জেরোম বা অ্যান্টনিকেও ছাড়িয়ে যান। এঁরা প্রায়ই ঘাস বা লতাপাতা খেয়ে

প্রাণ ধারণ করতেন, এবং হয় গুহার মধ্যে—না হয় কোন স্তম্ভের উপর বসবাস করতেন। যাঁরা সারা জীবন স্তম্ভের উপর কাটাতেন তাঁদের নাম ছিল 'স্টাইলাইট' সন্ন্যাসী এবং এঁদের মধ্যে সাধু সাইমিয়নের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় (৫ম শতাব্দী)।

ড্যানিয়েল নামে এক স্টাইলাইট সন্ন্যাসীর ভক্ত ছিলেন বাইজান্টিয়ামের সম্রাট্ দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস্, এবং কথিত আছে প্রত্যেকবার ঝড়বৃষ্টি হওয়ার পর সম্রাট সন্ধান নিতেন সন্ন্যাসী স্তম্ভের উপর তখনও অক্ষতদেহে রয়েছেন কি না। অ্যালিপিয়াস নামে অপর এক সাধু একাদিক্রমে ৫৩ বৎসর এক স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত এর ফলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাঁকে স্তম্ভের উপর থেকে নামানো হয়। সুতরাং চূড়ান্ত শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন যে এঁদের সকলের জীবনেই শান্তি এনে দিত, তা মনে করলে ভুল করা হবে। সন্ন্যাসীদের আত্মনিগ্রহেরও যে একটা সীমা থাকা উচিত, এই সব সাধুদের জীবন আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই জন্যই বোধ হয় ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় যোগীদের পক্ষে পরিমিত আহার, বিহার ও নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। বুদ্ধদেবের কৃচ্ছ্রসাধনার ও তাঁর 'মঝ্ঝিম পন্থা'র কথাও এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমাদের মনে পড়ে।

বেসিলের নিয়মাবলী

কিন্তু এত কঠোর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সকল সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব বা স্বাভাবিক ছিল না। তাই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকেই ইওরোপের সন্ন্যাসীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন একক জীবন যাপনের রীতি পরিত্যাগ ক'রে সংঘ বা আশ্রম জীবনের সূচনা করেন। আনুমানিক ৩৪০ খৃঃ দক্ষিণ মিশরের থীব্‌স্ নামক স্থানে সাধু প্যাকোমিয়াস প্রথম এই ধরনের সন্ন্যাসী-সংঘ স্থাপন করেন। প্যাকোমিয়াসের আরব্ধ কার্য যাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে ক্যাপাডোসিয়ার বিশপ বেসিলই ছিলেন সর্বপ্রধান। অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধনের পরিবর্তে বেসিল সন্ন্যাসীদের এমনভাবে কায়িক পরিশ্রম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের ভরণ পোষণের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন। কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে সরল জীবন যাপন, দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ ও নিয়মিত ধ্যানধারণার রীতিও বেসিলের নূতন সন্ন্যাসী সংঘে প্রচলিত হয়। প্যাকোমিয়াসের সংঘের সন্ন্যাসীরা প্রধানত কৃষিকার্যের উন্নতির দিকে মন দিয়েছিলেন, বেসিলের অনুগামীরা অনাথ-আশ্রম ও বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী-সংঘ পরিচালনার জন্য বেসিল যে সব বিধিবিধান প্রণয়ন করেছিলেন পূর্ব ইওরোপের সংঘগুলিতে আজও সেগুলি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা হয়।

পূর্ব ইওরোপের মত পশ্চিম ইওরোপেও প্রথম দিকে হার্মিট্ সন্ন্যাসীদেরই বেশী দেখা গিয়েছিল, যাঁরা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় বিশ্বাস করতেন। ইটালিতে সাধু অ্যাথানাসিয়াস প্রথম এই রীতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ অল্পদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীদের সংঘজীবনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। বেসিলের নিয়মাবলী ল্যাটিন ভাষায় সংক্ষেপে অনূদিত হয় এবং ৪১০ খৃঃ জন ক্যাসিয়ান নামে এক সাধু মার্সাই এর নিকট তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বিশপ মার্টিন, যিনি 'গল' দেশে অর্থাৎ বর্তমান ফ্রান্সে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনিও এই নূতন ব্যবস্থার একজন প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠেন। উত্তর আফ্রিকার কার্থেজে স্বনামধন্য বিশপ অগষ্টাইন্ (৩৫৪-৪৩০ খৃঃ) তাঁর অধীনস্থ যাজকদের সন্ন্যাসজীবন যাপন করতে প্ররোচিত করেন। এতদিন পর্যন্ত যাঁরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চার্চের

কর্ম-নির্বাহক ছিলেন না, কিন্তু অগস্টাইনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে এর পর বহু বিশপ ও সাধারণ পুরোহিত সন্ন্যাসজীবন যাপনে প্রবৃত্ত হন।

সন্ন্যাসাশ্রমের উচ্চ আদর্শ কিন্তু পশ্চিম ইওরোপে অল্পদিনের মধ্যেই বিকৃত হয়ে পড়ে। সত্যকারের আধ্যাত্মিক প্রেরণা না পেয়েই বহু লোক সন্ন্যাসী-সংঘগুলিতে প্রবেশ করে। জীবিকাসংস্থানের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অথবা বাধ্যতামূলক সামরিক দায়িত্ব এড়াবার জন্য অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে, এবং তার ফলে পশ্চিম ইওরোপের বহু পরিবারে ভাঙ্গন দেখা যায়। সাধু অগষ্টাইন্ তাঁর নিজের অধীনস্থ সন্ন্যাসীদের কারও কারও মধ্যে আন্তরিকতার শোচনীয় অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। জেরোমের চিঠিপত্র থেকেও অনুরূপ তথ্যাদি জানা যায়।

বেনিডিক্ট

পশ্চিম ইওরোপে সন্ন্যাসের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক শক্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি হলেন নার্সিয়া-নিবাসী সাধু বেনিডিক্ট। ৪৮০ খৃঃ এক ধনী অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে বেনিডিক্ট সংসার ত্যাগ করেন এবং তারপর এক পর্বতের গুহায় তিন বৎসর ধরে চলে তাঁর নিঃসঙ্গ কঠোর সাধনা। এই তপস্যার খ্যাতি অচিরেই দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু সংসারতাপদগ্ধ লোক তাঁর কাছে শান্তি পাবার আশায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আনুমানিক ৫২০ খৃঃ—প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে, রোম ও নেপল্‌সের মধ্যবর্তী মণ্টে ক্যাসিনো নামে এক স্থানে পর্বতের উপর বেনিডিক্ট তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই আশ্রমের সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা-নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি এক নূতন নিয়মাবলীও প্রণয়ন করেন (৫২৯ খৃঃ)।

বেনিডিক্ট তাঁর সংঘের সাধুদের অতিশয় কৃচ্ছ সাধন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ক'রে দেন। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংঘপ্রধানের অনুমতি নিয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলত। সন্ন্যাসীদের যৌথ জীবন যাপনের উপর বেনিডিক্ট বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁদের সকলের একত্র আহার, নিদ্রা এবং প্রার্থনার সময় নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়। সন্ন্যাসীরা কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখতে পারতেন না, এমনকি তাঁদের নিজস্ব একখণ্ড পরিধেয় বস্ত্রও থাকত না। সমস্ত দিবারাত্রে তাঁদের দুবারের বেশী আহার করা চলত না এবং সংঘের মধ্যে কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংঘের সন্ন্যাসীরা পরিচ্ছন্ন থাকাকেও একটি বিলাস মনে করতেন এবং সুস্থদেহ সন্ন্যাসীদের স্নান করার অনুমতিও সহজে দেওয়া হ'ত না। অলস লোকেই সহজে দৈহিক ও মানসিক প্রলোভনের বশবর্তী হয় ব'লে সংঘের সন্ন্যাসীদের সব সময় কোন না কোন কাজ নিয়ে থাকতে হ'ত। তাঁরা হয় কৃষিকার্য নিয়ে থাকতেন, না হয় অনাথ আতুরের সেবায় বা পুস্তকের অনুকৃতি-রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন।

বেনিডিক্টের এই নিয়মাবলী আজও পশ্চিম ইওরোপের (আয়র্লণ্ড বাদে) সংঘগুলিতে অনুসরণ করা হয়, যেমন বেসিলের নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয় পূর্ব ইওরোপে। বেনিডিক্টের মৃত্যুর পর তাঁর আশ্রম লম্বার্ড আক্রমণকারীদের প্রচণ্ড আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় ও সন্ন্যাসীরা সাময়িক ভাবে রোমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রোমে এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বহু যাজক এই সংঘে যোগদান করেন এবং ক্রমশঃ সারা পশ্চিম ইওরোপে বেনিডিক্টের সন্ন্যাসী-সংঘের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ ক'রে সাধু ক্যাসিওডোরাসের চেষ্টার ফলে।

বেনিডিক্টের আন্দোলন সাময়িকভাবে সন্ন্যাসী-

সংঘের দুর্নীতিগুলি দূর করতে পারলেও রোমান চার্চের ঐশ্বর্যলোলুপতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তার মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম গ্রেগরি নামে এক মহাশক্তিশালী পোপের আবির্ভাব হয়, সেই সময় থেকেই রোমান চার্চ কেবলমাত্র ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে ধীরে ধীরে ইওরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ক্ষমতা-প্রসারের চেষ্টা করে। নবম ও দশম শতাব্দীতে ইউরোপের বিখ্যাত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটেরাও স্ব স্ব ক্ষমতা-বৃদ্ধির জন্য চার্চের উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করেন, এবং এরই ফলে শেষ পর্যন্ত ইওরোপের রাজশক্তি ও যাজকশক্তি জনসাধারণের আনুগত্য-লাভের জন্য প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। চার্চের শীর্ষস্থানীয় নেতারাই যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা-লাভের জন্য লোলুপ, তখন সাধারণ যাজকেরা যে দারিদ্র্যব্রতের গর্ব নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন, তা কল্পনা করাই বাতুলতা, বিলাস-ব্যসন এবং দুর্নীতি এ যুগের চার্চ-প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস ক'রে ফেলে এবং যাজকেরা সকলেই তাঁদের ধর্মনৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যলাভের সাধনায় মত্ত হন। চার্চের এই শোচনীয় পতন স্বভাবতই সত্যকারের ধার্মিকদের মনে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি দশম ও একাদশ শতাব্দীর ক্লুনিয়াক্ আন্দোলনে।

ক্লুনিয়াক সংঘ

ক্লুনিয়াক্ আন্দোলনের জন্ম হয় ফরাসীদেশের বার্গাণ্ডি অঞ্চলে অবস্থিত ক্লুনি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। এই গ্রামে ৯১০ খৃঃ ডিউক উইলিয়াম নামে জনৈক ধর্মভীরু ফরাসী সামন্তের চেষ্টায় একটি সন্ন্যাসী-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংঘের সন্ন্যাসীরা মূলতঃ বেনিডিক্টের নিয়মাবলীই অনুসরণ ক'রে চলতেন এবং একমাত্র পোপ ব্যতীত অন্য কোন যাজকের নির্দেশ তাঁরা গ্রহণ করতেন না। কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা এই সংঘের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সংঘের নেতার কর্তৃত্ব সকলে নতমস্তকে স্বীকার ক'রে চলতেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ক্লুনিয়াক্ সংঘের শাখাপ্রশাখা প্রসারিত হয়। চার্চের দুর্নীতি দূর করার জন্য ক্লুনিয়াক্ নেতারা দুটি মূলনীতি গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তাঁরা যাজকদের সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্যের প্রলোভন থেকে দূরে থাকবার ও কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন যাপন করবার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা বলেন যে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই চার্চ রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করবে না। পোপের ক্ষমতাকে অসীম বলেই তাঁরা ঘোষণা করেন। ক্লুনিয়াক্ সাধুরা ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সরল ও পবিত্র জীবনযাপন করতেন এবং জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিতেন। তাঁদের আদর্শ ইওরোপের কয়েকজন সম্রাট ও পোপকে প্রভাবিত করে এবং চার্চের ভিতরে কিছুটা সংস্কারও এর ফলে সম্ভব হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লুনিয়াক্ আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এর ফলে চার্চের দুর্নীতি দূর হওয়ার চেয়েও পোপের ক্ষমতা-বৃদ্ধিই বেশী দেখা গিয়েছিল, এবং ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ হিল্‌ডিব্রাণ্ড এই ক্লুনিয়াক্ নীতি অনুসরণ করে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্‌কে তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করতে বাধ্য করেন।

ফ্র্যান্স

খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে ইওরোপে শেষবারের মত সন্ন্যাস-আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করে। বহু নূতন সন্ন্যাসী-সংঘ এই সময়ে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে আত্মপ্রকাশ করে, এবং এদের মধ্যে কোন কোন সংঘে প্রাচীন যুগের 'হার্মিট্'দের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের রীতি প্রচলিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আমরা

প্রথমেই জার্মাণ সন্ন্যাসী ব্রুনের প্রতিষ্ঠিত কার্থু্সিয়ান সংঘের নাম করতে পারি। এই সংঘের সন্ন্যাসীরা এক আশ্রমে বসবাস করেও প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন এবং সমস্ত সময়ই ধ্যানধারণায় অথবা জ্ঞান-আহরণে নিযুক্ত থাকতেন। ইটালী এবং ইংলণ্ডে এই সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কঠোর শৃঙ্খলারক্ষা ও অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য এই সংঘের নাম সর্বত্র প্রচারিত হয়।

এ যুগের আর একটি বিখ্যাত সন্ন্যাসী-সংঘ হচ্ছে ফরাসীদেশের বার্গাণ্ডি অঞ্চলে সাধু রবার্টের প্রতিষ্ঠিত সিস্টার্সিয়ান্ সংঘ। এই সংঘের সব চেয়ে বিখ্যাত মহান্ত ছিলেন সাধু বার্নার্ড (মৃত্যু ১১৫৩)। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে দ্বিতীয় ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ইনিই প্ররোচিত করেছিলেন। এই সংঘের সন্ন্যাসীরাও কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন যাপন করতেন এবং কৃষিকার্যের ব্যাপারে, বিশেষতঃ পতিত জমি উদ্ধারের ব্যাপারে তাঁরা অগ্রণী হন।

সন্ন্যাসী-সংঘের অনুকরণে কয়েকটি সন্ন্যাসিনী সংঘও ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠে। স্ত্রীলোকদের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অবশ্য ইওরোপের ইতিহাসে একেবারে নূতন ঘটনা নয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই আমরা ইওরোপের প্রথম সন্ন্যাসিনীদের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু ১২শ শতাব্দীতেই প্রথম সন্ন্যাসিনী-সংঘ গঠনের চেষ্টা হয় এবং এই ব্যাপারে চার্চেরই কোন কোন নেতা অগ্রণী হয়েছিলেন। কোথাও কোথাও সন্ন্যাসিনী-সংঘগুলি সন্ন্যাসী-সংঘেরই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠে। ১১৩১ খৃঃ ইংলণ্ডের লিঙ্কন-শায়ার অঞ্চলে গিলবার্ট নামে জনৈক যাজক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের এক যুক্ত সংঘ স্থাপন করেন। চার্চের যাজকদেরও এই সময় অনেক ক্ষেত্রে সাধু অগস্টাইনের বিধান-অনুসারে সংঘ-জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়।

কার্থু্সিয়ান্ বা সিষ্টার্সিয়ান্ সংঘের পরিণাম পূর্ববর্তী যুগের ক্লুনিয়াক্ সংঘের পরিণাম থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র ধরনের হয়নি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে সংঘগুলির অসাধারণ ঐশ্বর্য-বৃদ্ধি। সংঘের সন্ন্যাসীরা ব্যক্তিগত জীবনে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করলেও সংঘ-জীবন যাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন অনুভব করতেন, এবং এই অর্থ প্রচুর পরিমাণেই এসেছিল ভক্তমণ্ডলীর নিকট থেকে। বিরাট সংগঠন এবং প্রচুর ঐশ্বর্য পরিমাণে সংঘের মূল আদর্শ-সিদ্ধির অন্তরায়ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সংঘের সাধুরা মূলতঃ বেনিডিক্ট-পন্থী হওয়ায় কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করতেন, সমাজ-সেবার সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছিল গৌণ। তাছাড়া তাঁদের কর্মক্ষেত্রও ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইওরোপের গ্রামগুলিতে সীমাবদ্ধ। ১২শ শতাব্দী হতে ইওরোপে যে নূতন নাগরিক ও বণিক সভ্যতার প্রসার আরম্ভ হয় তার সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করেছিলেন এই প্রাচীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়গুলি। অথচ ইওরোপের বহুজাতি অধ্যুষিত, ধর্মভাব-বিবর্জিত এই নগরগুলিতেই ধর্মপ্রচারের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। এই নূতন প্রয়োজন মিটাবার ভার গ্রহণ করে এ-যুগের দুটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের প্রতিষ্ঠান—ফ্রানসিস্কান ও ডোমিনিকান ভ্রাতৃসংঘ। ফ্রানসিস্কান ও ডোমিনিকান সংঘের প্রচারকেরা প্রচলিত অর্থে ঠিক সন্ন্যাসী ছিলেন না, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার চেয়েও জনসমষ্টির সেবা ও তার মধ্যে ধর্মভাব উদ্দীপন করার প্রয়াসকে তাঁদের মহত্তর কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইওরোপের নূতন নগরগুলিই ছিল বিশেষভাবে তাঁদের কর্মক্ষেত্র এবং এই নগরের জনতার সঙ্গে তাঁদের সংযোগও ছিল খুব গভীর। নূতন আদর্শে গঠিত এই দুটি ভ্রাতৃসংঘের আবির্ভাবের পর থেকেই প্রাচীন সংঘগুলি ধীরে ধীরে তাদের জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে, এবং শেষে প্রায় বিলুপ্ত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইও-রোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কালে।

ফ্রান্সিস্কান

ফ্রানসিস্কান ও ডোমিনিকান ভ্রাতৃসংঘ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। ফ্রানসিস্কান সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আসিসির বিখ্যাত সাধু ফ্রান্সিস্ (১১৮২-১২২৬)

ইনি এক ধনী বস্ত্রব্যবসায়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবনে এঁর মনে সৈনিক হবার বাসনাই ছিল প্রবল। কিন্তু প্রথম যৌবনে একবার দীর্ঘ রোগভোগের পর এঁর মনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে, যার ফলে ভিক্ষুকের ছিন্ন বস্ত্র ধারণ ক'রে ইনি সংসার পরিত্যাগ করেন এবং সমাজের দুর্গত ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সেবায় নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করেন। ফ্রান্সিস্ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যীশু-খৃষ্টের প্রতিটি আচরণ অনুকরণ করবার চেষ্টা করতেন এবং খৃষ্টের মত কুষ্ঠরোগীদের সেবাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হতেন না। তাঁর অনুগামীরা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাস করতেন না এবং জনসাধারণের মধ্যে তাদের নিজেদের ভাষায় (ল্যাটিনে নয়) খৃষ্টের বাণী প্রচার করাকেই তাঁরা তাঁদের পবিত্রতম কর্তব্য বলে মনে করতেন। গ্রামের দরিদ্র কৃষকের কুটির বা সহরের দুঃস্থ শ্রমিকের বস্তি—কোন স্থানই তাঁদের অগম্য ছিল না, এইভাবে সমস্ত ইটালিতে এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশেও ধর্মপ্রচার ক'রে তাঁরা সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়েছিলেন ও বহু অবিশ্বাসীর বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন। সংঘ-গঠন বা জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে সাধু ফ্রান্সিস্ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু ভ্রাতৃসংঘের প্রচারকদের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ তাঁর মতে ছিল একান্ত অপরিহার্য। এই প্রচারকেরা ব্যষ্টিগত-ভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কোন ধনসঞ্চয় করতে পারতেন না, এমনকি তাঁদের নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তাঁদের দৈনন্দিন পরিশ্রম করতে হ'ত অথবা দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করতে হ'ত। ফ্রান্সিস্ নিজেই এ বিষয়ে তাঁর অনুগামীদের দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। 'সরলতা, অহঙ্কারশূন্যতা, ধৈর্য, সাহস, প্রজ্ঞা এবং জীবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। কিন্তু এত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও ফ্রান্সিস্ সম্পূর্ণভাবে তাঁর সংঘকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারেননি। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর সংঘ রোমান চার্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে (কিছুটা পোপেরই কূটনীতির ফলে!) এবং দারিদ্র্যব্রত পরিত্যাগ ক'রে ধীরে ধীরে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। এই সময়ে সংঘের সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার নির্দেশ দেওয়া হয় জ্ঞানচর্চার জন্য। ধর্ম প্রচার-কার্যেও সাধারণ যাজকদের সঙ্গে শুরু হয় তাঁদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

শেষ পর্যন্ত, চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনায়, সংঘের প্রচারকেরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন, এবং যাঁরা তখনও ফ্রান্সিসের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের উপর আরম্ভ হয় নির্মম অত্যাচার। পোপের আদেশে ধর্ম-দ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ক'রে তাঁদের অনেককে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই শোচনীয় অবস্থার পূর্বেই ফ্রান্সিস্কান সংঘের ভ্রাতৃবৃন্দ মধ্যযুগের ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাঁদের বিশিষ্ট অবদান রেখে যেতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা—মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সকল বিভাগেই ফ্রান্সিস্কান ভ্রাতৃসংঘের কিছু না কিছু দান দেখা যায়। ম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তা-নায়ক রোজার বেকন ছিলেন অক্সফোর্ড-নিবাসী এক ফ্রান্সিস্কান। এ যুগের ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মচর্চার কেন্দ্রেই ফ্রান্সিস্কান সংঘের সদস্যদের দেখা যেত।

ডোমিনিকান

ডোমিনিকান ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাষ্টিল-নিবাসী সাধু ডোমিনিক (১১৭০-১২২১)। ডোমিনিক অবশ্য অল্প বয়স হতেই চার্চে প্রবেশ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন এবং প্রথম জীবনে তিনি স্পেনের চার্চে একটি উচ্চ পদও পেয়েছিলেন। কিন্তু এমন সময় ফরাসী দেশের জনৈক ধর্মদ্রোহীর সংস্পর্শে আসায় তাঁর জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। এর পর ইওরোপের ধর্মদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে সনাতন-পন্থী চার্চকে রক্ষা করাই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হয়ে ওঠে এবং এর জন্য তিনি একটি সুশিক্ষিত প্রচারকসংঘ গঠন করার চেষ্টা করেন। এই সংঘের সদস্যদের কাছে শাস্ত্রচর্চা এবং শাস্ত্রপ্রচারই ছিল জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় প্রচারকার্য চালিয়ে তাঁরা অবিশ্বাসীদের সংশয় দূর করার চেষ্টা করতেন। ফ্রান্সিস্কান সংঘের অনুকরণে ডোমিনিকানরাও কঠোর দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করতেন, কিন্তু প্রথম সংঘটি থেকে তাঁদের

পার্থক্য ছিল এই যে একেবারে সূচনা হতেই তাঁরা একটি সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং জ্ঞানচর্চার ব্যাপারেও তাঁদের উৎসাহ অনেক বেশী দেখা যায়।

ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর ডোমিনিকান সাধু দেখা যায় এবং মধ্যযুগের দুজন বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ্, মহান্ অ্যালবার্ট এবং টমাস্ অ্যাকুইনাস এই ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ডোমিনিকান সংঘের গঠন-ব্যাপারে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আদর্শ গৃহীত হয়েছিল এবং এই আদর্শ তৎকালীন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গঠনপদ্ধতিকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ব্রিটিশ 'হাউস্ অব্ কমন্সে'র জনক বলে যাঁকে সাধারণতঃ অভিহিত করা হয় সেই সাইমন্ ডি মণ্টফোর্ট ছিলেন সাধু ডোমিনিকের সাক্ষাৎ শিষ্য। সাইমনের বিধান যিনি কার্যে পরিণত করেছিলেন সেই সম্রাট প্রথম এডওয়ার্ডও সব সময়ে ডোমিনিকান পরামর্শদাতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন। ফ্রান্সিস্কান ভ্রাতৃবৃন্দের মত ডোমিনিকানরাও ইওরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচারকার্যে নিযুক্ত হন, এবং পরবর্তী কালে তাঁরা এই উদ্দেশ্যে উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, পারস্যদেশ, এমনকি ভারতবর্ষেও এসে উপস্থিত হন। ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের মত ডোমিনিকান সম্প্রদায়ও তার সদস্যপদে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রবেশাধিকার স্বীকার করেছিল। পরবর্তী কালে রোমান চার্চ ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্মদ্রোহীদের নিপীড়নের ব্যাপারে ডোমিনিকান সংঘের সাহায্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেছিল। ডোমিনিকান সংঘের সদস্যদের অনেক সময়ে "ঈশ্বরের শিকারী কুকুর" (Hounds of God) নামে অভিহিত করা হ'ত।

উপসংহার

মধ্যযুগের ইওরোপীয় সভ্যতায় ধর্মসংঘগুলির অবদান আলোচনা ক'রে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাক। মধ্যযুগের মঠগুলি যে সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার বা দুর্নীতি থেকে মুক্ত ছিল না, তা উপরের আলোচনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায়। কোন ক্ষেত্রে সাধুরা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু এ কথা মনে রেখেও বলা চলে যে মধ্যযুগের সাধারণ জীবনাদর্শের তুলনায় এঁদের জীবনের আদর্শ ছিল অনেক পবিত্র, অনেক মহৎ এবং স্বার্থগন্ধহীন। কঠিন জীবন-সংগ্রামে উদ্‌ভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত বহু নরনারী এই সংঘগুলির আশ্রয়ে এসে লাভ করেছিল মানসিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির নির্দেশ। তাছাড়া সংঘের সাধুরাই কৃষকদের উন্নততর কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং শিল্পীদের দিয়েছিলেন উন্নততর শিল্পপদ্ধতির নির্দেশ। মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত বিদ্যালয় এবং অনাথাশ্রমগুলি ছিল এই সব সংঘের পরিচালনাধীনে। ইওরোপে জ্ঞানচর্চার প্রদীপ সন্ন্যাসীরাই এযুগে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। সাধু জেরোম সংসারে সব কিছু পরিত্যাগ করেও তাঁর গ্রন্থাগারটি বর্জন করতে পারেননি এবং মরুভূমিতে তাঁর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন-কালের একমাত্র সাথী ছিল এই গ্রন্থাগারটি। সন্ন্যাসী-সংঘে সযত্নে রক্ষিত মূল্যবান্ দলিল পত্রগুলি পাওয়া না গেলে ইওরোপের ইতিহাসই থেকে যেত অসম্পূর্ণ। মধ্যযুগের ইওরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ জীবনী-সাহিত্যে সন্ন্যাসীদের অবদান ছিল প্রচুর, এবং তাঁদের রচিত উপাসনা-সঙ্গীতগুলি আজও ইওরোপের বিভিন্ন চার্চে নিয়মিত গীত হয়ে থাকে। মধ্যযুগের একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন এই সন্ন্যাসীরা, তাঁদের মঠেই ছিল সে যুগের একমাত্র আরোগ্যশালা। সংসার পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনায় নিযুক্ত হওয়া যদি আজ সংশয়বাদীদের চক্ষে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির পন্থা বলে মনে হয়, তাহলে আমাদের একথাও স্মরণ করতে হবে যে সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ ক'রে সমাজের যে ক্ষতিসাধন করেছিলেন, সে ক্ষতির শতগুণ তাঁরা পূরণ ক'রে দিয়েছিলেন নানাভাবে সমাজের সেবা ক'রে। একমাত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসীরা তাঁদের যে অবদান রেখে গেছেন তাই তাঁদের 'অপরাধ' ক্ষালনের পক্ষে যথেষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) Thompson and Johnson. An Introduction to Medieval Europe.
(২) Adams—Civilization During the Middle Ages.
(৩) Coulton—Life In The Middle Ages (4 Volumes)
(৪) Bertrand Russell—History of Western Philosophy.
(৫) Henderson—Select Historical Documents of the Middle Ages.
(৬) Hannah—Western Monasticism.

ধর্ম সমন্বয়

অধ্যাপক রেজাউল করীম।

অতীতে ধর্মের নামে পৃথিবীতে বহু রক্তপাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে গেছে। আজও বহু লোক ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে মানুষের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টির চেষ্টা করতে ছাড়ছে না। কিন্তু ধর্মের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তো বিভেদ বা দ্বন্দ্ব নয়। ধর্মের উদ্দেশ্য জীবের কল্যাণ, সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয়-সাধন। ধর্মের বাহন হয়ে যাঁরা মর্ত্যধামে এসেছিলেন তাঁরা সবাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্যই তাঁদের আগমন। ঈশ্বর যদি সর্বজীবকে ভালবাসেন, সকলকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন তবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি যাঁরা—তাঁদের শিক্ষা সাধনা উপদেশ ও আদর্শের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ থাকতে পারে না। সুতরাং যখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ দেখি তখন মনে হয় যে এঁরা ঠিকভাবে ধর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি।

সমাজে প্রচলিত আচার-বিচার ও ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যায়। তা থেকে অনেকের মনে হতে পারে যে বিভিন্ন ধর্মগুলি বুঝি পরস্পর বিরোধী। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় মোটেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্ম যদি পরস্পর বিরোধী হয় তবে তাদের অনুবর্তী ও অনুসরণকারীদের মধ্যে মিলন সমন্বয় ও সদ্ভাব মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু একটু ধীরভাবে ধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে এ অভিযোগ ঠিক নয়। আচার-বিচারের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্য পরস্পর বিরোধী নয়, তাদের মধ্যে ঐক্য আছে ও সমন্বয় সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করা কোন ক্রমেই কঠিন কাজ নয়।

অতীতে ধর্মসমন্বয়ের কথা বহু উদারচেতা মহাপুরুষ বলে গেছেন। তাঁরা তাঁদের উপদেশ ও আচরণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে ধর্ম-সমন্বয় একটা অতীব বাস্তব সত্য। তাঁদের সমগ্র জীবনের সাধনা ছিল কেমন ক'রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা যায়। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই সাধনাই ক'রে গেছেন। তিনি সকল ধর্মকেই সত্য ব'লে জেনেছিলেন এবং নিজের জীবনে সকল ধর্মের আদর্শ পালন ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সব ধর্ম মূলতঃ এক, ও তারা একই উদ্দেশ্য সাধন করে। 'যত মত তত পথ'—এই মহাবাণী এক বৈপ্লবিক ঘোষণা।

যখন বিভিন্ন ধর্মের প্রচারক ও সমর্থকগণ নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য বিদ্বেষকে আশ্রয় ক'রে অপর ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই সময় রামকৃষ্ণের এই মহাবাণী 'যত মত তত পথ'—সত্যই যুগান্তর এনে দিল। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডগুলি যতই পৃথক্ হোক না কেন, তবুও সকল ধর্মই সত্য, সব ধর্মেই ভক্তি মুক্তি সম্ভব। যদি অন্তর দিয়ে ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করতে পারি তবে সিদ্ধি নিশ্চয় সম্ভব। কারণ মহান্ ঈশ্বর ধর্মের বাহিরটা দেখেন না, তিনি দেখেন অন্তর।

রামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এই কথাটা জলের মত সহজ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

একটি পুকুর বা দীঘির চারদিকে চার ঘাট। যে ঘাট দিয়েই যাও পুকুরেই পৌঁছবে, আর সেই এক পুকুরের জলই পাবে। ঘাট বিভিন্ন হলেও জল বিভিন্ন হবে না। সেইরূপ ধর্মও যেন একটা বিরাট দীঘি, এতে যাবার নানা পথ। যে যে পথেই ধর্মের অনুসন্ধান করুক না কেন, সে যথা-সময়ে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। এ-কেই ঠাকুর বলেছেন 'যত মত তত পথ'। বর্তমান যুগে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ধর্ম-সমন্বয়ের স্তম্ভ বললে কোন অত্যুক্তি করা হবে না।

ধর্মের ভিতর প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে সমস্ত ধর্ম মূলতঃ এক, ও একই কেন্দ্র থেকে উৎসারিত। দেশ-বিভাগের পূর্বে অনেকে রাজ-নৈতিক কারণে বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পর-বিরোধী ব'লে প্রচার ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। তার কুফল হাতে হাতেই পাওয়া গেছে। মানুষে মানুষে হিংসা দলাদলি বেড়ে গেছে। এই ছিন্নভিন্ন শতধাবিভক্ত মানব-সমাজকে আবার এক করতে হবে, একই পরিবারভুক্ত আত্মীয়ের মত ক'রে তুলতে হবে। রাজনীতির পন্থায় তা হবে না, তা হবে ধর্মের পন্থায় ও ধর্ম-সমন্বয়ের মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ধর্মকে বিচার করলে দেখা যাবে—ধর্ম মিলন ও সমন্বয়ের সহায়ক। ধর্মকে কোন মতেই রাজ-নীতির কুটিল হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত করা সমীচীন নয়। নানা ধর্মের মধ্যে যে সব ঐক্য-সূত্র আছে সেগুলিকে আবিষ্কার করতে হবে, এবং সেই ঐক্যসূত্রে দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়কে গ্রথিত করতে হবে। এ-যুগের এইটাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

সত্য, ন্যায়, নীতি, সদাচার, পরোপকার, চিত্তের ঔদার্য, সৎ-চরিত্র প্রভৃতি মহৎ গুণ কোন একটি বিশেষ ধর্মের বৈশিষ্ট্য নয়—সব ধর্মই এই সব আদর্শ শিক্ষা দেয় এবং এদেরই উপর জোর দেয়। আবার অন্যদিকে অন্যায় পাপ, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, অনুদারতা, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ ইত্যাদি কদাচার কোন ধর্মই সমর্থন করে না। সকল ধর্মই মানুষকে সকল দিক দিয়ে ভাল হতে বলে। যে মানুষ সৎপথে চলে না, যে ধর্মকে অমান্য করে, তার আচরণের জন্য ধর্ম দায়ী নয়। আজ মানব-সমাজে যে হিংসা বিদ্বেষ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে তার জন্য ধর্মকে দোষ দেওয়া বা দায়ী করা চলে না। কতকগুলি কুটিল ও খল স্বভাবের মানুষের অন্যায় দ্বারা গোটা সমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে। মানুষকে ভাল করবার, মহৎ ক'রে গড়ে তোলার দায়িত্ব ধর্মের। ধর্মের উদারতা সর্বজনীনতা ও কলুষনাশী প্রভাব দ্বারা বিশ্বের মানব-সমাজে রূপান্তর ঘটাতে হবে। অতীতের মহাপুরুষগণ ও সাধকগণ এই ভাবেই সমাজের মধ্যে বিপ্লব এনেছিলেন। আজকের দিনে আবার সেই প্রকার যুগান্তকারী সাধনা করতে হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে তিনটি সাধারণ নীতি ও পদ্ধতি আছে, যার একটিকে বাদ দিলে 'ধর্ম' বলতে আর কিছু থাকে না। সে তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) ঈশ্বরে বিশ্বাস (২) প্রার্থনা ও (৩) জীবসেবা। সমস্ত ধর্মের ভিত্তি এই তিনটির উপর রচিত। এই তিনটির একটিকে বাদ দিলে বা অস্বীকার করলে কোন ধর্মই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ধারণা, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব কোন ধর্মই অস্বীকার করে না। পূজা, প্রার্থনা, উপাসনা বা আরাধনা বিভিন্ন প্রকার; কিন্তু যে ব্যক্তি যে ভাবেই ও গুলি করুক না কেন, লক্ষ্য সকলেরই এক—সেই মহান্ ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন। আর ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবাও করতে হবে। এই তিনটি নীতি যথার্থ

ভাবে পালন করলে অপর সমুদয় গুণাবলী আপনা থেকেই জাগ্রত হবে। জাতিতে জাতিতে ভেদ হতে পারে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মের এই ত্রিবিধ মূলনীতি স্বীকার করলে সকল প্রকার শত্রুতা ও বৈরভাব দূর হয়ে যাবে। এই ভাবেই মানুষের মধ্যে ঐক্য সম্প্রীতি ও সমন্বয়-সেতু রচিত হবে।

একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা 'doctrine of exclusive salvation' [এক আমার ধর্ম-দ্বারাই মুক্তি সম্ভব] নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা ভুল। এক বিশেষ প্রকার পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পদ্ধতি ঈশ্বর ভালবাসেন না, একথা বলার মানে মহান্ ঈশ্বরে ক্ষুদ্রত্ব, পক্ষপাতিত্ব দোষ অরোপ করা। আমরা একদিকে ঈশ্বরকে প্রেমময়, করুণাময়, ক্ষমাশীল, সর্বজীবের রক্ষক বলব, আবার অন্যদিকে ঘোষণা করব যে তিনি এক বিশেষ ধর্মাচার ব্যতীত অন্য সব আচারকে ঘৃণা করেন—এরূপ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করাও পাপ, অসীম ঈশ্বরে সীমা-কল্পনা সীমাবদ্ধ মানবমনের স্বাভাবিক দুর্বলতা।

কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ, অথবা কোন্ ধর্মে ঈশ্বর-লাভ হয়—এই নিয়ে অতীতে বহু তর্ক ও রক্তপাত হয়েছে। ধর্মধ্বজীরা এখনও এর কোন মীমাংসা করতে পারেননি। তাঁদের বুঝা উচিত যে, জগতের কোটি কোটি লোকের সংখ্যার তুলনায় একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য। তাহলে কি এই বিশ্বাস করতে হবে যে ঐ অল্প-সংখ্যক লোককেই ঈশ্বর ত্রাণ করবেন, আর পৃথিবীর সমুদয় মানব-সমাজকে তিনি অনন্ত নরকে প্রেরণ করবেন? এরূপ বিশ্বাস করা শুধু অন্যায় নয়, এ ধরনের বিশ্বাস ঈশ্বরদ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতীতের মানুষ ধর্মসম্বন্ধে বহু অনুদার ভাব পোষণ ক'রত। আজ তা দূর করতে হবে। আজ উদার দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু বিচার করতে হবে, মনে করতে হবে সর্ব ধর্মে ঈশ্বর-লাভ বা মুক্তি সম্ভব। তাহলে রামকৃষ্ণ পরমহংসের উদার মতই গ্রহণ করতে হবে—যত মত তত পথ।

উনবিংশ শতাব্দীর একজন উদারপন্থী লেখক এক জায়গায় বলেছেন—'It is only by a slow process that the human mind can emerge from a system of error'—অর্থাৎ মানব-সমাজ ধীরে ধীরে ভুল কাটিয়ে ওঠে। বাস্তবিকই ধর্মসম্বন্ধে মানব-সমাজের বহু লোক এমন সব অনুদার ও সঙ্কীর্ণ মত পোষণ করে যে মনে হয়, আজও তারা মধ্যযুগে অবস্থান করছে। বহু যুগ গত হয়েছে, আজ অতীতের ভ্রম সংশোধনের সময় এসেছে। এ যুগে রামকৃষ্ণদেব উদারভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা ক'রে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা দূর ক'রে গেছেন। বহু রক্তপাত ও হত্যালীলার পর আজও কি ধর্মসম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণা দূরীভূত হবে না? রামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনের উদার আচরণ দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ধর্মসমন্বয় সম্ভব। একজনের জীবনে দেখে কোটি কোটি মানুষকে এই মহান্ আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। এই দিক দিয়ে ভারতবর্ষ এক গৌরবজনক ঐতিহ্য রচনা করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম দেশই ধর্মসম্বন্ধে উদারতার আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছে। প্রাচীন গ্রীস সক্রেটিসকে সহ্য করতে পারেনি। রোমের দোর্দণ্ড প্রতাপের যুগেই তো রোমক শাসনকর্তার আদেশে মহাত্মা যিশুখৃষ্টকে শূলে নিহত করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে দেখি—ধর্মসম্বন্ধে চরম উদারতার নিদর্শন। মহাত্মা বুদ্ধদেব প্রচলিত আচার বিশ্বাস সংস্কার ও ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁকে সহ্য করেছে, তাঁকে

দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমন পরমত-সহিষ্ণুতার উদাহরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। রিফর্মেশনের যুগে ইওরোপে ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে কি বীভৎস কাণ্ডই না হয়ে গেছে। ঠিক সেই যুগে ভারতে প্রচারিত হয়েছে সমন্বয়ের বাণী। ক্যাথলিক ইওরোপ প্রোটেষ্টাণ্টকে বরদাস্ত করতে পারেনি। আবার প্রোটেষ্টাণ্ট ইওরোপ ক্যাথলিকদের নিপীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। সে সময় ধর্মসমন্বয়ের কথা খুব কম লোকেই গভীরভাবে চিন্তা করেছিল। কিন্তু সেই যুগেও ভারতের সাধু সজ্জনের কণ্ঠ থেকে আমরা শুনতে পাই ধর্মসমন্বয়ের বাণী,—শুনতে পাই বিভিন্ন সাধকের নিকট থেকে যে, সব ধর্মই ভাল, সব ধর্মপন্থাতেই মুক্তি সম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপ দাদু, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি মহা-মানুষের নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা সহজ সরল পন্থায় সর্বমানবকে এক মহাক্ষেত্রে আহ্বান করেছিলেন। 'এক ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই'—এমন মত তাঁরা কখনও প্রচার করেননি। তাঁদের কাছে সকলেই সমান ছিল। তাঁরা সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতেন। সকল ধর্মের লোক তাঁদের পদতলে আশ্রয় নিয়ে জীবন ধন্য করেছিল।

মহাত্মা দাদূর উক্তি থেকে উপলব্ধি হবে যে ধর্মসম্বন্ধে তিনি কত উদার ছিলেন।—'জগৎ জুড়ে দলাদলি চলছে। এমন লোক অল্পই আছেন যিনি দলাদলির ঊর্ধ্বে। যিনি জীবনে নিরঞ্জন লাভ করেছেন তিনিই দলাদলি থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। হে খালেক, হে হরি, এই সবই তোমার বৈচিত্র্যের খেলা, তুমিই নিজেকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রেখে সকলকে ঐক্য-বন্ধনে যুক্ত ক'রে নিয়েছ।' দাদূ বলেন যে, 'জগতে তোমার এই লীলা উপলব্ধি ক'রে আমার প্রাণে বিশ্বাস লাভ হয়েছে।' মহাত্মা কবীরও ঠিক এই ধরনের কথা বলেছেন : 'সেই এক ঈশ্বর সমানভাবে বহুরূপে প্রকট হয়েছেন। আবার সকল সত্তা তাঁতেই লয় পেয়ে সমান হয়ে, এক হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় নাই বলে এখন কবীরের কাছে সবই এক।' মহাপুরুষদের এই বাণী উদারতার বাণী। এখানে 'Exclusive Salvation' (একমাত্র আমার ধর্মেই মুক্তি) এই নীতির জয় ঘোষণা নেই—এখানে আছে সমন্বয়ের বাণী, ঐক্য ও মিলনের আবেদন। বর্তমান যুগে সাধক রামকৃষ্ণ সেই একই কথা বর্তমান যুগের পরিবেশে নূতন ক'রে বলেছেন। সকল ধর্মমতকে তিনি স্বীকার করেছেন, কোন ধর্মকে অগ্রাহ্য করেননি।

আজ আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাসভূমি। এই ভারতের হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন পার্শি য়িহুদি সকলকে এই কথাই উপলব্ধি করতে হবে যে ঘৃণা বিদ্বেষ ধর্মের আদর্শকে কলুষিত করে, আর প্রেমপ্রীতি ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সমন্বয়ের আদর্শ সার্থক হোক, তাঁর সেই আদর্শ জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ভারতবর্ষ ধন্য হোক।

যে ধর্মই হোক, যে মতই হোক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে ; তাই কোন ধর্ম, কোন মতকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করতে নেই। এক বই তো দুই নেই ; যে যা বলে, যদি আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁর কাছে নিশ্চয় পৌঁছবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সর্বজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের অজ্ঞতা

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

যিনি সব বিষয়েরই কিছু কিছু এবং একটি বিশেষ বিষয়ের সব কিছু জানেন তাঁহাকেই বলা হয় পণ্ডিত। এরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা কোন দেশেই বেশী নহে। এদেশে তো খুবই কম। পঞ্চাশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করার ধুয়া উঠে নাই। একজন বি এ পাস লোক সে সময়ে কিছু বিজ্ঞান কিছু ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিষয় জানিতেন। তখন অবশ্য রাজনীতি, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির অধ্যয়ন অধ্যাপনা ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। এখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেক নূতন নূতন বিষয়ের শিক্ষণ-ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে ছোটবেলা হইতেই ছাত্রছাত্রীকে বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করার চেষ্টা হইতেছে। বিশেষজ্ঞতার ভূত আমাদিগকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে ১২।১৩ বছরের ছেলেমেয়েকে অনেক জায়গায় বাধ্য করা হইতেছে—কয়েকটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া তাহাতেই জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখিতে। বিহারে অষ্টম মানের ছাত্রছাত্রীকে ঠিক করিতে হয় সে কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী বাণিজ্য, চারুশিল্প, বিজ্ঞান অথবা সাহিত্যের মধ্যে কোন্ শাখায় বিশেষজ্ঞ হইবে। যে বিষয় সে নির্বাচন করিবে তাহাই পড়িয়া তাহাকে স্কুল বোর্ডের পরীক্ষা দিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে কলেজেও তাহা ছাড়া অন্য কোন বিষয় পড়িবার স্বাধীনতা পাওয়া সহজ হইবে না। সাহিত্যের পাঠ্যসূচীর মধ্যে অনেকগুলি বৈকল্পিক (optional) বিষয় আছে—তাহার মধ্যে দুই তিনটি নির্বাচন করিতে হয়। ফলে কোন ছাত্রছাত্রী ইতিহাস ভূগোল ও অঙ্ক না পড়িয়াও বোর্ড পরীক্ষা পাস করিতে পারে। তাহাদিগকে অবশ্য সর্বজ্ঞ বানাইবার জন্য সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ-অধ্যয়ন শিক্ষা (Social Studies) দেওয়া হয়।

অনেক বিদ্যালয়েই সাধারণ বিজ্ঞান পড়াইবার মতন যন্ত্রপাতি ও ল্যাবরেটরি নাই, সেখানকার ছাত্রেরা বিকল্পে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পড়ে। যেখানে সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানো হয়, সেখান হইতে পাস-করা অনেক ছাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অধ্যাপকেরা বলেন, তাহারা যে ভুল শিখিয়া আসে তাহা শুধরাইতে তাঁহাদের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়। তাঁহাদের মতে যাহারা বিজ্ঞানের কিছুই জানে না, কলেজে তাহাদিগকে শেখানো অনেক বেশী সহজ। এরূপ আশ্চর্যজনক পরিস্থিতির কারণ এই যে অনেক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষক নাই। কোন কোন জায়গায় আর্টস্ লইয়া পাস-করা লোকও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে।

সমাজ-অধ্যয়নের নামে যাহা শেখানো হয়, তাহাতেও সত্য তথ্য পরিবেশন করা অপেক্ষা কতকগুলি ভাসা ভাসা গালভরা কথা শেখানোর দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যায়। ইহারাই কয়েক বৎসর পরে দেশের নাগরিকের দায়িত্ব পালন করিবে, ইহাদের মধ্য হইতেই আইন তৈয়ারী করিবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইবে। গণতন্ত্রে যদি বেশীর ভাগ নাগরিক অজ্ঞ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে শাসনের ক্ষমতা কতিপয় উদ্যোগী ও প্রভুত্বপ্রিয় ব্যক্তির হাতে যাইয়া পড়ে।

বিশেষজ্ঞ যে অনেক সময়েই বিশেষ রকমে অজ্ঞ হন, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা যখন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে আসিলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে লাগিলাম। একদিন কথায় কথায় 'Anatole France' সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, "আমার ভূগোল সম্বন্ধে কোন interest নাই।" বোধহয় তিনি France শব্দটি শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন ইহা ভূগোলের প্রশ্ন, অথবা Anatole-র সঙ্গে Anatolia-র সম্বন্ধ কিছু আছে ভাবিয়া ঐরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। আর একজন ইতিহাসের বিশেষজ্ঞকে সারাজীবন ধরিয়া ইওরোপের আধুনিক ইতিহাস পড়াইতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে একবার ছাত্রদের সঙ্গে সারনাথে যাইতে বলায় তিনি এই বলিয়া আপত্তি করেন যে সারনাথ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না। বিলাতী ডিগ্রীধারী অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ এক অধ্যাপককে ভারতীয় অর্থনীতির কয়েকটি মূল সমস্যা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ দেখিয়াছিলাম। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনে এক ডবল ডক্টরেট-ডিগ্রীধারী অধ্যাপক অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন যে দাম বাড়া-কমার ব্যাপারে সরকারের কোন হাত নাই। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইউনিভার্সিটি-প্রফেসরের পদপ্রার্থীদিগের যোগ্যতা বিবেচনার সময় দেখিয়াছিলাম—অর্ধেকের বেশী প্রার্থী মহাভারতের শান্তিপর্বে রাষ্ট্র-সম্বন্ধে যে অমূল্য তথ্য আছে সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

জ্ঞানের পরিধি যেমন বাড়িতেছে, এক শ্রেণীর পণ্ডিত তেমনি হতাশ হইয়া ভাবিতেছেন, সব যখন জানা অসম্ভব তখন একটি কোন বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ সম্বন্ধে সব কিছু জানার চেষ্টা করাই ভাল। এই মনোভাবকে ঠাট্টা করিয়া বলা হয় যে তিনিই হইতেছেন বিশেষজ্ঞ, যিনি একটুকরা বিষয়ের সব কিছু জানার জন্য দুনিয়ার সব কিছু সম্বন্ধে চোখকান বুঁজিয়া থাকেন। খানিকটা সাধারণ বিদ্যা লাভের পর কোন একটি বিষয়ে অসাধারণত্ব লাভের চেষ্টা অবশ্য প্রশংসনীয়। তাহা না হইলে জ্ঞান গভীর হয় না এবং বিদ্যার সীমাও বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু আমাদের দেশে এখন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকেই বিশেষজ্ঞ বানাইবার জন্য আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। যে বিজ্ঞান পড়ে সে ইতিহাস পড়ে না, দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু জানে না, এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাহার কাছে গ্রীক ভাষার চেয়েও দুর্বোধ্য। আবার সাহিত্যের ছাত্র বিজ্ঞানের বিন্দুবিসর্গও জানে না। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিলেও, একজন ছাত্রের পক্ষে উহার একটি মাত্র পড়িয়া অন্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকা অসম্ভব নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য ভারত সরকার ও University Grants Commission সাধারণ শিক্ষার (General Education) পাঠ্যক্রম সকল ছাত্রেরই অবশ্য পঠনীয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নানা বিভাগের বিশেষজ্ঞেরা সম্মিলিত হইয়া এইরূপ পাঠ্যক্রমের একটা খসড়া তৈয়ারী করিয়াছেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী এই পাঠ্যক্রমের অদল বদল করিতে পারিবে। সাধারণ শিক্ষার তিনটি মূল বিভাগ থাকিবে: সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের ছাত্রকেই এই তিনটি সাধারণ শিক্ষার বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

সাহিত্যের পাঠ্যসূচী এইরূপ : মহান্ কাব্য ও মহৎ গদ্যসাহিত্যের নিদর্শন, উহার মধ্যে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যেরও কিছু অংশ থাকিবে, একখানি ভালো নভেল, কয়েকটি একাঙ্কিকা নাটিকা, গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লিসের একটি নাটক ও সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর প্রসিদ্ধ অংশসমূহ, গীতা, উপনিষদ্, বুদ্ধদেবের কথোপকথন, গ্রন্থসাহেব, বাইবেল ও কোরানের নির্বাচিত অংশ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, ধর্মকীর্তি প্লেটো, আরিস্ততল ও কন্‌ফুসিয়াসের রচনার কিছু কিছু নিদর্শন, শিল্পকলা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যের মধ্যে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজশাস্ত্র, অর্থনীতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশসমূহ থাকিবে—যথা :

বেদের পূর্বের ও বৈদিকযুগের সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থা, মনুসংহিতার রাজধর্ম, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দ্রাবিড়দের সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সভ্যতায় দক্ষিণের দান, ইস্‌লাম ও পাশ্চাত্যের দান, ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় শাসনবিধির ক্রমবিকাশ—শাসন-পদ্ধতির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি—মৌলিক অধিকার ভারতীয় শাসন, বিধির সংশোধন, যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা : কেন্দ্র ও প্রান্ত, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ; জনমত এবং রাজনৈতিক দল।

ভারতীয় সমাজকে যুক্ত ও বিভক্ত করিবার মতো উপাদান—জাতি, শ্রেণী, ধর্মমত ও ভাষা লইয়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিরোধ ও সংঘাত, বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যসাধনার সমস্যা। ভারতীয় আর্থিক জীবনের কাঠামো। আর্থিক বিকাশ ও সামাজিক সুবিচার। আর্থিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল-প্রবর্তনের সমস্যা। শক্তি ও শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ। ভারতের সহিত জগতের সম্বন্ধ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যক্রম।

গণতন্ত্র ও সমূহ-তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য। উদার-নৈতিক রাষ্ট্রীয় মতবাদ। ফ্যাসিষ্ট, সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিষ্ট মতবাদ। আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্নতা পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র, সমবায় প্রথার রীতি ও প্রকৃতি—উন্নয়নব্রতী রাষ্ট্র। সামাজিক পরিবর্তন-সাধনের সমস্যা। মার্কসীয় দর্শন। স্বাধীনতার অর্থ ও স্বরূপ। স্বাধীনতা ও শাসনযন্ত্র পরিচালনা।

বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম এইরূপ হইবে : পৃথিবীর কিরূপে উৎপত্তি ও বিকাশ হইল ? পৃথিবীর ভিতরে ও বাহিরে কি কি আছে ? কাজ, উদ্যম ও শক্তি। বস্তু। আণবিক কণা ও আণবিক শক্তি। পরমাণুর উপাদান। প্রাণী-জগতের বৈশিষ্ট্য। দেহকোষের গঠনপ্রণালী। পুষ্টি। উদ্ভিদ্ ও জন্তুদের প্রাণশক্তি ও উৎপাদন প্রণালী। প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের স্বরূপ। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে প্রাচীন ভারতের দান। কোপার্নিকাস্ ও গ্রহগণ। বেকন্ ও গবেষণা-প্রণালী। গ্যালিলিও ও কেপ্‌লার। হার্ভের আবিষ্কার ও রক্তের সঞ্চালন-প্রণালী। সপ্তদশ শতকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বিকাশ। নিউটন ও তাঁহার আবিষ্কার। ডারুইনের ক্রমবিকাশ-মতবাদ। পাস্তুরের আবিষ্কার। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—ডাইনামো, মটর, বেতার, কৃত্রিম রং, এরোপ্লেন এবং তাহার চালনার প্রণালী, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিকাশ, সংক্রামক ব্যাধির নিবারক ঔষধ, বীজাণু। কৃষিকর্মের আধুনিক বিকাশ। জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানের প্রভাব।

সাধারণ শিক্ষার এই পাঠ্যক্রমের পঠনপাঠন

যদি রীতিমতভাবে হয় তাহা হইলে শিক্ষার মান উন্নত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের উপর বিভিন্ন বিষয় পড়াইবার ভার দিলে তাঁহাদের বক্তৃতা বোধগম্য হইবে কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যদি সরল ভাষায় ও প্রাঞ্জল ভাবে তাঁহাদের জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ অংশ সম্বন্ধে আদর্শ বক্তৃতা তৈয়ারী করিয়া দেন, তাহা হইলে সাধারণ অধ্যাপকবৃন্দ তাহা দেখিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন।

এই শিক্ষাকে কার্যকরী করিবার বিপক্ষে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও অধ্যাপকদের স্বার্থ অন্তরায়স্বরূপ হইতে পারে। আর্থিক বাধা এই যে কেন্দ্রীয় সরকার ইহার জন্য অর্ধেক বা দশ আনা ব্যয়ভার বহন করিলেও প্রাদেশিক সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বাকীটা জোগানো সহজ নহে। সংস্কৃতি-গত বাধা এই যে বর্তমানে ছাত্রদের উপর বিভিন্ন বিষয়ের যে পাঠ্যক্রমের বোঝা আছে, তাহার ভার লাঘব না করিতে পারিলে সাধারণ শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হইবে। বি.এ.-তে যেখানে বাধ্যতামূলক বিষয় ছাড়া দুইটি বিষয় পড়িতে হয়, সেখানে হয় একটি বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়, নয়তো দুইটি বিষয়েরই পাঠ্যক্রম কমাইয়া দিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকবৃন্দ সহজে ইহাতে রাজী হইবেন না, কেননা তাঁহারা মনে করেন—ইহার উপর তাঁহাদের অর্থ উপার্জন অনেকখানি নির্ভর করে। মনে করুন প্রতি বিষয়ে তিনটি পত্রের স্থানে দুইটি পত্র প্রবর্তিত হইল, তাহার ফলে পরীক্ষক ও অধ্যাপকের সংখ্যা হ্রাস হইবার আশঙ্কা আছে। যদি প্রত্যেক বিষয়ে যতটা এখন পড়ানো হইতেছে তাহাই বজায় রাখিয়া 'সাধারণ শিক্ষা'র কোন পরীক্ষা না লওয়া হয়, তাহা হইলে খুব কম ছাত্রই 'সাধারণ শিক্ষা'র বক্তৃতা শুনিতে আগ্রহশীল হইবে বা উহার পাঠ্যপুস্তকাদি অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে অগ্রসর হইবে। এইসব সমস্যাগুলির যথোচিত সমাধানের উপর আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে দেশব্যাপী শিক্ষিতের অজ্ঞতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে আরও অধিক অর্থ ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সরকারের নিকট হইতে তাঁহাদের আয়ের শতকরা ৭৩.৩ ভাগ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় প্রান্তীয় ও কেন্দ্রীয় সাহায্য মিলাইয়া শতকরা ৭৫.৮ ভাগ পাইয়া থাকে। সে তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষ কিছু পায় না বলিলেই হয়। রাশিয়াতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ছাত্রদের নিকট কোন ফি লওয়া বন্ধ করা হইয়াছে, সেখানে রাষ্ট্রই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে। সেখানে ৭ বৎসর বয়স হইতে ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আর আমাদের দেশের শাসনবিধিতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদিগকে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পরিবর্তন করিয়া ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১১ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানো বাধ্যতামূলক করার কথা হইতেছে। উহাও কার্যকরী হইবে কিনা ভগবান জানেন।

অর্ধনারীশ্বর

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের চিত্ত যখন নির্মল প্রশান্ত সুসংস্কৃত ও তত্ত্বজ্ঞানালোকিত তখন সে দেখিতে পায় যে, এই বিশ্বসংসার বাহ্য দৃষ্টিতে যতই বৈষম্যসমাকুল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সংঘর্ষময় ও পরিবর্তনশীল প্রতীয়মান হোক না কেন, ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে এক নিত্য আত্ম-সমাহিত সচ্চিৎপরমানন্দঘন পরমপুরুষ। মানুষ তখন দেখে জড়ের ভিতরে চেতনের বিলাস, বহুর ভিতরে একের প্রকাশ, সীমার ভিতরে অসীমের খেলা, সংঘর্ষের ভিতরে আনন্দময়ের লীলা, অনিত্যের ভিতরে নিত্যের আত্মরতি। চোখের সামনে সে দেখে, জড়জগতে কতপ্রকার বিচিত্র শক্তির তাণ্ডব নৃত্য, কত সৃষ্টি, কত ধ্বংস। জীবজগতে কত পরঘাতী ও আত্মঘাতী সংগ্রাম, কত আসুরশক্তি ও পাশবশক্তির সাময়িক বীরদর্প ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং কালক্রমে সকলেরই মৃত্যুর কবলে আত্মবিলয়। এ সংসারে ক্ষণিক সুখের উল্লাস ও ক্ষণিক দুঃখের আর্তনাদ, হিংসা-ঘৃণা-ভয়-বিদ্বেষ-লোভ-মোহ, কিছুই তাহার চোখ এড়ায় না। কিন্তু দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অন্তরাত্মা দেখিতে পায়, এ সকলের মধ্যেই এক চিদানন্দময়ী মহাশক্তির বিচিত্র বিলাস।

বিশ্বজগতে যত প্রকার শক্তির সহিত মানুষের পরিচয় হয়, সব শক্তির মধ্যেই অন্তর্দর্শী মানুষ দেখে এক মহাশক্তিরই আত্মপ্রকাশ, এবং সেই মহাশক্তি চৈতন্যময়ী—প্রেমময়ী আনন্দময়ী কল্যাণময়ী। সে আরও দেখে যে, এই পরমাশক্তি এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার সহিত স্বরূপতঃ অভিন্না,—পরমাত্মার সত্তাতেই তাঁহার সত্তা, পরমাত্মার চৈতন্যেই এই মহাশক্তি উদ্ভাসিতা, পরমাত্মার আনন্দেই ইনি আনন্দময়ী, পরমাত্মাকেই এই মহাশক্তি বিচিত্র নামে বিচিত্র রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দে বিচিত্রভাবে উপাধি-বিশিষ্ট করিয়া, দেশে কালে লীলায়িত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। অনাদি অনন্তকাল দেশকালাতীত অসীম চৈতন্যময় পরমাত্মা পরমপুরুষের বক্ষঃস্থলই তাঁহার একমাত্র স্থান, একমাত্র আশ্রয়। পরমপুরুষের স্বরূপগত অনন্তত্বকে বিচিত্রভাবে লীলায়িত করাই তাঁহার নিত্যসেবা, মহাশক্তি-বিরচিত তাঁহার এই লীলায়মান রূপই এই বিশ্বসংসার। তত্ত্বদর্শী মানুষ বিশ্বজগতে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার এই লীলায়মান রূপ প্রত্যক্ষ করে।

এই যে দিব্যদর্শন, এই যে তত্ত্বানুভূতি,—ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অসংখ্য দিব্যদর্শন-সম্পন্ন শুদ্ধাত্মা মহান্ পুরুষ ও মহীয়সী নারী ভারতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং জনসাধারণের কাছে এই দর্শনের কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুভূতি ভারতীয় জনসাধারণের মন বুদ্ধি ও হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের জীবন-ধারাকে এক মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শের পথে পরিচালিত করিতেছে। কেবলমাত্র ভারতের দর্শনশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রই নয়, ভারতের কাব্য সাহিত্য শিল্পকলা, ভারতের ধর্মবিধান সমাজ-বিধান রাষ্ট্রবিধান, ভারতের ব্রতনিয়ম মূর্তিপূজা আনন্দোৎসব,—ভারতীয় জীবনের সকল বিভাগ স্মরণাতীত কাল হইতে মহামানবদের এই দিব্য-দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত।

অতি প্রাচীন যুগেই ভারতে শিল্পকলার বিকাশ সাধিত হইয়াছে। শিল্পিগণ ঋষি-মুনি-ভক্তজ্ঞানী মহাযোগিগণের তাত্ত্বিক অনুভূতিকে রূপায়িত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কঠিন প্রস্তরকেও তাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন, চৈতন্যময় প্রাণময় মহাভাবময় করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রস্তরাদির মধ্যেও যে প্রাণস্পন্দন, যে চৈতন্যবিলাস, যে ভাবমাধুর্য, অসংস্কৃত দৃষ্টির সম্মুখে আত্মগোপন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী শিল্পিগণ তাহা সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রকটিত করিবার নিমিত্ত অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পকলা জড় ও চেতনের মধ্যে, সসীম ও অসীমের মধ্যে, অনিত্য ও নিত্যের মধ্যে, ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে, বৈচিত্র্য ও একত্বের মধ্যে, অত্যাশ্চর্য সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছে। এই শিল্পের প্রভাবে সসীম অনিত্য স্থূলেন্দ্রিয়গোচর প্রাকৃত জড় পদার্থ অসীম নিত্য অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত সচ্চিৎপ্রেমানন্দ স্বরূপের প্রতিমারূপে পূজার আসন লাভ করিয়াছে ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সাধকগণের ধ্যানের বস্তু হইয়াছে। মহাজ্ঞানী মহাভক্ত মহাযোগী মহাপুরুষগণ আত্মসমাহিত-চিত্তে যে পরমতত্ত্বের অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার লাভ করেন, জড়ের ভিতরে সেই তত্ত্বের আভাস রূপায়িত করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করা এবং বহির্মুখ জনতার মনবুদ্ধিহৃদয় সেই তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করাই ভারতীয় শিল্পের মুখ্য আদর্শ।

ভারতীয় শিল্প-সাধনার একটি প্রধান বিষয়-বস্তু—পরমপুরুষ পরমাত্মার সহিত বিশ্বপ্রকৃতির নিত্য যোগ, নিত্য মিলন, নিত্য অঙ্গাঙ্গিভাব, নিত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। পরমপুরুষকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির কোন সত্তাই নাই, আবার বিশ্ব-প্রকৃতিকে বাদ দিয়া পরমপুরুষের কোন বাহ্য আত্মপ্রকাশ নাই, আত্মপরিচয় নাই। অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত প্রেম, অনন্ত বীর্য সৌন্দর্য মাধুর্যের নিত্য আধার এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ, সব তাঁর স্বরূপে একরস অখণ্ড চৈতন্যে পর্যবসায়িত, সব অব্যক্ত। এ সকলেরই বৈচিত্র্যময় প্রকাশ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। বিশ্বপ্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া, বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে আত্মপ্রকাশ করিয়াই তিনি সর্বৈশ্বর্য-সম্পন্ন ভগবান, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা, সর্বকল্যাণময় মহাযোগেশ্বর শিব, নিখিলসৌন্দর্যমাধুর্যসিন্ধু লীলাময় পরম-দেবতা। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তাঁহার বিচিত্র রসের খেলা,—মধুর হইতে বীভৎস পর্যন্ত এমন কোন রস নাই, এমন কোন ভাব নাই, যাহার প্রকাশ বিশ্বপ্রকৃতির খেলার মধ্যে নাই! সেই হেতুই 'রসো বৈ সঃ'—তিনি রসরাজ, অখিল-রসামৃত সমুদ্র। বিশ্বপ্রকৃতির খেলার ভিতরে জীবের দুঃখ দৈন্য আছে, অভাব অভিযোগ আছে, আর্তি আছে, 'পরিত্রাহি' ডাক আছে। আর এই সকলের মধ্যেই তাঁহার করুণাময় প্রেম-ময় পতিত-বন্ধুরূপে আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে তাঁহারই অখণ্ড সত্তা অসংখ্য খণ্ডসত্তারূপে অভিব্যক্ত, তাঁহারই অখণ্ড চেতনা অসংখ্য জীবচেতনারূপে প্রকটিত, তাঁহারই আত্মভূতা পরমাশক্তি অসংখ্য জড়শক্তি ও জীবশক্তিরূপে লীলায়িত। পরমপুরুষের যত বিশেষণ ও উপাধি, সবই বিশ্বপ্রকৃতিকে বুকে লইয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া। বিশ্ব-প্রকৃতিকে বাদ দিলে তিনি নির্বিশেষ চৈতন্য-স্বরূপ, আত্মপরিচয়বিহীন সত্তামাত্র,—তখন তাঁহাকে সৎ বলাও যে কথা, অসৎ বা শূন্য বলাও সেই কথা। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ দেখিয়াছেন—বিশ্বের সর্বত্র "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ

নিগূঢ়াম্", তাঁহারা দেখিয়াছেন বিশ্বকারিণী বিশ্ববিলাসিনী বিশ্বরূপিণী মহাশক্তিকে আলিঙ্গন করিয়াই বিশ্বাত্মা সচ্চিদানন্দঘন পরমপুরুষ নিত্য স্ব-স্বরূপে বিরাজমান।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে যুগলমূর্তির উপাসনা এই দিব্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগলমূর্তির উপাসনা দ্বৈতের উপাসনা নয়, দ্বৈতালিঙ্গিত অদ্বয় পরমতত্ত্বেরই উপাসনা। বিশ্বপ্রকৃতি যে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ নয়, অথচ ইহা যে অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যাও নয়, বিশ্বপ্রকৃতি যে অদ্বয় ব্রহ্মেরই লীলায়িত আত্মপ্রকাশ,—এই মহাসত্যই ব্রহ্মের যুগলমূর্তির মধ্যে সাধকগণ দর্শন করিয়াছেন, শিল্পিগণ রূপায়িত করিয়াছেন। ব্রহ্মই পুরুষ, ব্রহ্মই প্রকৃতি। ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ, নির্বিশেষ ও সবিশেষ, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, অচল ও সচল, অকর্মা ও বিশ্বকর্মা, অভোক্তা ও সর্বভুক্। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত, নিত্য আত্মসমাহিত হইয়াও বৈচিত্র্যবিলাসী। তিনি দেশকালাতীত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপে নিত্য বিরাজমান থাকিয়াই সর্বদেশে সর্বকালে অনন্তরূপে অনন্তভাবে আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতেছেন, আপনার স্বরূপভূত ঐশ্বর্য ও মাধুর্যকে আস্বাদন করিতেছেন। এই মহাসত্য ব্রহ্মের বিচিত্ররূপে পরিকল্পিত যুগলমূর্তির মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। মহাযোগী জ্ঞানী ও ভক্তগণ এই দ্বিবিধ ভাবেই ব্রহ্মকে দর্শন করেন, আরাধনা করেন, আস্বাদন করেন। তাঁহারা চিত্তেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া নিবিড় সমাধিতে ব্রহ্মের নির্গুণ নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয় অবাঙ্‌মনসোগোচর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন, আবার চোখ মেলিয়া চিত্তেন্দ্রিয়কে ক্রিয়াশীল করিয়া বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে সেই সর্বভাবাতীত ব্রহ্মেরই বিচিত্র রূপ, বিচিত্র ভাব, বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, বিচিত্র লীলাখেলা দর্শন ও আস্বাদন করেন। এই দ্বিবিধ ভাবের মধ্যেই ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ। এই দ্বিবিধ ভাবে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের আস্বাদনই যুগল-উপাসনার তাৎপর্য।

ভারতীয় শিল্পসাধনায় ব্রহ্মের সর্বভাবাতীত সর্বদ্বন্দ্বাতীত নিষ্ক্রিয় স্বরূপকে পরমপুরুষরূপে এবং বিচিত্রভাববিলাসী অনন্তদ্বন্দ্বময় সক্রিয় স্বরূপকে পরমানারীরূপে চিত্রিত করা হইয়া থাকে। এই সক্রিয় স্বরূপে তিনি বিশ্বজননী বিশ্ববিধাত্রী বিশ্বরূপিণী বিশ্বসংহর্ত্রী বিশ্বরূপিণী বিচিত্ররসবিলাসিনী বিচিত্রদ্বন্দ্বময়ী মহাশক্তি পরমাপ্রকৃতি, এবং এই হেতু অদ্বিতীয় নারীরূপে কল্পিত। কিন্তু তাঁহার নির্দ্বন্দ্ব নিষ্ক্রিয় স্ব-সমাহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপই এই সক্রিয় স্বরূপের প্রাণ, আত্মা, অন্তর্যামী, ভর্তা, আশ্রয়। সেই হেতু তিনি অদ্বয় পুরুষরূপে কল্পিত। একথা বলা বাহুল্য যে, নারী-পুরুষ-ভেদ দেহেন্দ্রিয়ের স্তরেই হয়। চৈতন্যের স্তরে কোন নারী-পুরুষ ভেদ নাই। তথাপি চৈতন্য-তত্ত্বকে দেহেন্দ্রিয়ের স্তরে রূপায়িত করিতে হইলে, নারী-পুরুষ-ভাবের কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে ব্রহ্মই পুরুষ, ব্রহ্মই নারী। ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় নিশ্চল আত্মসমাহিত ভাব তাঁহার পুরুষভাব, এবং সক্রিয় সচল সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী লীলাচঞ্চল ভাব তাঁহার নারীভাব। শক্তিরূপে তিনি নারী, শক্তির আশ্রয় ও আধাররূপে তিনি পুরুষ। বৈচিত্র্যবিলাসীরূপে তিনি নারী, স্বীয় অপ্রচ্যুত স্বরূপে তিনি পুরুষ। তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন নিত্য স্বপ্রকাশ-স্বরূপ সব বৈচিত্র্যের সর্বাঙ্গে অনুস্যূত, সব বৈচিত্র্যের অন্তর্যামী নিয়ন্তা ও সম্ভোক্তা, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। আবার স্বীয় বিচিত্র রূপকে অতিক্রম করিয়াও তিনি আত্মস্বরূপে বিরাজমান। বৈচিত্র্যবিলাসিনী নারীমূর্তিতে তিনি আপনার সর্বৈকরূপ স্বয়ংপূর্ণ পুরুষমূর্তির সেবা করিতেছেন, আপনার পুরুষ-

মূর্তির অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্পদকে বাহিরে আনিয়া তিনি বহুভাবে আপনার সম্ভোগ্যরূপে উপস্থিত করিতেছেন।

অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের এই যুগলভাব ভারতের অধ্যাত্মনিষ্ঠ শিল্পসাধনায় নানাপ্রকারে রূপায়িত হইয়াছে। 'অর্ধনারীশ্বর' শিবমূর্তি তাহারই একটি রূপ। শিব ব্রহ্মেরই নামান্তর। অতি প্রাচীন যুগ হইতে তত্ত্বজ্ঞানী মহাযোগিগণ বিশ্বের চরম তত্ত্বকে শিবনামে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। মহাযোগী শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন:

যদাতমস্তন্নদিবা ন রাত্রি
ন সন্ ন চাসন্ শিবএব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥

—যখন বাহ্যতঃ সব অপ্রকাশ, দিনরাত্রির (আলোক-অন্ধকারের) ভেদ নাই, সৎ ও অসতের ভেদ নাই, তখন কেবলমাত্র শিবই স্ব-স্বরূপে বিরাজমান। তিনি নিত্য অপ্রচ্যুতস্বভাব অক্ষর, তিনি সবিতারও বরণীয় (বিশ্বপ্রসবিতারও আদিপুরুষ, মূলতত্ত্ব), সনাতনী প্রজ্ঞাও তাঁহার স্বরূপ হইতে প্রসৃত হইয়াছে।

শিব সর্বপ্রকার ভেদ-অবচ্ছেদের অতীত, দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য সচ্চিৎপরমানন্দ স্বরূপে বিরাজমান, এক অদ্বিতীয় স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ পরমতত্ত্ব। আবার তাঁহারই অচিন্ত্য শক্তি হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ, সব জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত। তিনি নিত্য বিশ্বাতীত ও বিশ্বময়, অচিন্ত্যশক্তির আধার, অনন্ত জ্ঞানের উৎস। তিনি সর্বজীবের আত্মা ও সর্বজীবের আরাধ্য।

এই শিবকে আধা-পুরুষ ও আধা-নারীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য অবশ্য এরূপ নয় যে, তাঁহার অর্ধাঙ্গ পুরুষের ও অর্ধাঙ্গ নারীর। তাঁহার পুরুষভাব ও নারীভাব—নিষ্ক্রিয়ভাব ও সক্রিয়ভাব, সর্বাতীতভাব ও সর্বময়ভাব,—অদ্বৈতভাব ও দ্বৈতভাব অনাদি অনন্তকাল পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। মহাযোগী মহাজ্ঞানী উভয়ভাবেই তাঁহাকে আরাধনা ও আস্বাদন করেন। উভয়রূপে পরম ব্রহ্ম শিবকে উপাসনা করিয়া তাঁহারা নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, কর্মের মধ্যে জ্ঞানের, ভোগের মধ্যে ত্যাগের, সমাজধর্মের মধ্যে সন্ন্যাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পরমতত্ত্বের ধ্যান অক্ষুন্ন রাখিয়া যোগযুক্তচিত্তে নিষ্কামভাবে সংসারে সপ্রেম সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকে শিবময় দেখিয়া এবং অন্তরে শিবময় হইয়া তাঁহারা জগতের সকল দ্বন্দ্ব, সকল সংঘর্ষ, সকল বৈষম্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিবার অপূর্ব কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন।

নিষ্ক্রিয় নিশ্চল আত্মসমাহিত সচ্চিদানন্দ শিবের বুকের উপর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী বিচিত্ররসবিলাসিনী মহাকালীর অবিরাম নৃত্য, পরমব্রহ্মের এই যুগলভাবেরই আর একটি মূর্তি। এই শিবাসনা কালীর উপাসনা দ্বারা বহু সাধক মানবজীবনের সম্যক্ কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বপ্রপঞ্চের যাবতীয় ব্যাপারে সচ্চিদানন্দময়ী মহাকালীরই অপূর্ব তানলয়ছন্দোবিশিষ্ট আনন্দনৃত্য উপভোগ করিয়াছেন এবং সব ব্যাপারেরই অন্তরালে অধিষ্ঠানরূপে স্ব-স্বরূপে বিরাজমান শিবকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মভাব উপলব্ধি করিয়াছেন।

শরৎকালে মহাসমারোহে যে দুর্গামূর্তির পূজার্চনা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যেও ব্রহ্মের এই যুগলভাবই অতি আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত। শিব আত্মসমাহিতভাবে সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি দুর্গার মস্তকোপরি বিরাজমান, আর তাঁহারই স্বরূপভূতা ভগবতী মহাশক্তি জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী, ঐশ্বর্যরূপিণী লক্ষ্মী, বীর্যরূপী কার্তিক ও শান্তিরূপী গণেশকে সঙ্গে লইয়া (সব দৈবী শক্তিরূপে আপনাকেই অভিব্যক্ত করিয়া) এবং বিশ্বসংসারে সব আসুরিক ও পাশব শক্তিকে আপনার চরণতলে রাখিয়া অনাদি অনন্তকাল নৃত্য-বিলাস করিতেছেন। সব দৈবশক্তি, আসুরশক্তি ও পাশবশক্তি এই মহাশক্তিরই বিচিত্র বিলাসরূপ, এবং সকলকে লইয়াই তাঁহার সংসারলীলা, সকলকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখিয়াই তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-বিলাস, সকলের ভিতরেই তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তা চেতনা ও আনন্দের প্রকাশ। ভক্ত সাধক সর্বত্র সচ্চিদানন্দময় শিব ও তাঁহার মহাশক্তির লীলা দর্শন করেন।

দেবীপক্ষ

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্চর্য সুন্দর হ'য়ে ওঠে,
আশ্বিনের যাযাবর এই স্বপ্ন মেঘ!
কোথা হ'তে ভেসে আসে ?
ও যেন সমস্ত প্রেরণা ও প্রাণের আবেগ
একীভূত ক'রে কারে চায়।
ক্ষণিক ও মুক্তি দেয় মনে,
খেলা করে আনন্দ-চঞ্চল এক শিশু,
দোল দিয়ে যায় কাশ-বনে
নূতন ধানের শীষে নিজে দোল খায়।
পুঞ্জীভূত রাত্রির কুয়াশা—
বিন্দু বিন্দু মুক্তা হ'য়ে জলে,
শেফালিকা-ঝরা বনতলে,
হ্রদে-ভাসা কহ্লারের দলে।

বোধন-বাদনে
ধরার অঙ্গনে—বিল্ববৃক্ষতলে
শক্তি, কর্ম-জ্ঞান-শ্রদ্ধা-ভক্তি—যা অব্যক্ত,
তাই মূর্তি ধরে কথা বলে।

আশ্চর্য মধুর এই আশ্বিন-আলোক!
খুলে দিয়ে আনন্দের দ্বার
রূপে রসে গন্ধে বর্ণে
মূর্ত করি' ছবি আঁকে কোন্ অমরার ?
ভাদ্র-নদী কূলে কূলে ভরা,
নীল আকাশের বুকে নীল-মেঘ-মায়া,
তরী হ'য়ে সারি গান গেয়ে ভেসে যায়,
খালে বিলে কাঁপে তার ছায়া।

মৃত্তিকা-কুটীরে কন্যারূপে নামে
ত্রিনয়নী মহামায়া—ভূমা—ভূমি,
কী আনন্দ মনে। কী প্রশান্তি জলে স্থলে!
এই সন্ধিক্ষণে আমি, তুমি—
নীলপদ্ম, জবাপুষ্প, বিল্বপত্র,
দূর্বাপরাজিতা,ধূপ আর দীপ,
নৈবেদ্য, তুলসী, মাল্য ও চন্দন,
পরিপূর্ণ ঘট, আরতি-প্রদীপ :
মৃন্ময়ী প্রতিমা সহ একসত্তা সব উপচার,
—সকলই চিন্ময়।
প্রতিমায় প্রতিবিম্ব নিখিল বিশ্বের,
—দেবীপক্ষে সবি দেবীময়।
জননীর আবাহনে ছন্দোবদ্ধ গীতিময় প্রাণ,
আনন্দ-উদার,
অসীমার আগমনী বাজে,
এ সীমার একতারে তুলিয়া ঝংকার।

সংস্কৃত দূতকাব্যে বাঙালীর দান

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

প্রসিদ্ধ আলংকারিক ভামহ তাঁর 'কাব্যালঙ্কার-সূত্র'গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি বুঝতে পারেন না কেন বড় বড় কবিও 'অবাচোঽযুক্ত বাচোঽদূরদেশবিচারিণঃ'—অর্থাৎ যারা কথা বলতে পারে না, যাদের বাক্যের কোনও সংলগ্নতা নেই এবং যারা দূরদেশে পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে না, তাদের "দূত" ক'রে প্রেরণ করেন। এ রকম "দূতে"র উদাহরণ তিনি দিয়াছেন, যেমন (১) মেঘ, বাতাস, চন্দ্র; (২) ভ্রমর, হারীত, চক্রবাক, শুক প্রভৃতি। ভামহ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর লোক। কালিদাসের ও তাঁর আবির্ভাব-সময়ের মধ্যে উল্লিখিত নামের গ্রন্থসমূহ নিশ্চয় রচিত হয়েছিল, কিন্তু আজ সেগুলি নামে মাত্র পর্যবসিত হয়ে গেছে। কালের করাল গ্রাস থেকে যে দূতকাব্যগুলি রক্ষা পেয়েছে, সেগুলির মধ্যে বাঙালী সংস্কৃত কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ধোয়ী লক্ষ্মণসেনের সভাকবি, কাজেই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অন্ত্যভাগ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি জীবিত ছিলেন।

সেই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গদেশে বহু সংস্কৃত দূতকাব্য রচিত হয়েছে। দুএক খানা বাংলা দূতকাব্যও রচিত হয়েছে, যেমন রঘুনাথ দাসের 'হংসদূত'। আমরা বঙ্গদেশে বিরচিত চল্লিশখানা দূতকাব্যের হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করতে পেরেছি। এ সমস্ত দূতকাব্য বিশ্লেষণ করলে একটি কথা বিশেষভাবে মনে হয়। কালে কালে সংস্কৃত দূতকাব্য-সাহিত্যে বিভিন্ন বিষয়, ছন্দ, বর্ণনকৌশল প্রভৃতি অবলম্বিত হয়, এ সাহিত্যের ধারা বহুমুখী। বঙ্গদেশ তো এ সবই অবলম্বন করেছে, কিন্তু এ দেশের দূতকাব্য-সাহিত্যে দানের বহু বৈশিষ্ট্যও আছে। সে বৈশিষ্ট্য বাঙালীর মনোধর্মের দার্শনিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী বৌদ্ধ সংস্কৃত কবি রামচন্দ্র ভারতী তাঁর 'ভক্তি-শতক' রচনা করেছিলেন সিংহলে প্রবাসকালে। কিন্তু তাঁর এ গ্রন্থে ভগবান্ বুদ্ধ, শিব, কৃষ্ণ—একেবারে একাকার হয়ে গেছেন। জয়দেব যেভাবে বিভোর হয়ে 'গীতগোবিন্দ' কাব্য রচনা করেছিলেন, বঙ্গদেশ তখন সেভাবের বন্যায় পরিপ্লাবিত। তা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' থেকেও সুপ্রকট। ধোয়ীও প্রেমের কাব্যরূপেই 'পবনদূত' লিখেছেন:

গন্ধর্বকন্যা কুবলয়বতী মলয়-পর্বত থেকে পাণ্ড্য, চোল, সুহ্ম, কাবেরী, গোদাবরী, রেবা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর দূতকে প্রিয় বিজয়ী বীর লক্ষ্মণসেনের কাছে বঙ্গদেশের তদানীন্তন প্রখ্যাত বিজয়পুরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। কিন্তু তিনি বিরহিণীর যা অবস্থা বর্ণন করেছেন, তাতে কুবলয়বতীকে রাধাভাবেই ভাবিত দেখা যায়। লক্ষ্মণসেন কায়ব্যূহ বিস্তার ক'রে তাঁর চারিধারে বিদ্যমান, কুলশীল লজ্জা প্রভৃতি ত্যাগ ক'রে তিনিও ছুটে আসতে চান—এ মিনতিই তিনি নিবেদন করেছেন। বঙ্গদেশের এ ভক্তি-বিপ্লাবিত মনোভাব যখন স্ফুটতর ও ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে, তখন এলেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। তার একশত বৎসর পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমবতীর্ণ হয়ে সে ভক্তিধারাকে

জগদ্ বিপ্লাবী ক'রে দিলেন। বঙ্গদেশের তাপিত প্রাণ শীতল হ'ল।

ফলে মহাপ্রভুর শিষ্য প্রশিষ্যেরা যে সকল দূত-কাব্য বিরচণ করেছেন, তার মধ্যে এ স্রোত তো খরবেগে প্রবাহিত হবেই। মহাপ্রভুর নিজের মাতুল বিষ্ণুদাসের 'মনোদূত' গ্রন্থ ভক্তিরসের আকরস্বরূপ। সেই শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন রাধিকারমণ, সেই হিন্তাল-তাল-বটশাল-পরিবৃত বৃন্দাটবী, সেই প্রেমযমুনা ও ভক্তি-মন্দাকিনী শ্রীকৃষ্ণ ও কবির মাঝখানে দূত হচ্ছে কবির আপন মন। এ বংশে সমুদ্ভূত আর একজন কবি রামরামশর্মাও 'মনোদূত' রচনা করেছেন। এখানেও ভক্তি উপজীব্য—রস শান্ত, কিন্তু বর্নভঙ্গিতে ও ছন্দে বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে মন ও দ্বিজ বা কবির মধ্যে কথোপকথন চলেছে, ছন্দ কখনও বা শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী প্রভৃতি, কখনও বা পজ্ঝটিকা প্রভৃতি।

তালিত-নগর-নিবাসী মাধব কবীন্দ্র ভট্টাচার্য মহাভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত উদ্ধবের দৌত্যের প্রত্যুত্তরে গোকুল থেকে পুনরায় মাতাপিতা বিশেষতঃ গোপীগণের ও শ্রীরাধার দূতরূপে সেই একই উদ্ধবকে দূত ক'রে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেছেন। ফলে এ গ্রন্থের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের ও ভক্তিভাবের বিপুল প্রভাব অনিবার্য। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব দবীরখাস শ্রীরূপগোস্বামীও 'উদ্ধব সন্দেশ' রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি ভাগবত-বৃত্তান্তই অনুসরণ করেছেন, ছন্দও নিয়েছেন 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব ভাবের নব-নবোন্মেষণে, ভক্তির প্রবল বিপ্লাবনে। শ্রীরূপ 'হংসদূতে'ও এ ভক্তির বন্যা প্রবাহিত ক'রে দিয়েছেন। এ গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে তিনি তাঁর অগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে প্রণতি জানিয়েছেন—তা অত্যন্ত শোভন। এজন্য যে তাঁর অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীই তো স্বকৃত "মেঘদূত-টীকা"য় দূতকাব্য সাহিত্যের প্রতি চরম আসক্তি এবং ভগবচ্চরণে পরমা ভক্তি প্রদর্শন করেছেন—এ টীকার প্রারম্ভেই তিনি করপাত্রী নন্দনন্দনের জয়গান করেছেন।[১] 'হংসদূতে' রাধার বিরহ-বর্ণনায় কবি কবিত্ব ও ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। 'হংসদূত' তো আরও অনেক আছে, বামনভট্ট বাণও 'হংসদূত' রচনা করেছেন[২] কিন্তু এ গ্রন্থে কবি দূতকাব্যকে করেছেন সর্বকালজয়ী—পরমহংসই সত্যস্বরূপের পূর্ণ নিদর্শন।

এ ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে আরও পরবর্তী যুগে বঙ্গের কত কবিই না সংস্কৃত দূতকাব্য রচনা করেছেন, যথা: শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম—'পদাঙ্ক দূত', লম্বোদর বৈদ্য—'গোপীদূত', ত্রিলোচন—'তুলসী-দূত', বৈদ্যনাথ দ্বিজ—'তুলসীদূত', গঙ্গাটিকুরীর ভোলানাথ—'পান্থদূত'[৩], কালীপ্রসাদ—'ভক্তি-দূত', গোপেন্দ্রনাথ গোস্বামি—'পাদপদ্মদূত' প্রভৃতি। এই গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে পদাঙ্কদূতের[৪] *একটি আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে। ন্যায়ের সঙ্গে,* ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে ভক্তিভাবের এমন অপূর্ব সম্মেলন ইতঃপূর্বে কোনও দিন দৃষ্ট হয়নি, পরবর্তী যুগেও তার তুলনাস্থল নেই। ন্যায়-শাস্ত্রের সঙ্গে ভক্তির বিরোধের একি অপূর্ব সমাধান,—সত্যি অভাবিতপূর্ব! কাব্য-প্রকাশের ও দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কা-লঙ্কারের 'চন্দ্রদূত' ও ন্যায়শাস্ত্রগন্ধি সিদ্ধনাথ

১। প্রাচ্যবাণী মন্দির থেকে প্রকাশিত মেঘদূতের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২। ঐ প্রকাশিত দূতকাব্য সংগ্রহের চতুর্থ খণ্ড।

৩। ঐ ষষ্ঠ খণ্ড। ৪। ঐ সপ্তম খণ্ড।

বিপ্র তাঁর 'পদ্মদূতে'ও ন্যায়ঘটিত বাক্য ও ন্যায়-পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ শেষোক্ত গ্রন্থে সীতা তাঁর উদ্ধারের নিমিত্ত রামচন্দ্র সিন্ধুতট পর্যন্ত এসেছেন জেনে 'পদ্ম'কে দৌত্যে বরণ করেছেন।

সীতা ও রামের বিরহকাহিনীমূলক দূত-কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের অগ্রজ রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির 'ভ্রমরদূত'[৫]। এখানে হনুমানের অশোককানন থেকে সীতাদেবীর সংবাদ নিয়ে ফিরে আসার পর শ্রীরামচন্দ্র ভ্রমরকে মাল্যবান্ পর্বত থেকে সীতাদেবীর নিকট দূত ক'রে পাঠাচ্ছেন। এ বিষয়ে অন্যতর বিশিষ্ট গ্রন্থ কৃষ্ণনাথের 'বাতদূত'—এ গ্রন্থে সীতা অশোক-কানন থেকে পবনকে দূত ক'রে পাঠাচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের নিকট।

বর্তমান সময়ে রচিত হলেও মহামহোপাধ্যায় অজিত ন্যায়রত্নের 'বকদূত' গ্রন্থ[৬] সর্বযুগের দূতকাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য। দূতের গমনপথ কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত, এবং গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার। নবদ্বীপের তোটরঙ্গ বাজার থেকে পণ্ডিতসমাজ পর্যন্ত অনেকের ও অনেক কিছুর নিন্দা ও স্তুতির আকর এ গ্রন্থ বিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের এক অক্ষয় গৌরবের নিদর্শনরূপে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকবে।

৫। ঐ সংগ্রহ-কাব্যমালার প্রথম পুষ্প।

৬। প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ড।

নির্ভাবনা

শ্রীশান্তশীল দাশ

প্রদীপখানি নাই বা যদি জ্বলে
চরণ দু'টি থেমেই যদি যায়,
দুষবো নাক' কারেও কোন ছলে,
ভাগ্য নিয়ে করবো না হায় হায়।

বলবো আমি: ইচ্ছা ছিল মনে,
জ্বালবো বাতি, চলবো বহুদূর,
বারে বারেই নিভলো অকারণে
প্রদীপখানি, বাজলো নাক' সুর।

সাঙ্গ হ'ল সমুখ পথে চলা,
এবার শুধু নীরব সুরে গান,
একলা বসে মনের কথা বলা,
কারও পরে নেইকো অভিমান।

আলো ছায়ার কতই খেলা চলে
কান্না-হাসির এই ধরণী' পরে,
কারও ঘরে উছল বাতি জ্বলে,
কেউ বা থাকে আঁধার ঘেরা-ঘরে।

আমার ঘরে আঁধার যদি থাকে,
থাকুক না সে—গভীর অমারাতি;
সেই আঁধারে পাবই পাব তাকে,
যে জন আমার চিরদিনের সাথী।

বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সাধারণতঃ চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা পাই। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে :

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ।
বিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

(বলদেব বিদ্যাভূষণের উপক্রমণিকার টীকায় ও প্রমেয়-রত্নাবলীতে ১।৫-৮ উদ্ধৃত)

অর্থাৎ—রামানুজ শ্রী সম্প্রদায়, মধ্ব ব্রহ্মার সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়, ও নিম্বার্ক সনকাদি-সম্প্রদায়-ভুক্ত।

এই প্রবাদানুসারে বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায় ও শুদ্ধাদ্বৈত-মতবাদের প্রবর্তক। শ্রীযদুনাথজীর নামে প্রচলিত 'শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়' গ্রন্থেও আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামী কর্তৃক প্রবর্তিত শুদ্ধাদ্বৈত-বাদই পরে শ্রীবল্লভাচার্য পুনঃ প্রচারিত করেন (২য় অবচ্ছেদ)। অবশ্য, বল্লভ স্বয়ং বিষ্ণুস্বামীকে সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে কোন স্থানে প্রণতি নিবেদন করেননি। উপরন্তু, তিনি তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বিষ্ণুস্বামীর মতবাদের অপেক্ষা স্বীয় মতবাদের শ্রেয়ত্ব-প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন।

যাহোক, বিষ্ণুস্বামীর জীবনী সময় ও রচনাবলী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর কোন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি গ্রন্থে তাঁর মতবাদের কিছু বিবরণ পাওয়া যায় :

(১) শ্রীনিবাসাচার্য-রচিত 'সকলাচার্য-মত-সংগ্রহে' বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বার্ক ও মধ্বের মতবাদের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে প্রপঞ্চিত বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ বল্লভের মতবাদেরই অনুরূপ।

(২) মাধবাচার্য-বিরচিত 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহে'র রসেশ্বর-দর্শন আলোচনা-কালে বিষ্ণুস্বামীর মতও সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হয়েছে :

"ন চেদমদৃষ্টচরমিতি মন্তব্যম্। বিষ্ণুস্বামি-মতানুসারিভির্নৃপঞ্চাস্য শরীরস্য নিত্যত্বো-পাদানাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ—

সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্য পূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্।
নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সংমতম্॥"

অর্থাৎ রসশাস্ত্রোক্ত মার্গদ্বারাই জীবন্মুক্তি সম্ভবপর, এবং জ্ঞানীর দেহ নিত্য—এই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলছেন যে, এই দেহের নিত্যত্ব, তা যে কোন কালে দৃষ্ট হয় না, তা মনে করা ভুল। কারণ, যাঁরা বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারী, তাঁরা বলেন যে, বিষ্ণুর নরসিংহ দেহ নিত্য। সেজন্য 'সাকার সিদ্ধি'তে বলা হয়েছে—সৎ, চিৎ, নিত্য, অচিন্ত্য, পূর্ণানন্দের একমাত্র বিগ্রহ যে নরসিংহমূর্তি, তাঁকে আমি বন্দনা করি। এই বিগ্রহ বিষ্ণুস্বামি-সম্মত।

'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' এই রসেশ্বর-দর্শনেই বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্রের উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে :

সদাদীনি বিশেষণানি গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রৈঃ
বিষ্ণুস্বামি-চরণ-পরিণতান্তকরণৈঃ প্রতিপাদিতানি।

অর্থাৎ—বিষ্ণুস্বামীর চরণে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ক'রে গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র নরসিংহ-বিগ্রহের সৎ ও অন্যান্য গুণাবলী প্রতিপাদিত করেছেন।

এরূপে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহে' উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামী ও বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মত থেকে জানা যায় যে, এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা শ্রীনৃসিংহ। এই দিক থেকে, বল্লভ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের প্রভেদ আছে, কারণ বল্লভ-

সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা গোকুল-কৃষ্ণ। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মতেই—দেহ ও দেহী অভিন্ন, এবং পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ নিত্যদিব্যবিগ্রহবান্।

(৩) শ্রীধরস্বামি-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা 'ভাবার্থদীপিকায়' বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ সংক্ষেপে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন, তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুস্বামিনা—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥
তথা, স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দিতঃ।
স্বাবির্ভূত-পরানন্দঃ স্বাবির্ভূত-সুদুঃখভূঃ॥
স্বাদৃগুত্থবিপর্যাস-ভব-ভেদজ-ভী-শুচঃ।
যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ॥ (১-৭-৬)

অর্থাৎ বিষ্ণুস্বামীর মতে, ঈশ্বর বা নৃহরি হ্লাদিনী বা আনন্দ ও সংবিৎ বা জ্ঞান-শক্তিবিশিষ্ট এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু জীব, স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এবং তজ্জন্য সমস্ত ক্লেশের আকর-স্বরূপ। এরূপে, তিনিই ঈশ্বর যিনি মায়াধীশ, বা মায়াকে সম্পূর্ণ নিজের বশে রেখেছেন, এবং তিনিই জীব যিনি মায়াধীন, বা মায়ার দ্বারা ক্লিষ্ট। সেজন্য জীব স্বীয় অজ্ঞানবশতঃ, স্বীয় স্বরূপের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হন। এবং আত্মা থেকে ভিন্ন দেহাদিকে আত্মারূপে গ্রহণ ক'রে ভয়-শোক-প্রমুখ অশেষ ক্লেশভাগী হন। শ্রীনৃহরির মায়ার দ্বারাই জীব সংসারে অবস্থান করেন।

এরূপে বল্লভের ন্যায়, বিষ্ণুস্বামীর মতেও মায়া শব্দের অর্থ ব্রহ্মাশ্রিত মিথ্যা মায়া-শক্তি নয়। পরমেশ্বরের দিক্ থেকে 'মায়া' শব্দের অর্থ হ'ল—তাঁর অচিন্ত্য শক্তি যার সাহায্যে তিনি জীবজগৎ সৃষ্টি করেন, জীবের দিক থেকে 'মায়া' শব্দের অর্থ—জীবাশ্রিত অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যার প্রভাবেই জীব—চিৎস্বরূপ হয়েও ক্লেশভাগী।

শ্রীধরস্বামী 'ভাবার্থদীপিকা'য় (৩-১২।১-২) বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারে জীবের এই পঞ্চক্লেশের উল্লেখ করেছেন, যথা অজ্ঞান, বিপর্যাস (স্বরূপান্যথা জ্ঞান), ভেদ (আত্মভিন্ন দেহে অহংমমত্ব জ্ঞান), ভয় ও শোক। যথা: "শ্রীবিষ্ণুস্বামি প্রোক্তা বা জ্ঞান-বিপর্যাস-ভেদ-ভয়-শোকাঃ।"

শ্রীধরস্বামী 'ভাবার্থদীপিকা'য় (১০।৮৭।২১) বিষ্ণুস্বামীর মোক্ষবিষয়ক মতবাদ উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন:

শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি।—

যদাহ—'যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্ম-বাদিনশ্চ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে।'

অর্থাৎ 'সর্বজ্ঞ' ভাষ্যকারের মতে, মুক্ত জীব-গণও লীলাভরে বিগ্রহ পরিগ্রহ ক'রে পরমেশ্বরের ভজনা করেন। এই মতও বল্লভ-মতানুসারী।

(৪) শ্রীধরস্বামী স্বরচিত বিষ্ণুপুরাণ-টীকা 'আত্ম-প্রকাশে' (১।১২।৭০) 'সর্বজ্ঞ-সূক্তি' নামক গ্রন্থের উল্লেখ ক'রে 'ভাবার্থদীপিকা'য় উদ্ধৃত শ্লোকটি পুনরায় উদ্ধৃত করেছেন: "তদুক্তং সর্বজ্ঞ-সূক্তৌ—হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ॥"

এরূপে, 'ভাবার্থদীপিকা' ও 'আত্মপ্রকাশ' উভয় গ্রন্থেই শ্রীধরস্বামী 'সর্বজ্ঞ-ভাষ্যকৃৎ' ও 'সর্বজ্ঞ-সূক্তি'র উল্লেখ করাতে, অনুমান করা চলে যে, বিষ্ণুস্বামী 'সর্বজ্ঞ-সূক্তি' নামক ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করেছিলেন।

(৫) শ্রীযদুনাথজীর নামে প্রচলিত 'শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়' নামক গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তাঁর সম্প্রদায়ের একটি বিবরণী আছে। এই গ্রন্থানুসারে—বল্লভকে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় ভুক্ত বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) নাভাদাসের হিন্দি ভক্তমালেও বিষ্ণু-স্বামী ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থানুসারেও বল্লভ বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত।

(৭) রামানন্দি-সম্প্রদায়ের 'রামপটল' নামক গ্রন্থে নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্ব-সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী সঙ্কলিত আছে। এই গ্রন্থানুসারে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা—কমলা-সহিত জগন্নাথ, এবং মুক্তি সাযুজ্য-মুক্তি।

বিষ্ণুস্বামীর সম্পূর্ণ মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর স্বরচিত কোন গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত—অন্ততঃ সাধারণে পরিজ্ঞাত না হওয়ায়, বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভের মতবাদের ঐক্য বা অনৈক্য সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। তবে, 'সকলাচার্য-মত-সংগ্রহে' উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মত-বাদকে প্রামাণিক ব'লে গ্রহণ করলে, বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভের মতবাদকে প্রায় এক ব'লে স্বীকার করতে হয়।

ভক্তিবাদ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ভক্তি তুমি নিষ্ঠুর অতি, তোমায় করি নমস্কার,
তোমার কৃপা যাহার পরে তাহার দেখি অশ্রু সার।
শয়নে হরি, স্বপনে হরি, ভোজনে স্মরি' হরির নাম
নিত্য পূজি' গোবিন্দজী গোকুল ভাবে স্বর্গধাম!

হারিয়ে তারা ঐহিকেরে হয় যে বড় 'বুদ্ধিহীন'
দম্ভ ভুলে অহংকারী তোমার প্রেমে পরম দীন!
তরুর চেয়ে সহনশীল, তৃণের চেয়ে সুনীচ দেখি,
স্তম্ভিত এ শক্তি হেরি, ভেল্কি খেলে ভক্তি একি!

গর্ব ছিল যাহার রূপে, গর্ব ছিল অশেষ গুণে,
লুটিয়ে দিয়ে সব কিছু সে দাস বনেছে,—অবাক্ শুনে!
হীরক-প্রভা যার প্রতিভা, অশেষ ছিল বিদ্যা ঘটে,
জ্ঞানের শিখা জ্বলতো সদা দীপ্ত তেজে ললাট-পটে,

ভক্তিরসে সিক্ত করি আত্ম-ভোলা করছো তারে,
নির্বাপিত বুদ্ধি যেন, তোমায় যাচে নির্বিচারে।
তিলক ফোঁটা, তুলসীমালা, মানতো না যে পূর্বাবাসে,
মানছে নুড়ি, পুতুল, বলে, 'ভক্তি নাশে অবিশ্বাসে!'

ভক্তিরসে ভাসলে লোকে হারিয়ে ফেলে সহজ জ্ঞানে,
অলৌকিকে শ্রদ্ধা জাগে, ইষ্ট লভে কৃষ্ণ-ধ্যানে।
কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ মিতা, কৃষ্ণ প্রিয়,
কৃষ্ণ হরি নারায়ণই ভক্তপ্রাণে বাঞ্ছনীয়।

মত্ত সদা কীর্তনেতে, নামের প্রেমে ভাবসমাধি,
চিত্তপুরে নাচছে সুরে সম্বাদী ও বিসম্বাদী।
নিজের ব'লে রাখতে কিছু দাওনা তুমি ভক্তে জানি,
অন্ধ করো তোমার প্রেমে, তাইতো আমি শংকা মানি।

ভক্তি নিয়ে উঠলে মেতে হতেই হবে 'লক্ষ্মী-ছাড়া',
ভক্তি আনে নির্ভরতা, জীবন-মূলে দেয় সে নাড়া।
ভক্তজনে কাঁদিয়ে বলো, 'কাঁদলে তবে ভিজবে মন,'
তোমার দাবি সর্বগ্রাসী—নিঃশেষে প্রাণ-সমর্পণ!

প্রশ্ন শুধু, তোমার পায়ে লুটিয়ে দিয়ে সত্তা তারা
কৃষ্ণনামে হরির নামে কেমনে হয় আত্মহারা?
সর্বনাশা বিধান দেখে যাই না ভয়ে তোমার কাছে;
'ভক্ত' নামে জাহির যারা—ভক্তি তাদের সত্যি আছে?

একটি নদী ও দুইটি পর্বত

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

এবার গ্রীষ্মকালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় নদী ও দুইটি বিখ্যাত তুষারশৃঙ্গ দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। পর্বতদ্বয়ের একটি ওরিগন রাজ্যে অবস্থিত—মাউণ্ট হুড (Mount Hood), উচ্চতা ১১,২৫৩ ফুট, অপর পর্বতটির নাম মাউণ্ট রেনিয়ার (Mount Rainier)—উচ্চতা ১৪,৪১০ ফুট, এটি ওয়াশিংটন প্রদেশের অন্তর্গত। ওরিগন এবং ওয়াশিংটন দুইই প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে পাশাপাশি রাজ্য। ওরিগনের উত্তরে ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটনের উত্তরে আর যুক্তরাষ্ট্র নয়—কানাডা দেশ। ওরিগন ও ওয়াশিংটন এবং এদের অব্যবহিত পশ্চিমদিকে অবস্থিত আইডাহো—এই তিনটি রাজ্যকে একত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'উত্তর-পশ্চিম' (North-West) বলা হয়। প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই 'উত্তর-পশ্চিমে'র একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দূর-বিস্তৃত পর্বতমালা ও অরণ্যানীর পাশাপাশি বহুপ্রসারিত সমতলভূমি, ছোট বড় অনেক হ্রদ, এবং আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ নদী কলাম্বিয়া ও তার শাখাপ্রশাখার পরিপ্রসার এই বৈশিষ্ট্যের মূলে। ১২১৪ মাইল লম্বা কলাম্বিয়া নদী কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি পাহাড় থেকে বেরিয়েছে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন রাজ্যের ভিতর উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পরে ওয়াশিংটন ও ওরিগনের সীমা বিভাগ ক'রে বরাবর পশ্চিমে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। সমুদ্র-সঙ্গম থেকে প্রায় তিনশ' মাইল পিছনে কলাম্বিয়ায় মিলিত হয়েছে আর দুটি বড় নদী—য়াকিমা (Yakima), এবং 'সর্প' নদী (Snake river)। 'সর্প' নদীর সর্পিল গতি-বিলাসের বেশিটা ঘটেছে আইডাহো রাজ্যে। পাহাড়, বন, নদী, সমতল, হ্রদ, জলপ্রপাত এবং তুষার—প্রকৃতির এই সপ্ত মূর্তির চমৎকার সামঞ্জস্য হেতু আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে একটি রুদ্র-কোমল শান্ত-তরল শ্বেত-শ্যামল শ্রী বিরাজ করে, যা ভ্রমণকারীর চিত্তে একটা স্বপ্ন-মায়ার ছাপ রেখে দেয়।

জুলাই-এর গোড়ার দিকে এক বিকালে স্যানফ্রান্সিস্কো উপসাগরের পশ্চিমতীরস্থ ওকল্যাণ্ড ষ্টেশনে সাদার্ন প্যাসিফিক রেলওয়ের উত্তরগামী একটি গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ীর নাম—'ক্যাসকেড'। ক্যাসকেড পর্বতমালার মধ্য দিয়ে এঁর গতি, তাই ঐ নাম।

এদেশের স্বাধীনতা-দিবস ৪ঠা জুলাই-এর দৌলতে স্যানফ্রান্সিস্কো এবং অ্যালামেডা বন্দরে ৩।৪ রকম বড় বড় যুদ্ধের জাহাজ এবং সাব-মেরিনের ভিতরে গিয়ে সব দেখা হয়েছে, হেলিকপটারও দেখে নিয়েছি, কিন্তু আমেরিকার রেলগাড়ীতে চড়ার সুযোগ এ যাবৎ হয়নি! অতএব গাড়ীতে উঠে প্রাণে একটা মুক্ত স্বচ্ছ ভাব বোধ করছিলাম।

বেদান্ত সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ ক্লিফটন ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন—বললেন, ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে নিন্। ঠিক কথা। আমেরিকায় পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত ৪টি বিভিন্ন সময়-অঞ্চলে বিভক্ত। এক একটি অঞ্চলের সময়ের হিসাব যথাক্রমে একঘণ্টা ক'রে কম। আঞ্চলিক সময়-গুলির নাম যথাক্রমে—ইস্টার্ন স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, সেণ্ট্রাল স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, মাউণ্টেন স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম

এবং প্যাসিফিক স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। নিউইয়র্কে যখন সন্ধ্যা ৭টা ক্যানসাস্ সিটিতে তখন ৬টা, সল্ট-লেক সিটিতে তখন বেজেছে ৫টা আর প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে স্যানফ্রান্সিস্কো বা লস্এঞ্জেলেস্ শহরের ঘড়ির কাঁটা তখন বিকাল ৪টায়। কিন্তু বিপদ এইখানেই শেষ নয়। ক্যালিফর্নিয়ায় গরমের তিনমাস আর একটি পঞ্চম সময় চালু থাকে—ডে লাইট সেভিং টাইম। এই কয়মাস দিন বড়, তাই দিবালোককে যতটা সম্ভবপর কাজে লাগাবার জন্যে ঘড়ির কাঁটা একঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়। প্যাসিফিক স্ট্যাণ্ডার্ডে যখন বিকাল ৪টা ক্যালিফর্নিয়া 'ডে লাইট সেভিং' সময় তখন বিকাল ৫টা। আমি ক্যালিফর্নিয়ায় থাকি, 'ডে লাইট' মেনে চলতে হয়। সাদার্ন প্যাসিফিক রেল-কোম্পানি মানেন প্যাসিফিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। অতএব আমার ঘড়ির কাঁটা একঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হ'ল।

ক্যাসকেড গাড়ীটি যে এত লম্বা তা আগে ভাবতেই পারিনি। আমি ছিলাম সব চেয়ে পিছনের কামরায়। গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা খানেক পরে রেল লাইনের একটা বড় বাঁকে যখন গাড়ীটি অর্ধ-বৃত্তাকারে এগুচ্ছে তখন জানালা দিয়ে তাকিয়ে গাড়ীর আগের দিক নজরে পড়লো। কিন্তু আগা কোথায়? কেবল কামরার পর কামরাই দেখছি, ইঞ্জিন যে কতদূর তা ঠাহর করতে পারা গেল না। আবার এই অতিকায় গাড়ীটি চলবে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়শ্রেণী চড়াই ক'রে! সমস্ত গাড়ীটির মাঝ বরাবর একটি পথ (করিডর) রয়েছে, গাড়ীর যে কোন অংশ হ'তে অপর যে কোন অংশে যাওয়া যায়।

গাড়ী চলছে বিদ্যুৎশক্তিতে। ইঞ্জিনের সঙ্গে জেনারেটার রয়েছে, ওখানেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। এত বড় গাড়ী ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ মাইল বেগে যাচ্ছে, কিন্তু গাড়ীর ভিতরে বসে বিশেষ কোনও ঝক্‌ঝক্ শব্দ টের পাচ্ছিলাম না। এও আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। রেলগাড়ীর সঙ্গে ঝক্‌ঝক্ শব্দ শিশুকাল থেকে মনে বসে আছে।

আমেরিকায় প্রায় ৬০টি রেল-কোম্পানি আছে। এদের মালিকানা ব্যক্তিগত, তবে ভাড়া ইত্যাদি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি নির্দেশ সব কোম্পানিকেই মেনে চলতে হয়। রেল-কোম্পানিগুলি ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে, নাম—পুলম্যান কোম্পানি (The Pullman Company)। এই প্রতিষ্ঠান রেল-কোম্পানিগুলিকে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সহ শোবার কামরা ভাড়া দেন, কামরাগুলিতে বেডরুম, কম্পার্টমেণ্ট, ড্রয়িংরুম, ডুপ্লে সিংগল রুম, রুমেট, সেকশন, বার্থ—এতগুলি পর্যায়ের শয়ন-ব্যবস্থা। পুলম্যানের এই কামরাগুলি মূল গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। রেল-কোম্পানির টিকিট ছাড়া পুলম্যান কোম্পানির আর একটি টিকিট কিনতে হবে, যদি কেউ শুয়ে যেতে চান। পুলম্যান কোম্পানির হেড কোয়ার্টার শিকাগোতে। বর্তমানে এঁদের সাড়ে চার হাজার স্লীপিং কার (Sleeping car) রয়েছে, এক একটি স্লীপিং কার প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা এবং অনেকগুলি উপরোক্ত বেডরুম, কম্পার্টমেণ্ট প্রভৃতিতে বিভক্ত। যে রেল-কোম্পানির যখন যে রকম চাহিদা তদনুসারে এঁরা এই 'কার'গুলি ধার দেন। পুলম্যানের এই 'কার'গুলিতে কোম্পানির নিজেদের কনডাক্টর, পোর্টার প্রভৃতি আছে।

আমি চলেছি পুলম্যানের একটি রুমেট-এ (roomette); রুমেট অর্থাৎ ছোট কক্ষ। কক্ষ তো নয়, একটি ছোট যন্ত্রশালা! চারিপাশেই সুইচ এবং গ্যাজেট (Gadget)। গ্যাজেট শব্দের

অর্থ নিত্যকার কাজে সহায়ক ছোট যন্ত্র। আমেরিকা হ'ল গ্যাজেটের দেশ। কায়িক পরিশ্রম, অসুবিধা ও সময় বাঁচাবার জন্যে নিত্য নতুন রকমারী গ্যাজেট উদ্ভাবিত হচ্ছে। আমেরিকান গৃহে গৃহলক্ষ্মীরা এই হরেক রকম গ্যাজেটের সাহায্যে এক একজন দশভুজা; একা মানুষ পাঁচজনের কাজ করতে পারেন। যাহোক এক রাত্রির এই ক্ষুদ্র অতিথিশালা 'রুমেট'-এ অতিথি-সৎকারের যান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা দেখে আমার চক্ষুস্থির! বিভিন্ন রকমের আলোর সুইচগুলি ছাড়া কক্ষের টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে সুইচ রয়েছে। বাতাস-নিয়ন্ত্রণের আলাদা সুইচ। একটি সুইচ পোর্টারকে ডাকবার জন্যে। বসবার সোফাটিতে ২।৩টি গ্যাজেট বসানো উপবেশনের আরামের প্রকার-ভেদের জন্যে। দুটি গ্যাজেট ঘুরালে দেয়াল থেকে ৬ ফুট লম্বা ও প্রায় ৪ ফুট চওড়া স-কম্বল সোপাধান এক দুগ্ধফেননিভ শয্যা উদ্‌গত হয়ে ধীরে ধীরে নীচে পড়বে। তৃতীয় আর একটি গ্যাজেটের সাহায্যে এই শয্যাকে ৪ সেকেণ্ডের মধ্যে দেয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। রুমেটের এক পাশে টয়লেট, ওয়াশ-বেসিন, বরফ-শীতল পানীয় জল নিজ নিজ গ্যাজেট-সাহায্যে সেবা-উন্মুখ হয়ে রয়েছে। ধবধবে পরিষ্কার ছোট বড আধ ডজন তোয়ালে, নতুন সাবান এবং জলপানের জন্যে কাগজের অনেকগুলি গ্লাস এখানকার তাকে সাজানো রয়েছে। কক্ষের আর একটি দেয়ালে অপর একটি গ্যাজেট দেখা যাচ্ছে। এটির সঞ্চালনে ঐ দেয়াল ফাঁক হয়ে একটি জামাকাপড রাখবার ক্লজেট চোখে পড়বে। রুমেট্-এর একটি তাকে জুতো খুলে রাখবার জায়গা। পোর্টার সুবিধামতো এসে জুতো পালিশ ক'রে দিয়ে যায়। কক্ষের সব গ্যাজেট ও সুইচের প্রয়োগ-প্রণালী নিজে বুঝতে না পারলে পোর্টার সানন্দে ওয়াকিবহাল ক'রে দেয়। ব্যবহৃত তোয়ালে গ্লাস প্রভৃতি রাখবার স্বতন্ত্র জায়গাও এককোণে নির্দিষ্ট রয়েছে। জানলা ও দরজায় পর্দার ব্যবস্থা আছে। তাও গ্যাজেট সাহায্যে টানতে বা খুলতে হয়।

এত আরাম ভারতীয় সন্ন্যাসীর ধাতে সহ্য হওয়া কঠিন, তাই ঘুম ভেঙে গেল। বালিশের নীচে থেকে পকেট ঘড়িটা টেনে দেখি রাত দুটো, ঘড়ির সাড়াশব্দ নেই। অনেক ঝাঁকাঝাঁকি করাতেও তাঁর ঘুম ভাঙলো না। অগত্যা রাত দুটো কি তিনটে কিছুই বুঝতে না পেয়ে চুপচাপ ভগবৎস্মরণ ও ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ভোরে জানালার পর্দা টেনে বাইরে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। ক্যালিফর্নিয়ার গ্রীষ্মকালীন শুকনো ঘাসে-ছাওয়া ন্যাড়া পাহাড় নয়—সজল, শ্যামল বনানীমণ্ডিত, ঠিক যেন কার্সিয়ং-দার্জিলিং পাহাড়। নর্থ-ওয়েস্টে এসেছি বটে! চোখ জুড়িয়ে গেল।

সকাল আটটায় 'ক্যাসকেড' ঠিকানায় পৌছুলেন—ওরিগনের প্রধান শহর পোর্টল্যাণ্ডে। প্রধান শহর হলেও পোর্টল্যাণ্ড ওরিগনের রাজধানী নয়। রাজধানী সালেম অনেক ছোট শহর। আমেরিকার রাজ্যগুলিতে রাজধানী একটা ছোট জায়গাতেই হয়। আমেরিকান-জীবনে রাজ্য-শাসন ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাসন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি শব্দগুলি আমেরিকানরা বেশী পছন্দ করে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই এদের প্রিয় আদর্শ। 'রাজ্য থাকলে রাজ্যের আইন কানুন শাসন অবশ্য চাই—কিন্তু যাদের উপর ভার দিয়েছি তারা সেটা করুক, আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাবো না; আমরা আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা এবং অপর দশ রকম ব্যাপৃতি নিয়ে থাকবো'—এই যেন সাধারণ গণ-মানসের ভাব।

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির পরিচালক স্বামী অশেষানন্দজী স্টেশনে এসেছেন। সঙ্গে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ৬ফুট ৪ইঞ্চি লম্বা সত্তরবৎসর-বয়স্ক জোয়ান মিঃ র‍্যাল্‌ফ্‌ থম্‌। তিনি এক-গাল হেসে আমার স্যুটকেশ দুটি দু'হাতের দুই আঙুলে ধরে এক নিমেষে তাঁর মোটর গাড়ীতে তুললেন এবং দ্বিতীয় নিমেষে আমাদের দুজনকে গাড়ীতে ঢুকিয়ে গাড়ীর স্টার্ট দিলেন। ভারি স্ফূর্তি লাগছিল এমন একটি জীবন্ত সরস মানুষকে দেখে।

স্বামী অশেষানন্দজীর সঙ্গে এগারো বৎসর পরে দেখা হ'ল। ১৯৪৭ সালে মহীশূর স্টেশনে তাঁকে মাদ্রাজের গাড়ীতে তুলে দিয়েছিলাম, মনে পড়ে। তাঁর তখন আমেরিকা আসা স্থির হয়েছে। দেখতে দেখতে এগারো বৎসর তিনি আমেরিকায় কাটিয়ে দিলেন। পোর্টল্যাণ্ডে এসেছেন তিন বৎসর, স্বামী দেবাত্মানন্দজী অসুস্থ হয়ে ভারতে ফিরে যাবার পর। পোর্টল্যাণ্ড আশ্রমের পুষ্পোদ্যান-বেষ্টিত শান্ত পরিবেষ্টনী বড় ভাল লাগলো। এখানকার সভ্য-সভ্যা, ভক্ত ও বন্ধুদের বেদান্তের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা প্রশংসাযোগ্য। সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশী নন, কিন্তু তাঁদের গভীরতা ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত রেখেছে। স্বামী দেবাত্মানন্দজীর কথা বার বার মনে পড়ছিল। আহা, এই আশ্রমটিকে গড়ে তুলবার জন্যে তিনি দিনের পর দিন কী কঠোর পরিশ্রম ক'রে গেছেন!

কয়দিন শহরের নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখা চললো। তারপর একদিন সকাল ১০টায় মিঃ থম্‌ তাঁর দলবল নিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, আজ অনেক দূরে যাওয়া হবে, সারাদিনের প্রোগ্রাম।

—কোথায়?

—কলাম্বিয়া রিভার হাই-ওয়ে দিয়ে চলবো, যতদূর যেতে পারি।

—কি আছে দেখবার?

মিঃ থম্‌ কিছু জবাব দিলেন না, একটু হাসলেন। ষাটবৎসর-বয়স্কা থম্‌-গৃহিণী পাশে বসে-ছিলেন, তাঁর মুখেও স্মিতহাসি ফুটে উঠলো। বড় শান্ত হাসি—ঠিক ভারতবর্ষের জননীর মুখের হাসির মতো। ভাবটা এই—চলুন, সাধুজী চলুন। কিসে আপনার প্রাণ খুশী হবে তা আমাদের জানা আছে। আজ ত্রিশ বৎসর আমরা সাধুসঙ্গ করছি।

মিঃ থমের মুখে খই ফুটছে। আগেই যাত্রীদের কাছে 'মাফী' মেঙ্গে রেখেছেন, কেননা নতুন সাধু-অতিথি এসেছেন, তাঁকে সব ব্যাখ্যা ক'রে না বললে চলবে কেন? মিঃ থম্‌ বলে চললেন, এই যে, উইল্যাম্‌ইট (Willamit) নদী পোর্টল্যাণ্ড শহরকে দুভাগে বিভক্ত ক'রে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে যাচ্ছে, এই নদী গিয়ে পড়েছে কলাম্বিয়ায়। উইল্যাম্‌ইট পোর্টল্যাণ্ডের লক্ষ্মী। পোর্টল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য সব এই নদীরই দৌলতে। এই যে ব্রিজটি আমরা পার হয়ে এলাম এই রকম অনেকগুলি ব্রিজ উইল্যাম্‌ইটের উপর রয়েছে পোর্টল্যাণ্ড শহরে। ব্রিজগুলি শহরের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগকে সংযুক্ত করছে।

আমার কাশ্মীরের শ্রীনগরের কথা মনে পড়লো। ঝিলম নদী শ্রীনগরের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিতা। ঝিলম নদীরও অনেকগুলি ব্রিজ শ্রীনগরের দুই অংশকে যুক্ত রেখেছে। ক্রমে ক্রমে আমরা পোর্টল্যাণ্ড শহরের সীমানা পার হয়ে আর একটি ছোট ব্রিজের সম্মুখীন হলাম। মিঃ থম্‌ বললেন, 'দেখুন, এর নীচে 'বালুকা' নদী (Sandy river)। মাউন্ট হুডের গ্লেসিয়ার থেকে এই

নদী আসছে। বালির ভিতর জল ঝিরঝির্ করছে—কিন্তু বর্ষা হলে জল বাড়ে, আর তখন এত মাছ হয়, জল দেখা যায় না।' মিসেস্ থম্ ভাষ্য ক'রে দিলেন. মিঃ থম্ একজন উৎসাহী মৎস্য-শিকারী।

এবার মোটর পাহাড় চড়াই করছে। মিঃ থম্ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ঐ, ঐ দেখুন!' তাঁর আঙুল অনুসরণ ক'রে বামদিকে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম—সারা দেহ রোমাঞ্চিত হ'ল। দৃষ্টি আর ফিরাতে পারলাম না। ক্যাসকেড পর্বতমালার কোল ঘেঁসে প্রবহমাণা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একান্ত সাম্রাজ্ঞী অতি-বিস্তৃতা কলাম্বিয়া নদীর শুভ্র গম্ভীর প্রসারিত জলরাশি। মিঃ থম্ বললেন, আমরা যাচ্ছি নদীর ডানদিকের পাহাড়ের উপরকার হাই-ওয়ে দিয়ে। নদীকে বামে রেখে রেখে চলবো। ফিরবার সময় নদীর একেবারে কিনারে সমতল হাই-ওয়ে ধরে ফিরবো। কলাম্বিয়া তখন আমাদের ডানে থাকবে।

কলাম্বিয়া এখানে প্রায় দু'মাইল চওড়া। ওপারে ওয়াশিংটন রাজ্য, এপারে আমরা চলেছি ওরিগনের মধ্য দিয়ে। দুই তীরের পাহাড়ই ক্যাসকেড পর্বতমালার অন্তর্গত। যত এগুচ্ছি ক্যাস্কেডেরও চেহারা বদলাচ্ছে, ঠিক হিমালয়ের দৃশ্য। ক্রমে আমরা একটি উঁচু দুর্গের মতো জায়গায় উপনীত হলাম। নাম ভিস্টা হাউস (Vista house) অর্থাৎ দৃশ্য দেখবার ডেরা। একটি খাড়া পাহাড়ের মাথা সমান করে পার্ক এবং বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। এখান থেকে ওপারের পাহাড় এবং কলাম্বিয়া নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। বিরাট নদীর বক্ষে অনেকগুলি দ্বীপ। কোন কোন দ্বীপে বসতি রয়েছে। আমেরিকানরা খুব ভ্রমণপ্রিয়। ছুটি পেলে এদের আর ঘরে মন বসে না। কোনও না কোন বেড়াবার জায়গায় বেরিয়ে পড়ে। ভিষ্টা হাউসেও তাই অনেক মোটরের ভিড়। পার্কটি বৃত্তাকার। ধারে ধারে ষ্ট্যাণ্ডে টেলিস্কোপ বসানো—দূরের দৃশ্য দেখবার জন্যে। মিঃ থম্ হঠাৎ বালকের মতো সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ দেখুন গাড়ী।' নীচে নদীর পাড়ে হাই-ওয়ের সমান্তরালে রেল লাইন চলে গেছে। একটি মালগাড়ী আসছে দেখা গেল। কিন্তু শুধু গাড়ী দেখিয়েই আমাদের পাণ্ডাজী খুশী নন, বললেন—'দেখুন, দেখুন, এখনই গাড়ীটা ঐ টানেলের মধ্যে ঢুকবে।' দু'হাজার ফুট নীচে চলমান একটা রেলগাড়ীর টানেলের মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে যাওয়া দেখতে বেশ মজাই লাগলো, বিশেষতঃ এই মজাদার বৃদ্ধটির পাশে দাঁড়িয়ে।

ভিস্টা হাউস থেকে নেমে আবার কলাম্বিয়া হাই-ওয়ে ধরে মোটর চললো। মিঃ থম্ গলা পরিষ্কার করে নিলেন, কেননা এবার পর পর অনেকগুলি জলপ্রপাতের এলাকা; প্রত্যেকটির প্রাকৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য নতুন অতিথিকে শোনাতে হবে। দুশ' ফুট থেকে ছয়শ' পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঁচু ছোট বড় জলপ্রপাতগুলি আমাদের ডানদিকের পাহাড় থেকে বেরিয়ে কলাম্বিয়া নদীতে পড়ছে। দৃশ্য অতি চমৎকার! সবচেয়ে বড় প্রপাতটির নাম মাল্ট্নোমা ফল্স্। এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহৎ জলপ্রপাত।

জলপ্রপাতের এলাকা পার হয়ে এবার আমরা কলাম্বিয়া নদীর একটি ড্যাম-অভিমুখে চললাম। নাম—বনভিল ড্যাম (Bonneville dam)। ওয়াশিংটন রাজ্যে ৬০০ মাইলের মধ্যে কলাম্বিয়া নদী ১২৯০ ফুট খাড়াই ভেঙে নেমেছে, এজন্য এই নদী উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রধান আধার। সমগ্র আমেরিকায় উৎপন্ন মোট জল-বিদ্যুৎশক্তির শতকরা ৪২

ভাগ কলাম্বিয়া নদীর স্রোত থেকে আসে। বনভিল ড্যাম থেকে ৩৮০ মাইল উপরে এই নদীর বৃহত্তম ড্যাম—গ্রাণ্ড কুলী ড্যাম (Grand Coulee), এই ড্যামটি ওয়াশিংটন রাজ্যে। ১৯৪২ সালে এর নির্মাণ শেষ হয়, খরচ হয় প্রায় ১০০ কোটী টাকা। বনভিল এবং গ্র্যাণ্ড কুলী দুটি ড্যামই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন।

ভারতবর্ষ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাপ পাশাপাশি রাখলে দুই দেশের নদীগুলির সংস্থানে একটা চমৎকার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী, যমুনা, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে আমেরিকার প্রধান ছয়টি বড় নদী—কলাম্বিয়া, কলর‍্যাডো, রিওগ্রাণ্ড (Rio Grande), মিজুরী (Missouri), মিসেসিপি (Mississipi) এবং ওহাইও(Ohio)-র তুলনা করা যেতে পারে। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে কলাম্বিয়া তার শাখাপ্রশাখা নিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণের পঞ্চনদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

* * *

কলাম্বিয়া নদী চিত্তের গভীরে একটা স্থায়ী রেখা এঁকে রেখে গেল বুঝতে পারছিলাম। আর একটি রেখা পড়লো তিনদিন পরে—পোর্টল্যাণ্ডবাসীর বড় গৌরব, প্রীতি, আনন্দ ও শান্তির বস্তু তুষারশৃঙ্গ মাউণ্ট হুডের স্মৃতিরেখা। এদিনকার অভিযানে থম্-দম্পতি থাকতে পারেননি, মিঃ থম্ একটি গল্‌ফ্ ম্যাচে আটকে পড়েছিলেন। দুখানি গাড়ীতে সোসাইটির কতিপয় বন্ধুসহ স্বামী
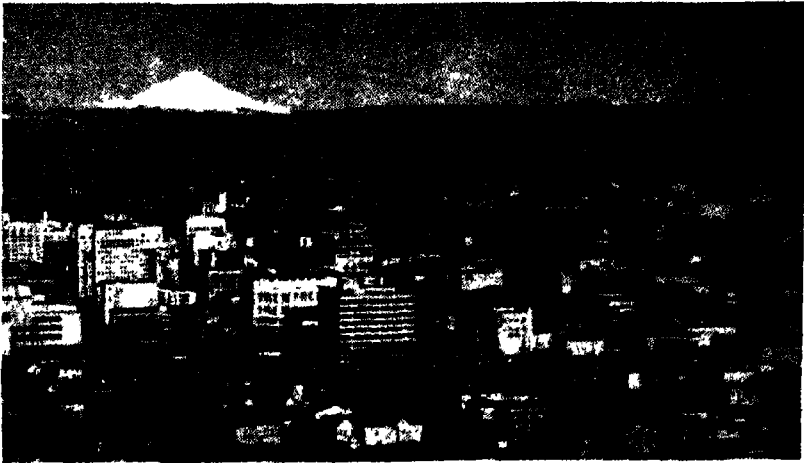
পোর্টল্যাণ্ড ও মাউণ্ট হুড

অশেষানন্দজী আমাকে নিয়ে সকাল সকাল রওনা হলেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে শহর থেকে মাউণ্ট হুড বেশ দেখা যায়, কিন্তু পোর্টল্যাণ্ডের আকাশ প্রায়ই পরিষ্কার থাকে না। মেঘ, কুয়াসা ও বৃষ্টি এখানকার অন্তরঙ্গ সহচর। বন্ধুদের আশঙ্কা ছিল পাহাড়ের উপর যদি মেঘ থাকে তাহলে অভিযানটি সার্থক হবে না। কিন্তু আমরা যখন পাঁচ হাজার ফুট চড়াই করতে শুরু করলাম তখন

ঝরঝরে রৌদ্রে পাহাড় ঝলমল করতে লাগলো। মাউণ্ট হুডের শ্বেত শীর্ষ চোখে পড়ছে। একটা অপার্থিব শান্ত আনন্দে প্রাণ ভরে উঠছিল।

ছয় হাজার ফুটে উঠে গাড়ী থামলো—মাউণ্ট হুডের পাদদেশে। এখান থেকেই বরফ বরাবর চূড়া পর্যন্ত ছেয়ে রয়েছে। গরমকাল বলে জায়গায় জায়গায় বরফ গলে গেছে—সেইসব জায়গা দিয়ে হাঁটাপথ (trail) উপরে উঠে গেছে। হুডের চূড়ায় ওঠা এই অঞ্চলের একটা খুব আকর্ষণীয় নেশা, বিপদ তেমন কিছু নেই, বেশ ঢালু পাহাড়।

অনেক গাড়ী এসেছে, লোক কিলবিল করছে। ভ্রমণকারীদের বিশ্রাম ও আপ্যায়নের জন্যে একটি বিপুলাকার দ্বিতল কাঠের বাড়ী রয়েছে—নাম 'টিম্বারলাইন লজ'। দেয়াল, ছাত, সিঁড়ি, দরজা, আসবাবপত্র—এমনকি কাঠ জুড়বার পেরেক পর্যন্ত কাঠের। শীতকালে এখানে বরফে স্কিইং করবার জন্যে জোয়ানদের সমাগম হয়। টিম্বারলাইন লজের ভিতর রেস্টরেন্ট ও গিফ্ট-শপে (উপহার-দ্রব্যের দোকান) লোকের খুব ভিড় দেখলাম। উপরতলায় বরফের দৃশ্য দেখবার জন্যে অনেকগুলি টেলিস্কোপ ফিট্ করা রয়েছে, ১০ সেন্টের একটি মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট ফাঁকে ফেললে তবেই টেলিস্কোপটি আপনা থেকে কার্যকরী হবে এবং আইপীস-এর (eye-piece) মধ্য দিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, মুদ্রা বিনা আইপীস অচল।

মাউণ্ট হুডের চতুষ্পার্শ্বের সমগ্র পরিবেশটাই একটি অভিনব সৌন্দর্যে ভরপুর। যেদিকে চাওয়া যায় ঢেউ-খেলানো পাহাড়—দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রসারিত, কোনখানেই দৃষ্টিকে বাধা দেয় না। এ সবই ক্যাসকেড পর্বতমালা। মাউণ্ট হুড এই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ। দূরে আর দুটি বরফের শিখর নজরে পড়লো বটে, কিন্তু তাদের চারিপার্শ্বের গিরিশৃঙ্গের সঙ্গে মাউণ্ট হুডের মতো এমন চমৎকার দৃশ্য-সামঞ্জস্য নেই।

অনেক লোক এসেছে। পাহাড়ের স্পর্শ ওদের মনে লেগেছে। ওরা শহরকে, দৈনন্দিন তীব্র গতিশীল জীবনধারাকে সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছে। শৈলশ্রেণীর এই উদার সহজ ঐশ্বর্যে ওদের ক্ষুদ্র অহমিকা লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রয়েছে। মাউণ্ট হুডের শুভ্র তুষার-কিরীট ওদের চঞ্চলতাকে স্তব্ধ করেছে।

আমরা প্রায় ঘণ্টা দুই ওখানে রইলাম। নীচে নামতে নামতে রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে 'পিকনিকের জায়গা' বলে চিহ্ন দেখতে পেলাম। আমাদের গাড়ী দুটি ঐরূপ একটি স্থানে থামলো। তরতর ক'রে একটি পাহাড়ী স্রোতস্বিনী বয়ে যাচ্ছে—তারই ধারে পরিচ্ছন্ন জায়গা। জায়গায় জায়গায় গাছের ছায়ায় লম্বা টেবিল ও বেঞ্চি পাতা রয়েছে, বসে খাবার জন্যে। খাবার জলের কল কাছে। বন্ধুরা দুপুরের খাবার ও সরবত দুধ প্রভৃতি পানীয় নিয়ে এসেছিলেন। অনেক রকম খাবার। এক সঙ্গে বসে, কেউ কেউ বা দাঁড়িয়ে আনন্দ ক'রে খাওয়া হ'ল। জায়গায় জায়গায় ঢাকনা-দেওয়া বড় লোহার ড্রাম রয়েছে, ভুক্তাবশিষ্ট এবং এঁটো কাগজের প্লেট, হাত ও মুখ-পোঁছা কাগজের ন্যাপকিন প্রভৃতি ফেলবার জন্যে—এই দূর জনশূন্য জঙ্গলে। অতবড় পিকনিকের গ্রাউণ্ড, কিন্তু কোথাও এক টুকরো কাগজ, পোড়া সিগারেট, কমলালেবুর খোসা বা দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে

আছে—দেখতে পাওয়া যাবে না। বহুর স্বার্থের সম্মান এরা রাখতে জানে। দশজনের জায়গাকে ব্যক্তিগত অসাবধানতা ও আলস্যের জন্য নোংরা ক'রে রাখাকে এরা মহা দোষের বলে মনে করে।

ফেরবার পথে পাহাড়ের গায়ে একটি 'সর্বসাধারণের গির্জা'য় (Community Church) স্বামী অশেষানন্দজী আমাদের নিয়ে গেলেন। খ্রীষ্টানদের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এটি নয়; যে কেউ এখানে এসে উপাসনা করতে পারে। পার্বত্য পরিবেষ্টনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনাড়ম্বরভাবে গির্জাটি নির্মিত। ভিতরে চমৎকার একটি শান্ত পবিত্র ভাব। আমরা কিছুক্ষণ ওখানে বসে ঈশ্বরচিন্তা করলাম।

* * *

ওয়াশিংটন স্টেটের প্রধান শহর সিয়্যাট্‌ল্ (Seattle), পোর্টল্যাণ্ড থেকে ১৮৩ মাইল। রাজ্যের রাজধানী অন্য একটি ছোট শহরে, নাম ওলিম্পিয়া। পোর্টল্যাণ্ড সিয়্যাট্‌লের চেয়ে অনেক পুরনো শহর, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সিয়্যাট্‌ল্ খুব বেড়ে উঠেছে। ১৮৮০ সালে সিয়্যাট্‌লের লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজার, আজ সেই সংখ্যা সাড়ে সাত লাখের কাছাকাছি ঠেকেছে। ছড়ানো শহর, পোর্টল্যাণ্ডের মতো গোছানো নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী খুব সুন্দর। একদিকে প্রশান্ত উপসাগর, অপরদিকে কুড়ি মাইল লম্বা ওয়াশিংটন হ্রদ। শহরের অনেকটা অংশ সাতটি পাহাড়ের উপর, প্রচুর গাছপালা, বাগান। সারা সহরটিই যেন একটি বিরাট উদ্যান। সিয়্যাট্‌ল্ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের অন্যতম বৃহৎ বন্দর। ওয়াশিংটন হ্রদের উপর ভাসমান সেতুটি পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা পন্টুন ব্রিজ।

স্বামী বিবিদিষানন্দজীর নেতৃত্বে সিয়্যাট্‌ল্ বেদান্ত কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে ১৯৩৮ সালে। ১৯৪২ সালে কেন্দ্রের বর্তমান বাড়ীটি কেনা হয়। স্বামী বিবিদিষানন্দজী ৩০ বৎসর হ'ল আমেরিকায় এসেছেন। সিয়্যাট্‌ল্ কেন্দ্রের সুসংহতির জন্যে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। শহরের একটা নিরিবিলি অঞ্চলে পরিচ্ছন্ন ছোট বাগান-ঘেরা আশ্রমটির আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রাণকে স্পর্শ না ক'রে যায় না।

স্বামী অশেষানন্দজী পোর্টল্যাণ্ড থেকে যাত্রার আগে বলেছিলেন, মাউণ্ট হুড দেখে এত প্রশংসা করা হচ্ছে, কিন্তু সিয়্যাট্‌লে মাউণ্ট রেনিয়ার দেখলে হুডের স্মৃতি তলিয়ে যাবে। একদিক দিয়ে তিনি ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু পোর্টল্যাণ্ডের আর একটি ভক্ত-বন্ধুর কথা বোধ করি আরও ঠিক। তিনি বলেছিলেন, দেখুন মাউণ্ট হুড যেন নারী আর মাউণ্ট রেনিয়ার হলেন পুরুষ-সিংহ।

স্বামী বিবিদিষানন্দজী সেই পর্বতরাজকে দেখবার সাথী দিলেন যাঁকে—তাঁর নাম মিঃ চেষ্টার নেলসন, ইনি সিয়্যাট্‌ল্ আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট—বয়স পঞ্চাশের উপর, অবিবাহিত, একটু স্থূলকায়, স্বভাবটি বেশ প্রফুল্ল। প্রথম আলাপেই আলাপ জমে উঠলো। সেদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। স্বামী বিবিদিষানন্দজী বিষণ্ণমুখে বললেন—দেখ, উপরে গিয়ে যদি মেঘ কেটে যায় তো ভাল, না হলে রেনিয়ার দেখা আর ভাগ্যে ঘটবে না। মিঃ নেলসন যখন তাঁর মোটরে ষ্টার্ট দিলেন তখন সকাল ৮॥ টা।

জেট-বিমান তৈরীর বিখ্যাত বোইং (Boeing) কোম্পানির বড় কারখানা সিয়াট্‌লেই। ঐ কারখানার পাশ দিয়েই মাউণ্ট রেনিয়ারের পথ। বিমানগুলি যেমন অতিকায় কারখানাটিও তেমনি বিরাট।

শহরের এলাকা ছেড়ে পল্লী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছি। ক্রমে আর পল্লীও নেই, একেবারে আরণ্য প্রকৃতি। অবশেষে পাহাড়ে উঠছি। মাইলের পর মাইল ফার সিডার ও পাইন গাছের বন। মিঃ নেলসন জিজ্ঞাসা করছেন, এই রকম সুন্দর ফারের সারি দেখেছেন কোথাও? বলতে হ'ল,—না। মিঃ নেলসন কয়েক বৎসর আগে ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের হিমালয়, গঙ্গা, ভারতবর্ষের মন্দির তাঁকে মুগ্ধ করেছে। বললেন—এমন আর কোথাও দেখিনি, দেখবো না।

যত উপরে উঠছি দৃশ্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। মেঘ কেটে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে রৌদ্র-ঝলকে দূরের পাহাড়ে কিছু কিছু বরফ দেখা যাচ্ছে। মিঃ নেলসনের মুখ প্রসন্ন হ'ল। বললেন—আর আশঙ্কা নেই। আমরা রেনিয়ারকে ভালভাবেই দেখতে পাব। কিছু পরে বললেন, শীঘ্রই রেনিয়ার আমাদের প্রথম চোখে পড়বে, ডান দিকে তাকিয়ে থাকুন।

মাউণ্ট রেনিয়ার

সেই মুহূর্তটি সত্যই অবিস্মরণীয়—অনেকগুলি পাহাড়ে পরিবেষ্টিত মাউণ্ট রেনিয়ারের সমুন্নত বিশাল শুভ্র তুষারমূর্তি প্রথম যখন দৃষ্টিতে ঠেকলো। ভারতীয় সন্ন্যাসীর মন তো এই মূর্তিকে অচেতন বরফের স্তূপ বলে দেখতে অভ্যস্ত নয়। তাই মনে হ'ল চৈতন্যময় মহাদেব নিজের অচল মহিমায়, নিজের আনন্দঘন সত্তায় নিস্পন্দ ধ্যানে সমাসীন। হাঁ, ইনি পুরুষ—উপনিষদ্ যাঁকে বলেছেন 'পুরুষ এবেদং সর্বম্'। বিশ্বপ্রকৃতির যিনি অধীশ্বর তাঁর তো দেশের, জাতির, পরিবেশের সীমা নেই। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র তিনি অভিব্যক্ত। তাঁকে আবাহনের, তাঁকে অনুভবের কি

স্থান কাল আছে? প্রাচীন আর্যেরা হিমালয়ের তুষার-কায়ে শিবের আরোপ করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বের অন্যত্রও যদি ঐরূপ প্রাকৃতিক সমাবেশ থাকে, সেখানেও অনুরূপ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উন্মীলন সম্ভবপর নয় কি? অপেক্ষা শুধু উপযুক্ত মনের উন্মেষ।

ক্রমে আমরা মাউণ্ট রেনিয়ার ন্যাশনাল পার্কের একটি গেটে প্রবেশ করলাম। ঐ পর্বতকে কেন্দ্র ক'রে ৩৮০ বর্গ মাইল ব্যাপী এই পার্ক। অবশ্য মাউণ্ট রেনিয়ার নিজেই এই আয়তনের এক চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে। ঘন বন, নানা রকম ফুলে ঢাকা পাহাড়ী ঢালু ময়দান, ছোট বড় অনেকগুলি হ্রদ, জলপ্রপাত, রেনিয়ার পর্বতের গ্লেসিয়ার থেকে নেমে আসা নদীস্রোত এবং সর্বোপরি ২৬টি গ্লেসিয়ার সহ রেনিয়ার পর্বত নিজে—প্রকৃতির এতগুলি বৈচিত্র্য এক সঙ্গে এই পার্কে বর্তমান বলে মাউণ্ট রেনিয়ার ন্যাশনাল পার্ক উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার একটি বিখ্যাত বেড়াবার জায়গা। ১৩০ রকম পাখী এবং ৫০টি বিভিন্ন জাতির বন্য জন্তুর আবাস এখানে। জলপ্রপাতের ও হ্রদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ এবং ৬২। পার্কের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ২৭৬ মাইল।

আমরা প্রথমে রেনিয়ার পর্বতের পূর্বদিকে 'সূর্যোদয়' (Sunrise) নামক স্থানে এসে থামলাম। এখান থেকে বিরাট পর্বত শৃঙ্গটির দৃশ্য অনুপম। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে—পর্বতটি আগে একটি আগ্নেয়গিরি ছিল। এখন সবটাই বরফে ঢাকা। বরফের গভীরতা কোন কোন জায়গায় ৫০০ফুট পর্যন্ত। 'সূর্যোদয়ে' একটি মিউজিয়ম আছে। গ্লেসিয়ারের উৎপত্তি গঠন ও প্রকৃতি নানা চিত্র ও মডেলের সাহায্যে এখানে ব্যাখ্যা করা রয়েছে। ভ্রমণকারীদের আহার ও বিশ্রামের জন্যে একটি বড় লজও এখানে আছে।

এবার আমরা গাড়ীতে মাউণ্ট রেনিয়ারকে প্রদক্ষিণ ক'রে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'স্বর্গ' (Paradise) পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রে হাজির হলাম। এখানেই যাত্রীদের বেশী ভিড়, কেননা গ্লেসিয়ারগুলি পর্বতের এই দিকেই। আমরা একটা হাঁটাপথে এক মাইল চড়াই ক'রে নিকটতম গ্লেসিয়ারটির পাদদেশে উপস্থিত হলাম। 'স্বর্গ' থেকে পাহাড় চড়াই করবার অনেকগুলি হাঁটাপথ। প্রত্যেক পথের দুপাশে অসংখ্য বনফুল ফুটে আছে। অবশ্য শীতকালে সব বরফ-চাপা পড়বে। পার্কের কর্তৃপক্ষ এই বনফুল রক্ষার জন্যে বিশেষ যত্ন নেন। একটি ফুলও ছেঁড়বার অধিকার কারও নেই।

একটি বড় পাথরের উপর বসে আমরা চুপ ক'রে রেনিয়ারের ধ্যানস্তব্ধ মূর্তি দেখতে লাগলাম। সমস্ত প্রাণ শান্ত হয়ে এল। মিঃ নেলসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষে হ'লে এই পর্বতকে তোমরা কি বলতে?' বললাম, শিবগিরি।

'অর্থ?'—অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলাম। মিঃ নেলসন খুব খুশী।

আমরা যখন সিয়্যাটলে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা ৭॥টা, এগারো ঘণ্টা এই বিরাট চিরতুষারাবৃত পর্বতশিখরটির প্রতীক্ষা, দর্শন, সংস্পর্শ ও ধ্যান দ্বারা চিত্তে যে একটা আশ্চর্য আধ্যাত্মিক শান্তি সঞ্চয় করেছিলাম এতে কোন সংশয় নেই।

মীনাক্ষী ও কন্যাকুমারী

স্বামী ধর্মেশানন্দ

ধনুষ্কোটি হইতে মাদুরাই আসিয়া পৌছিলাম। ভক্ত নটরাজন্ 'কার' লইয়া উপস্থিত। ষ্টেশন হইতে ২॥ মাইল দূরে এবং মন্দির হইতে ৩॥ মাইল দূরে চাক্কিকুলম্ নামক এক স্থানে বাগিচা-সহ নটরাজনের সুরম্য দ্বিতল প্রাসাদ। নটরাজন্-গৃহিণী কমলাদেবী মাতৃভাবঘন দেবী-মূর্তি,—ধর্মকর্ম লইয়াই তাঁর সংসার, সন্তানাদি নাই। প্রতি সপ্তাহে তাঁর বাড়ীতে পাড়ার মেয়েদের ধর্মচক্র বসে, প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের আরতি হয়। এই আশ্রম-সদৃশ বাড়ীটিতে তিন দিন আমরা বিমল আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছি।

পৌছিবার পরদিন শনিবার মায়ের বার। সকাল পৌনে দশটায় দেবী মীনাক্ষীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অবাক্ হইলাম। মন্দিরটি সর্ব বিষয়ে বিরাট। বিরাট গোপুরম্ সমূহ, বিরাট প্রাকার, তিনটি মহল, বাহিরের প্রাকার পরিক্রমা করিতে ২০ মিনিট লাগিল। এক ফটক ছাড়িয়া আর এক ফটকে যাইতেছি, ভাবিলাম এই বুঝি গর্ভমন্দির। আবার চলিলাম। পুনরায় অন্তর্গৃহে। শেষে যখন মন্দিরে মীনাক্ষীকে দর্শন করিলাম তখন আর সন্দেহ নাই, নিশ্চিন্ত মনে প্রণত হইলাম। শুনিয়াছি এইখানে দেবীকে দর্শন করিতে করিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভাবসমাধি হইয়াছিল। মনে হয় সম্মুখে যেন জীবন্ত একটি দক্ষিণদেশীয়া রাজ-কন্যা, রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া এক হস্তে বর ও অন্য হস্তে বাম পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া আনন্দে দণ্ডায়মানা, নির্ভীক ভাব।

"পর্বত রাজকুমারী ভবানী,
বক্ষয় কৃপয়া মম দুরিতানি।
দীনদয়া-পরিপূর্ণ কটাক্ষী,
তিরিপুরসুন্দরী দেবী মীনাক্ষী॥"

এই ভজন নটরাজন্ গাহিলেন। একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম কিভাবে মা সজ্জিতা। শ্রীবদনে নাকে কানে বক্ষে রত্নজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। পাদদ্বয় স্বর্ণাবৃত, দক্ষিণীভাবে রেশমী কাপড় জড়াইয়া জড়াইয়া পরানো। মস্তকে টোপরের মতো স্বর্ণমুকুট। চক্ষু মীনের মত টানা, সরলতা ও করুণায় ভরা।

পূজা-আরতির পর কলা নারিকেল কুমকুম প্রসাদ পাইলাম। কিছু জমা দিয়া টিকিট লইলে ভিতরে যাইতে দেয়, একেবারে গর্ভ-মন্দিরে নহে। একদৃষ্টে দর্শন ও স্তব করিয়া হৃদয়-ভরা আশ্বাস লইয়া ফিরিলাম।

এবার সুন্দরেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন—একটু দূরে মন্দির। তিনটি স্বর্ণপাতে নাতিবৃহৎ শিবলিঙ্গে ত্রিপুণ্ড্রকের মত খচিত। উত্তরে বিশাল গোপুরম্। কেহ কেহ বলেন, এইটি দক্ষিণ ভারতের সর্ব-বৃহৎ গোপুরম্। তবে শ্রীরঙ্গম্ ছাড়া অপর সকল মন্দির অপেক্ষা আয়তনে ইহা বৃহৎ। কারুকার্য অতুলনীয়। কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত দেবদেবী হস্তী, সিংহ, গণপতি, সুব্রহ্মণ্য, নটরাজ প্রভৃতির মূর্তি বিরাট, শিল্প সূক্ষ্ম ও মনোহর। স্তম্ভের কারুকার্য অতি পরিপাটি, সব এক একটি গোটা পাথরের। দেওয়ালে শিবপার্বতীর চরিত্র ও লীলাচিত্র অঙ্কিত।

একটি চিত্রে দেখিলাম দরিদ্র মজুর শিবের

ভক্ত, মজুরিতে যাইতে অক্ষম হওয়ায় শিব তাহার বেশে মজুরি করিতে গিয়াছেন। মালিক কাজের গলদ ধরিয়া মজুরকে বেত্রাঘাত করিলে উপস্থিত সকলের শরীরে বেতের দাগ ও আঘাত লাগিল,—সর্বং শিবময়ং জগৎ।

কতভাবের শিবনৃত্য যে পর্বতগাত্রে খোদিত—বামাবর্ত, দক্ষিণাবর্ত, উর্ধ্বপদ। সহস্র মণ্ডপটিও বৃহৎ। গণপতিরও অনেক মূর্তি। গণপতি ও সুব্রহ্মণ্য (কার্তিক) খুব সমাদৃত। ঐদিনে বৈকাল ৪।। টায় আরতি দর্শন করিয়া উৎসব মূর্তির মন্দিরে গেলাম। প্রবাদ, এখানে শিবপার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভূত-প্রেতের জন্য দুধের নদী প্রবাহিত করা হয়। সেই নদীটির বর্তমান নাম 'ওয়াইকাই'—শহরের মধ্যে প্রবাহিত।

পরদিন ভোরে ৫টায় সূর্যোদয়ের পূর্বে মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পার্বতীর কোলে তিন বৎসর বয়সের শিশুরূপে এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শৈব সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানসম্বন্ধরের দুগ্ধপানলীলা-মূর্তি দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

বৈকালে নটরাজনের বাড়ীতে ভক্তসভা, ইংরেজীতে কিছু বলিতে হইল। নটরাজন্ তামিলে অনুবাদ করিয়া দিলেন। বিষয়: ভারতের মহীয়সী নারীজাতি। কয়েকটি তামিল ভজনের পর আমরা ঠাকুরের ও মায়ের ভজন ও আরতি স্তব দুটি গাহিলাম। একদিন ৭ মাইল দূরবর্তী পাহাড়ের গায়ে খোদিত গুহায় কারুকীর্তি দেখিয়া আসিলাম। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় একটি মসজিদ্ দেখিলাম। এদিকে অনেক পর্বতে ঐরূপ দেখিয়াছি।

মাদুরায় বিরাট রাজপ্রাসাদের বিরাট বিরাট স্তম্ভ এবং বীম-ছাড়া বিরাট বিরাট খিলানে তৈয়ারী বহিঃপ্রাসাদ দেখিলাম। বর্তমানে উহা বিচারালয়-রূপে ব্যবহৃত। এত বড় বড় স্তম্ভ কোথায়ও দেখি নাই। তিরুমল কোয়েল নামক একটি বিষ্ণুমন্দিরও শহরের আর এক প্রান্তে দেখিয়া আসিলাম—বেশ বড় দণ্ডায়মান নারায়ণমূর্তি।

পরদিন ভোরের ট্রেনে ডিণ্ডিগাল হইয়া পালনি পৌছিলাম। সেখানে পাহাড়ে সুব্রহ্মণ্য-মন্দির দর্শন করিয়া ট্রেনে সমুদ্রতীরে তিরুচুন্দুরে রত্নমের অতিথি হইয়া সব দেখাশুনা হইল। পরদিন সকাল ৮টায় তাঁর মোটরে ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ১০টায় ৺কন্যাকুমারীতে পৌছিলাম।

* * *

বহু আকাঙ্ক্ষিত কুমারিকা উপদ্বীপে পদার্পণ করিয়া হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তখনই দেবস্থান টোল বা অতিথিশালায় জিনিসপত্র রাখিয়া ভিন্নিমালাই আশ্রমের স্বামী সত্যানন্দজীর সঙ্গে ধূলিপায়ে মন্দিরে চলিলাম। প্রাণ ভরিয়া মাল্য কুমকুম্ কলা নারিকেল মিছরি গন্ধদ্রব্য লইয়া মন্দিরের তৃতীয় মহলে গর্ভমন্দিরের দ্বারে গিয়া কি দেখিলাম। দেখিলাম অপরূপ সুন্দরী কুমারীমূর্তি—ষোড়শী, অথবা আরও কম বয়স। সর্বাঙ্গ চন্দনে আবৃত। চক্ষু দুইটি উন্মীলিত। স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,—বালিকার মত, কর্ণে কুণ্ডল, শিরে টোপরের মত স্বর্ণমুকুট, নাকে ছোট নোলক ও নাকছাবি—গলে ৮।৯টি স্বর্ণহার, ৩।৪টি পুষ্পহার, হস্তপদ স্বর্ণাভরণে (সোনার পাতে) আবৃত। বালিকার ন্যায় হাস্যময়ী। দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা এবং বামহস্ত বামপার্শ্বে সংলগ্ন। দক্ষিণ পার্শ্বে রত্নখচিত উজ্জ্বল দর্পণ, জ্যোতির্মণ্ডল, বামপার্শ্বে উজ্জ্বল দীপালোক। মা মন্দির আলো করিয়া দণ্ডায়মানা। মূর্তি চারি ফুট হইবে। মা বাণাসুর-বিনাশিনী, শিবকামা। শুক্লা ৮মী ও ৯মী, মায়ের পূজার তিথি। ৮ই এপ্রিল, সোমবার—চৈত্রমাস, রাম-নবমী—শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন। এই সময় শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত দেবী কন্যাকুমারীর শ্রীশ্রীলক্ষার্চনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমরা চতুর্থ দিনে আসিয়াছি। সেইজন্য মন্দির পত্র-পুষ্প, কদলীবৃক্ষসহ শোভিত, কচি তালপাতার মালা চারিদিকে শোভমান। মায়ের 'ছোট' আরতি দেখিয়া ১১।টায় চৌলট্রীতে (হোটেল) ফিরিলাম। সেখানে জলের বন্দোবস্ত নাই। তাই

সন্ধ্যার পর আমরা বাধ্য হইয়া নিকটবর্তী এক শৈবসিদ্ধান্তী মঠে গিয়া ৩ দিন বাস করিলাম। তথা হইতেও সমুদ্রদর্শন হয়। কন্যাকুমারী ছোট শহর, বালির উপর। ভারতের শেষপ্রান্ত। ৺মায়ের মন্দির একেবারে সমুদ্রের উপর। পাহাড়ে জায়গা। সমুদ্রগর্ভেও অনেক পাহাড় অর্দ্ধমগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে। দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম তিনদিকে সমুদ্র। মন্দির পূর্বাভিমুখী। এখন সে দ্বার বন্ধ। উত্তর-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। মায়ের শ্রীঅঙ্গে অনেক মণিমাণিক্য রত্নসম্ভার আছে। ঐ রত্ন এত উজ্জ্বল যে, তাহার উপর সমুদ্রগামী জাহাজের তীক্ষ্ণ আলো পড়িলে জাহাজের পাইলট প্রভৃতির চক্ষু জ্যোতি দ্বারা প্রতিহত ও স্তম্ভিত হইত। জাহাজ চলা এইরূপে বন্ধ হইত। কারণ জনশ্রুতি আছে জাহাজের লোকেরা মায়ের সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া পড়িত। তাই অধুনা সমুদ্রের দিকে প্রধান কবাট বন্ধ। দক্ষিণে ও পশ্চিমে দ্বার নাই। মন্দিরে তিনটি মহল নাতিবৃহৎ। মন্দির ছোট। কিন্তু ভারতে এরূপ সুন্দর মূর্তি আর কোন মন্দিরে নাই।

বৈকালে ৬৷৷ টায় আরতি, নানারকম দীপ দ্বারা অনেকক্ষণ হয়। আবার নূতন পুষ্পসজ্জা। রাত্রি ৯টায় শয়নারতি, তারপর উৎসবমূর্তির চতুর্দোলায় মন্দির পরিক্রমা, অবশ্য মন্দিরের চত্বরের মধ্যেই সব। বহিঃপ্রাকার বেশ উঁচু, ফোর্টের মত দৃঢ়। কারণ কেপ্ কমোরিনে (কন্যাকুমারীতে) বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর মিলিত, তিনদিকে সমুদ্র থাকায় প্রচণ্ড ঝড় হয় ও সমুদ্র প্রায় সব সময় বিক্ষুব্ধ থাকে। খুব ঢেউ। ৯মীতে ও ১০মীতে ভোরে ৪৷৷ টায় গিয়া মায়ের গঙ্গাজল ও নানা গন্ধদ্রব্যে অভিষেক, চন্দনবেশ ও পুষ্পের এবং অলঙ্কারের সাজ পরান, পূজা, আরতি ও ভজন বেলা ৮৷৷ টা পর্যন্ত দেখিলাম, পুরোহিতটি খুব ভক্তিমান্, মায়ের সাজ করিতে করিতে ভজন করিতেছে, আবদার করিয়া মার সঙ্গে কথা কহিতেছে। মুখ দেখিলে সরল বালকের ভাবটি মনে পড়ে। আজ সম্পূর্ণ চন্দন-সাজ নহে, কেবল শ্রীবদন চন্দনাবৃত। ৪৷৫টি সপ্তম-অষ্টম-বর্ষীয়া কুমারী ৺মায়ের ভজন করিল, সঙ্গে তাহাদের সঙ্গীতাচার্য। শুনিলাম ২মাইল দূরে মহাদানপুরমে আশ্বিনে দুর্গাপূজার সময় বার্ষিক উৎসব হয়। স্নানজল, পুষ্পচন্দন ও কুমকুম প্রসাদ পুরোহিত সযত্নে দিল। গ্রহণ করিয়া মনের আনন্দে মঠে ফিরিলাম। তিন দিনই সন্ধ্যায় আরতি ও ভজনে গিয়াছিলাম। সকালেও কুমারীদের ভজন হয়।

তৃতীয় দিন ভোরে অভিষেকাদি দর্শনান্তে সমুদ্রে স্নান করিয়া একটু সাঁতার দিয়া বিবেকানন্দ রকের পার্শ্বে নিকটবর্তী একটি বেশ বড় জলমগ্ন পাহাড়ে উঠিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিলাম। চারি দিকে সমুদ্র, আমি শৈলশীর্ষে। নীচে গভীর জল, স্রোতে পড়িলেই প্রাণ শেষ। পশ্চাতে দূরে ভারতবর্ষ পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামীজী ঐ সম্মুখে (১ ফার্লং দূরে) শৈলে (rock) ভারতের জনসাধারণের দুঃখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন ও আমেরিকায় গিয়া ধর্মবিনিময়ে তাহাদের জন্য অর্থসংগ্রহের সংকল্প করিয়াছিলেন। এখানে স্বামীজীর স্মৃতি-ফলক স্থাপিত হইলে সুন্দর হইত। সকালে ও বৈকালে সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখিতাম। সূর্যাস্ত দেখিতে সমুদ্রতীর দিয়া প্রায় ১৷৷ মাইল হাঁটিতে হইয়াছিল। ভালই হইল, সমুদয় উপদ্বীপটি দেখা হইল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ৺কন্যাকুমারীতে তিন রাত্রি বাস করিয়াছিলেন, তখন স্বামী ওজসানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিলেন 'রাজা মহারাজ' মন্দিরে গিয়া দর্শনাদি করিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ শুনিতেন। একজন পুরোহিত দ্বারা উহা পাঠ করান হইয়াছিল। সাধুভক্ত ৫০৷৬০ জন সঙ্গে, মহারাজ নীরব, ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। সমাধিতে কতক্ষণ কাটিত। মন্দিরে জমজমাট ভাব। সকলে সেই দিব্য আনন্দের আভাসে স্থির হইয়া থাকিত। কখনও কখনও ২৷৩ ঘণ্টা এইভাবে কাটিত। কুমারী কন্যারা ভজনও করিত।

৺কন্যাকুমারীতে ত্রিরাত্রি বাসের সৌভাগ্য হইয়াছিল। উহার মধ্যে একদিন বৈকালে বাসে চড়িয়া ৪ মাইল দূরে অনুপম কারুকার্যমণ্ডিত শুচীন্দ্রম্ মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম।

উমা

বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

বিপুল বিশ্বেতে রয়েছে যত ঠাঁই
ধরিতে তোরে তারা পারেনি কোনকালে,
অনাদিকাল, সে তো খুঁজিয়া তোর সীমা
ফিরিয়া আসিয়াছে লজ্জানতভালে।

শাস্ত্র রাশি রাশি কত কি কহিল যে
তোমারে হেরি তবু স্তব্ধ রহে চাহি
আভাষে বলে শুধু, এ নহে বলিবার—
এ মহাসাগরের কোন তো কূল নাহি।
ধরিতে নারে মন, ধরিবে কেবা হায়
অযুত ধরা যার রয়েছে রোমকূপে
আদেশ লভি যার নিয়ম অগণন
সাধিয়া নিজ কাজ ফিরিছে চুপে চুপে।

ইচ্ছা শুধু যার নিমেষ না ফেলিতে
শূন্য স্বপনেরে সত্য করি তোলে
কঠিন বাস্তব করুণা লভি যার
চকিতে স্বপনের অলীক কোলে দোলে।

তবুও বুঝিবারে চাহেনা মন যার
সংসারে নিতে চায় তুলিয়া করপুটে
মেনকারাণী তোরে আনিয়া দিল তার
বিচারশৈলের পাষাণকারা টুটে।

কন্যা উমারূপে টানিয়া নিজ বুকে
তৃষিত হৃদয়ের জুড়াল সব জ্বালা
হাসিতে ঝরে-পড়া স্নিগ্ধ মণি দিয়ে
দ্বিধার আঁধারেরে করিয়া দিল আলা।
এসেছে উমারূপে, ভুবন ভুলায়েছে
রূপের পারে সে যে, সে কথা মানে কে?
পেয়েছে হৃদয়ের নাগালে তারে আজ
হৃদয় ভরপুর হইয়া গেছে যে।
ঘুচেছে সংশয়—কন্যা আসিয়াছে
অতুল বৈভব মানিবে কেবা তা'র?

মাতার স্নেহটিতে করেছে নির্ভর
হৃদয়ে সব ঠাঁই করেছে অধিকার।
বলিছে সবে তারে বিশ্বপ্রসবিনী
চন্দ্র রবি যার আঁচলে গড়ে সাজ—
সে কথা শুনিবার সময় কোথা তার?
উমার তরে পড়ে আছে যে কত কাজ!

সকালে খায় নাই শুকায়ে গেছে মুখ,
দেখিয়া বারে বারে শুকায়ে যায় বুক।
আনিতে হবে বারি, আনিতে হবে ফল,
প্রতিটি কাজে জাগে গগনভরা সুখ।

শরতশশী আজি মানস-সরোবরে
স্নিগ্ধতর হয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে
মাতৃহৃদয়ের স্নেহের মৃদু বায়ে
হেলিয়া দুলিয়া সে কত না খেলিতেছে।

বল্‌ গে তোরা তারে যার যা প্রাণে চায়—
আদ্যাশকতি বা সকল-গুণহীন,
মেনকা-মার কোলে উমার রূপে সে
মায়ের মুখ চেয়ে থাকিবে চিরদিন।

শরত এলে পরে গগনে শশী হেরি
বেদনা দিতে সারা সকল ঘরে ঘরে
ব্যাকুলা জননীরা সজল আঁখি মেলি
জাগিয়া কাটাইবে রজনী তার তরে।
আসার পথে তার সুরভি হবে বায়ু
শেফালী লুটাইবে, কমলকলি আর
অমিয় ঝরে ঝরে পড়িবে সব ঠাঁই
খুশিতে প্রাণমন হইবে একাকার।
নিকটে আসিলে সে শীতল হবে প্রাণ,
যা কিছু আশা মনে করিবে মাথা নীচু—
তাহারে বুকে ধরে কাটাবে চিরদিন
বিপুলা ধরণীতে চাবে না আর কিছু।

দুইটি কবিতা

বনফুল

১

পাইনি এখনও ঠিকানা তার
সবার উপরে যে মানুষ বড়
খুঁজেছি তাহারে বারংবার।
জীবন কাটিল তারই সন্ধানে
সে মানুষ কোথা আছে কেবা জানে
কোথা সেই রবি যাহার প্রভায়
ঘুচিবে রাতের অন্ধকার।

অন্ধ নয়নে করিয়া দৃষ্টি দান
মানুষেরই বেশে মানুষেরই ঘরে
আসে না কি ভগবান?
সে ভগবানের কাহিনী স্মরিয়া
দুয়ারে দুয়ারে আঘাত করিয়া
ফিরেছি দুয়ারে, পাইনি তাহারে
খোলে নাই আজও বন্ধ দ্বার।

২

চাহিলেই পাওয়া যায় না ভাই
চাহিবার মতো শক্তি চাই,
ভক্তি চাই,
আগ্রহ-ভরা একান্ত অনুরক্তি চাই।
আশাপথে পেতে রাখিও দৃষ্টি
ঝরিবে যখন তুমুল বৃষ্টি
সূর্যের কথা ভুলো না তখনও
তপনাগ্রহী আস্থা চাই।
রামচন্দ্রের প্রতীক্ষা-রতা
শবরীর কথা মনে কি নাই?

অতিমানব

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আমার অন্তরে আছে যে অতিমানব—
যার লাগি ধরি আশা শত তেজ প্রাণে,
তাহারি পূজার ক্ষণে সঙ্গীত নীরব—
মূর্ছনে মিশিছে দূর আকাশের গানে!
সুরগুলি যেথা পায় নির্বাণ বিলয়:
আঁখির মাঝারে তার ভাষার আরতি,
ইন্দ্রিয়ের মাঝে তার অনন্ত প্রলয়—
দিগন্তে দিগন্তে তার অসীম মূরতি!

রক্তে রক্তে নেশা জাগে, মুহূর্তের ক্ষুধা
দুর্বার অনল সম ধরে তীব্র শিখা,
ক্ষণেকের জন্ম নিয়ে কে বিলাবে সুধা?
ব্যর্থতার জয়বাণী জীবনে যে লিখা!
অন্তহীন আত্মা তাই অপূর্ব ধারায়
তাহার দ্যোতনা নিয়ে ওঙ্কারে হারায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের 'স্বর্গরাজ্যে'

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ ছয় বৎসর আগেকার কথা। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ চার্লস্ এ মূরের কাছ থেকে এক তারবার্তা পেলাম, আমাকে এক বৎসরের জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক (Visiting Professor) পদে নিযুক্ত করতে চান, পড়াতে হবে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি। সানন্দে সম্মতি জানালাম এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিয়োগ-পত্র পেলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রে প্যান-আমেরিকান এয়ারওয়েজ সংস্থার এক বিমানে দমদম্ বিমান-ঘাঁটি থেকে যাত্রা করলাম, গন্তব্যস্থল হোনোলুলু, হাওয়াই।

সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে ভারতের সিন্ধু প্রদেশের ওয়াটুমুল পরিবারের (যাঁরা এখন ওখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রে East India Store নামে এক বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন) বদান্যতায় হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি অধ্যাপনার জন্য যে অধ্যাপকের পদ স্থাপিত হয়, তাতেই আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সেখানে এই পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়, বিশেষভাবে মিঃ জি জে ওয়াটুমুলের সংগে একটা বন্ধুত্ব-সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁরা আমাকে প্রায় নিমন্ত্রণ ক'রে আদর আপ্যায়ন করতেন।

যাত্রার পরদিন সকালে ব্যাঙ্ককে বিমান অবতরণ ক'রল এবং সেখান থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই রওয়ানা হ'য়ে তারপর দিন হংকংএ পৌছলাম। হংকং একটি বিরাট বন্দর ও ব্যবসা-কেন্দ্র। সেখানে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হ'ল এবং পরদিন সকালে জাপানের রাজধানী টোকিও পৌছান গেল। বিরাট শহর, দ্রষ্টব্যও অনেক, সারাদিনে কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির দেখলাম। এক মন্দিরের বাইরে এক বিরাট বুদ্ধমূর্তি দেখে ভক্তিবিনম্র চিত্তে প্রণাম করলাম এবং ভিতরে গিয়ে শান্ত সমাহিত করুণাবিগলিতচিত্ত বুদ্ধের মূর্তি ও উপাসনার সামগ্রী দেখে হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করলাম।

রাত্রি দু'টায় আকাশে বিমান উড়ল—সঙ্গের যাত্রীরা সব আমেরিকান, জাপানী, য়ুরোপীয়ান, ভারতীয় আমি একা। একঘণ্টা ভ্রমণের পর বিমান আবার টোকিওতে ফিরে এল, কারণ তার একটি ইঞ্জিন অচল হয়ে গেছে। যদি ওটাকে সারা যায় রাত্রি চারটার সময় বিমান আবার রওয়ানা হবে, অতএব যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হবে বলে নির্দেশ এল, কাজেই সবাই বিশ্রামাগারে বসে রইলাম। কিন্তু চারটার সময় খবর এল যে, সে রাত্রে আর যাত্রা করা হবে না, পরদিন দুপুরে বিমান ছাড়বে, যাত্রীদের হোটেলে ফিরে যেতে হবে। আমি তো নির্বিবাদে আদেশ মেনে নিলাম, কিন্তু সহযাত্রী কয়জন আমেরিকান অভিযোগের সুরে অনেক কথা বলতে বলতে হোটেলের দিকে অগ্রসর হলেন।

সে-সব কথা শুনে আমি বললাম, 'যে দুর্ঘটনাতে মানুষের হাত নেই তার জন্য মানুষকে দোষ দেওয়া উচিত নয়'। এই কথা শুনে সহযাত্রীদের মধ্যে একজন (তিনি নেব্রাস্কা ষ্টেটের প্রধান বিচারপতি) বললেন,

'আপনার জীবন-দর্শন তো বড় চমৎকার (nice), আপনি কোন্ দেশের লোক?' উত্তর দিলাম, 'আমি ভারতীয়, ভারতের দর্শন এরূপ শিক্ষা দেয়।' ফলে তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রতি একটু আগ্রহান্বিত ও শ্রদ্ধান্বিত হলেন এবং আমার লিখিত 'The Fundamentals of Hinduism' পুস্তকের একখণ্ড কিনে নিয়ে তাতে আমার হস্তাক্ষর অঙ্কিত করিয়ে নিলেন।

যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আমরা একদিন বিলম্বে, ২৪শে সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটায় হোনোলুলু বিমানবন্দরে পৌছলাম। সেখানে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মূর সাহেব ও প্রেসিডেণ্ট গ্রিগ্ এম সিনক্লেয়াব আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, এবং আমার জন্য অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট একটি বাসগৃহে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় ওয়াহুদ্বীপে হোনোলুলু শহরে অবস্থিত, হাওয়াই দ্বীপেও তার একটি শাখা আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অঞ্চলে আটটি দ্বীপ নিয়ে আমেরিকাব অধীনে হাওয়াই অধিরাজ্য (Territory of Hawaii) গঠিত। এই আটটি দ্বীপের নাম—হাওয়াই, মাবুই, ওয়াহু, কাউয়াই, মোলোকাই, লানাই, নীহাউ, কাহুলায়ুই। এর মধ্যে যে সাতটি দ্বীপে লোকের বসবাস আছে তাদের মোট মাপ হ'ল ৬৪৩৫ বর্গমাইল এবং তখন মোট লোকসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। ওয়াহু দ্বীপে রাজধানী হোনোলুলু অবস্থিত এবং তার মধ্যেই হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ অতি মনোরম স্থান, দ্বীপগুলি সমুদ্রবেষ্টিত, নাতিশীতোষ্ণ, ফল-ফুলসম্ভারে সজ্জিত, মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। এ জন্যই এই দ্বীপপুঞ্জকে বলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরের স্বর্গরাজ্য (The Paradise of the Pacific)।

এই দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের এখন হাওয়াইয়ান বলে, এরা পলিনেসিয়ান জাতির একটি শাখা। প্রথমে পলিনেসিয়ান জাতিই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে বসবাস আরম্ভ করে। ককেসিয়ান জাতির কোন এক শাখা ভারতবর্ষে তাদের বাসস্থান ত্যাগ ক'রে বহু বৎসর ভ্রমণের পর প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপগুলি আবিষ্কার ক'রে এখানে বসবাস আরম্ভ করে। প্রখ্যাত ইংরেজ নাবিক কাপ্তেন জেমস্ কুক্ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি এই দ্বীপমালা পুনরাবিষ্কার করেন এবং তখন থেকে এগুলি সভ্যজগতে পরিচিত হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা থেকে ২০০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অধিরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এর অধিববাসীদের মধ্যে অনেক জাপানী, চীনা ও কোরিয়ান আছেন। আমেরিকান ও য়ুরোপীয়ানদের সংখ্যা কম। এখানে বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের একটা মিলন ঘটেছে।

জীবনে এই প্রথম ভারতের বাইরে ৮০০০ মাইল দূরে এক দেশে এসে পড়েছি। কাজেই মনটা কিছু খারাপ হয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম যে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ ক'রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমিতি ও অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই তাদের সৌজন্য ও আদর আপ্যায়ন দ্বারা আমাকে ভুলিয়ে রাখবার এবং আমার আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবার চেষ্টা করতেন। যাহোক কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ব্রতী হলাম। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় অন্যদেশের তুলনায় খুব বড় না হ'লেও ছোট নয়। যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ত, এবং কলা ও বিজ্ঞানের প্রায়

সব বিষয়ই পড়ানো হ'ত এবং তাতে গবেষণার কাজও পরিচালিত হ'ত। আমাকে বৎসরের প্রথমার্ধে (First Semester) প্রাচীন ভারতীয় দর্শন পড়াতে হয়েছিল এবং বৌদ্ধদর্শনে ছাত্রদের আলোচনা-সভা (Seminar) পরিচালনা করতে হ'ত। বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে (Second Semester) সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপনা, বৌদ্ধ দর্শনের বিতর্ক-সভা পরিচালনা এবং বেদান্তের প্রধান শাখাগুলির সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে আমি পড়িয়েছি—ঋগ্‌বেদের দার্শনিক চিন্তাধারা, উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব, চার্বাক ও জৈন দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন ও তার প্রধান ভারতীয়, চীনা ও জাপানী শাখাগুলি, ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য যোগ এবং মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন, আর বেদান্তের অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত শাখা দুটি। বিশেষ ক'রে বেদান্তের বিশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের বেদান্তসূত্রও পড়াতে হয়েছিল। সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন পড়াতে আমি রাজা রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা ও বিচার করেছিলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নের খুব আগ্রহ আছে দেখলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন অধ্যাপনার সঙ্গে আমাকে আরও অনেক কাজ করতে হ'ত। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'Philosophy—East and West' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদনে সাহায্য করতাম। মূর এবং রাধাকৃষ্ণনের রচিত A Source Book in Indian Philoshphy পুস্তকের জন্যও কিছু কিছু কাজ করেছি। সেখানকার অনেক স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা তথ্য জানবার প্রবল আগ্রহ দেখেছি। সেজন্য প্রায়ই আমার কাছে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা এসে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান পেতাম। এখন সে সব বিষয়েরই কিছু আভাস দিচ্ছি। তার আগে সাধারণভাবে বলে রাখি যে, যে সব বিষয়ে তাঁদের জানাবার আগ্রহ দেখেছি তার মধ্যে প্রধান বিষয়গুলি হচ্ছে—যোগদর্শন ও যোগশিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, বেদান্ত দর্শন, হিন্দুধর্ম, ভারতের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, জাতিভেদপ্রথা, অস্পৃশ্যতা-সমস্যা, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ-সমস্যা (Inter-group relations), শিখধর্ম ও ধর্মীয় আচরণ ইত্যাদি।

একদিন এক ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বসবার ঘরে এসে দেখা করলেন এবং যোগ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ক'রে শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে যোগ শিক্ষা দিতে পারেন?' উত্তর দিলাম, 'যোগ-দর্শন জানি, যোগ শিক্ষা দিতে পারি না, সেজন্য ভারতে গিয়ে কোন যোগীপুরুষের সাহায্য নেবেন।' আর একদিন এক ব্যক্তি টেলিফোনে প্রশ্ন করলেন, 'শিখেরা মাথায় চিরুণী ও হাতে লোহার কড়া পরে কেন?' উত্তর দিলাম, 'শিখধর্মে দীক্ষার সময় কৃপাণ কড়া প্রভৃতি পঞ্চ 'ক'-এর ব্যবস্থা আছে—এ সম্বন্ধে ডাঃ আর সি মজুমদার, এচ সি রায়চৌধুরী ও কে দত্তর লিখিত Advance History of India পড়ে দেখবেন।

অন্য একদিন এক মহিলা ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে করতে বলে বসলেন, "আমরা শুনেছি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আমেরিকা অপেক্ষা রুশীয়ার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন (more friendly to Russia than America) এর উত্তরে বলেছিলাম "না, না, আমরা সকল দেশের প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন, বরং রুশীয়া অপেক্ষা আমেরিকার প্রতি অধিক মিত্রভাবাপন্ন কারণ এই রাষ্ট্রের আদর্শের (ideology) সঙ্গে আমাদের আদর্শের মিল আছে।" ভারতে রুশীয় সাম্য-বাদের (communism) প্রসার সম্বন্ধে ও দেশের লোকেরা আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন এবং আমি তার সদুত্তরই দিতাম।

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছবার পরই স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে আমার ছবি-

সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী দ্বারা পরিচালিত Kaleo O Hawaii পত্রিকার প্রতিনিধিরা আমার সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাৎকার-কালে তাঁরা কলিকাতা মহানগরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে বিশেষ ক'রে ভারতে জাতিভেদ-প্রথা সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। এসব খবর তাঁদের পত্রিকা ৩ ১০ ৫২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

তারপর হোনোলুলু রোটারী ক্লাব থেকে আহ্বান এলো য়ু এন (U N) সংস্থার প্রতি ভারতের মনোভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলাম এবং ৩১ ১০ ৫২ তারিখে ভোজসভায় বক্তৃতা দিলাম। তার মূল কথা: 'ভারতবাসীরা রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ও উচ্চ আশা পোষণ করে এবং বিজ্ঞান মনুষ্যজাতিকে দেশ ও কালে নিকটতর করলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে যে নৈকট্য ও একতা সম্পাদনে অসমর্থ, তা রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হতে পারে, কিন্তু এই সংস্থার সভ্যদের সঙ্কীর্ণ জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত।

অক্টোবর মাসের শেষভাগে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা Honolulu Advertiser-এর এক প্রতিনিধি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করেন। এই সূত্রে আমি তাঁকে এই সব কথা বলেছিলাম: 'ভারতের শহরগুলিতে জাতিভেদ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত এবং গ্রামেও শ্লথ হয়ে গেছে। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশে গভীর ও ব্যাপক অজ্ঞতা দেখা যায়, এখানের লোকেরা হিন্দুদের প্রতিমা-পূজার গভীর তাৎপর্য না বুঝে উহাকে কুসংস্কারপ্রসূত পুতুল-পূজা (idolatry) বলেন। ভারত মহামানবের সাগর-তীর—এখানে একাধিক জাতি ভাষা ও ধর্ম বিদ্যমান, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সংস্কৃতিগত ঐক্য আছে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভারতের নারী ও পুরুষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই, নারীদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা ও ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে নেত্রীস্থানীয়া হয়েছেন। ভারতের শিল্প-সম্পদ প্রাচীনকালে অতুলনীয় ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের ফলে তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে, অধুনা আবার শিল্পের অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।' এই সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার বিবরণ ঐ পত্রিকায় আমার ছবিসহ ২ ১১ ৫২ তারিখে প্রকাশিত হয়।

কয়েকদিন পরে বিশ্বভ্রাতৃত্বের শিক্ষা-সংগঠন সমিতির (World Brotherhood of Educational Organisation Committee) কাছ থেকে এক বক্তৃতা দেবার আহ্বান পেলাম। বক্তৃতার বিষয়: ভারতীয় বিদ্যালয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে শিক্ষা—(Inter-group relation Courses in Indian School) স্থানীয় Central Intermediate School বাটীতে সভা হয় এবং সেখানে এ বিষয়ে যা বলেছিলাম তাহা হোনোলুলুর Star Bulletin পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অল্পদিন পরে আমাকে একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের Board of Debate and Forensics তাদের 'Spotlight on Experts' programme-এ আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য অনুমতি চাইলেন। এর অর্থ হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও রেকর্ড ঘরে আমাকে বসিয়ে চারজন ধনুর্ধর ছাত্র যথেচ্ছ প্রশ্ন করবে এবং আমাকে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিতে হবে, আর প্রশ্ন ও উত্তর গুলি tape recorded (ফিতায় রেকর্ড করা) হয়ে যাবে। একটু শঙ্কান্বিত চিত্তে সম্মতি দিলাম। ২০ ১১ ৫২ তারিখে এই অভিনব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চারজন ছাত্রের শত বিষয়ে অবিরাম প্রশ্ন চলতে লাগল, আমি ধীর স্থিরভাবে তার উত্তর দিয়ে গেলাম। মনে হ'ল যেন অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে ঘিরে অবিরাম বাণ নিক্ষেপ করছে, তবে পার্থক্য এই যে সপ্তরথী অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন, আর এরা আমাকে বধ করতে পারেনি। শেষে রেকর্ড-করা প্রশ্নোত্তর-গুলি আমাকে শুনিয়ে দিলেন। ঠিক একমাস পরে হোনোলুলুর রেডিও ষ্টেশন থেকে এই প্রোগ্রামটি আমেরিকার সর্বত্র প্রচারিত হ'ল। (ক্রমশঃ)

'উদ্বোধন'

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমি যখন প্রথম এলে তিনটি কুড়ি বছর আগে—
মহাপুরুষ মহামানব ভক্তগণের অনুরাগে,
এলে তুমি প্রেমিক ভাবুক—উন্মাদনার কি আগ্রহে!
দেবে পতিত দেশ-জাতিকে নূতন জীবন আদর্শ হে।
বললে তুমি, আমি এলাম, অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই—
অমৃতের যে পরিবেশন করবো আমি, অমৃত চাই।

কক্ষহারা মহাভারত স্থাপন করি কক্ষপথে—
বিশ্বরূপের রূপের জ্যোতি আনবো আবার লক্ষ্যপথে।
নির্মলতায় পবিত্রতায় করবো ভারত শুভ্র শুচি
ফিরিয়ে আবার আনবো তাহার দিব্য দেহ দিব্য রুচি
নূতন ক'রে গড়বো ভারত জাতিস্মর যে করবো তারে,—
তপস্যাতে এনে দিব বৈদিকী সেই চেতনারে।

জগন্মাতার আদর পেয়ে ফিরবে আদিম সে গৌরবে
বিপুল বিশ্ব যোগ দেবে তার সন্ধ্যারতির মহোৎসবে।
কি হয়েছে, কি হবে সে, বলতে আমি চাইনে নিজে—
মায়ের বেদী যে ভরিবে সিক্ত-সুধা সরসিজে।
মানবজাতি মুগ্ধ হ'য়ে ফেলে মিথ্যা অহমিকা—
ভক্তিভরে হেরবে আবার জ্বালামুখীর পুণ্যশিখা।

তুমি এলে, কে এলো যে, তখন কেহ বুঝেনি তা'—
এলো জাতির পুণ্য ঘন, তপস্যা ও তেজস্বিতা।
স্বাধীনতা ধূসর হ'য়ে সাধুর চরণ ধূলিতে হায়—
সুদীন বেশে ধরলো যে পথ মহাভারত-পরিক্রমায়।
সকল যুগের মুনি ঋষি কল্যাণকৃৎ বীরেন্দ্রেরা
দেখলো গভীর আনন্দেতে তোমার ভাবের এই ইশারা।

তোমার ভজন তোমার সাধন কৃচ্ছ্র তোমার তপস্যা হে
বঙ্গ নহে, ভারত নহে, বসুন্ধরা নিত্য চাহে।
ভক্ত হিয়ার প্রার্থনা যে টলিয়েছে আজ ভগবানে!
অকৃপণ যে দৃষ্টি তাঁহার পড়লো পুণ্যভূমির পানে।
সেবা তোমার ধর্ম বটে—ধর্ম তোমার ঊর্ধ্বে তোলা,
তোমার ডাকে, তোমার ধ্যানে জগন্মাতা হন উতলা।

জেগে ওঠ মহামায়া !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

অন্ধকারে ছেয়ে গেছে সীমাহীন উর্ধ্বে আকাশ,
দিকে দিকে ঘনাইছে ভীতিময় দারুণ দুর্দিন।
আলোকের চিহ্ন নাই, মন আজ হয়েছে নিরাশ,
লক্ষ্য দূর-পরাহত—ব্যর্থতায় হ'য়ে গেছে লীন।

কোথা নব সূর্যোদয় ? এযে ঘোরা তিমিরা রজনী।
ভীমা বিভীষিকা জাগে—শঙ্কা জাগে অন্তরে বাহিরে।
জাগে মহাঘনঘটা—কোথা যেন গর্জ্জিছে অশনি,
প্রবল ঝটিকা যেন আসে ধেয়ে সর্ব দিক্ ঘিরে।

দিশাহারা আঁখি আজ, আলেয়াব ভ্রম চারিভিতে,
দুস্তর পথের মাঝে কে দেখাবে লক্ষ্যেব নিশানা।
কে দানিবে বক্ষে বল। দুর্গমতা আজি উত্তরিতে—
কে আনিবে প্রাণে প্রাণে নব আশা—নবীন প্রেরণা।

তুমি জাগো হে জননি, জাগো সর্ব-মঙ্গলা অভয়া,
সন্তান বেদনা-আর্ত—হের আজ কত যে কাতর।
জাগো দশ-প্রহরণা, জাগো তুমি করুণা-নিলয়া,
প্রসন্ন হাসিতে তব ভ'রে দাও দিগ্ দিগন্তর।

সর্বার্থ-সাধিকে এস, এস মাগো বিপদ্-তারিণি,
আশ্বাসের সুধারস সন্তানের প্রাণে তুমি ঢালো,
সম্মুখে দাঁড়াও এসে হতাশার দুঃখ-নিবারিণি,
আকাশেতে ভ'রে দাও তব দীপ্ত জ্যোতির্ময় আলো।

জানি মাগো নহি মোরা উপযুক্ত সন্তান তোমার,
নাহি জানি করিবারে ও-রাতুল চরণ-অর্চনা,
চিত্ত মাঝে নাহি ভক্তি, নাহি হায় পূজা-উপাচার,
তবু জাগো হে জননি, স্নেহ-আর্দ্রা তুমি বরাননা।

এস তুমি দিকে দিকে, এস তুমি নয়নে নয়নে,
মন্দিরে মন্দিরে এস, এস তুমি পূজা-বেদীতলে !
পূর্ণ কর জল-স্থল তব পুণ্য করুণা-কিরণে,
হৃদয়ে হৃদয়ে এস, দাঁড়াও মা হৃদি-পদ্ম-দলে।

বোধনের পুণ্য লগ্নে জেগে ওঠ তুমি মা আপনি,
জেগে ওঠ দুঃখ-জয়া, মহামায়া, সর্ব-বিঘ্ন-হরা।
নিখিলের বক্ষমাঝে জেগে ওঠ নিখিল-জননি,
অভয়-প্রসাদে ভরো বিভীষিকাময়ী এই ধরা !

সমালোচনা

গীতায় ঈশ্বরবাদ (ষষ্ঠ সংস্করণ)—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪, পৃষ্ঠা ৩২১, মূল্য ৩।০।

'গীতায় ঈশ্বরবাদ'—বাংলা ভাষায় দর্শন-সাহিত্যে একখানি সুপরিচিত গ্রন্থ। সুপণ্ডিত দার্শনিক গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতেই গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান ষষ্ঠ সংস্করণ ইহার জনপ্রিয়তারই পরিচয় প্রদান করে। একুশটি অধ্যায়ে ও পরিশিষ্টে আলোচিত বিষয়সমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: ষড়্‌দর্শনের স্থূলকথা, কর্ম ও কর্মযোগ, বেদান্ত ও গীতা, জীব ও ব্রহ্ম, ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মের সাধন, গীতোক্ত জীবতত্ত্ব, গীতার ত্রিবেণী, গীতার পাঞ্চজন্য। শেষোক্ত তিনটি প্রবন্ধ বর্তমান সংস্করণে নতন সংযোজিত। এই গ্রন্থপাঠে গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে এবং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দর্শনের সহিত গীতার তুলনামূলক আলোচনায় লেখক বলিতেছেন: গীতায়ও দুঃখনাশের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে উপায়ের সহিত দর্শনোক্ত উপায়ের তুলনা করিলে একটি প্রভেদ লক্ষিত হয়। সে প্রভেদের মূলসূত্র—গীতায় ঈশ্বরবাদ। গীতা দুঃখহানির উদ্দেশ্যে যে বিবিধ উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন—সে সকলেরই কেন্দ্রস্থানে—ঈশ্বর। দর্শনশাস্ত্রোক্ত উপায়সমূহের সহিত গীতোক্ত উপায়ের ইহাই মর্মান্তিক প্রভেদ। দর্শনশাস্ত্রে অনেক চিন্তা, বিচার ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হয় নাই, কিন্তু গীতা ঈশ্বরবাদ-রূপ একটি অপূর্ব বস্তুর সংযোগ করিয়া দিয়া অতি সহজে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন।

—জীবানন্দ

গদাধর—সুকমল দাশগুপ্ত, ক্লাসিক প্রেস, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৮, দাম একটাকা আট আনা।

শিশুদের জন্য লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কতকগুলি ঘটনা। বেশ মিষ্ট সুরে ও ছন্দে কথার ছবি এঁকেছেন কবি। ছড়ার মতো ছন্দ ছোট ছেলেমেয়েদের মুখস্থ হয়ে যাবে সহজে, আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ছবিগুলি তাদের মনে আঁকা হয়ে যাবে। কবিতাধারা বয়ে চলেছে তর তর ক'রে নদীর মতো, আর ছবির ধারাও চলেছে চলচ্চিত্রের মতো। উভয়ের মিলনে লেখকের শ্রম সার্থক হয়েছে—এ কথা বলতেই হবে।

তবে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বা ইতিহাস নয় এ বই। তাঁরই জীবনের কতকগুলি ঘটনাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে লেখা কবিতা মাত্র।' শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ঐতিহাসিক সত্য বজায় রেখে কল্পনার রঙ দিতে পারলে জিনিসটি আরও সুন্দর হয়। শুদ্ধি-পত্রে অনেক ভুল ধরা পড়েনি। মুদ্রণ কাগজ ও বাঁধাই মন্দ নয়।

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন পত্রিকা—(একত্রিংশ বর্ষ—ফাল্গুন ১৩৬৪), শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ১০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া। পৃঃ ৭০।

অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ গল্প ও কবিতায় সুসমৃদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন পত্রিকা যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। দশ বারোটি চিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী কর্মধারা ফুটে উঠেছে। 'পুরাতন কথা'য় অতীত এবং 'আমাদের কথায়' বর্তমান মুখর হয়েছে, ভবিষ্যৎ, আশার আলোয় উজ্জ্বল।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

Eight Upanishads (Volume Two) with the Commentary of Sankarācarya translated by Swami Gambhirananda, published by Advaita Ashrama (Mayavati, Almora, U P) Calcutta Office 4, Wellington Lane, Calcutta-13 P-515 Price Rupees 6.50.

স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত শংকরভাষ্য-সমেত ঐতরেয়, মুণ্ডক মাণ্ডূক্য (কারিকা সহ) এবং প্রশ্ন—এই চারটি উপনিষদ্। প্রথমে উপনিষদের মূল শ্লোক দেবনাগরী অক্ষরে, তারপর বড় অক্ষরে ইংরেজীতে মূলানুগ আক্ষরিক অনুবাদ, শেষে ছোট অক্ষরে শংকরাচার্যের ভাষ্যানুবাদ। গ্রন্থশেষে চারটি উপনিষদের শ্লোকসূচী ও গৌড়পাদের মাণ্ডূক্য-কারিকার শ্লোকসূচী স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত।

সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের আশানুরূপ দখল নাই, ইংরেজীর মাধ্যমে আচার্য শংকরের মহোচ্চ দার্শনিক ভাবরাশির সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে চান, প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই পুস্তকখানিও তাঁহাদের বিশেষ সহায়ক হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী স্বস্বরূপানন্দের দেহত্যাগ— আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৯.৮.৫৮ তারিখে সকাল ৭॥ টায় ৭৯ বৎসর বয়সে স্বামী স্বস্বরূপানন্দ (আশু) দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলেন। গলদেশে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা আনা হইতেছিল, হাওড়া স্টেশনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

যে বৎসর বাঁকুড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য আশুতোষ সেই বৎসরই (১৯১৭ খৃঃ) ঐ আশ্রমে যোগদান করিয়া আশ্রমের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২৩ খৃঃ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার বৎসর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী স্বস্বরূপানন্দ কিছুকাল জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরেও কর্মীরূপে ছিলেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ জীবনে তিনি গুরু ও ইষ্ট-চিন্তায় কালযাপন করিতেছিলেন। দেহান্তে তাঁহাদেরই শ্রীচরণে মিলিত হইলেন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লীঃ রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৭ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ১৯২৭ খৃঃ ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এই কেন্দ্র বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে জনকল্যাণে রত।

ইহার বর্তমান কর্মধারা :

(১) ধর্ম : এই বিভাগ কর্তৃক ক্লাস বক্তৃতা আলোচনা ও ভজনাদি আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং আশ্রমে নিয়মিত পূজা ও উৎসব সম্পন্ন হয়। ধর্মবিষয়ক ব্যক্তিগত প্রশ্নেরও সমাধানমূলক উত্তর দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক বক্তৃতা-সংখ্যা:—

আশ্রমে ২৮ এবং বাহিরে ২৫, শ্রোতৃবৃন্দের মোট উপস্থিতি যথাক্রমে ৩০,৯৫০ এবং ৩,৪৭৫। এই বৎসর মোট বক্তৃতা ও আলোচনার সংখ্যা ১৪২, শ্রোতৃসংখ্যা ৭২,৬৯০।

(২) শিক্ষা ও সংস্কৃতি: আশ্রমে ফ্রি লাইব্রেরি ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৭,৯৮১, দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ২৪০, শিশু-বিভাগে ৭০। পাঠাগারে ১৩টি দৈনিক ও ১০৪টি সাময়িকী পত্রিকা লওয়া হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে আগ্রহশীল ব্যক্তিদিগের জন্য সংস্কৃত ক্লাসের ব্যবস্থা আছে।

(৩) চিকিৎসা: এই বিভাগ কর্তৃক আশ্রমে ফ্রি বহির্বিভাগ এবং কারেলবাগে ফ্রি যক্ষ্মা ক্লিনিক পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৮,৩৭৪ (নূতন ৯,৬৫৬)। যক্ষ্মা বহির্বিভাগে ১,০২,৮৮৭ জন রোগী (নূতন ১,৮৩৯) চিকিৎসা লাভ করে, অন্তর্বিভাগে ৫২৩ রোগী পর্যবেক্ষণ করা হয়। ৪০০টি পরিবারকে বিনামূল্যে দুগ্ধ দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ কর্তৃক নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা। এই উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ১১০জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন।

সমাজ-শিক্ষা

সমাজ-শিক্ষার সেমিনার—নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে আশ্রম-প্রাঙ্গণে গত ২১শে ও ২২শে জুন 'সমাজ-শিক্ষায় সাক্ষরতার স্থান' এই বিষয়টির উপরে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে মোট প্রায় ৬৬ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সমাজশিক্ষা-কেন্দ্রের কর্মী যোগদান করেন।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সেমিনারের উদ্বোধন করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন সমাজকর্মী শিক্ষণ-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ (Principal, S. E. O. T. C.) শ্রীঅনীশ মুখোপাধ্যায় ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। 'সমাজ শিক্ষা সাক্ষরতা-ভিত্তিক হইবে বটে, কিন্তু সাক্ষরতাই প্রধান হইবে না'—আলোচনা বৈঠকে ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। সমাজশিক্ষার কর্মসূচীর ও পদ্ধতির অধিকাংশই পরীক্ষামূলক স্তরে। পদ্ধতি-নির্মাতাদের অনেকেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা কম।

শিক্ষা-শিবির: উক্ত পরিষদের পরিচালনায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে (১৯শে হইতে—২৬শে জুন) আটদিনের জন্য আয়োজিত একটি শিবিরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রায় ৪০ জন সমাজশিক্ষা-কেন্দ্রের কর্মীকে প্রাক্‌সাক্ষরতা বিষয়ে একটি পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে এই বিষয়টি সম্বন্ধে সমাজ-কর্মীদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না।

শিবির-জীবনের কর্মচঞ্চল দিনগুলি আলোচনা-সভা বিতর্ক-সভা খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই আলোচনায় যোগদান করেন এবং রাজ্য-সরকার ও কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটের সমাজ-কর্মীরা ইহাতে শিক্ষকতার কার্য করেন।

শিবির-সমাপ্তি দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠের স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক সভায় শিবিরবাসীদিগকে সমাজ কর্মীদিগকে মানপত্র দান করা হয়। অতঃপর পূজনীয় মহারাজ বলেন যে সমাজ-সেবা কার্যের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকর্মীরা যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের দিকে সচেষ্ট থাকেন, তবেই তাহাদের সেবাকার্য পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

'পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত'

নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দ চার মাসের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। ন্যাশনাল কালচারাল এসোসিয়েশনের আহ্বানে ডেরাডুন টাউনহলে গত ৭ই আগষ্ট তিনি 'পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত' সম্বন্ধে এক ঘণ্টা ব্যাপী ইংরেজীতে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন—নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল :

চিকাগো ধর্মসভায় তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর স্বামী বিবেকানন্দই পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত প্রচার আরম্ভ করেন, সর্বজনীন ধর্মের ভারতীয় আদর্শটিই তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। বেদের শেষ ভাগ বেদান্তই উপনিষদ্। এখানেই আমরা পাই ধর্মের সর্বোচ্চ বিকাশ—এখানে কোন আচার অনুষ্ঠান নেই, জাতি বা সম্প্রদায় নেই। বুদ্ধিবৃত্তিরও চরম বিকাশ এখানে—আধুনিক মানবমনের কাছে এর প্রবল আবেদন। 'জীবন কি?'—জানাই জীবনের উদ্দেশ্য। উপনিষদে এটি বোঝাবার জন্য কত দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য জানতে গেলে সেই জিনিস জানতে হবে—যা জানলে সব জানা হয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দেখাই জ্ঞান। বিজ্ঞানেরও লক্ষ্য এই। 'আমার ভগবান সত্যি, না তোমার ভগবান সত্যি?' এই প্রকার ছেলেমানুষি ব্যাপার নিয়ে—লড়াই না করতে শিক্ষা দেয় উপনিষদ্! 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, পণ্ডিতেরা তাকে বহুভাবে বর্ণনা করে থাকেন—এটি বেদ ও বেদান্তের বাণী। আমেরিকায় বেদান্ত সোসাইটিগুলি থেকে এই বাণীই প্রচারিত হয়। প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় আমেরিকায় প্রায় সর্বত্র ধর্ম আলোচনা হয়। শুধু জ্ঞানের প্রতি নয়, ধ্যানের প্রতিও ওদেশে অনুরাগ বাড়ছে।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতা সফর

ভারতের পূর্বোত্তরপ্রান্ত-নিবাসী ধর্মপিপাসুদের আহ্বানে, শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ১৭ই এপ্রিল হইতে ১২ই মে পর্যন্ত আসামের বিভিন্ন স্থানে—চেরাপুঞ্জী, শিলং, গৌহাটী, পাণ্ডু, নওগাঁ, তেজপুর, ডিগবয়, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড, শিবসাগর, যোড়হাট, গোলাঘাট, লামডিং, হাফলং, ইম্ফল (মণিপুর), করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং শিলচরে মোট ৫৬টি (বাংলায় ১০টি, হিন্দীতে ২টি এবং ইংরেজীতে ৪৪টি) বক্তৃতা দেন। অধিকাংশ স্থানেই বক্তৃতার বিষয় ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিশেষ বাণী ও বার্তা এবং ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি।

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়ার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী রঙ্গনাথানন্দ Science Democracy & Indian thought (বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও ভারতীয় চিন্তাধারা) সম্বন্ধে ইংরেজীতে ভাষণ দেন। নওগাঁ কলেজে, ডিগবয় ইওরোপীয়ান ক্লাবে, ডিব্রুগড রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতিতে, গৌহাটি শিবসাগর গোলাঘাটেও তিনি ঐ বিষয়ে বলেন। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতা 'উপনিষদের সৌন্দর্য' বিশেষ উল্লেখযোগ্য! গীতার সারকথা, নাগরিকের ধর্ম, বিশ্বশান্তি, জাতিগঠনের দায়িত্ব, প্রভৃতিও তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হইয়াছিল।

জাপানে ভারতীয় কৃষ্টি ও ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ২৪শে আগষ্ট বিমানযোগে টোকিও যাত্রা করিয়াছেন। এই কার্যের জন্য তিনি জাপানে ছয় সপ্তাহ থাকিবেন এবং টোকিও শহরে নবম আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলনে যোগদান করিবেন। অতঃপর তিনি ফিজি দ্বীপপুঞ্জে যাইতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ

মহাভারত ও গীতার রুশ অনুবাদ

U S S R Academy of Science (রাশিয়ার বিজ্ঞান পরিষদ)-এর প্রকাশনা বিভাগ হইতে ইলাইনের বিরাট পুস্তক 'মহাভারত—প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য' প্রকাশ করা হইতেছে, যাহাতে সাধারণ পাঠক ভারতের ভাবধারার সহিত পরিচিত হয়। ১৭০ বৎসর পূর্বে রাশিয়া মহাভারতের কথা প্রথম জানিয়াছে, এবং ১৭৮৮ খৃঃ মহাভারতের অংশ গীতাই সর্ব প্রথম রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত-সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়িতেই থাকে, মহাভারত শুধু ইণ্ডোলজিষ্টদেরই নয়, কবি এবং লেখকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি জুকোভস্কির 'নল দময়ন্তী' নিঃসন্দেহে একটি শিল্প-সৃষ্টি। ১৮৯৮ খৃঃ গীতিকার আরোনস্কী ঐ বিষয় লইয়া একটি অপেরা রচনা করেন।

মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ শুরু হয় ১৯৩৯ খৃঃ, সোভিয়েট ইণ্ডোলজিষ্ট ব্যারানিকভের উদ্যোগে ও সম্পাদনায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাজ ব্যাহত হয়। ১৯৫০ খৃঃ 'আদি পর্ব' প্রকাশিত হইয়াছে, অনুবাদ করিয়াছেন রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ কাল্যানভ।

জর্জি ইলাইনের পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ ইহাতে আছে, ইলাইন সংস্কৃত হিন্দী ও ইংরেজীতে সুপণ্ডিত। মূল সংস্কৃত মহাভারত পড়িতে তাঁহার কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। প্রথমে তাঁহার বই লিখিবার কোন পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু ঐ মহাকাব্যের অসাধারণ সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক মূল্যমান তাঁহাকে বৃহত্তর পাঠক সমাজের জন্য এই পুস্তক-প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভগবদ্‌গীতার একটি পূর্ণাঙ্গ রুশ অনুবাদ ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত হইতে নিখুঁতভাবে ইহা অনুবাদ করিয়াছেন সোভিয়েট বিজ্ঞানপরিষদের সদস্য স্মিরনফ, ইহা তাঁহার বিশবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফল। আশ্‌কাবাদ হইতে তুর্কমেন বিজ্ঞানপরিষদ-কর্তৃক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত।

যে সব ভাবসম্পদ ও দর্শন-চিন্তার জন্য ভগবদ্‌গীতা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, সোভিয়েট পাঠকসমাজের এক ব্যাপক অংশ সেগুলির প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইবে। ভগবদ্‌গীতার বক্তব্য ও দার্শনিক সূত্রগুলি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে এবং দেড় শতাব্দিক বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে প্রবল বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ, এক প্রাচীন প্রবাদবাক্যের পুনরুক্তি করিয়াই সুন্দরভাবে বলা যায়, ফলভারে আনত গাছকেই লোকে বেশী করিয়া নাড়া দেয়।

ভগবদ্‌গীতার এই রুশ অনুবাদের ভূমিকায় স্মিরনফ লিখিয়াছেন, নৈতিক প্রশ্নগুলিকে এক বিশ্বজনীন মানবিক সমস্যা হিসাবে যেসব রচনায় তুলিয়া ধরা হইয়াছে, সেই সব রচনাগুলির মধ্যে ভগবদ্‌গীতা হইল প্রাচীনতম একটি রচনা, এই প্রশ্নটির আলোচনাকে এমন এক গভীরতায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি বাধ্য হয় নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বজনীন

নৈতিক নিয়মের অধীন বলিয়া স্বীকার করিতে। —এই জন্যই ভগবদ্গীতা তাহার চিরন্তন আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মূল্য হারাইতে পারে না। স্মিরনফ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভগবদ্গীতার রচনাভঙ্গী ও ভাষা বিচার করিয়া ইহার আদি রূপটিকে বহু পূর্ববর্তী সংস্কৃত রচনাবলীর শ্রেণীতে ফেলা যায় এবং ইহা উপনিষদ্গুলির সমগোত্রীয়। ভারতীয় পণ্ডিতগণও এই মতের পরিপোষক।

বিজ্ঞান-সংবাদ

গত ২০ বৎসরে বিজ্ঞানের যে বহুমুখী অগ্রগতি হইয়াছে পূর্বে আর কখনও সেরূপ হয় নাই। পেনিসিলিন এবং আণবিক বিজ্ঞান সত্যই জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। নিম্নে কতকগুলি বিস্ময়কর এবং কল্যাণকর নবাবিষ্কৃত পদার্থের কথা সংকলিত হইল।

পলিও টীকাঃ ব্যাপক পলিও ব্যাধি বহু শিশুকে পঙ্গু করিয়া রাখিত, পিট্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সাক (Dr J E Salk) এই টীকা (Polio-Vaccine) আবিষ্কার করিয়া তিনপ্রকার পলিও ব্যাধিতে ব্যবহার করেন, ১৯৫৩ খৃঃ প্রায় ৮০-৯০% ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী হয়, ১৯৫৫ খৃঃ হইতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সকল শিশুকেই এই টীকা দেওয়া শুরু হইয়াছে।

কীটনাশক ডি ডি টি ঃ—ডি ডি টি ১৮৭৪ খৃঃ আবিষ্কৃত হইয়া বিস্মৃত হইয়াছিল। ১৯৩৯ খৃঃ জনৈক সুইস্ বৈজ্ঞানিক ইহাকে আবার সকলের গোচরে আনেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেপল্স্ শহরে টাইফাস্ প্লেগ দমন করিয়া ডি.ডি.টি. বিখ্যাত হয়। যুদ্ধের পর কৃষিক্ষেত্রে কীটঘ্ন হিসাবে ইহার ব্যবহার বাড়িতেছে, আরও কয়েকটি প্রবল কীটঘ্ন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করা যায়, বহু শস্য রক্ষা করিয়া ইহারা ক্ষুধার্ত পৃথিবীকে অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর খাদ্য জোগাইবে।

বৃহৎ টেলিস্কোপ ঃ কালিফোর্নিয়ার পালোমার পর্বতের আকাশ-পর্যবেক্ষণ-মন্দিরে ২০০-ইঞ্চ ব্যাস-বিশিষ্ট প্রতিফলন দূরবীক্ষণকে (Reflecting Telescope) পৃথিবীর বৃহত্তম চক্ষু বলা যায়, ইহার সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে।

টেলিভিসন ঃ ১৮৮৪খৃঃ টেলিভিসনের মূলনীতি আবিষ্কৃত হইলেও ১৯২০খৃঃ ইহার প্রধান প্রায়োগিক রূপায়ণ সাধিত হয়। টেলিভিসনে প্রথম চিত্র প্রক্ষেপ সম্ভব হয় ১৯৩৯ খৃঃ। ১৯৫০খৃঃ পর হইতে ইহা জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।

অদ্ভুত ঔষধাবলী ঃ আজকাল ডাক্তারেরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করেন ১৫।২০ বৎসর পূর্বে তাহার তিন-চতুর্থাংশই অজানা ছিল। রাসায়নিক ঔষধ-বিজ্ঞানের উন্নতি লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা করিতেছে। প্রথম বিস্ময়কর ঔষধ 'সালফানিলামাইড্', নিউমোনিয়া, রক্তদুষ্টি, টনসিলাইটিস ও শিশুজ্বরে ইহা কার্যকরী। সালফা-পরিবারের অপরাপর ঔষধও দ্রুত আসিতে থাকে—তাহাদের নাম 'সালফোনামাইড্'।

রূপকথার মতো বিস্ময়কর এ্যান্টিবায়োটিক 'পেনিসিলিন'—সারা পৃথিবীতে অসংখ্য রোগীকে নবজীবন দিয়াছে। ১৯২৮ খৃঃ গ্রেট ব্রিটেনে ফ্লেমিং (Sir A Fleming) ইহা আবিষ্কার করেন, কিন্তু ইহাকে বাজারে চালু করার মতো করিয়া প্রস্তুত করিতে ১৫ বৎসর লাগিয়াছে।

১৯৪০ খৃঃ পর আরও অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন—আজ ঘরে ঘরে সুপরিচিত।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আজকাল ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ নির্ণয়ে ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

বৃহত্তম শহর

নিউ ইয়র্ক পৃথিবীর 'যথার্থ' বৃহত্তম নগরী, তারপর টোকিও। প্রথম পাঁচটি নগরীর মধ্যে লণ্ডন বা প্যারিসের নাম নাই।

তৃতীয়—সাংঘাই, চতুর্থ—মস্কো, পঞ্চম—বুনেস এরিস। শুধু রাজধানীটুকু ধরিলে লণ্ডন (লোক-সংখ্যা ৮২,৭০,৪৩০) তৃতীয়, এবং বৃহত্তর প্যারিস ধরিলে প্যারিস (৬৪,৩৬,২৯৬) চতুর্থ।

লোকসংখ্যা	রাজধানীর	শহরতলীর
নিউ ইয়র্ক	১,৪০,৬৬০০০	৭৭,৯১৪৭১
টোকিও	৮৪,৭১৬৩৭	৭১,৬১৫১৩

অন্য তিনটি 'যথার্থ' নগরীর লোকসংখ্যার উল্লেখ বিবৃতিতে নাই।

—U N. Demographic Year Book

পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান

গত ১৯৫৭ খৃঃ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র ও পত্রিকার পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে মোটের উপর কাগজের কাটতি বাড়িয়াছে। ১৯৫৬ খৃঃ ২,৮৪৩ ও ১৯৫৭ খৃঃ ৩,০৫০ পত্র-পত্রিকার হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই ভারত সরকারের প্রেস-রেজিষ্ট্রার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তালিকাকারে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল ঃ

	কাটতি		১৯৫৬—৫৭
পাক্ষিক	৮৪ ৬%	বৃদ্ধি	৭ ৮—১৪ ৫
দৈনিক	৮ ৩ „	„	২৯ ১—৩১ ৫
সাপ্তাহিক	১ ১ „	„	৩ '২—৪০ ৫
মাসিক	৪১ ০ „	হ্রাস	৩৭ ৪ —৩১ ৬
অন্যান্য		হ্রাস	৭'৬— ৪'৫

সাল	পত্র-পত্রিকা-সংখ্যা	কাটতি
১৯৫৬	২,৮৪৩	১১০ লক্ষ
১৯৫৭	৩,০৫০	১১৩ „

ভাষা হিঃ কাটতির হ্রাস বৃদ্ধি

ইংরেজী	'৯% বৃদ্ধি
হিন্দী	৮'৮ „ হ্রাস
সংস্কৃত	১৫০'০% বৃদ্ধি
কন্নাড়া	৮৩ ২ „ „
তেলুগু	২৮ ৯ „ „
অসমীয়া	১৬ ৩ „ „
ওড়িয়া	৭ ০ „ „
বাঙলা	৪ ৪ „ „
উর্দু	'৬ „ „
মালায়ালাম	১৭ ৭ „ হ্রাস
মারাঠী	১৭ ০ „ „
পাঞ্জাবী	১৬ ১ „ „
গুজরাতী	১২ ৯ „ „
তামিল	১০'৩ „ „

ভাষা অনুসারে	কাটতি	শতকরা
ইংরেজী	২৪ ৯৭ লক্ষ	২২ ৩
হিন্দী	২০ ২৫ „	১৮'০
তামিল		৯ ১
উর্দু		৭ ০
গুজরাতী		৬'৫
বাঙলা		৬ ১
মারাঠী		৫'৯
তেলুগু		৫'০

১৫টি দৈনিক ও ১৬টি সাময়িকের গ্রাহক সংখ্যা ৫০,০০০এর উপর।

মালিকানা (১৯৫৭)	শতকরা
ব্যক্তিগত	৪২ ৪
সমিতি বা সংঘ (ধর্ম, সংস্কৃতি)	২১'১
সমিতিবদ্ধ কোম্পানি	৯ ৭
অংশীদার-ভিত্তিক	৮'১
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৭ ৬
সরকারী	৫'৫

সাধারণ সংস্থা ব্যতীত বহু ধর্মীয় সংস্থা, সরকার এবং বিভিন্ন দেশের দূতাবাস হইতেও অনেক পত্রিকা বাহির হয়।

স্যালভেশন আর্মি ইংরেজী মারাঠী, গুজরাতী, তেলুগু ও মালায়ালাম ভাষায় মোট ১০টি পত্রিকা পরিচালনা করেন, উত্তর ভারত আম্বালা চার্চ কাউন্সিল হিন্দী ইংরেজী ও পাঞ্জাবীতে মোট ৮টি, ক্রীশ্চান লিটারেচার সোসাইটি তামিল ও তেলুগু ভাষায় মোট ৯টি, রিলিজিয়স ট্রাক্টস্—সোসাইটি অব জীসস্ ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় মোট ৫টি, তেরুনভেলি ডায়েসিশন প্রেস তামিলে ৬টি, থিওসফিক্যাল সোসাইটি ইংরেজী ও তামিলে মোট ৩টি, অ্যাপষ্টলিক সেমিনরি মালায়ালামে ৩টি, রামকৃষ্ণ মিশন ইংরেজী ও তেলুগুতে মোট ৪টি। [মনে হয় বিবরণীর এই অংশ অসম্পূর্ণ, ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা: ইংরেজী ৩, বাংলা ১, মারাঠী ১, তামিল ১, তেলুগু ১ মালায়ালাম ১।]

সরকারী তত্ত্বাবধানে মোট ২৯৭টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে কেন্দ্রে ১৪৯, এবং বিভিন্ন রাজ্যে ১৪৮টি। বিভিন্ন দূতাবাস হইতে ২৯টি সাময়িক এবং ১৫টি সংবাদ-বুলেটিন প্রকাশিত হয়। যথা:

	বিভিন্ন ভাষায়	কাটতি
আমেরিকান রিপোর্টার	৫টি	২,০৭,০৩৫
সোবিয়েত ল্যাণ্ড	১২ ,,	১,৬৫,৫৭৫
চায়না টুডে	২ ,,	৫,৭৫৬

এ বৎসর ৮০০টি নূতন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, তন্মধ্যে ইংরেজী ১৯৩, হিন্দী ১০৮। প্রকাশের সময় হিসাবে: ৩৫টি দৈনিক, ১৪৮ সাপ্তাহিক, ৯৫ পাক্ষিক, ৩৩০ মাসিক ও ৮৪ ত্রৈমাসিক। ১৭৫টি কাগজের প্রকাশ বন্ধ হয়। তন্মধ্যে ৩৭টি হিন্দী ও ৩২টি উর্দু, ২৫টি ইংরেজী।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭খৃঃ মোট ৮২৯টি পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৩৩টি দৈনিক ৭৩ সাপ্তাহিক, ৩০৫ মাসিক। এই বৎসর ৯৫টি নূতন কাগজ আত্মপ্রকাশ করে এবং ২৪টির প্রকাশ বন্ধ হয়। প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা:

ভাষা হিঃ	বাংলা	ইংরেজী	হিন্দী	উর্দু	অন্যান্য
দৈনিক	৬	৮	৬	৮	৫
সাপ্তাহিক	১১২	২৬	১৮	৪	১৩
মাসিক	১৫৮	৯০	২৪	১	৩২

পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার মধ্যে কলিকাতা হইতেই প্রকাশিত হয় দৈনিকগুলি সব অর্থাৎ ৩৩টি, সাপ্তাহিক ৮৩টি, মাসিক ২৪৯টি।

হাওয়াই দ্বীপে বেদান্ত প্রচার

বেদান্ত সোসাইটি, হাওয়াই: হাওয়াই দ্বীপের বেদান্তানুরাগী ভক্ত মিঃ মরেজি জানাইতেছেন যে গত আগষ্ট মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল্ বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী অবকাশ যাপনের জন্য হোনোলুলু শহরে আসিয়া স্থানীয় বেদান্ত সোসাইটির আমন্ত্রণে সেখানে অতিথি হন, এবং ধ্যানধারণা, বক্তৃতা, অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত থাকেন।

জনসাধারণের জন্য YWCA ভবনে চারটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলির বিষয়বস্তু ছিল: যোগের গভীরতর অর্থ, ধ্যানে শক্তি ও শান্তি, অবচেতন মন ও অতীন্দ্রিয় দর্শন, মানুষের অদৃষ্ট ও জন্মান্তর। বাহা-ই সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মালোচনাচক্রে তিনি যোগদান করেন। সেখানে 'অভিজ্ঞতামূলক ধর্ম' এই আলোচনায় তিনি বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী স্থাপন করেন, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রচারকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মতবাদ সম্বন্ধে বলেন। শ্রোতৃবৃন্দ সাগ্রহে সকলের কথা শ্রবণ করে।

অবকাশ শেষে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দজী ভারত হইতে ফিরিবার পথে এখানে স্বামী বিবিদিষানন্দজীর সহিত মিলিত হন, তাঁহার সম্মানার্থে আহূত একটি অভ্যর্থনা সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি ছাত্রদের বহু প্রশ্নের উত্তর দেন।

অনিমেষ দৃষ্টি

নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী,
তবেত্যাহুঃ সন্তো ধরণিধর-রাজন্যতনয়ে।
ত্বদুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ,
পরিত্রাতুং শঙ্কে পরিহৃতনিমেষাস্তব দৃশঃ॥
—শ্রীমৎ শংকরাচার্য-কৃত 'আনন্দলহরী' (৫৬তম শ্লোক)।

হে গিরিরাজকন্যা। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন—তোমার চক্ষের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারাই জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। তোমার নয়নের উন্মেষ দ্বারাই এই নিখিল বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বুঝি মাতৃহৃদয় তোমার নয়ন নিমেষ-হারা।

* * *

হিমালয়-দুহিতা বিশ্বপ্রকৃতি — জগজ্জননী মহামায়া। এ জগৎসংসার তাঁহার ইচ্ছায়—লীলায়—দৃষ্টিমাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার নয়নপদ্ম বিকশিত হইলে জগৎ প্রকাশিত হয়, মুকুলিত হইলে জগৎ তিরোহিত হয়; ঈশ্বরের হৃদয়েশ্বরী মহামায়া উদাসীন বা নির্লিপ্ত হইতে পারেন না, পাষাণতনয়া পাষাণহৃদয়া নন, জগজ্জননী জীবজগতের প্রতি স্বভাবতই মমতাময়ী।

স্বীয় সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীলা পালনপরায়ণা কল্যাণী শক্তি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন সন্তানদের প্রতি—পাছে তাহাদের এতটুকু ক্ষয় ক্ষতি হয়; তিনি জানেন, তাঁহার পলকপাতে মহাপ্রলয়। তাই তো স্নেহময়ী জননী অতন্দ্র অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আমরা তাঁহাকে দেখি না দেখি, তিনি আমাদের দেখিতেছেন—অনিমেষ নয়নে দেখিতেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

শক্তি-উপাসনা

'শক্তি-সাধনা', 'শক্তি-উপাসনা' কথাগুলি আমাদের অতি পরিচিত, কিন্তু ইহাদের অর্থ লইয়া নানা মুনির নানা মত। 'শক্তি কি?'—'শক্তি উপাসনা কেন করিব? কেমন করিয়া করিব?'—'শক্তি সাধনার ফল কি?' প্রভৃতি প্রশ্ন আমাদের মনে কখন না কখন উঠিয়া থাকে, কিন্তু উত্তর পাইবার পূর্বেই উহারা আবার মনেই মিলাইয়া যায়, ভবিষ্যতে আবার মনে প্রশ্ন জাগিবে, যতদিন না সঠিক উত্তর মিলিবে।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, শক্তি-সাধনা একটা নূতন কিছু নয়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানবমাত্রেই শক্তির সাধক। শক্তি-সাধনা জীবন-সাধনার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে, ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কারণ, কে না জানে জীবন একটি অবিরাম সংগ্রাম। শক্তি ভিন্ন কি সংগ্রাম সম্ভব? প্রশ্ন উঠেঃ কাহার সহিত সংগ্রাম? গভীর বিশ্লেষণের ফলে অনুভূত হয়, দুইটি বিপরীত শক্তির সংগ্রামকেই আমরা জীবন বলিয়া থাকি। একটি শক্তি চাহিতেছে ব্যক্ত, বিকশিত হইতে—ফুটিয়া উঠিতে, অপর শক্তি তাহাকে বাধা দিতেছে। অঙ্কুর চাহিতেছে উদ্গত হইতে, মাটি তাহাকে বাধা দিতেছে, বীজ-মধ্যস্থ প্রাণশক্তি তাহা ভেদ করিয়া উদ্ভিদরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শক্তি সহায়ে বাধা জয় করিয়াই মানবজীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি, যাহার অপর নাম সভ্যতা, সংস্কৃতি—সাধনায় সিদ্ধি।

জন্মগ্রহণ করিয়াই শিশু কাঁদিয়া উঠে, ইহা যেন প্রমাণ করে সে একটি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবন-সংগ্রাম শুরু করিল। বহিরন্তঃশক্তি সঞ্চয় করিয়াই শিশু পূর্ণ মানবে পরিণত হয়। প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইতে তাহাকে অন্তরে বাহিরে কতই না সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছে। শিশুর ক্রন্দন জীবন-সংগ্রামের একটি প্রতীক চিত্র। জীবন রক্ষার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে বিপরীত শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি মানুষকে নীচের দিকে টানিয়া রাখিতেছে—উপরে উঠিতে দিবে না, কিন্তু নানাবিধ যন্ত্র ও শক্তি উদ্ভাবন করিয়া, বাধা জয় করিয়া মানুষ সর্বত্র গতি লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগৎ—মানুষের মনকে নীচের দিকে, ভোগের দিকে টানিয়া রাখিতেছে, কিন্তু সূক্ষ্মতর সাধনশক্তি সহায়ে মানব উহা অতিক্রম করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া উন্নততর জীবন লাভের চেষ্টা করিতেছে।

তাপ বিদ্যুৎ অনু প্রভৃতি জড় শক্তির সাধনায় জড়ের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া, বহু প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া মানুষ ঐহিক সুখ সুবিধার নানা ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু প্রতিকূল শক্তি তো জড় জগতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাহার এলাকা স্থূল সূক্ষ্ম সর্বস্থান ব্যাপিয়া। শক্তি-সাধনা বলিতে আমরা মনোজগতের সূক্ষ্ম শক্তির অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণই বুঝিয়া থাকি।

যথা বহির্জগতে তথা অন্তর্জগতে শক্তির এই অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণ মানুষের বহু দুঃখ দূর করিয়া সুখ-শান্তির কারণ হইয়াছে, তাই তো দুঃখের নিবৃত্তিকামী, সুখান্বেষী, শান্তিপ্রয়াসী মানুষ স্বভাবতই—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শক্তির সাধক।

বাহিরের রৌদ্র-বৃষ্টি-শীতের দুঃখকষ্ট অন্যান্য জীবজন্তুর মতো মানুষ মুখ বুজিয়া সহ্য করে নাই, সে পরিচ্ছদ ও আচ্ছাদন সহায়ে তাহা জয় করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। অনিশ্চিত আহার্য সংস্থানের পরিবর্তে সে খাদ্য উৎপন্ন ও সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে। বন্যার প্লাবনে স্বাভাবিক নিয়মেই দিগ্‌দেশ ভাসিয়া যায়, কিন্তু মানুষ বাঁধ দিয়া, নদীর গতির নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাকে নিজের কাজে লাগায়। প্রকৃতিকে জয় করিয়াই সংস্কৃতির পথে জয়যাত্রা। প্রাকৃত জীবনের স্রোতে, কাম-ক্রোধ স্বার্থ-দ্বন্দ্বে ভাসিয়া না গিয়া—বরং তাহার বিপরীত মুখে—প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন।

প্রকৃতির রাজ্যে উদ্ভিদ জন্মায়—আগাছা জন্মায়, বন আছে—জঙ্গল আছে, কিন্তু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই মানুষ শুরু করিয়াছে কৃষি, রচনা করিয়াছে উদ্যান। এগুলি প্রাকৃতিক নয়, সাংস্কৃতিক।

প্রকৃতির রাজ্যে স্ত্রী-পুরুষ মিলন আছে, কিন্তু বিবাহ নাই, সমাজ নাই, সংসার নাই। এগুলি প্রাকৃতিক নয়, সাংস্কৃতিক, অথবা বলিতে হয় উচ্চতর প্রকৃতির ক্রমবিকাশ। ইহার জন্য মানুষকে বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, প্রকৃতির প্রেরণা বা প্রবৃত্তি-শক্তিকে জয় করিয়াই মানুষকে সংস্কৃতির প্রথম সোপান প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

কিন্তু সংগ্রাম তো এখানেই শেষ নয়, সংগ্রামের তিনটি স্তর স্পষ্টতঃ চোখে পড়ে। প্রথম স্তরের সংগ্রাম বহিঃপ্রকৃতির সহিত বা বহির্জগতের সহিত। সমবেত চেষ্টায় প্রাকৃতিক শক্তি বিজিত হইলে শুরু হয় সমাজশক্তির, এই দ্বিতীয় স্তরে স্বার্থের সংঘাতে মানুষের সংগ্রাম মানুষের সহিত। শুভাশুভ শক্তির সংঘর্ষে মানুষ বুঝে, সব মানুষ এক প্রকার নয়, মানুষে মানুষে প্রভেদ মনের বিকাশ লইয়া। মনোভাবের এই তারতম্যই মানুষকে অন্তর্মুখী করে—সে জানিতে চায়, বুঝিতে চায়, খুঁজিতে চায়—কে আছে তাহার মনে, যে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে চালায়। এইখানেই শুরু হয় নিজেকে লইয়া তাহার তৃতীয় স্তরের সংগ্রাম,—আত্মশক্তির অনুশীলন দ্বারা। অন্তঃপ্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিয়া সে হইতে চায় উন্নততর মানব। স্বার্থের প্রেরণায় এই শক্তি-সাধনা শুরু হইলেও পরিণতি ইহার পরার্থে, পরিসমাপ্তি পরমার্থে।

আত্মরক্ষার্থে ব্যায়াম অনুশীলন করিয়া যে পেশীতে শক্তি সঞ্চয় করে, সে কি বিপৎকালে অপরকেও রক্ষা করে না? পেশীশক্তি বা বুদ্ধি-শক্তি সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইলেই কল্যাণশক্তি, নতুবা উহারা অকল্যাণেরও কারণ হইয়া থাকে। ঊর্ধ্বতর অধ্যাত্মশক্তি-সাধনাই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত; অন্যগুলি জড়শক্তির নামান্তর ও রূপান্তর, অতএব সেগুলি অন্ধ শক্তি মাত্র। ঐ সকল শক্তি দ্বারা কল্যাণ হইবে, না অকল্যাণ হইবে—তাহা নির্ভর করে, ঐগুলি কে কাজে লাগাইতেছে, এবং কি উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইতেছে তাহার উপর।

*　　*　　*

এই শক্তি-সাধনা মানুষকে দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন প্রকার শক্তি-উপাসনায় নিযুক্ত করিয়াছে। অঙ্কুরের উদ্‌গমে এবং শিশুর জন্মে নিশ্চয়ই বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং নারীতে সৃষ্টিশক্তির স্থূল প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াই মানুষ সৃজনী বা 'জননী'-শক্তির উপাসনা শুরু করিয়াছিল। পরে এই মাতৃনির্ভরতাই তাহাকে কল্যাণী পালনী শক্তির উপাসনায় নিযুক্ত করে, তাঁহারই তুষ্টিবিধানে এবং তাঁহারই প্রতি প্রার্থনা-পরায়ণতায় মানবকে উদ্বুদ্ধ করে।

তথাপি প্রশ্ন উঠে: ঈশ্বর আমাদের পিতা না মাতা? বিশ্বব্যাপী এই দ্বন্দ্বভাবের পরিসমাপ্তি

বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মে। কিন্তু সৃষ্টিস্থিতিলয় তো শক্তির কাজ, এবং শক্তি স্ত্রী-স্বভাবা, শক্তিই সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী। আবার শুনি ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা? এই দুই বাক্যের একমাত্র সম্ভাব্য সমন্বয়: ঈশ্বর ও শক্তি অভেদ—অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ। এই অতুলনীয় অদ্বিতীয় অভেদভাবই ঈশ্বরকে কখন পিতৃভাবে কখন মাতৃভাবে মানুষের মনে প্রতিভাত করে। ঈশ্বর অনন্তভাবময়, মানুষ পরিবেশ ও অবস্থা অনুসারে, তাহার মনের বিকাশের তারতম্য অনুসারে তাহার ভাব অনুযায়ী উপাসনা করে; উপাসনা একটি পথ মাত্র।

পশুচারণ-নির্ভর পিতৃপ্রধান জাতিগুলি ঈশ্বরশক্তিকে পিতৃভাবেই উপাসনা করিয়াছে। কৃষি-নির্ভর সমাজ ঈশ্বরশক্তিকে প্রথমেই মাতৃভাবে আরাধনা করিয়াছে। ভারতে আমরা পাইয়াছি বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব—যাহাতে বলা হইয়াছে: তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পিতা, তুমি সকল সম্বন্ধের কারণ, অথচ সকল সম্বন্ধের অতীত।

আস্তিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্যে ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, প্রকৃতির সাহায্যেই জগতের সব কিছু ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃতিই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, সত্ত্বরজস্তমোগুণের তারতম্যেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য, পুরুষ অকর্তা, সাক্ষী, চৈতন্য। বেদান্তের ব্রহ্ম পূর্ণ বিকশিত সাংখ্যের পুরুষ। অসংখ্য পুরুষ এক অসীম আত্মায় পর্যবসিত, এবং পুরুষ হইতে ভিন্না প্রকৃতিই যেন পরে ঈশ্বরাভিন্না অনির্বচনীয়া মায়াশক্তিতে রূপান্তরিতা। অপরিবর্তনীয় এক অখণ্ড সত্তার পরিবর্তন ও খণ্ডখণ্ডভাব কিভাবে হইল? এই অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নের উত্তরে বেদান্তের সিদ্ধান্ত: 'বিবর্তবাদ'—সাধারণতঃ যাহা 'মায়াবাদ' নামে পরিচিত; অর্থাৎ এই পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে হয় নাই—মনে হইতেছে হইয়াছে।

এই উচ্চ তত্ত্ব জনসাধারণের বোধগম্য হয় নাই, তাহারা পুরাণ-মাধ্যমেই ধর্মতত্ত্ব বুঝিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম-বিকৃতির পর তন্ত্র যখন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সংক্ষিপ্ত আকারে প্রবর্তন করে—তখন বৈদান্তিক অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর 'শিব-শক্তি'-তত্ত্ব স্থাপিত হয়। বর্তমানে বেদ বা বেদান্ত অপেক্ষা তন্ত্র ও পুরাণই আমাদের ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তন্ত্রের উদ্দেশ্য বেদান্তের উচ্চতম অদ্বৈত-তত্ত্ব জীবনের অনুভূতির মধ্যে আনা, তাই তো সেখানে বাহ্য পূজা অপেক্ষা মানস পূজার উপর বেশী জোর, তাই তো বলা হইয়াছে: দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।

সাধনার প্রথমে সাধক নিজেকে দেবতা ভাবনা করিবে। সাধনার শেষে সিদ্ধ সাধক দেবতাস্বরূপ হইয়া যাইবে। 'জীব এব শিবঃ'—বেদান্তের মহাবাক্যেরই কার্যে পরিণত রূপ। দেবভূত মানবের সাক্ষাৎ পাইয়াই শুরু হইয়াছে মানব-প্রতিমায় শক্তি-উপাসনা।

তাই তো দেখা যায় শ্রীগুরু মূর্তির উপাসনা। জ্ঞানী গুরু শিবস্বরূপ। শুধু শিব নন, গুরু শিব-শক্তি ভাবের সমন্বয়! গুরু জ্ঞান-শক্তির প্রতিমা—মনুষ্যমূর্তিতে কেন্দ্রীভূত মহাশক্তি, যাহার সহায়ে বহু মানব ঊর্ধ্বতর জীবনলাভের সাহায্য পায়, এবং সমাজে দেখা দেয় বিরাট পরিবর্তন।

অবতার জগদ্‌গুরু। সিদ্ধগুরুর উপস্থিতি দীপালোকের মতো একটি গৃহের কয়েকটি হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে, অবতারের আবির্ভাব সূর্যোদয়ের মতো। এককালে দেশদেশান্তর আলোকিত হয়, ভিতর বাহির আলোয় ভরিয়া যায়। মানুষে এই অমানুষী দৈবী শক্তি দেখিয়া মানুষ তাঁহাকে ঈশ্বরের পূজার নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারে না। অবতার শক্তিরই

লীলা। অবতার-উপাসনাও শক্তি-উপাসনারই আর একটি রূপ।

* * *

এতদ্ভিন্ন প্রায় সর্বত্র সভ্য সমাজে প্রচলিত নারী-উপাসনাও অজ্ঞাতসারে শক্তি-উপাসনারই প্রকারভেদ। নারী শক্তির সহজ প্রতিমা। নারী কন্যারূপে ভগিনীরূপে জায়ারূপে মাতৃরূপে আদৃতা। অজ্ঞাতসারে এই শক্তি-উপাসনার ফলেই মানব-সমাজ কত উন্নত হইয়াছে। জ্ঞাতসারে ইহা করিতে পারিলে মানুষ সর্ব প্রকার পশুভাব-বিবর্জিত হইয়া দেবতায় পরিণত হইবে। সভ্যতার আদিম ঊষা হইতে যে নারী তাহার নিত্য সহচরীরূপে রাত্রির অজানিত অন্ধকারে গুহার আশ্রয়ে তাহাকে অভয় দিয়াছে—হিংস্র জন্তু হত্যা করিবার সময় যে নারী তাহাকে প্রস্তর-খণ্ড আনয়নে ও তাহা ক্ষেপণে সাহায্য করিয়াছে, শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপের সময় যে নারী ধনুতে জ্যা বিস্তার করিয়া দিয়াছে, পুনরপি সৌভাগ্যের সময় যে পশু-ধনধান্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠবস্তুরূপে পরিগণিতা হইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে, সম্পদে বিপদে যে পুরুষের চিরসাথী—শক্তি-উপাসনায় সেই তাহার শক্তিস্বরূপা, প্রবৃত্তিকালে জায়ারূপে মায়ারূপে, নিবৃত্তিকালে মাতৃরূপে মহামায়ারূপে শক্তি-স্বরূপিণী নারীই মানবের—সাধকের চিত্ত-মন্দিরে চির-আনন্দময়ী।

বিশ্বশান্তির জন্য ?

আজকাল বিশ্বশান্তি কথাটি বড় ব্যবহৃত হইতেছে। সকলেই বিশ্বশান্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত। বিশ্বশান্তির জন্যই আজ যত অশান্তি।

আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ ছুটাছুটি করিতেছে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে, কেন ? না বিশ্বশান্তি বিপন্ন। কলিকাতার ও শহর-তলীর শিশুরা স্কুলে না গিয়া পতাকা ফেষ্টুন সহ শোভাযাত্রায় বাহির হইয়া চীৎকার করিতেছে, কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খোকা স্কুল ছুটি হইয়া গেল কেন?' বুঝি বা কোন মহান্ নেতা লোকান্তরিত। না, তা নয়, প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রেরা সমস্বরে জবাব দিল, 'জানেন না, লেবাননে বিশ্বশান্তি বিপন্ন।' শিক্ষকসুলভ মনোভাব লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খোকা, লেবানন কোথা?' চটপট্ উত্তর আসিল 'তা জানি না'। যে শিশু জানে না লেবানন কোথা, সেও জানে লেবাননে বিশ্বশান্তি বিপন্ন, ইহাই আজিকার শিক্ষার, দীক্ষার, বিভিন্ন আন্দোলনের বিচিত্র চিত্র।

আমরা ঘরের খবর রাখি না, পরের খবরও রাখি না, শুধু কতকগুলি বড় বড় ফাঁকা বুলির ধাক্কায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বিশ্বশান্তির জন্য দুই দেশের প্রধান মিলিত হইয়া শুভেচ্ছার সহিত ভূখণ্ডের আদান প্রদান করেন তাঁহারা জানেন না—ইহার ফলে আরও কত লোক দুঃখে কষ্টে পতিত হইতে পারে, তাঁহারা জানেন না সেই ভূখণ্ড কোথায়! কিন্তু এ সময়ে এ ব্যবস্থা না করিলে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হইবে। দেশের শান্তি অপেক্ষা বিশ্বশান্তিই বড় কথা!

শান্তির জন্য কাহারও মতে 'যুদ্ধোপকরণ বাড়াও, তবেই শত্রু ভীত হইবে এবং আক্রমণ করিবে না।' আবার কাহারও মতে, 'শত্রুর

ছোটখাটো অন্যায় সহ্য কর, তাহাকে সন্তুষ্ট রাখো।' নানাপ্রকার বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাবসংঘাতের মধ্যে আজ সাধারণ মানুষই বিপন্ন।

সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মানবজাতির এতদিনের পুরাতন পরিচিত নীতি সব বিসর্জিত হইয়াছে। নূতনতর অস্ত্রশস্ত্রের ভীষণ গর্জনে পুরাতন মনীষীদের উপদেশ ডুবিয়া যাইতেছে। যে দু-একটি বাণী ভাসিয়া উঠিতেছে তাহাদেরও মুখোস-পরা রূপ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না—ইহারা আসল, না নকল।

'আদিম' মানব সম্মানের বিনিময়ে কখনও শান্তি চায় নাই। তাহাকে আমরা 'অসভ্য'—অর্ধসভ্য, একটু সুর নামাইয়া মধ্যযুগীয় বলিয়া গালি দিয়া থাকি। তাহার কাছে সম্মানই ছিল শ্রেষ্ঠ বস্তু, নিজের সম্মান, নিজ গোষ্ঠীর সম্মান, নিজ জননী-স্ত্রী-কন্যার সম্মান বিসর্জন দিয়া সে বাঁচিতে চায় নাই। মধ্যযুগেও দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, জাতির জন্য প্রাণ বিসর্জন ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু এখন মানুষ যথার্থ 'সভ্য' হইয়াছে, বুদ্ধিমান হইয়াছে, সামান্য দেশ, সামান্য ধর্ম, কি সংকীর্ণ জাতীয়তা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় তাহার নাই, তাহার মন এখন উদার হইয়াছে, তাহাকে এখন সারা বিশ্ব লইয়া চিন্তা করিতে হয়, সমগ্র মানবজাতির ভালমন্দের কথা ভাবিতে হয়। সহসা সংকীর্ণতার বশবর্তী হইয়া শুধু নিজের দেশের, নিজ ধর্মের বা নিজ জাতির জন্য কিছু করিয়া ফেলা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, ইহা একপ্রকার সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা।

এই প্রকার ছদ্ম-উদারতার পরিণাম কি—তাহা আমরা বিবেচনা করিতে চাই না, কিন্তু ইহার কারণ কি—তাহা বিশ্লেষণ করিবার সময় অবশ্যই আসিয়াছে।

এককথায় বলিতে পারা যায়, ইহার কারণ অন্তঃসারশূন্যতা বা দুর্বলতা। যে ব্যক্তি নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে স্বার্থপরতার প্রতিমূর্তি সেই সর্বাপেক্ষা জোর গলায় সাম্যবাদের বক্তৃতা দেয়। যে দৈনন্দিন ব্যবহারে—স্থানবিশেষে কোথাও জঘন্য নিষ্ঠুরতার, কোথাও বা ভীরুতার চূড়ান্ত দেখায়—সেই আবার অহিংসার প্রচারক। এই প্রকার মিথ্যাচার শুধু ভাবতে নয়, আজ পৃথিবীর সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে।

মানব-সাম্যের উদ্‌গাতা বলিয়া যাহারা গর্বিত, ভারতের অস্পৃশ্যতা যাহাদের তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য—তাহারাই নিগ্রোদের জন্য পৃথক পল্লী, পৃথক বিদ্যালয়, এমনকি পৃথক শাস্তি-বিধানের পর্যন্ত ব্যবস্থা চালু করিয়াছে। সভ্য জগতে ইহার প্রতিবাদ কই?

যাহারা সাক্ষাৎভাবে প্রাণিহত্যা করে না, অহিংসা ও শান্তি প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে, তাহারাই খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল দিয়া পরোক্ষভাবে একটি জাতিকে মৃত্যুর ও স্বাস্থ্যহীনতার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। আমরা তাহা সহ্য করিতেছি।

* * *

গৃহসংসারে, সমাজব্যাপারে, রাষ্ট্রচালনায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এইপ্রকার নানা অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে সময় মত প্রতিবাদ না করিয়া অন্যায়কে সহ্য করিয়া গেলে অন্যায় বাড়িয়াই যায়। আমরা ভুলিয়া যাই, যে অন্যায় করে আর যে অন্যায় সহে—উভয়েই সমান দোষী। অন্যায় সহ্য করিবার একজন থাকিলে অন্যায় করিবারও একজন নিশ্চয় থাকিবে। দুর্বলতার জন্যই আমরা উদারতার মুখোস পরিয়া অন্যায় সহ্য করি। ইহা আর যাহাই হউক সত্য আচরণ নহে। ক্ষমা করা তাহারই সাজে যাহার ক্ষমতা আছে। প্রেমপ্রসূত ক্ষমাই শত্রুর হৃদয় জয় করিতে পারে। তমোগুণাশ্রিত মৈত্রীর ভান ভয়প্রসূত, উহা দুর্বলতা, উহা অধিকতর দুঃখ ও অশান্তির কারণ। নির্বৈর বড় কথা, কিন্তু সংসারে ও সমাজে শান্তিরক্ষার জন্য রজোগুণাশ্রিত বৈর (বীরভাব) প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-'কথামৃতে' শ্রীশ্রীকালীতত্ত্ব

সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভি'র কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর এই জগতের আধার আধেয় দুইই।

কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী,—একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোনো কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। একই 'ব্যক্তি', নাম রূপ ভেদ।

যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম—অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী। যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। সাকার রূপও মানতে হয়। কালীরূপ চিন্তা ক'রতে ক'রতে, সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তারপর দেখতে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হ'য়ে গেল। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী। কালী—'সাকার আকার নিরাকারা'।

ব্রহ্ম শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হ'যে যায়—আমি-তুমি, ঘর-বাড়ি, পরিবার সব মিথ্যা হ'য়ে যায়। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন ব'লে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাটামোর খুঁটি না থাকলে, কাটামোই হয় না—সুন্দর দুর্গাঠাকুর প্রতিমাও হয় না।

আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা। তাঁর শক্তিতে অবতার। অবতার তবে কাজ করেন। সমস্তই মা'র শক্তি।

কালী কি কালো? দূরে তাই কালো। জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখো কোনো রংই নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখো, কোন রং নাই।—'মা কি আমার কালো রে।

কালো-রূপে দিগম্বরী হৃৎপদ্ম করে আলো রে।' কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে সূর্য ছোট দেখায়, কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না।

তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়। ভাবভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায়। মা নানারূপে দর্শন দেন। তিনি যে ভক্তবৎসল। ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে সেইরূপে তিনি দেখা দেন।

তিনি লীলাময়ী। এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি ক'রতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন ক'রে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ হয়। তাই 'লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।' তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা ক'রে বলে দিয়েছেন,

'যা, এখন সংসার ক'রগে যা।' মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া ক'রে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহ'লে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।

তিনি ইচ্ছাময়ী। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারো কিছু করবার যো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমনি ক'রতে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—নচেৎ নয়। বন্ধন আর মুক্তি—এই দুইয়ের কর্তাই তিনি।

ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। মায়া আবরণস্বরূপ। ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হ'য়ে বলে,—মা! পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।

সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়—তবে সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে দর্শন হয়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিষ কেবল দেখা যায়। সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা।

প্রতিমা

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

এ মূর্তি মাটির জানি,
তবু কেন তারই পদতলে,
আমার পূজার দীপ জ্বলে।
হৃদয়ের উপচার
তারই পায়ে কেন এনে রাখি?
অন্তর্যামী তুমি জান না কি?
তুমি যে ধারণাতীত,
আঁখি মেলে পাই না যে সীমা,
তাই গড়ি মাটির প্রতিমা।
তাই এ মন্দিরে—
ধূপের আরতি নিত্য
তুচ্ছ মৃন্ময়েরে ঘিরে ঘিরে।

তবু সে সৌরভ ভার,
ওঠে নাকি বহু ঊর্ধ্ব বাহি?
সে প্রদীপ জ্বলে না কি?
সুদূর অমৃতলোক চাহি?
মৃন্ময়েরে অতিক্রমি'
সে পূজার মন্ত্র উপচার,
যায় না কি চরণে তোমার?

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

স্বামী রাঘবানন্দ-লিপিবদ্ধ

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্থান : পূর্ববৎ—চিক্কাপেটা, আলমোড়া

২৪শে জুন, ১৯১৫

মানুষে মানুষ-বুদ্ধি থাকলে কখনও মুক্তি হবে না, ঈশ্বরবুদ্ধি থাকা চাই। একজন মহা উন্নত পুরুষ, জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্যে বিভূতিমান্—তাঁকে উপাসনা করলেও মুক্তি হবে না, যদি ঈশ্বর-বুদ্ধি না থাকে। ঐসব ঐশ্বর্য—জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণ তোমাতে আনতে পারে এই পর্যন্ত। কিন্তু যিনি স্বয়ং ঈশ্বরাবতার—তাঁকে যদি জান্তে, অজান্তে বা ভ্রান্তে উপাসনা করা যায়, তিনিই শেষে ঈশ্বরবোধ দিয়ে দেন। যেমন কৃষ্ণলীলায় শিশুপাল প্রভৃতির 'দ্বিষন্ হৃষীকেশমপি' (হৃষীকেশকে দ্বেষ করেও) উর্ধ্বগতি হয়েছিল। গোপীরা জারবুদ্ধি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে approach (বরণ) করা সত্ত্বেও শেষে তাঁদের তাঁতে ঈশ্বর-বুদ্ধি হয়েছিল। এক গোপীকে তার স্বামী গৃহে বন্ধ ক'রে রেখেছিল। তখন বিরহ-দুঃখে তার পাপ নাশ হ'ল, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানানন্দে পুণ্য নাশ হ'ল এবং সে মুক্তি পেল।

প্রশ্ন—তবে যে বলে, 'ঈশ্বর-জ্ঞান' চলে যায়, সে কি ?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—যিনি ঈশ্বরদর্শনের পর অধিকতর নৈকট্য অনুভব করতে চান তিনি ঐশ্বর্য-জ্ঞান যত্নে পরিহার করেন। গোপীরা সাধারণ মানুষ নয়, তাঁদের ভাগবতী তনু।

*　　*　　*

বীর্যধারণ হচ্ছে প্রধান উপায়। আঠাশ বৎসর বয়সে বীর্য পরিপক্ক হয়। যে বীর্য ধারণ করতে পারে তার জ্ঞান ভক্তি সব হয়। কামের নাম মনসিজ। মনেতে কামের জন্ম হয়। যে বীর সেই পারে ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যেতে।

Stubbornness (একগুঁয়েমি)-কে যদি strength (শক্তি) বল, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। Stubbornness (একগুঁয়েমি) দুর্বলতার একটা আবরণ। দুর্বল ব'লে বাইরে একটা stubborn (একগুঁয়েমি) ভাব রেখে দিয়েছে as a covering (আবরণরূপে)। Real strength (প্রকৃত শক্তি) সব দিকে যাবে, সব দিকে নুইবে, আবার নিজের strength regain (শক্তি পুনর্লাভ) করবে।

২৬শে জুন

বাবুরাম মহারাজ লিখেছেন, 'আমরা অনুমানে নেই, বর্তমানে আছি'। কি জন্য সব ছেড়েছি, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করতে হবে এবং নিজেকে test (পরীক্ষা) করতে হবে, ঠিক উন্নতির পথে যাচ্ছি কিনা।

২৭শে জুন

তাঁর (ঠাকুরের) দীক্ষা তো সামান্য ছিল না, একেবারে (কুণ্ডলিনী) জাগিয়ে দিতেন। আর একেবারে তর তর ক'রে বুকের ভিতর যেন ঢেউ খেলত। আমায় বলেছিলেন, তুই অভিষিক্ত হবি ? আমি বললাম, জানিনে। তিনি বললেন, তবে থাক্। একদিন কালীঘর থেকে নমস্কার ক'রে আসছি। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য ক'রে অন্যকে বললেন, 'এর উঁচু শক্তির ঘর, যেখান থেকে নাম রূপ হচ্ছে।' মুমুক্ষুত্বটা

আমার খুব এসেছিল। এ জীবনেই শেষ করতে হবে, এ ভাবটা আমার আজন্ম খুব ছিল। তা ঠাকুর ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এখন শরীর থাকল বা গেল।

২০শে জুন

আমরা এই চক্ষে দেখেছি, এই কর্ণে শুনেছি। স্বামীজীর উদ্দীপনা দেখে, ঠাকুরের এত উৎসাহ সত্ত্বেও ভাবতাম, এই জীবনে বুঝি কিছু হ'ল না! জীবন বুঝি বৃথা গেল! অর্থাৎ যা মনে করেছিলাম তা বুঝি হ'ল না! তারপর ঠাকুর সুসময় দিলেন। আমায় স্বামীজী তখন লিখেছিলেন: ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহে আশঙ্কয়া কাকবৎ। এই ক'রে দিন কাটছে।

'দুসরা ন কোঈ।' তিনি সর্বস্ব—এইটি যখন বোধ হবে, সম্পূর্ণ নির্ভরসা হবে, তখন ঠিক। এখন খালি এটাতে ভরসা, ওটাতে ভরসা, ধন-জন-বিদ্যায় ভরসা। মহা মহা পণ্ডিতকেও দেখা গেছে, screw (স্ক্রু) একটু খারাপ হয়ে যেতেই পাগল হয়ে গেল। আমার ধন-জন, friends (বন্ধু-বান্ধব) আছে, এই ভাব থাকলে ঈশ্বরে নির্ভরতা আসে না। এই 'অকিঞ্চনানাং নৃপ-স্তুদ্ধনং বিদুঃ।' যখন তোমার এবং তাঁর মধ্যে আর কিছুই থাকবে না, তখন হবে। গোপী-দের সব পাশ তিনি কেটে দিয়েছিলেন। শেষে তাঁদের খালি লজ্জা ছিল, তাও তিনি নিয়ে নিলেন। তিনি যখন দেখেন যে, কেউ তাঁর জন্য কিছু ছাড়তে পারছে না তখন তিনি নিজেই সেটা কেড়ে নেন।

"তুমি সব কেড়ে নাও আমায় কাঁদায়ে।
যত কিছু নিভৃত হৃদয়ে রেখেছি লুকায়ে॥"
"যদি ভবে পার হবে, ছাড় বিষয়-কামনা।"

ঠাকুর বলতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর। অর্থাৎ তাঁকে তোমার অন্তরাত্মা জেনে—তোমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু জেনে তাঁকে ভক্তি কর। তাছাড়া যে ভক্তিতে 'হে প্রভু! এই দাও, ঐ দাও'-ভাব তা সকাম। এতটুকু কামনা বাসনা থাকলে পরাভক্তি লাভ হয় না।

* * *

স্বামীজীর 'My Master' পড়া হ'ল। এক-স্থানে আছে: Can a man sleep without struggling if he knows that God the mine of infinite bliss is near at hand ?—কেউ যদি জানে যে, অনন্ত আনন্দের আকরস্বরূপ ঈশ্বর হাতের কাছে আছেন, সে কি তাঁকে পাবার চেষ্টা না ক'রে ঘুমুতে পারে? এই দেখ, আমাদের 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করা একটা কথার কথা। খানিক ধ্যান করলাম বা খানিক জপ করলাম—এ তো কোন রকমে দিন কাটানো। তাঁর জন্য প্রাণ ফেটে যাবে, একটা মহা যাতনা উপস্থিত হবে, প্রাণ আটুপাটু করবে। তবে তো! তুলসীদাস বলেছেন, 'অ্যায়সা গরীবকা ধাম, কব হোগা মেরা রাম?'

কামুক লোক একটা মেয়ে-মানুষকে পাবার জন্য কি রকম করে। তার পিছু পিছু কি রকম যায়! বিল্বমঙ্গল সাপ ধরে দেওয়ালে উঠছে। তাঁর হাতে সব না ছেড়ে দিলে কিছুই হবে না। এদিকে তাঁকে অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান্ বলছে, আবার তাঁর হাতে যেতে ভয়? রামও বলবে, আর কাপড়ও তুলবে? দ্রৌপদী যতক্ষণ না সব ছেড়ে তাঁকেই স্মরণ করলেন, ততক্ষণ তাঁর মনে হচ্ছিল কাপড় বুঝি ফুরুলো। তার পর অফুরন্ত কাপড়।

মনে করেছ, 'কপট ভক্তি ক'রে শ্যামা মাকে পাবে। এ ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।' তাঁকে কি ঠকাতে পারবে। তিনি সব দেখছেন। 'তুমি কর্তা, আমি অকর্তা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।'—এই ভাবটি the alpha and *omega of religion* (ধর্ম-জীবনের আদি

ও অন্ত)। 'I thy God am a jealous God.' (Bible)—আমি হিংসুক ঈশ্বর। আর কিছু জিনিস যদি ভালবাসলে, তাঁর জন্য সব না ছাড়লে, কিছু রেখে দিলে—তাহলে তাঁকে পাবে না।

৩০শে জুন

তাঁকে কে চায়? কেউ নয়। নিজের দুঃখ নিবারণ করবে, স্ফূর্তি করবে, এই সব চায়। তাঁর প্রতি অহৈতুক ভক্তি হওয়া বড়ই দুষ্কর। একজন লোক 'নির্জন চাই, নির্জন চাই' করত, একদিন সে বলে, আর একটা বিয়ে ক'রব নাকি?

১লা জুলাই

স্বামীজী যখন 'আমি' বলতেন, তখন সবটা নিয়ে যে 'আমি' সেই 'আমি' বুঝতেন। আমরা 'আমি' বললে এই দেহ-মন-ইন্দ্রিয় নিয়ে যে 'আমি' সেটা এসে পড়ে, সেইজন্য আমাদের বলতে হয়, দাস আমি, ভক্ত আমি। স্বামীজী 'আমি' বলতে উপাধি গ্রহণ করতেন না। তিনি পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে 'আমি' বলতেন। 'আমি' বললে তিনি মন-বুদ্ধির পারে চলে যেতেন। এইটা তাঁর প্রধান ভাব। এই ভাবে তিনি প্রধানতঃ থাকতেন। আমাদের তা আসে না। আমরা তা থেকে আলাদা একটি হয়ে বসে আছি। সেইজন্য আমাদের 'তুমি' 'তোমার' বলতে হয়।

প্রশ্ন—সেই বড় 'আমি'টা আনবার জন্য যাদের দ্বৈত সাধন তাদের অদ্বৈত গ্রন্থাদি পড়া ঠিক কিনা?

উত্তর—ঠাকুর বলতেন, 'অদ্বৈত ভাব আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।' যে ভক্ত 'তুমি' 'তোমার' করে, অর্থাৎ বলে, 'হে প্রভু, তুমিই সব, তোমারই সব,' তা থেকে আর অদ্বৈত তফাৎ কি? যে ভক্ত 'আমি' 'আমার' করে, তা থেকে আলাদা ভাবে এ মহা অনিষ্টকর দ্বৈত। সে মহা মায়ায় পড়েছে, মোহগ্রস্ত হয়েছে।

ঠাকুর জপ করতেন—নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ, দাসোঽহং দাসোঽহং। ভক্তের পক্ষে 'আমি' 'আমার' ভাব একেবারে ত্যাজ্য। শ্রীরামপ্রসাদ মার সঙ্গে কত আবদার অভিমান করেছেন। এই রকম একটা জমাট-বাঁধা ভাব চাই, যেমন জল জমে বরফ হয়। তবে তো শ্রীভগবানের রূপ দর্শন হবে। গোপালের মার সঙ্গে সঙ্গে গোপাল কাঠ কুড়াতেন। রামলালা ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন।

*　　*　　*

'ভাবই তো সব—সাকার বল আর নিরাকার বল—ভাবই আসল।

'নলিনী লো, এ তো নহে পিরিতি বিধান।
গগনে তপন বঁধু,　　হেসে তারে তোষ শুধু,
মধুকরে কর মধু দান॥'

এদিকে ভগবানকে সর্বস্ব বলছ, আবার কি রকমে স্ত্রীসম্ভোগ হতে পারে?

প্রশ্ন—রাগদ্বেষাদি কি ক'রে যায়?

উত্তর—রাগ (আসক্তি) দ্বেষ (বিরক্তি) কেন হতে দেবে? তুমি তো আর অপরকে নিগ্রহ করতে পারবে না? অতএব আত্মনিগ্রহ কর।

৩রা জুলাই

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারেতে মানুষ পশুর সমান। জ্ঞানেতেই মানুষ ভালমন্দ বিচার করতে পারে। Life (জীবন) যত low (নীচু) হবে, তত sense-এ (ইন্দ্রিয়ে) pleasure (আনন্দ); যত উন্নত হবে তত philosophy (দর্শন) জ্ঞানে সূক্ষ্ম আনন্দ। নিম্নস্তরের লোকেরা এ সব আনন্দ বুঝতে পারে না। দেখনা, মদ খাচ্ছে, শীকার ইত্যাদি কচ্ছে। এ তো একেবারে পশুর মতন। পশুরাও তাই করছে। মানুষজীবন পেয়ে বৃত্তিকে আরও উচ্চ না করলে কি হ'ল? যাদের মন উঁচুতে রয়েছে তাদের মন এ সবে নামে না। Impossible (অসম্ভব)!

ওলা মিছরির পানা খেলে চিটা গুড় ছ্যা হয়ে যায়। বিলাত যাবে? কি হবে গিয়ে—বহির্মুখ ক'রে বৃত্তিকে? খুব ধ্যান জপ ক'রে তাঁতে মগ্ন

হয়ে যাও। তদ্‌গতান্তরাত্মা হও, তদ্‌গতান্তরাত্মা হও। খালি ঠাকুরকে নিয়ে যদি পাঁচ বৎসর থাকতে পার তা হ'লে ঠিক হয়। বিলাত, এখান—সব এক হয়ে যাবে।"

* * *

বৈকাল বেলা পড়া হচ্ছে। মহারাজ বললেন, I do not care a fig for history or other things (আমি ইতিহাস বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য আদৌ ভাবি না)। 'ভগবানই সব'—কি সুন্দর কথা! সচ্চিদানন্দ-সাগরে অহং-রূপ লাঠি পড়ে আছে ব'লে দুই ভাগ দেখাচ্ছে। বাসনার দ্বারা অহং সৃষ্ট হয়। বাসনা বা কামনাই তো আলাদা ক'রে রেখেছে। এক সময়ে 'নির্বাসন' হতে হবেই হবে। সমস্ত বাসনা উপড়ে ফেলে তাঁকে ডাকতে হবে। বাসনাশূন্য হবার পর তাঁর ইচ্ছায় আবার কাজ করা যায়। তবে মহাপুরুষদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যারা কাজ করে তারা ঠিকই কচ্ছে। যাঁর কাছে সব দিয়েছ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমারই কল্যাণ সাধন করা। তাতে আর পাক লাগে না। উল্টে পাক খুলে যায়, তাতে বন্ধন আনে না।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, 'প্রভু! তোমায় যেন না ভুলি। এমন কাজ দিও না যাতে তোমায় ভুলে যাই। যেখানেই রাখ তোমায় যেন মনে থাকে।' তবে বোলো না, 'আমায় এই দাও, ও দিও না।' এটা সকাম। 'আমার এটা করতে ইচ্ছা করে, ওটা ইচ্ছা করে না।' এতে 'আমি' এসে পড়ল।

কেউ কেউ কাজে ভয় পায় এবং বলে, কাজ যেন না করতে হয়। তাতে গাঁট থেকে যাবে, ওতে মতলব থেকে যাবে। তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা করবে। আর তিনি যা করাবেন তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বলবে —সব অবস্থায় তোমায় যেন মনে থাকে, আর সর্বদা যেন তোমার ভক্তের সঙ্গ হয়, আর কারুর সঙ্গ নয়।

৪ঠা জুলাই

এটা পাকা ক'রে জানতে হবে যে, তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে। আবার তাঁর ইচ্ছায় সব যাচ্ছে। জগতে কত লোক উঠলেন, কত সেয়ানা এলেন। কিন্তু দেখ তাদের পরিণাম কি? সব তাঁর ইচ্ছায় হয়, যায়। এই যে আমাদের সংঘ, এও কি চিরকাল সমান থাকবে? এরও অবনতি হবে, তাঁকে আবার আসতে হবে।

* * *

যে ব্রাহ্মণ সে spiritual beggar (আধ্যাত্মিক ভিক্ষুক) তার দুদিনের সংস্থান থাকলেও হবে না। তাকে খালি ভগবান নিয়ে থাকতে হবে।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদের ঠাকুর তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। বলতেন, তাদের কোন পদার্থ নেই। মেয়েমানুষের কাছে তারা এত দীন হীন হয়ে যায় যে হাত জোড় করে। আরও কত কি শুনেছি। যাক সে সব কথা।

যাদের reason (বিচার) নেই তারা শীঘ্র একদিকে biased (পক্ষপাতী) হয়ে পড়ে, একতরফা শুনেই। বোঝবার শক্তি ও সপ্রেম হৃদয়—স্বামীজীর সমান ছিল। তিনি জেনে শুনেই লোককে ক্ষমা করতেন।

* * *

প্রশ্ন—এমন হয় না যে, আপনি আপনি সজাগ থাকব?

উত্তর—তা অমনি হবে? আগে কিছু সাধন কর। আগে নিজে সাবধান হবার চেষ্টা কর। তারপর আপনিই আপনার monitor (চালক) হয়ে যাবে। লোকে একেবারে এইটেই চায় বটে।

তোমারই মধ্যে শুদ্ধ যেটা—সেটা তিনি, আর খারাপ যেটা—সেটা তুমি। 'আমি' বললে তুমি সেই খারাপটাকেই বোঝ। যত তাঁকে চিন্তা করবে তত তিনি তোমার মধ্যে বেড়ে উঠবেন, আর তোমার খারাপ ভাবটা পালিয়ে যাবে। কেউ কেউ আছে চাপা, নিজের চারপাশে বড় বড় পাঁচিল তুলেছে, কাউকে দেখতে দেবে না ভিতরটা, নিজেও গোপন করতে চেষ্টা করবে। ও বড় খারাপ। সরল না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

৭ই জুলাই

যতই অহংকার-বর্জিত হ'য়ে তাঁর হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় হয়ে যাবে, ততই শান্তি লাভ করবে। তিনি কর্তা, আমি অকর্তা—এই ভাব যতই আয়ত্ত হবে, ততই প্রাণ শীতল হবে।

দেবীপূজায় দেবীসূক্ত

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

দেবীসূক্ত ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত। ইহা দুর্গোৎসবে দেবীপূজায় পঠিত হয়। এই সূক্তের ঋষির নাম বাগাম্ভৃণী অর্থাৎ অম্ভৃণ ঋষিব কন্যা বাক্। দেবীপূজায় প্রয়োগ থাকিলেও ইহাতে দেবীব কথা কই? ব্রহ্মবিদুষী বাক্ এই সূক্তে নিজের আত্মাকেই বরণ করিতেছেন। 'সচ্চিৎসুখাত্মকঃ সর্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা'—সায়ণ টীকায় এই কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাব মতে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই এই সূক্তের দেবতা, সর্বগত পরমাত্মার কথাই এখানে বলা হইয়াছে। নিখিল জগতের সহিত ঋষি আপন আত্মীয়তা অনুভব করিয়া সর্বজগৎ-রূপে আপনার প্রকাশ দেখেন এবং আপনি সকল হইয়াছেন—এই উপলব্ধিতে আত্মাকেই পূজা করিতেছেন।

এই ব্রহ্মবাদের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ কি? দুর্গতিনাশিনী বরাভয়দায়িনী জগজ্জননী-রূপে যে শক্তির আমরা পূজা করি, মূলতঃ তাহা ব্রহ্মবিদ্যা। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অর্জুন দেবী-দুর্গার স্তব করিয়াছেন:

ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং।

—তুমি বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, দেহীদের তুমি মহানিদ্রা। কেনোপনিষদে দেখি, দেবতাদিগকে যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন—তিনি বহুশোভমানা হৈমবতী উমা। উমা যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা সায়ণের একটি ভাষ্যে উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'সোম' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন:

হিমবৎপুত্র্যা গৌর্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানরূপত্বাৎ গৌরীবাচক উমা-শব্দো ব্রহ্মবিদ্যাং উপলক্ষয়তি।

—হিমালয়কন্যা গৌরী ব্রহ্মবিদ্যার প্রতীক, অতএব গৌরীবাচক উমা-শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইতেছে। আমাদের শক্তিপূজা মূলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা।

ঋষির অন্তরে পরমজ্ঞানের প্রকাশ হইল। তাহা ছন্দে ফুটিয়া উঠিল:

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১

মন্ত্রদ্রষ্টা বাগাম্ভৃণী ব্রহ্মরূপা হইয়া বলিতেছেন: আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসুতে বিচরণ করি, দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণ আমারই প্রকাশ, আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীযুগলকে ধারণ করি।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২

শত্রুহন্তা সোমকে আমিই ধারণ করি, ত্বষ্টা, পূষণ এবং ভগ—ইহাদিগকে আমিই পালন করি, যে যজমান হবি এবং সোমরস প্রদানে দেবতাদিগকে অর্চনা করে সেই ভক্তিমান্ পূজককে আমিই ধনসম্পদ্ দান করি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩

আমিই সর্ব জগতের ঈশ্বরী, ধনদাত্রী, আমিই মানুষকে পরব্রহ্মের জ্ঞান দিয়া মুক্তিদান করি, আমিই যজ্ঞার্হাদিগের মুখ্যা। আমাকেই দেবগণ

বহুভাবে আরাধনা করেন। সর্ব ভূতের অন্তরে অবস্থান করিয়া আমি সর্বব্যাপিনী, আমার আশ্রয়স্থান ভূরি এবং বিচিত্র—আমি জীবভাবে সর্বজীবের অন্তরে বর্তমান।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

যিনি অন্ন ভোজন করেন, যিনি দর্শন করেন, যিনি শ্রবণ করেন, যিনি প্রাণ ধারণ করেন—সকলে সকল কাজ আমার দ্বারাই করেন—আমিই অন্তর্যামীরূপে ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা এবং অন্তর-বাসিনী আমাকে যাহারা জানে না তাহারা কষ্ট পায়। হে বিদ্বান্ বন্ধু! শ্রদ্ধায় শ্রবণ কর, আমি উপদেশ দিতেছি—সযত্নে তাহা উপলব্ধি কর।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টম্
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫

শ্রবণ কর, আমি নিজে উপদেশ দিতেছি, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সুধী মানুষগণ এই ব্রহ্মবিদ্যার সেবা করিবেন। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ করি, তাহাকে স্রষ্টা, দ্রষ্টা এবং শোভনপ্রজ্ঞ করি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬

যখন রুদ্র ব্রহ্মদ্বেষী অসুর বধ করিতে সংকল্প করেন, আমিই তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দিই, আমিই আমার প্রিয়জনগণের হইয়া যুদ্ধ করি—স্বর্গ ও পৃথিবীকে আমিই আবিষ্ট করিয়া আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭

দ্যুলোকরূপ পিতাকে আমিই প্রসব করিয়াছি—জগতের মস্তকই আকাশ। কারণস্বরূপ ব্রহ্ম-শক্তি আমা হইতেই আকাশাদি কার্যসকল উদ্ভূত হইয়াছে। সমুদ্রের জলমধ্যে আমার যোনি। আমি ভূরাদি সকল ভুলোক ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান রহিয়াছি—এবং আমার মায়াময় দেহ দ্বারা অতি সুদূর স্বর্গলোকও স্পর্শ করি।

সমুদ্র পরমাত্মা স্বরূপ—তাহার ব্যাপনশীল ধীবৃত্তিতে যে অন্তর্গূঢ় ব্রহ্মচৈতন্য তাহাই আমার স্বরূপ—আমি ব্রহ্মচৈতন্য, অতএব কারণাত্মিকা হইয়া সমস্ত ভুবনকে ব্যাপ্ত করি।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ
তাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮

আমিই কারণরূপে বিশ্বভুবনকে উৎপাদন করি—বাতাস যেমন স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয়, আমিও তেমনি নিজেই—অপরের দ্বারা পরিচালিত না না হইয়াই সকলের প্রবর্তন করি। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ যে ইহা পৃথিবীকে অতিক্রম করে, ইহা দ্যুলোককেও অতিক্রম করে।

ওয়ালিস তাঁহার Cosmology of the Rigveda পুস্তকে লিখিয়াছেন:

"Vac, speech is celebrated alone in two whole hymns x. 71 and x. 125, of which the former shows that the primary application of the name was to the voice of the hymn, the means of communication between heaven and earth at the sacrifice

The other hymn illustrates the constant assimilation of the varied phenomena of nature to the sacrifice ; all that has a voice in nature, the thunder of the storm, the re-awakening of life at dawn, with songs of rejoicing over the new birth of the world, are embodied in this Vac in the same way as it is said of Brihaspati, that he embraces all things that are. It is thus another expression for that idea of the unity of the world, which we have seen crowning the mystical speculation of all the more abstract hymns of the collection. Cosmology of the Rigveda by Mr. Wallis—p. 85.

—দুইটি সূক্তে বাক্ স্তুত হইয়াছেন দশম মণ্ডলের ৭১ এবং ১২৫ সূক্তে। প্রথমটিতে আমরা দেখি যে বাক্ যজ্ঞে স্বর্গ এবং মর্ত্যের যোগসূত্র—যজ্ঞের ধ্বনি, দ্বিতীয়টি যজ্ঞের সহিত নিসর্গের বিবিধ শক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহস্পতি যেমন যাহা কিছু আছে তাহার সকলকে আবিষ্ট করিয়া আছেন, বাকও তেমনই প্রকৃতির প্রত্যেকটি শব্দকে অনুপ্রাণিত করিয়া বর্তমান, ঝড়ের সময় বজ্ররব, প্রভাতে যখন পৃথিবীর নবজন্ম তখন যে উল্লাস ও কলরব জাগে তাহার সকলই বাকের অভিব্যক্তি। সংহিতায় অধ্যাত্মরসসম্পন্ন সূক্তগুলিতে যে রহস্যময় চিন্তাধারার পরিচয় পাই—তাহার পরাকাষ্ঠা বিশ্বজগতের ঐক্যানুভূতিতে রূপায়িত—বাক্ এখানে সেই পরম ঐক্যবোধের প্রকাশ।

ওয়ালিসের ব্যাখ্যা বহিরঙ্গ। উক্ত দুইটি সূক্তেই বাকের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু সূক্ত দুইটির মর্মে প্রবেশ করিলে আমরা বুঝিব ইহারা ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে।

ভারতের চিন্ময় আত্মার দীপ্ততম প্রকাশ বেদান্তে। মানুষের অবিদ্যা দূর করিয়া যে অমৃতবিদ্যা মানুষের জীবনে আনে পরমা শান্তি, সাম্য ও অব্যাকৃত আনন্দ—তাহাই বেদান্ত।

বেদান্তের আলোকে সকল তমসা বিলুপ্ত হয়, সমস্ত ভয় ও ভাবনা দূরীভূত হয়, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। বেদান্তের নির্ভরভূমি ব্রহ্ম; তাহা কি ভাষায় ঠিক বলা যায় না। বাক্য ও মনের অতীত—সেই সত্যকে কেবল আমরা অনুভব করিতে পারি, তাহা 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি'—তিনি আনন্দরূপ, তিনি অমৃত, তিনি প্রকাশশীল।

সেই যে ভূমা, সেই যে বৃহৎ তাহা দূরে নয়, তাহা অগম্য নয়, অপ্রাপ্য নয়, কারণ আমার আত্মাই সেই পরমাত্মা—আমার স্বরূপই বিশ্বভুবনের অন্তর্যামীরূপে চরাচরে বিদ্যমান—আমার বাহিরে কিছুই নাই—আমার মহিমা সীমার পারে গিয়াছে—তাই দ্যুলোক ও ভূলোক তাহাকে ধরিতে পারে না, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমার জ্যোতি ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া ওঠে। এই বেদান্ত-বিদ্যাকেই মহর্ষি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মবাদিনী বাক্ তাই আমাদের চিরনমস্যা।

শিব ব্রহ্মরূপ, তাই তিনি মহাদেব, তাহার শক্তি মহাদেবী, তিনি জীবনের সর্ব দুর্গতি দূর করেন, তাই তিনি দুর্গা। দেবীপূজায় তাই অদ্বৈত জ্ঞানের উন্মেষই সাধকের অভীপ্সা। মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ জাগে বিদ্যায়, ছন্দে, শ্রীতে, সম্পদে, প্রতিষ্ঠায়, অমৃতত্বে এবং অভয়ে। তাহার একমাত্র পথই ব্রহ্মবিদ্যা—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—আর অন্য পথ নাই।

দুর্গাপূজা তাই ব্রহ্মবিদ্যার পূজা—অম্ভৃণতনয়া সেই ব্রহ্মবোধের প্রথম উদ্‌গাত্রী। দেবীসূক্ত পাঠে তাই জীবন শুদ্ধতর হয়, দিব্য জীবনে মানুষের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্মবাদ শক্তিহীনতার কথা নয়—শক্তির পরিপূর্তিই তার আদর্শ।

মানুষকে আজ তার ক্ষুদ্রতার পরিবেশ ত্যাগ করিয়া—ছন্দোহীন সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া বিরাটের অভ্যুদয়ে প্রবৃত্ত হইবার আহ্বান জানাইতে হইবে। আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগরণের জন্য প্রার্থনা করি।

নবীন যুগ আসিতেছে। ব্রহ্মবিদ্যা আর বিরল সাধকের গোপন সম্পদ্ রহিবে না, প্রত্যহের কর্ম আত্মার আলোকে উদ্ভাসিত হইবে! এই জীবনেই মানুষ দেবত্ব লাভ করিবে; বিবর্ধনের, উধর্বায়নের সেই স্বপ্ন সফল হউক। মানবতার এই চরম বিকাশের সন্ধিক্ষণে বাগাম্ভৃণীকে প্রণতি জানাইয়া দেবীসূক্ত আবৃত্তি করি:

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সংবভূব।

'জাতিরূপেণ সংস্থিতা'

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নয়ন-সম্মুখে দেখ মায়ের মন্দিরে
একে একে খুলিছে দুয়ার,
রাত্রিশেষ প্রহরের ঘণ্টা গেছে বাজি ,
জবাকুসুমের আভা উদয়-আকাশে
ধীরে ধীরে ফুটিতেছে , দিগন্তে বিলীন
অতিক্রান্ত রজনীর প্রদোষ আঁধার,
দিগ্বলয়ে খণ্ড খণ্ড মেঘের কিনারে
শঙ্কা মৌন বিহ্বলতা যদি কিছু থাকে
অনন্ত আকাশপটে, আয়ু তার মুহূর্তেরও নহে।
দুঃস্বপ্নের মায়াজাল ছিন্নভিন্ন করি'
আসিছে নূতন দিন শারদ প্রভাতে।

শুধু তোরা আয় ওরে রাত্রিজাগা উদ্‌ভ্রান্ত সন্তান।
যত ক্লান্তি নয়নের মুছে ফেল্ আলোক-উল্লাসে,
প্রাতঃস্নান ক'রে আয় প্রবল প্রবাহে,
অবগাহনের তৃপ্তি নিয়ে আয় সর্বাঙ্গে মাখিয়া,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আয় সংশয়-ব্যাকুল দু'নয়নে।
অন্তরের অবসাদ মথিত করিয়া
জাগিয়া উঠুক মন্ত্র অনাদি কালের—
অভী-মন্ত্র অভয়া মায়ের।

শুধু তোরা আয় আয়
ছুটে আয় মায়ের মন্দিরে,
মা তোদের ডাকিছেন বহুকাল পরে—
অকাল বোধনে নয়, নব উদ্বোধনে
জননী জাগ্রতা আজি, অন্ত স্বাপকাল!
প্রহরণ-ধারিণীর মুখে আছে সহাস্য ভঙ্গিমা,
বরাভয় করে আছে
মৃত্যুহীন জীবনের অমোঘ আশিস।

যত ক্ষুধা জ্বলিতেছে জঠরে জঠরে
যত তৃষ্ণা কণ্ঠে কণ্ঠে রয়েছে সঞ্চিত
বঞ্চনার যত গ্লানি পুঞ্জীভূত বিক্ষুব্ধ অন্তরে,
অহঙ্কৃত অনাচারে যত পাপ করেছে আশ্রয়
স্তরে স্তরে বন্ধ্যা মৃত্তিকার,
ঐশ্বর্যের যত গর্ব, শক্তিমত্ত যত অপৌরুষ—
ভস্ম হবে হোমাগ্নির জ্বলন্ত শিখায়।
শুধু চাই আত্ম-বলিদান—
বলিদান বেদীতলে সহস্র প্রাণের।
নির্বিশেষ আত্ম-সমর্পণে
জাতিরূপে সংস্থিতা জগৎ-জননী
জাগিবেন এ ভারতে
পরিপূর্ণ মহিমার শাশ্বত আলোকে।

বেদান্ত ও মায়াশক্তি

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

বেদান্তের আচার্যগণের মতে প্রস্থানত্রয়ই ভারতের সর্বপ্রধান শাস্ত্র। এই তিন প্রস্থানের নাম : (১) শ্রুতি-প্রস্থান—উপনিষৎ, (২) ন্যায়-প্রস্থান—বেদান্ত-দর্শন ও (৩) স্মৃতি-প্রস্থান—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বেদান্ত-দর্শন ষড়্‌দর্শনের শিরোমণি-স্বরূপ। ভারতবর্ষ দর্শন-শাস্ত্রের আদি পীঠস্থান। বেদান্ত-দর্শনের আর এক নাম উত্তর-মীমাংসা। মহর্ষি বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেন, বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত করেন, তিনিই মহাভারতের অন্তর্গত গীতারও রচয়িতা। বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎকেই বেদের অন্তভাগ বা 'বেদান্ত' বলা যায়। উপনিষদুক্ত বিভিন্ন ও উহাতে বিচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত তত্ত্বসমূহই প্রণালীবদ্ধ ভাবে উত্তরমীমাংসায় মহর্ষি বেদব্যাস লিপিবদ্ধ ক'রে জগদ্‌বরেণ্য হয়েছেন। যে অদ্ভুত মেধা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তা জগতে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁর জ্ঞানের তুলনা হয় না।

এই প্রবন্ধে আমরা বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে উহাতে শক্তিবাদ কতটা ও কিরূপভাবে গৃহীত হয়েছে তাও বিচার করতে চেষ্টা করব।

আমরা অনুভূত বিশ্বকে জড় ও চেতন—এই দুই ভাগে ভাগ করি, মানুষের দেহটি জড়, কিন্তু তার আত্মা চেতন। চৈতন্যরূপী আত্মার অবস্থানের জন্যে জড় দেহটাই যেন চেতন ব'লে মনে হয়। মনে করা যাক, একজনের জলে হাত পুড়ে গেল; কিন্তু জলের গুণ শীতলতা, তাতে তো হাত পুড়তে পারে না। তবে জলে যে উষ্ণতা প্রবিষ্ট হয়েছে, তাতেই হাত পুড়ে গেছে। সেই রকম আমাদের দেহ ও মন কাজ করছে ঐ চেতন আত্মার অবস্থিতির জন্যে। দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যেই আমরা দুঃখ পাই, যদি আমাদের যথার্থ আত্মবুদ্ধি হয় তা হলেই আমরা ত্রিবিধ দুঃখের হাত হ'তে চিরতরে মুক্তি-লাভ করতে পারি।

বেদান্ত জ্ঞানশাস্ত্র, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় এর আরম্ভ। এই শাস্ত্রের যিনি অধিকারী হ'তে চান, তাঁকে কয়েকটি প্রাথমিক সাধনসম্পন্ন হ'তে হবে। প্রথমতঃ প্রয়োজন নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক, অর্থাৎ ত্রিকালে সত্য ও ক্ষণে ক্ষণে বিকারী বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক—এ সম্বন্ধে ধারণা চাই। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন—ইহলোক ও পরলোকে যত প্রকার ভোগ্যবস্তু আছে, তাদের প্রতি বৈরাগ্য অর্থাৎ ভোগে অনিচ্ছা। তারপর চাই শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি; সর্বশেষ মুমুক্ষুত্ব। ষট্‌সম্পত্তি বলতে শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের দমন, দম অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়-সকলের দমন, উপরতি অর্থাৎ মনকে ইন্দ্রিয়-বিষয় হ'তে বিপরীতে আকর্ষণ, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি সহ্য করবার ক্ষমতা, শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস, সমাধান দ্বারা ঠিক সিদ্ধান্তে মনের শান্ত অবস্থা বোঝায়। মুমুক্ষুত্ব বলতে মুক্তিলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোঝায়।

মূল কথা হচ্ছে—যিনি এই রকম বিচারসম্পন্ন যে দেশকালাতীত ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু, আর যা কিছু সবই অনিত্য—যিনি অনিত্য জ্ঞানে স্বর্গসুখ ও ঐহিক ইন্দ্রিয়জ সুখে অনাসক্ত, শাস্ত্র শ্রবণ-মনন ব্যতীত যিনি মনকে অন্য বিষয়ে বা চিন্তায় ব্যাপৃত রাখেন না, যিনি পঞ্চ

কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত রাখেন, যিনি মনকে বিষয় ও কর্মে অনাসক্ত রাখেন বা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, যিনি শীত উষ্ণ সহ্য করেন, এবং তজ্জাত সুখদুঃখে যিনি অচঞ্চল ও যিনি গুরু-বেদান্ত-বাক্যে একান্ত বিশ্বাসবান্ এবং যিনি আন্তরিক ভাবে মুক্তিকামী—তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। তাঁকে যাজ্ঞিক হ'তে হবে বা কর্ম-মীমাংসা সম্বন্ধে জ্ঞানী হ'তে হবে এমন কোন কথা নেই।

বেদান্ত-মতে আত্মা তর্কাতীত বস্তু। উহা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত বস্তু। আত্মা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই একরূপ। ভ্রান্তিবশতঃ মনে হয় আত্মাই যেন কর্তা ভোক্তা, সুখী দুঃখী, জাত মৃত। এই ভ্রান্তি দূরীকরণকেই মোক্ষ বলে। লোকে যে 'আমি আমি' করে, সে আমি-বোধটা আত্মবোধ নয়, ওটা মনেরই একটা অহংকার-বৃত্তি মাত্র। প্রকৃত আত্মা ঐ অহংবৃত্তির দ্রষ্টা বা সাক্ষী।

যতদিন দেহাত্মবোধ থাকে ততদিন মানুষ সংসারের সুখ দুঃখ অনুভব করে। মানুষ আত্মজ্ঞানহীন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে স্থূল শরীরের ওপর মমতা দূর হ'লেও তার সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে অভিমানটা ঠিকই থেকে যায়। 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'স্বরূপ'। জীবের জীবত্ব মিথ্যা, ব্রহ্মত্বই সত্য। আত্মা অদ্বিতীয় জ্ঞাতা স্বরূপ, তার দ্বিতীয় কিছু নেই। দেহ প্রভৃতি মায়িক ও সাময়িক উপাধির জন্য তিনি সংসারী জীব হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোন ভেদ নেই। জীব অবিদ্যাচ্ছন্ন ব'লে বুঝতে পারে না যে সে স্বয়ংই পরমাত্মা। দেহে অবস্থিত হয়ে সে বুঝতে পারে না যে দেহ আত্মা নয়, কিন্তু সে তার দেহকেই 'আমি' ব'লে মনে করে। যখন ঐ অজ্ঞান বা ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়, তখন একমাত্র পরমাত্মাই থেকে যান. জীব ব'লে তখন আর কিছু বোধ থাকে না। যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পরমার্থতঃ কোন ভেদ নেই, তবুও অজ্ঞান দৃষ্টিতে ভেদ ঠিকই আছে। দেহ-মন-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধি-যোগে পরমাত্মাই অজ্ঞানীর কাছে জীবাত্মারূপে একটা আলাদা জিনিস ব'লে বোধ হয়।

একই আকাশকে যেমন ঘট, মঠ প্রভৃতি উপাধি-যোগে ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করা হয়, সেই রকম একই পরমাত্মা উপাধি-যোগে বিভিন্ন জীবাত্মা হন। উপাধি-শূন্য অবস্থায় তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য। অতএব ভেদ বাস্তব নয়, উহা উপাধি-কল্পিত মিথ্যা, ভেদকে আশ্রয় ক'রেই সমস্ত লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার চলছে।

আত্মাকে যদি দেহ-পরিমাণ বলা যায়, তা হ'লে তিনি অপূর্ণ ও স্বল্পস্থানব্যাপী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আত্মার কর্তৃত্ব স্বভাবগত নয়, উপাধিগত, উহা পারমার্থিক নয়, ব্যাবহারিক। আত্মার বাহ্যাভ্যন্তর ব'লে কিছু নেই, উহা পূর্ণ, চৈতন্যঘন, অখণ্ডৈকরস। তবে দেহাদি উপাধির জন্যে সংসারী জীব ব'লে একজন পৃথক্ জ্ঞাতা ব্যবহার-ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়। একই আত্মা—উপাধিযোগে জীব, উপাধিশূন্য অবস্থায় পরমাত্মা। জীব যখন স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, তখন সে সৎ-এর মধ্যে লীন হয়, আপনার স্বরূপ লাভ করে, কিন্তু তখন জীবের অন্তঃকরণ-উপাধি সূক্ষ্মভাবে থাকে ব'লে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য হারায় না। যখন ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থার অনুভূতিগুলি বাসনার আকারে মনের মধ্যে কাজ করে, তখন সেই মন-উপহিত জীবকে স্বপ্ন-দ্রষ্টা বলে। জীব কার্য, পরব্রহ্ম কারণ; কারণ

হ'তে কার্য অভিন্ন। কার্যের কারণ-অতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীব ও ব্রহ্ম নামেই পৃথক্, বস্তুতঃ পৃথক্ নয়, একই। জীব স্বভাবতই ব্রহ্মস্বরূপ, তাকে যত্ন ক'রে ব্রহ্ম হ'তে হয় না।

জীবের বৈষম্য ও দুঃখের জন্যে জীবই দায়ী, এ জন্যে পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী ও নির্দয় বলা যায় না। বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় কর্মবীজকে অনাদি ব'লে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। মৃত্যুকালে জীব প্রাণ ইন্দ্রিয় মন অবিদ্যা, ধর্মাধর্ম কর্ম ও জন্মান্তরীণ সংস্কাররাশি নিয়ে এই দেহকে পরিত্যাগ করে। মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে চলে যায়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ভাবী জন্মের চিত্র তার মনে উদিত হয়। জ্ঞানের সাধকগণ দেবযান-পথে ব্রহ্মলোকে ও যজ্ঞাদি পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠাতাগণ পিতৃযান-পথে চন্দ্রলোকে গমন করেন।

যাঁহা হ'তে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও কালে যাঁতে জগৎ বিলীন হয়, তাঁকে পরমকারণ ব্রহ্ম বলা হয়। সৃষ্টির আগে জগদ্বীজ বা মায়া বা অবিদ্যা অব্যক্ত রূপে থাকে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বিতীয় নেই, তাই এঁকে বলা হয় ভূমা। ভূমাই অমৃত, নিত্য, অবিনাশী, চিরস্থায়ী। সত্য বস্তু তাকেই বলা যায় যা সর্বকালে, সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র একরূপেই অবস্থান করে। আর যা কখন আছে, কখন নেই তাকেই মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা অর্থে—নেই বা শূন্য বোঝায় না। এক ও অবিকৃত রূপে না থাকাকেই মিথ্যা বলা হয়। এই হিসাবে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা।

জীবাত্মা পরমার্থতঃ বিভুই বটে, তবে ব্যক্ত অবস্থায় বা ব্যাবহারিক দশায় উহা 'অণু' ব'লে মনে হয়। উপাধি-যোগে ব্রহ্ম সবিশেষ, পরমার্থতঃ ব্রহ্মকে সবিশেষ স্বভাববিশিষ্ট বলা চলে না। নির্বিশেষই পরমার্থ-তত্ত্ব। ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, তিনি কখন উচ্ছিষ্ট হননি। একমাত্র শ্রুতি ভিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ের দ্বিতীয় উপায় নেই। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ব্রহ্ম তার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন, তা হ'লে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্বের ও অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয়।

এইবার আমরা শক্তিবাদের কথায় এসে পড়ছি। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, তাঁর মায়া নামে অনির্বচনীয় এক শক্তি সহায়ে ঈশ্বর জগৎকারণ, ও সেই শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতীয়মান। পরমেশ্বর শক্তিরহিত হয়ে সৃষ্টি করতে পারেন না। এই শক্তি অবলম্বন করেই ইনি সৃষ্টিকর্তা। এই মায়াশক্তি এমন একটা কিছু যার প্রভাবে নির্বিকার ব্রহ্মকেও বিকৃত ব'লে দেখায়, যা অটলকেও টলিয়ে দেয়। ঐ শক্তির সঙ্গে এক ক'রে যখন ব্রহ্মকে দেখা যায়, তখন তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। যদি শক্তি হ'তে তাঁকে পৃথক্ ক'রে দেখা যায়, অথবা শক্তি যখন অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হয়ে থাকেন, তখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তৃত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করা যায় না। তখন তিনি অদ্বৈত, নির্গুণ—যা বাক্য মনের অতীত বিষয়। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ উদাসীন হলেও শক্তি-যোগে তিনি সক্রিয় ও সগুণ। এমন সময় ছিল না, যখন সমগ্র জগতে সৃষ্টিশক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না। প্রলয়ের সময় প্রকৃতি অব্যক্ত ভাব ধারণ করেন।

স্থির সমুদ্র যেন নিরুপম ব্রহ্মের উপমা। আর ঐ সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে সেই হ'ল (ঈশ্বর)-শক্তির প্রতীক। শক্তি দেশ-কাল-নিমিত্তরূপা। শক্তি ব্রহ্মের গতিশীল ব্যক্ত ভাব, ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ। যখন তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন,

তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম—আদ্যাশক্তি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত, তখন তিনি বাক্য-মনের অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম। সগুণও যিনি, নির্গুণও তিনি। তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, তাই তিনি এই জগতের উপাদান-কারণ। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। এই অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহে পরে পরে যে সৃষ্টি হয়, তা পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির অনুরূপই হয়। প্রলয়ে কোন বস্তুরই একেবারে বিনাশ হয় না, সবই বীজরূপে থাকে, সৃষ্টিকালে আবার ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। আদ্যাশক্তি সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ, তবে ব্রহ্মকে সব কিছুর আধার বা অধিষ্ঠান বলাই সঙ্গত। মায়াশক্তি পরব্রহ্মের স্বভাব, সেই স্বভাবের বশেই সৃষ্টি হয়।

ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্ম হওয়া। সমস্ত জ্ঞানের যিনি জ্ঞাতা তাঁকে আবার জানবে কে? জ্ঞাতা চিরকাল জ্ঞাতাই থাকেন, তিনি কখন জ্ঞেয় হ'তে পারেন না, তা হ'লে তো তিনি এই টেবিল চেয়ারের মত হয়ে পড়েন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ ব্রহ্ম হওয়া।

অদ্বৈতবেদান্ত-মতে পরমার্থ-দৃষ্টিতে সৃষ্টি ব'লে বাস্তবিকই কিছু নেই, অবিদ্যার প্রভাবে ও রকম একটা দেখাচ্ছে মাত্র। রজ্জুগত অবিদ্যার স্বভাবে রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক কিন্তু সর্প হয়ে যায় না। এই ভ্রমের প্রয়োজন ব'লে কিছু নেই, অবিদ্যার স্বভাবে এ রকম হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন এ-রকম হয়, সে প্রশ্নই উঠতে পারে না। যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ কারণ হ'তে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ব্রহ্মসূত্র)—ইহা সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ বা তটস্থ লক্ষণ, কারণ পরব্রহ্ম শক্তিযুক্ত হ'লে সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি গুণে লক্ষণীয় হন। মায়ার দুটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ-শক্তির প্রভাবে জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হয়, বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে জীব নিজেকে দেহ মন প্রভৃতি মনে করে। মায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির উদাহরণ—ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি-বিস্তার। ভেল্কি দেখার সময় দর্শকের মনে হয়, সবই যেন সত্য অথচ সবই ভ্রম। সে যেন কত কি দেখছে ও শুনছে, কিন্তু সবই মায়া। মায়াশক্তি ইন্দ্রজাল বিস্তার ক'রে জীবকে মোহিত ক'রে রেখেছেন। ব্রহ্ম স্বরূপে ঠিক থেকে বিকৃত বা পরিণাম প্রাপ্ত না হয়েও জগৎরূপে বিবর্তিত হন।

জীব-জগৎ এই মায়া-শক্তিরই লীলা। জীবের জন্ম মৃত্যু, বন্ধন মুক্তি সব তাঁরই ইচ্ছা। ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই তখন ত্রিগুণাতীতা, মহা-মায়া ব্রহ্মাভিন্না। চণ্ডীতে তাঁকেই বলা হয়েছে: 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—

—তিনি প্রসন্না হ'লে তবেই মুক্তি। তাই তো শক্তির উপাসনা। শক্তিকে সন্তুষ্ট না ক'রে কেউ মায়ার এলাকা কাটাতে পারে না।

জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে এক মায়া-আবরণ আছে। এই মায়া-আবরণ না সরে গেলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় না।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

নারী ও সাধনা

শ্রীমতী নলিনী ঘোষ

মহাপ্রভু সাধক ভক্তদের বলেছেন—"ভব-সাগরের পরপারে গমনেচ্ছু নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পক্ষে নারীসন্দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও ক্ষতিকর। বিষভক্ষণে দেহত্যাগ হয়—স্ত্রীসন্দর্শনে আত্মা কলুষিত হয়।"

শাস্ত্রেও এ রকম উক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। নারী সত্যই পুরুষকে বিষভক্ষণ করায় কিনা—চিন্তা ক'রে দেখবার বিষয়। পার্বতী শিবকে, সীতা রামচন্দ্রকে, সাবিত্রী সত্যবানকে কি বিষভক্ষণ করিয়েছিলেন—না অমৃতের অধিকারী হতে পূর্ণ সহায়তা করেছিলেন? সাধারণ লোকে এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে, নারীর মনেও নিজের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ঘটা অসম্ভব নয়।

সাধনপথে অধিকারী-ভেদে বিভিন্ন পন্থা নির্দেশিত আছে। সাধক জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি—এই তিন পথের যে কোন একটি পথ অবলম্বন করেন। আবার প্রত্যেক পথেরও বিভিন্ন ধারা আছে। সুযোগ্য গুরু সাধ্য অনুসারে সাধককে পথের নির্দেশ করেন এবং সেই পথের নিশানা ধরেই সাধককে অগ্রসর হতে হয়। বিভিন্ন সাধকের সাধনার ধারা সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু পরিণামে সকলকেই সেই এক গন্তব্য স্থলে পৌছতে হবে। সকলের পক্ষে এক পথ ধরে চলা সম্ভব ও সহজসাধ্য নয় বলেই এই রকম ব্যবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন,—'সকলের পেটে সব সয় না, তাই মা, যার যেমন সহ্য হয় সেই রকম ব্যবস্থা করেন। কারুর জন্যে মাছের ঝোল, কারুর জন্য মাছের ঝাল, আবার কারুর জন্যে মাছ ভাজা।' সাধন-রাজ্যেরও সেই কথা। কারও পক্ষে সংসার পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন, আবার কারও পক্ষে সংসারে প্রবেশ ক'রে সাধন প্রয়োজন। চৈতন্য-পার্ষদ—যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে একেবারে একীভূত বলা চলে, (গৌর-নিতাই দুটি নাম একই সঙ্গে বৈষ্ণবের মুখে উচ্চারিত হয়) সেই নিত্যানন্দ প্রভু সংসারী হয়েছিলেন।

'শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥'

শ্রীবাসের গৃহে ধর্মালোচনাতে মাধবীদাসীর উপস্থিতির কথাও আমরা চৈতন্য-গ্রন্থাবলীতে জানতে পারি।

সাধক যখন প্রকৃত সাধনমার্গে প্রবেশের অধিকারী হয়, তখন নারী তার পথের অন্তরায় হতেই পারে না। সাধনের অত্যন্ত নিম্নস্তরের অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদবুদ্ধি থাকে। কিন্তু সাধক যখন ভগবৎকৃপায় ভগবৎশক্তির কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারে তখনই তার সমদৃষ্টি আসতে থাকে। জ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মার তো রূপই নেই, তবে আর তার লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ কি? সাধনার এত অতি সহজ কথা।

* * *

উচ্চস্তরের সাধনার ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষ ভেদের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, ভক্তিশাস্ত্রের দিক থেকেও জগতে তো একমাত্র পুরুষ সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর তো কেউ পুরুষ নেই, সবাই যে তাঁর আরাধিকা। সাধিকা-শিরোমণি মীরাবাঈ যখন একবার সর্বত্যাগী পরম বৈষ্ণব শ্রীরূপগোস্বামীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ

করেন তখন শ্রীরূপগোস্বামী স্ত্রীলোকের মুখ দর্শনের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। উত্তরে মীরা বলেন, 'বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ—আর সব তাঁর প্রকৃতি। গোস্বামীজী যদি নিজেকে পুরুষ জ্ঞান করেন তবে তাঁর শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করাই কর্তব্য।' গোস্বামীজী নিজের ভ্রম বুঝতে পারেন। পরে তাঁরা পরস্পরকে গুরুজ্ঞান ক'বে কিছুকাল সাধন ভজন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই, প্রাচীন কালে শাস্ত্রে এবং মহাপুরুষ-বাণীতে সাধন সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা সর্বথা সর্বজনের জন্য প্রযোজ্য নয়। নারীকে সসম্মানে সাধনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই যেন ঠাকুরের মর্ত্যধামে অবতবণের অন্যতম কারণ ব'লে মনে হয়। ঠাকুর বলতেন—'যতদিন গাছ ছোট থাকে ততদিন তাকে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হয়, না হ'লে গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলবে, কিন্তু গাছ বড় হয়ে গেলে তাতে তখন প্রবল পরাক্রান্ত হাতীও অনায়াসে বেঁধে রাখা যায়।' তেমনি সাবন-জীবনের প্রথম স্তরে বলা হয় 'সাধু সাবধান', তখনই ভুলভ্রান্তির আশঙ্কায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বিচারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাধক যখন সাধনমার্গে কিছুটা উন্নতি করে, তখন আর তার নিম্নস্তরের মনোবিকার উপস্থিত হয় না। মনকে জয় করাই তো সাধকের সর্বপ্রধান কর্তব্য। নিজের মনকেই যদি বশীভূত করতে না পারা যায়—তবে আর কি আশা করা যেতে পারে?

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে যখন স্বীয় পত্নী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে ধনসম্পদাদি বিভাগ ক'রে দিতে চাইলেন তখন মৈত্রেয়ী বললেন: 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।'

মৈত্রেয়ী স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণের বাধা তো হলেনই না, বরং নিজেও যাতে অমৃতের সন্ধান লাভ করতে পারেন সেই শিক্ষাই স্বামীর কাছ থেকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মহাপুরুষেরা সাধককে নারী সম্বন্ধে যে রকম সাবধান করেছেন, তেমনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী সারদাদেবীও মেয়েদের উপদেশ দিয়েছেন—"দেখ মা, পুরুষ-জাতকে কখনও বিশ্বাস কোর না—অন্য পরের কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না, এমনকি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ ক'রে তোমার কাছে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস কোর না।" এও বড় কম সাবধান-বাণী নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে উভয় পক্ষ থেকেই কিছুটা সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। এরূপ সতর্ক হয়ে চলা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু সে প্রথম অবস্থার কথা। উচ্চস্তরের সাধকের জীবনে নারী বিষক্রিয়া করে না, স্নিগ্ধতা সঞ্চার করে। কারণ নারী যে আনন্দময়ী—তার প্রকৃতরূপই হচ্ছে আনন্দ-দায়িনী, অন্য কোন সম্বন্ধে সে সাধকের সঙ্গে যুক্ত নয়। সে যে আনন্দময়ী, শক্তিরূপিণী আদ্যশক্তির অংশসম্ভূতা। সামান্য মানুষ তো তুচ্ছ, স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা দেবাদি-দেব মহাদেব তাঁর শক্তির কাছে নিষ্ক্রিয় হয়ে পদতলে পড়ে আছেন। নারী সেই আদ্যা-শক্তির অংশ হয়ে কি সাধকের সাধনপথের কণ্টকস্বরূপ হ'তে পারে?

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবার নর-লীলায় নিজে স্ত্রী গ্রহণ করলেন, সাধনপথে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজনই বোধ করলেন না। শুধু তাই নয়, স্ত্রীগুরুও গ্রহণ করলেন। অধিকারী-ভেদে নিজ ভক্ত সন্তানকে স্ত্রীগ্রহণে সম্মতি দিয়েছেন। ঠাকুরের পরম

প্রিয় মানসপুত্র পূজনীয় রাখাল মহারাজ বিবাহিত ছিলেন, রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ব'লে পরিচিত। গৃহী ভক্তের চরম দৃষ্টান্ত সাধু নাগ মহাশয় বিবাহ করেছিলেন, স্ত্রী পরিত্যাগ না ক'রে সারাজীবন একই সঙ্গে সাধন-ভজনে যুক্ত থেকে সাধনার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

যাঁর হাতে এ-যুগের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সৃষ্ট হচ্ছে সেই শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে দীর্ঘ নয় মাস একাদিক্রমে নিজের কাছে রেখে একই ঘরে একত্র বাস করেছিলেন। এই সময় তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শে থেকেও গভীর সমাধিতে নিমগ্ন থাকতেন। সাধনায় কোন ব্যাঘাত ঘটা তো দূরের কথা, এই সময়েই তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ সাধনা ষোড়শী-পূজা।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে সংসারে আবদ্ধ ক'রে নামাতে যাননি, তিনি তাঁর সাধনপথের পূর্ণ সহায়িকা হতে পেরেছিলেন; ঠাকুর নিজের মুখে বলেছেন, সে কথা।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী এসে ঠাকুরের গুরুর আসন গ্রহণ করলেন। একে একে সকল তন্ত্র তাঁকে শিক্ষা দিলেন। ঠাকুরের মতো সাধক জগতের ইতিহাস বিরল, তাঁর তো নারীতে মাতৃভাব ছাড়া আর কোনও ভাব এলই না। তাঁর চরম আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখে ভৈরবী ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত।

তাই মনে হয়, মহাপুরুষদের বাণীর যথার্থতা উপলব্ধি করার জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা করা দরকার। সাধারণ মানুষের বা প্রথমাবস্থার সাধনের জন্য যে বিচার-বিবেচনা বিধি-নিষেধ প্রয়োজন, উচ্চস্তরের সাধকের পক্ষে তা প্রযোজ্য নয়। আবার সাধক-ভেদে, অধিকারী-ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, এই কথাটি মনে রাখতে পারলে আর বিভ্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে না।

অনুপম

অনিরুদ্ধ

ভাষা হ'ল রুদ্ধ তবু জানি তুমি সর্ববাক্যমূল,
রূপ লীন অরূপেতে, তবু বিভা রাজিছে অতুল।
নাই নাই নাম নাই, তবু তব গূঢ় পরিচয়
দ্বিধা-সংশয়ের পারে আপনি তো জানিছে হৃদয়।
প্রাণস্পন্দ থামিয়াছে, তবু আছ প্রাণেরো যা প্রাণ
ইন্দ্রিয়ের আলো নাই, আছ জ্যোতি স্বয়ং-প্রমাণ।
সকল কামনা স্তব্ধ—জাগো এক পরম এষণা।
বিশ্বের বৈচিত্র্য নাই সমরস অদ্বয় চেতনা।

এই দেহ এই মন মূল্য পায় তোমারি গৌরবে,
জীবন সার্থক হয় পরিপূর্ণে খুঁজে পাই যবে।
জন্ম-মৃত্যু অর্থহীন, প্রহসন ইহ-পরকাল—
আমার অস্তিত্ব আজ তোমাতেই অক্ষয় বিশাল।
আত্মসত্য প্রিয়তম তোমা সম কিছু নাই আর—
সর্ব-আভরণহীন অনুপম ঐশ্বর্য আমার।

জ্ঞানের স্বরূপ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জ্ঞান একটি অনন্যসাধারণ পদার্থ। 'জ্ঞান' শব্দ হইতে তাহার একটি অর্থ বোধগম্য হয়, কিন্তু তাহা কি, বর্ণনা করা সহজসাধ্য নহে। জ্ঞান যে কেবল মানুষেরই আছে তাহা নহে। পশু-পক্ষীদিগেরও জ্ঞান আছে। চণ্ডীতে আছে—

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলং।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ॥

কেবল মানুষই যে জ্ঞানবান তাহা নহে, পশুপক্ষী প্রভৃতিরও জ্ঞান আছে। মৃগপক্ষীদিগের যে জ্ঞান, মনুষ্যদিগেরও সেই জ্ঞান। মনুষ্যদিগের যে জ্ঞান তাহাদিগেরও তাহাই। কিন্তু পশুপক্ষীদিগের জ্ঞান কি রকম, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান আমাদিগের নাই। জ্ঞান কি দ্রব্য? অথবা গুণ, অথবা ক্রিয়া? প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দজ্ঞান ভিন্ন স্মৃতিও এক প্রকার জ্ঞান। মীমাংসা-দর্শনে জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রভাকরের মতে প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, তিনেরই এক সঙ্গে জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে 'ত্রিপুট সংবিৎ' বলে। জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বস্তুর সহিত জ্ঞানও আপনি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় কেবল যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা নহে, জ্ঞাতা যে জানিতেছে—এই জ্ঞানও হয়। 'অহম্ ইদং জানামি'—এই জ্ঞানে তিনটি বস্তুর অব্যবহিত জ্ঞান হয়; যথাঃ (১) অহম্ (বিষয়ী)-এর জ্ঞান (অহংবিত্তি), (২) ইদম্ (ইহা, বিষয়)-এর জ্ঞান (বিষয়বিত্তি), (৩) বিষয়জ্ঞানের জ্ঞান বা বোধ (স্ব-সংবিত্তি)। প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর জ্ঞান ও জ্ঞানের বোধ সংযুক্ত থাকে। এই জ্ঞানের বোধ (আমি জানিতেছি, এই বোধ) স্ব-সংবিত্তি।

প্রত্যেক জ্ঞানে—তাহা প্রত্যক্ষ, আনুমানিক অথবা শাব্দিক যাহাই হউক না কেন—মনের মাধ্যমে আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কিন্তু বিষয়ের অব্যবহিত জ্ঞান সকল ক্ষেত্রে হয় না, স্মৃতি ও অনুমান-জ্ঞানে বিষয় সংবিদের সম্মুখে অব্যবহিত ভাবে উপস্থিত থাকে না। কিন্তু এই গৌণ জ্ঞান (স্মৃতি ও অনুমান) সংবিদের সম্মুখে অব্যবহিত ভাবে বর্তমান থাকে। 'আমি জানিতেছি যে আমি জানিতেছি'—এই জ্ঞান হয়। জ্ঞানের জ্ঞান অব্যবহিত ভাবেই হয়। জ্ঞান আলোক-সদৃশ, তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান স্বতঃ-জ্ঞাত, কিন্তু জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞাত বিষয় আলোকের ন্যায় স্বপ্রকাশ নহে। তাহাদের প্রকাশের জন্য অন্য আলোকের প্রয়োজন। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু তাহা বিষয়-রূপে জ্ঞাত হয় না, তাহা অন্য জ্ঞান দ্বারাও জ্ঞাত হয় না। জ্ঞান বিষয় নহে। সুখ ও দুঃখের ন্যায় জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান যদি বিষয়রূপে জ্ঞাত হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন হইত, এবং অনবস্থার উদ্ভব হইত।

শবর স্বামীর মতে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। এই মতের সহিত প্রভাকরের মতের মিল নাই। সেই জন্য প্রভাকর বলেন, জ্ঞান যদিও আপনা হইতেই জ্ঞাত হয়, তথাপি তাহার উপস্থিতি

অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হয়। কোনও বিষয়ের যখন জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান হইতে আমরা অনুমান করি, যে আমাদের সেই জ্ঞান হইয়াছে, এই অনুমানলব্ধ জ্ঞান 'প্রমেয়' (সত্য জ্ঞানের বিষয়) হইলেও 'সংবেদ্য' (পূর্ণভাবে জ্ঞাত) নহে। যখন বিষয়ের রূপ প্রকাশিত হয়, তখন সেই জ্ঞানকে 'সংবেদ্য' বলে। এই সংবেদ্য কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধেই হয়। জ্ঞানের কোনও রূপ নাই, সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহার অস্তিত্ব কেবল অনুমিতই হইতে পারে। অনুমান দ্বারা তাহার বিষয়ের রূপ অথবা আধেয়ের জ্ঞান হয় না, কেবল বিষয়ের অস্তিত্বের জ্ঞানই হয়। জ্ঞান আত্মার পরিণাম। কুমারিল এবং প্রভাকর উভয়ের মতেই জ্ঞান অনুমানের বিষয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।

জ্ঞানের বহিঃস্থ কোনও কিছুর উপর তাহার প্রামাণ্য নির্ভর করে না। জ্ঞানের বাহিরে কোনও বস্তুই পাওয়া যায় না। যাবতীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই বাহ্য জগতে কর্মের প্রবর্তনা দান করে। এই প্রবর্তনার শক্তিই জ্ঞানের প্রামাণ্যসাধক। কোনও বিষয় যে-জ্ঞানে গৃহীত হয়, তাহা অপ্রামাণিক হইতে পারে না। জ্ঞানের যদি স্বতঃ-প্রামাণ্য না থাকিত তাহা হইলে তাহাতে কোনও বিশ্বাসই আমাদের হইত না। জ্ঞানের প্রামাণিক-তার ধারণা অন্য কিছু হইতে উদ্‌ভূত হয় না।

প্রভাকরের মতে প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। অনুভূতি (যেমন প্রত্যক্ষে হয়) বা অব্যবহিত জ্ঞান প্রামাণিক; স্মৃতি অপ্রামাণিক, কেননা পূর্ববর্তী জ্ঞান না থাকিলে স্মৃতি হয় না। যে জ্ঞানের সঙ্গে তাহার বিষয়ের সম্বন্ধ গৌণ বা ব্যবহিত, তাহা অপ্রামাণিক। প্রভাকরের মতে জ্ঞানের বিষয়ের পূর্ববর্তী জ্ঞানের অভাবই তাহার প্রামাণ্যের 'কষ্টি'। কুমারিলের মতে এই পূর্ববর্তী জ্ঞানাভাবের সহিত অন্য জ্ঞানের সহিত অসংগতির অভাবও জ্ঞানবিশেষের প্রামাণিকতার 'কষ্টি'।

বিপর্যয় ও মিথ্যা জ্ঞান এক নহে। সকল জ্ঞানই স্বপ্রকাশ এবং যথার্থ। যখন শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, তখন 'ইহা রজত'—এই জ্ঞান মিথ্যা নহে, কেননা তখন রজতের প্রত্যয় ও মনের সম্মুখে বর্তমান 'ইহা'র মধ্যে ভেদের অনুপলব্ধিই ভুলের কারণ। যাহা প্রত্যক্ষ (ইহা) তাহার সহিত স্মৃতিতে রক্ষিত যে রজতের প্রত্যয় তাহা আমরা মিশাইয়া ফেলি। যাহা সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই জ্ঞানের বিষয়। যখন বলি 'ইহা রজত' তখন যাহা সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত তাহা শুক্তি নহে, তাহা রজত। শুক্তি সেখানে উপস্থিত থাকে না, সুতরাং শুক্তিকে যে রজত বলিয়া বুঝি তাহা নহে, রজতের যে প্রত্যয় মনে আছে, তাহার সহিত প্রত্যক্ষ 'ইহা'র মিল নাই। প্রত্যক্ষ যাহা, তাহা পরে শুক্তি বলিয়া অবধারিত হয়। এই ভ্রমের কারণ 'অখ্যাতি'—অর্থাৎ সংবিদের সম্মুখে যাহা উপস্থিত আছে তাহার সহিত স্মৃতিতে যাহা আছে তাহার পার্থক্যের জ্ঞানের অভাব। যাহা প্রত্যক্ষ 'ইহা' এবং যাহার স্মরণ হয় 'রজত',—উভয়ই সত্য, কিন্তু উভয়ে যে ভিন্ন—সেই বোধের এখানে অভাব। এই বোধের অভাবের কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দোষ, এবং শুক্তি ও রজতের সাদৃশ্য হইতে পূর্ব জ্ঞাত রজতের সংস্কারের উদ্‌ভব।

এই 'অখ্যাতি'-বাদের সমালোচনায় বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন—যাহা প্রত্যক্ষ ও যাহার স্মরণ হয়, তাহা যদি সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্বই তো নাই। যদি উভয়ই সংবিদের সম্মুখে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে ভেদ তাহা দৃষ্ট হইবে না, ইহা অসম্ভব। যতক্ষণ ভুল থাকে ততক্ষণ প্রত্যক্ষ 'ইহা' সংবিদের সম্মুখে বর্তমান থাকে;

তাহা স্মৃতি নহে, তাহা প্রত্যক্ষ শুক্তি। তাহা সত্ত্বেও কিরূপে রজতের স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়াও সংবিদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে আবির্ভূত হয়—তাহা দুর্বোধ্য।

জ্ঞান সম্বন্ধে প্রভাকরের মত সন্তোষজনক নহে। জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্যের অর্থ—কোনও জ্ঞানের সত্যতা তাহার আবির্ভাব দ্বারাই প্রমাণিত হয়। যে বস্তু সম্মুখে দেখিতেছি, তাহার যে জ্ঞান হয়, তাহার সত্যতার প্রমাণ এই যে যেই জ্ঞান হইতেছে, সেই বস্তু সম্মুখে দেখিতেছি। কিন্তু এই জ্ঞান অব্যবহিত ভাবে উৎপন্ন হইলেও ইন্দ্রিয়দোষ বশতই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক সকল সময় সত্য হয় না। কোনও বস্তুর জ্ঞানের জন্য তাহার সম্মুখে অবস্থিতি ভিন্ন অন্য সহকারী কারণও আছে, যেমন যথেষ্ট আলোকের বর্তমানতা। তাহা ভিন্ন জ্ঞাতার মনোযোগেরও প্রয়োজন। জ্ঞাতার সম্পূর্ণ মনোযোগ জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত না হইলে সত্য জ্ঞান হয় না। জ্ঞান যদি স্বতঃ-প্রমাণ হইত, তাহা হইলে কোনও জ্ঞানকেই মিথ্যা বলা যাইত না।

জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিতেও বাধা আছে। সংবিদের সম্মুখে কিছু অবস্থিত থাকিলেই তাহার জ্ঞান হয়, ইহা সত্য, কিন্তু সে জ্ঞান সকল সময় স্বতই উৎপন্ন হয় না, তাহা উৎপন্ন করিতে কারণান্তরের প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাহার বিষয়বস্তুর ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমান থাকা আবশ্যক। স্মৃতিজ্ঞানে সেই জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কারণের প্রয়োজন। জ্ঞানের যাহা অবরোধক, তাহার অপসরণও আবশ্যক।

সূর্যরশ্মি স্ব-প্রকাশ, তাহা সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করে; কিন্তু তাহার প্রকাশের জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। তাহা উৎপন্ন করিতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি আছে, এবং তাহা স্বতই উৎপন্ন হয় না। যাহার উৎপত্তির কারণ আছে তাহাকে স্ব-প্রকাশ বলা যায় না। প্রভাকর বলিয়াছেন—প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ায় বিষয় বিষয়ী এবং বিষয়ের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন কোনও বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতার যে জ্ঞান হয়, তাহার প্রমাণ নাই। সেই জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, কেননা জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তু কাহার নিকট প্রকাশিত হইবে? কিন্তু জ্ঞাতা তখন প্রকাশিত হন, ইহা বলা যায় না। যিনি জ্ঞাতা, তাহাকে আমরা প্রতি জ্ঞানক্রিয়ায় জানিতেছি, ইহা বলা যায় না। 'বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ?' (বৃহদারণ্যক)—বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?

জ্ঞানের উৎপত্তির পরে পরিচিন্তনের ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। পরিচিন্তনে জ্ঞানের একজন জ্ঞাতা আছে, ইহা মনে হয়, তখন বিষয় ও বিষয়ী উভয়ের চিন্তাই মনে উদিত হয়। জ্ঞাতাকে বর্জন করিয়া জ্ঞাত বস্তুর চিন্তা করা যায় না, ইহা সত্য, কিন্তু কোনও বস্তুকে জ্ঞাত বলিয়া চিন্তা না করিয়াও তাহার চিন্তা করা যায়। পরিচিন্তনে জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুই প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের মতে 'আমি জানি' ইহা না জানিয়া আমরা কিছুই জানিতে পারি না। 'আমি জানি' এবং 'আমি জানি যে আমি জানি', এই দুইটার মধ্যে কোনও ভেদ প্রভাকর স্বীকার করেন না। জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের প্রকাশরূপেই জ্ঞাত হইবে। বিষয়ের প্রকাশরূপে নহে। তাহা হইলে বিজ্ঞান-বাদ (Subjective Idealism) আসিয়া পড়ে। তাহা পরিহারের জন্য প্রভাকর বলেন যে জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইলেও অনুমান দ্বারা লভ্য।

শবর স্বামীর মতে বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান

হয়, জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। প্রভাকরের মতের সহিত এই মতের সংগতি নাই। প্রভাকর জ্ঞানকেই চরম সত্য এবং বিষয়ী ও বিষয়ের অর্থ জ্ঞানের মধ্যে নিহিত বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের বহিঃস্থ কিছু দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ইহার অর্থ জ্ঞানে বাহ্য বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় না, এবং তাহা বাহ্য বস্তু দ্বারা উৎপন্ন হয় না। তাহার মতের যুক্তি-সঙ্গত পরিণতি বিজ্ঞানবাদে।

প্রভাকর জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, তাহার আবির্ভাবে যদি অন্য কিছুর অপেক্ষা না থাকে, বিষয়ের সহিত জ্ঞাতাও যদি জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান একই বস্তুর বিভিন্ন অংশ, এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই জ্ঞান। কিন্তু প্রভাকর তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এই সম্বন্ধ এক অনন্য-সাধারণ সম্বন্ধ। জ্ঞাতা এই জ্ঞানে স্পষ্ট প্রকাশিত হন না, তাঁহাব অনুমান হয়, এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েব সম্বন্ধরূপ জ্ঞানও অনুমানগম্য, প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। বিষয়েরই কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক স্পিনোজা 'আত্মসংবিদে'র আলোচনায় জ্ঞানের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। স্পিনোজার মতে 'সৎ' (Substance)-এর দুই গুণ: ব্যাপ্তি (Extension) ও চিন্তা (Thought)। বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তু ব্যাপ্তির বিকার, এবং অন্তর্জগতে জ্ঞান, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি চিন্তার বিকার। প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর একটি প্রত্যয় (idea) চিন্তার জগতে বর্তমান। মানুষের দেহ একটি যৌগিক বস্তু। চিন্তার জগতে তাহার যে প্রত্যয় বর্তমান—তাহাই মন। মন দেহের বিভিন্ন অবস্থার প্রত্যয়ের সমবায়। যখন কেহ কোনও বস্তু দর্শন করে তখন সেই বস্তুর প্রত্যয় মনের (দেহের প্রত্যয়) অন্তর্ভূত হয়। সেই প্রত্যয়ই সেই বস্তুর জ্ঞান। সেই প্রত্যয়ের সঙ্গে আবার চিন্তার জগতে তাহার (সেই প্রত্যয়ের) একটি প্রত্যয় উদ্ভূত হয়। এই দ্বিতীয় প্রত্যয়টি প্রথম প্রত্যয়ের জ্ঞান (জ্ঞানের জ্ঞান), দ্বিতীয় প্রত্যয়েরও আর একটি প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়, তাহা সেই জ্ঞানের জ্ঞান। এই প্রত্যয়-শ্রেণী অনন্ত পর্যন্ত চলিতে থাকে; এবং উহাদের সমষ্টিই আত্মজ্ঞান। স্পিনোজার এই মতের মধ্যে জ্ঞাতার কোনও কথা নাই। 'আমি জানি' এই জ্ঞান এক সমুৎপাদ। তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত। জ্ঞাতাকে জ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না, যদিও তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

অন্তঃসলিলা

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার অন্তর মাঝে শুনি অহরহ
কে যেন নীরবে কাঁদে, বেদনা দুঃসহ
বহিতে পারে না, শুধু ফেলে আঁখিজল,
বেদনার প্রস্রবণ উত্তপ্ত তরল
বয়ে যায় নিশিদিন। কী যে ব্যথা তার,
কেন ঝরে, অবিরল তপ্ত অশ্রুধার
বুঝিনাক', অসহায় শুনি শুধু কানে
নিরন্তর সে ক্রন্দন। পাই না সন্ধানে

সে-ব্যথার উৎস কোথা! কোন রূপ তার
দেখি না তো কোনখানে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার
সুযোগ মেলেনি আজো। সেই রূপহীন
অশরীরী একমনে বেদনার বীণ—
বাজায় নিভৃতে বসে। সে করুণ সুর
ক'রে তোলে এ অন্তর বেদনা-বিধুর।

প্রশান্ত মহাসাগরের 'স্বর্গরাজ্যে'

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি—প্রত্যাবর্তনের পথে)

ডিসেম্বর মাসের প্রথমে একটা বড় সভায় বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেলাম। হাওয়াই দ্বীপ-পুঞ্জে বহু জাপানী আছেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁদের উদ্যোগে Bodhi Day celebration উপলক্ষ্যে ৭ই ডিসেম্বর প্রত্যূষে Mckinley Auditoriumএ এক বিরাট সভা হ'ল, প্রায় দু'হাজার শ্রোতা, বক্তা দুইজন—জাপানের কন্‌সাল ও আমি। শ্রোতারা শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বুদ্ধের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনেছিলেন এবং উহার সারাংশ কয়েকটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর Hawaii Times-এর একজন সংবাদদাতা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতবর্ষ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'রে ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

পূর্বেই বলেছি যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আছেন। তাঁরা অনেক স্থানে বৌদ্ধ মন্দির স্থাপন ক'রে বুদ্ধের পূজার্চনা ও উপাসনা করেন। এ-সব মন্দিরে প্রতি রবিবার উপাসনা ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ভারতীয় কোন অধ্যাপক ওখানে গেলে তাঁর কাছে ঐসব বিষয় শোনবার ও জানবার জন্য তাঁরা তাঁকে আহ্বান করেন। ইংরেজী ভাষাতে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা শোনবার জন্য তাঁদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখলাম। তার কারণ ওখানকার জাপানী তরুণেরা ও প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা ইংরেজী ভাল জানেন এবং জাপানী ভাষা প্রায় ভুলে গেছেন। আর বুদ্ধের দেশের লোক ব'লে আমার কাছে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের কথা শোনবার জন্য তাঁরা ডিসেম্বর মাস থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাঁদের মন্দিরে বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে আহ্বান করতেন। আমিও সানন্দে সে আহ্বান গ্রহণ করেছি এবং বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছি। এইভাবে হোনোলুলুর প্রায় সব বৌদ্ধ মন্দির দেখা হয় এবং ওদেশের আচার্যদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়।

এখান থেকে হাওয়াই দ্বীপ প্রায় ২০০ মাইল দূরে, সেখানে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা আছে এবং হিলো ও কোনা নামে দুইটি শহর আছে। কোনাতে আগ্নেয়গিরি থেকে ধূম নির্গত হচ্ছে দেখলাম এবং স্থানে স্থানে অতীত অগ্ন্যুৎপাতের ভয়াবহ চিহ্নও দেখা গেল। দুই স্থানেই বৌদ্ধ মন্দির আছে। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে সেখানে Weisak Day (বৈশাখ দিবস) হয়, যাকে আমরা বুদ্ধপূর্ণিমা বলি। এই উৎসব উপলক্ষ্যে হাওয়াই দ্বীপের বৌদ্ধ সমাজ আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং আমি দুইদিনে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা দিই সেগুলির সারাংশ স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়।

এই সব বৌদ্ধমন্দিরে বক্তৃতা দেবার সময় হোনোলুলুর মেয়িশো তরুণ বৌদ্ধসভা (Honolulu Meisho Y. B A) আমাকে তাঁদের এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ জানান। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুআরি মাসের ২১শে এই ভোজসভায় 'বর্তমান যুগে বৌদ্ধধর্ম (Buddhism Today)' সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ভাষণ দিতে হয়। কয়েকদিন পর তাঁদের সভাপতি যুকাতা উনেবাসামি এজন্য ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র পাঠান। তার দুইদিন

পরেই Mckinley Community School for Adults এক ধর্মসভার আয়োজন করেন এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলবার জন্য আমাকে আহ্বান করেন। ঐ সভায় আমি 'বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখা ও সম্প্রদায়' সম্বন্ধে ভাষণ দিই।

হোনোলুলুতে অবস্থানকালে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেও দুইটি বক্তৃতা দিয়েছি এবং সে দুইটি খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের চার্চে। একটি বক্তৃতা Central Union Churchএ Lenten Fellowship Dinner উপলক্ষে এবং অপরটি Church of the Crossroads এর রবিবাসরীয় উপাসনার পরে। শেষের বক্তৃতাটি শ্রোতাদের নিকট বিশেষ তথ্যপূর্ণ হওয়ায় এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ওখানকার শিক্ষিত সমাজে যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে তার নিরসনে সহায়ক হবে বলে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা Honolulu Advertiser-এ ১৭.১.৫৩ তারিখ থেকে আরম্ভ ক'রে ছয়দিনে আমার ছয়টি প্রবন্ধ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়, এবং তাতে ওখানকার জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুধর্ম জানবার ও বুঝবার ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুআরি The Honolulu Advertiserএ এ-সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন এখানে তা উদ্ধৃত করছি :

'The series of articles on Hinduism recently published on this page served the useful purpose of further extending the tolerance that is growing among the world's peoples of various religious faiths. Dr Satis Chandra Chatterjee, Indian philosopher now visiting professor at the University of Hawaii under the auspices of the Watumull Foundation, stated beliefs of the Hindus so plainly that none could misunderstand them. He was wholly objective, arguing neither for nor against the Hindu belief but bringing it within the comprehension of many people who heretofore have had only the vaguest notion of what it is.

This method of approach to the public introduction of a religious faith is worthy of wider employment than is usually given. For it will be only when the peoples in all parts of the world can understand and appraise the value of their neighbours' forms of faiths that any real hope can be held out for world brotherhood'.

—অর্থাৎ 'সম্প্রতি হোনেলুলু এড্‌ভারটাইজারে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধিত হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আজ যে সহিষ্ণুতার ভাব দেখা যায় এ প্রবন্ধগুলি তার প্রসার ও পরিপুষ্টি সাধন করবে। ভারতীয় দার্শনিক ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্তমানে ওয়াটুমুল-সংস্থার আনুকূল্যে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও মতগুলি এমন সরলভাবে বিবৃত করেছেন যে কেউ তা বুঝতে ভুল করবে না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ, যথার্থ বস্তু-বিষয়ক (wholly objective) এবং সর্বসংস্কার-বিমুক্ত। তিনি এ বিষয়ে কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না।

হিন্দুধর্মের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা না ক'রে এমন সরলভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন যে এখানকার বহুলোক, যাদের আজও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ধারণা ছিল, তারা উহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। জনসাধারণ্যে কোন ধর্মের তত্ত্ব অবতারণা করবার এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তা সাধারণতঃ হয় নাই। কারণ পৃথিবীর সকল দেশের লোক যখন তাহাদের

প্রতিবেশীদের ধর্মমতগুলি বুঝতে ও সমাদর করতে পারবে তখনই বিশ্বভ্রাতৃত্বের আশা বলবতী ও ফলবতী হবে।'

এ সব বক্তৃতার পর বিশ্বভ্রাতৃত্ব-সম্মেলনে 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের সাংস্কৃতিক ভিত্তি' সম্বন্ধে এক ভাষণ দিয়েছিলাম, তা সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছিল এবং এখানে Calcutta Review-এ পরে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের আমেরিকা-দেশীয় সংস্থার হাওয়াই শাখার (Hawaii Branch of American Association for U N) আহ্বান পেয়ে তাদের একটি বড় সভায় 'ভারতে রাষ্ট্রীয় আদর্শ' সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার পর আমাকে অনেক প্রশ্ন ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং আমি তাদের যথাসাধ্য সদুত্তর দিয়েছিলাম।

ডিসেম্বর মাসে খ্রীষ্টমাস পর্বে হোনোলুলুতে খুব আনন্দ উৎসব হয়। বাড়ীতে বাড়ীতে আলোকসজ্জা এবং রাস্তার পাশেও আলোকমালা দেখা যায়। গীর্জায় উপাসনার বিশেষ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নাচ-গান-ভোজন ও প্রমোদ-ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকে। এ-সব নিয়ে দশ বার দিন শহরের কর্মতৎপরতা বেড়ে যায় এবং আনন্দোচ্ছ্বাসে লোকের হৃদয় উদ্বেলিত হয়। দিকে দিকে 'গুড মর্নিং' ও 'মেরি খ্রীস্টমাস' স্থলে হাওয়াই-য়ানদের মাতৃভাষায় 'আলোহা' ও 'মেলে কালি কি মাকি' ইত্যাদি শব্দ শুনা যায়। তারপর নববর্ষের উৎসব ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত তা চরমে উঠে এবং শেষ রাত্রি পর্যন্ত চলে। এই রাত্রিতে হোনোলুলু শহরে যে আলোকসজ্জা ও বিচিত্র আতসবাজি খেলার অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখেছি তা আমার এখনও বেশ মনে আছে।

এখন হোনোলুলু শহরে বেদান্তের আলোচনা ও প্রসার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলছি। আমি ওখানে পৌঁছবার অল্পদিন পরে ই. আর মরোজি (E R. Marozzi) নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আলাপ-পরিচয়ে জানলাম, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস মরোজি আমেরিকার নাগরিক, কিন্তু তাঁরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং আমেরিকার সিয়াটেল বেদান্ত কেন্দ্রের স্বামী বিবিদিষানন্দের দীক্ষিত শিষ্য ও শিষ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁদের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। এঁদের উদ্যোগে ওখানে একটি বেদান্ত সমিতি (Vedanta Society) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি ওয়াই, ডব্লু, এ, সি, (Y W A C) বাটীতে তার সাপ্তাহিক অধিবেশন হয় এবং বেদান্ত, যোগ প্রভৃতি দর্শনের আলোচনা হয়। এর সভ্য সংখ্যা খুব বেশী নয়, তখন ১৫।২০ জন ছিল এবং মহিলা সদস্যাই বেশী। মিঃ মরোজি বেদান্ত সমিতিতে বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে অনেকবার আহ্বান করেছিলেন। এখানে আমি চারটি বক্তৃতা দিয়েছি। প্রথমটি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'পূত জীবন' (The Holy Life) সম্বন্ধে প্রদত্ত হয় এবং পরে উহা লণ্ডনস্থ রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের মুখপত্র 'Vedanta for East and West' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী', তৃতীয়টির বিষয়বস্তু 'বৈদান্তিক জীবন-পথ (Vedanta as a way of life)। বেদান্ত-সমিতিতে শেষ বক্তৃতাটি হোনোলুলুতে আমার অবস্থানের শেষ দিবসে প্রদত্ত হয় এবং উহার বিষয়বস্তু ছিল 'বেদান্ত ও ভারতীয় সংস্কৃতি'। এ বক্তৃতাগুলি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তার পর দিন (১৯৫৩ খৃঃ ১লা জুন) আমি বিমানযোগে হোনোলুলু ত্যাগ করলাম। বিমান-

ঘাঁটিতে যে সব বন্ধু আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মূর সাহেব, মরোজ্জি-যুগল এবং এক জাপানী মহিলা (যাঁর সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্ম-সূত্রে পরিচয় হয়েছিল) ও তাঁর স্বামীর কথা এখনও মনে পড়ে। আর মনে পড়ে বেথুন ও ফিলিপ্‌স্ পরিবারের কথা, যাঁদের বাড়ীতে বহুবার ভারতীয় খাদ্যসামগ্রী ভোজনের আনন্দ পেয়েছিলাম।

পরদিবস দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এনজেল্‌স্ শহরে পৌঁছে সেখানকার বেদান্ত কেন্দ্রে গিয়ে উঠলাম। ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ যত্ন ক'রে আমার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সেখানে ঠাকুরের পূজা ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দেখে ও শুনে দ্রষ্টব্য কয়েকটি স্থানও দর্শন করলাম: তার মধ্যে হলিউড ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি বড় মনোরম স্থান, অপরটি এক বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যক্ষ আমার কার্ড পেয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আপনাকে আমরা আগে থেকেই জানি।' একটু বিস্মিত হলাম। আমার ভাব দেখে তিনি আবার বললেন 'আপনি তো ডক্টর দত্তের সঙ্গে An Introduction to Indian Philosophy বই লিখেছেন, বইটি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা খুব পড়ে।' একথা শুনে খুব আনন্দ হ'ল।

দু'দিন পরে বিমানপথে এলাম সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো শহরে, এবং স্বামী অশোকানন্দ মহারাজের বেদান্ত কেন্দ্রে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমার ভূতপূর্ব কৃতী ছাত্র ডাঃ হরিদাস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা হ'ল। তিনি American Academy of Asian Studies-এ ভারতীয় দর্শন অধ্যাপনা করেন। তাঁর অনুরোধে ঐ একাডেমিতে 'ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতে দর্শনচর্চার প্রগতি' বিষয়ে এক ভাষণ দিয়েছিলাম।

হোনোলুলুতে থাকাকালে একটি বিস্ময়কর বস্তু দেখেছিলাম, সেটি হ'ল 'চলন্ত সিঁড়ি' (escalator) একদিন মিঃ ও মিসেস্ মরোজ্জির সঙ্গে ডাউনটাউনে (নগরীর ব্যবসায় কেন্দ্রকে এঁরা Downtown বলেন) এক বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (store) দেখতে গেলাম, নীচের তলা থেকে উপরের তলায় যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে আমাকে কষ্ট ক'রে চলতে হ'ল না, তড়িৎ-চালিত একটা সিঁড়ির সামনের ধাপে দাঁড়ালাম, ধাপটি নিজেই চলতে লাগল এবং আমাকে দোতলায় পৌঁছে দিল। সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে এসে অধিকতর বিস্ময়কর আর একটি বস্তু দেখলাম, সেটি হ'ল 'চলন্ত ব্রহ্মাণ্ড', দেখে মনে হ'ল যেন অর্জুনের মত আমিও ভগবানের বিশ্বরূপ দেখছি। এ নাম হ'ল প্ল্যানেটেরিয়াম (planetarium)। এ বস্তুটি পৃথিবীর মাত্র চার জায়গায় আছে— আমেরিকার তিনটি* স্টেটে আর জার্মানিতে। বৈকালবেলা এক বিরাট অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করলাম, দর্শকরা প্রবেশ করবার পর দরজা জানালা সব বন্ধ ক'রে দিল, তারপর মাথার উপরে দেখলাম সন্ধ্যার আকাশে চন্দ্র, গ্রহ মণ্ডল, নক্ষত্ররাজি নিজ নিজ গতিপথে চলেছে। মঙ্গলগ্রহ দেখাবার সময় প্রদর্শকরা ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৫৬ খৃঃ আমেরিকানরা মঙ্গলগ্রহে অভিযান করবেন। তা কিন্তু এখনও হয়নি। সারারাত্রে আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রদের যে আবির্ভাব ও গমনাগমন ঘটে একঘণ্টায় সব দেখলাম, শেষে 'ভোরবেলা' তাদের তিরোভাব হ'ল, এবং পূর্বাকাশে 'অরুণোদয়' দেখলাম। এই প্ল্যানেটেরিয়াম যন্ত্রটি প্রস্তুত করতে নাকি কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

* আমেরিকাতেই এখন পাঁচ জায়গায় ৫টি প্ল্যানেটেরিয়াম: শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া, লস্‌এঞ্জেলস্, নিউইয়র্ক, পিট্‌স্‌বার্গ। উঃ সঃ

এখানে ছুইটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছি, ষ্টান্‌ফোর্ড ও বার্কেলো। প্রথমটি এক বিশাল বিদ্যায়তন, গ্রন্থাগারের বাড়ীটিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-ভবনের সমান হবে। ১৯৫৩ খৃঃ তার পুস্তক সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ গোহিন্‌ আমাকে দর্শনের একখানি নব প্রকাশিত পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে স্বামী বিবেকানন্দ যে বাগানে বেড়াতেন সেটি এবং অন্যান্য অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখেছিলাম। ওখানে ছুইটি বেদান্ত-কেন্দ্র আছে, একটি স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে, অন্যটি বার্কলিতে। বেদান্ত-প্রচারের কাজ ভালরূপেই চলছে। প্রথম কেন্দ্রটিতে কয়েকজন আমেরিকান ভদ্রলোক আশ্রমিক জীবন যাপন করেন। এখানে ঠাকুরের নিত্য পূজা হয়, পূজান্তে আমেরিকান আশ্রমিক ও অনাশ্রমিক ভক্তেরা ঠাকুরের আরতির সময় 'খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগবন্দন, বন্দি তোমায়' ইত্যাদি স্তবটি যে ভাবে গান করলেন তা শুনে আমার মন আনন্দে ও বিস্ময়ে আবিষ্ট হ'ল মনে মনে ঠাকুরকে প্রণতি জানিয়ে বললাম, একি মহিমা তোমার!

ছুই তিন দিন পরে ওখান থেকে ওয়াশিংটন ডি. সি.তে এসে পড়লাম। সেখানে তখন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ছিলেন। টেলিফোন-যোগে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। এখানে ক্যাপিটোল্‌ প্রভৃতি কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাসায় আহার ও বিশ্রাম ক'রে সন্ধ্যার দিকে নিউইয়র্ক যাত্রা করলাম। এখানে স্বামী নিখিলানন্দ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের নিকটে একটি হোটেলে আমার থাকবার এবং তাঁর ওখানে খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। নিউইয়র্কে স্বামী পবিত্রানন্দের তত্ত্বাবধানে আর একটি বেদান্ত-কেন্দ্র আছে। নিউইয়র্ক শহরে এসে মনে হ'ল যেন প্রকৃতির লীলাভূমি থেকে মানুষের ক্রীড়াভূমিতে পৌঁছলাম। এখানে আসবার আগে যে সব শহর দেখেছিলাম তাদের পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতির অপরিমেয় ও অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখন মানুষের বুদ্ধি ও শক্তিতে গঠিত গগনস্পর্শী প্রাসাদনিচয় এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য দেখে হতবাক্‌ হয়ে গেলাম। অধিকাংশ অট্টালিকা এত উচ্চ যে, তাদের চূড়া দেখতে হলে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। এই শহরে আমেরিকার অতুল ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যদেশীয় সব বেদান্ত-কেন্দ্রেই প্রতি রবিবার সকালে উপাসনা ও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়। ১৯৫৩ খৃঃ ৭ই জুন রবিবার স্বামী নিখিলানন্দের কেন্দ্রেও প্রাতঃকালীন ধর্মসভার আয়োজন হয়েছিল। সভার ঠিক আগে স্বামীজী আমাকে সভায় যোগদান করতে এবং তাঁহার বক্তৃতার পর কিছু বলতে আদেশ করলেন। যাহোক তাঁর আদেশ পালন করবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে কিছু বলতে উঠলাম। আমেরিকা মহাদেশ ও আমেরিকাবাসীদের প্রতি আমার সবিস্ময় শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় 'বর্তমান ধর্মগুলির ভবিষ্যৎ এবং বিশ্বের ভবিষ্যৎ ধর্ম' প্রসঙ্গে এই বিষয়টি প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করেছিলাম:

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পারলে কোন ধর্ম টিকবে না। বর্তমান ধর্মগুলির মধ্যে অনেক বিশ্বাস ও প্রত্যয় আছে যা আধুনিক বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানদ্বারা বাধিত ও নিরাকৃত হয়েছে বা হবে। আধুনিক বিজ্ঞান জড়দ্রব্য বা অবিভাজ্য অণুকে পরম সত্য বা চরম সত্তা বলে স্বীকার করে না,—সেইরূপ কোন অমিতপরাক্রম পুরুষবিশেষকেও বিশ্বস্রষ্টা বলে

মানতে চায় না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বসংসার এক সর্বব্যাপী, অসীম, অনন্ত জড়-শক্তির খেলা। এ কথা যেন অদ্বৈত বেদান্তের অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির অসম্পূর্ণ বর্ণনা। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বশক্তির স্বরূপ এখনও নির্ণয় করতে পারেনি। ভবিষ্যৎকালে যদি বিজ্ঞান এই শক্তিকে চিৎশক্তি ব'লে বুঝতে পারে, তবে সে অদ্বৈত বেদান্ত-মতকেই সমর্থন করবে। বিজ্ঞান যে সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, তার কিছু কিছু লক্ষণ এখন দেখা যায়। এজন্য মনে হয় বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎ ধর্ম 'বেদান্ত'।

নিউইয়র্ক থেকে বিমানযোগে যাত্রা ক'রে ১০ই জুন লণ্ডনে পৌঁছে স্বামী ঘনানন্দ-পরিচালিত বেদান্ত-কেন্দ্রে আশ্রয় পেলাম। তখন লণ্ডনে বৃষ্টি হচ্ছিল, ভীষণ শীত, শীতে আমার কষ্ট হতে লাগল, তার উপর আমাশয়ে পীড়িত হয়ে পড়লাম, কাজেই কোথাও যেতে বা বিশেষ কিছু দেখতে পারলাম না। তবে বেশ মনে হয় নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে এসে মনে হ'ল যেন কলিকাতা শহর ছেড়ে বাংলার কোন পল্লীগ্রামে এলাম। নিউইয়র্কের তুলনায় লণ্ডনের পূর্বশ্রুত গৌরব-গরিমা যেন ম্লান মনে হ'ল। লণ্ডনে দুচারদিন থেকে ইংলণ্ডের কয়েকটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার এবং তত্রস্থ বাঙ্গালী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শরীর অসুস্থ হওয়ায় তা পূর্ণ হ'ল না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র তখন নিউকাসেল্-অন্-টাইনে ছিল, একদিন আমার সঙ্গে বেদান্ত-কেন্দ্রে এসে দেখা করে। আর আমার একটি ছাত্রও এসে দেখা করে। একদিন লণ্ডন থেকে 'ট্রাঙ্ক কল'-যোগে অক্স্ফোর্ডে মিঃ এচ এন. স্পল্ডিং সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি আমাদের 'An Introduction to Indian Philosophy' পুস্তক পড়ে পূর্বে এক পত্র দিয়েছিলেন। অসুস্থতার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হ'ল না, এবং ফ্রান্স ও ইতালি যাওয়ার পরিকল্পনাও ত্যাগ ক'রে লণ্ডন থেকে বিমানযোগে সোজা ভারত অভিমুখে যাত্রা করলাম। পথে জুরিখ শহর দেখলাম—অতি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পরিবেষ্টিত নগরী। তার পরদিন লেবাননের বেরুট শহরে রাত্রে এক হোটেলে থেকে পরদিন সন্ধ্যায় করাচী পৌঁছলাম। তার পরদিন ১৯৫৩ খৃঃ ১৫ই জুন প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছে মনে হ'ল মায়ের ছেলে যেন মায়ের কোলে ফিরে এল।

মাতৃবন্দনা

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

　　প্রেম-ঢলঢল শান্তি পরিমল করুণা-ছলছল, অয়ি মা।
তুমি　দুর্গা দশভুজে ত্রিলোক তোমা পূজে, তব চরণাম্বুজে নমি মা।
তুমি　বাণী বীণাপাণি বিদ্যাদায়িনী, ব্রহ্মবাদিনী বরদে,
তুমি　লক্ষ্মী সীতা সতী পরমা প্রকৃতি, অগতির গতি সারদে।
তুমি　ত্রিতাপনাশিনী ত্রিগুণধারিণী মুক্তিদায়িনী কালিকে,
　　তুমি বেদগীতা ত্রিদেব-পূজিতা চিরবন্দিতা ত্রিলোকে।
নিজ　শকতি সম্বরি, স্বরূপ আবরি' এলে শঙ্করী শুভদে,
তুমি　সর্বলোকমাতা স্নেহবিমণ্ডিতা দুঃখখণ্ডিতা সুখদে।
কত　পাপীর অনলে নিজেরে দহিলে, কৃপায় তারিলে কত জনে,
কত　অসাধ্য সাধনা সাধিলে তুমি মা, সিদ্ধি করুণা ছুটি চরণে।
তুমি　আদর্শ অভিনব, সহজ পথ তব, অসীম কৃপা তব জানকী!
মাগো,　ভীষণ ভব-দরী, বড় যে ভয়ে মরি, কৃপায় পার করি লবে কি?
　　দাও মা সারদে অভয়ে বরদে, ব্যাকুল মম হৃদে ভক্তি,
যেন　তোমারি চরণে জীবনে মরণে রহে সদা অনুরক্তি।

'গীতা জ্ঞানেশ্বরী'

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[ভাদ্রসংখ্যার পর]

এই অধঃশাখা প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের অনেক শাখাপল্লব সোজা উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গিয়াছে, নীচের দিকে যে ডালগুলি নামিয়া আসিয়াছে তাহা হইতেও শিকড বাহির হইয়াছে এবং ঐ শিকড হইতেও অনেক লতাপল্লব নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে, আমি যাহা আরম্ভেই বলিযাছি তাহাই অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, শুন, অজ্ঞানই এই বৃক্ষের দৃঢ় মূল, যাহা হইতে মহদাদি 'শাসন' (অষ্টধা প্রকৃতি) এবং বেদরূপ ঘোর অরণ্য উৎপন্ন হয়, পরন্তু প্রথমে এই বৃক্ষের শিকড় হইতে স্বেদজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও অণ্ডজ এই চারিটি প্রবল শাখা বাহির হয়, এই এক একটি শাখা হইতে চুরাশি লক্ষ যোনিরূপ শাখা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে জীবরূপী অসংখ্য শাখা বাহির হয়, এই সরল শাখা হইতে আশেপাশে যে সব অসংখ্য নানা ডালপালা বহির্গত হয় তাহারাই ভিন্ন ভিন্ন জাতিব সৃষ্টি করে। (১৫০)

এই জীবগুলি নানাপ্রকাব বিকাববশতঃ নিজেদের মধ্যে মিলনের ফলে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক এই ব্যক্তিভেদের সৃষ্টি করে। বর্ষাকালে আকাশ যেমন নব ঘন মেঘে ছাইয়া যায়, তেমনি অজ্ঞান হইতে নানাপ্রকার আকার উৎপন্ন হয়, এই সংসার-বৃক্ষের শাখাগুলি বাড়িয়া নিজেদের ভারে নীচেব দিকে ঝুঁকিয়া পডিয়া পরস্পরের সহিত জড়াইয়া যায় এবং ইহাতে গুণগুলি ক্ষুব্ধ হয় ও গুণক্ষোভেব হাওয়া চারিদিকে বহিতে থাকে, এই গুণাবলীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে এই উর্দ্ধমূল বৃক্ষটি তিনভাগে বিভক্ত হয়, এইভাবে রজোগুণের হাওয়া উঠিলে ও বহিতে থাকিলে মানবজাতিরূপ শাখা বলবতী হইয়া বাড়িতে থাকে, এই শাখার উর্দ্ধদিকে কি অধোভাগে কোনও শাখা বাহির হয় না, পরন্তু মধ্যভাগে প্রচুর পরিমাণে চাতুর্বর্ণ্যের শাখা-প্রশাখা বাহির হয়, ইহা হইতে প্রতিক্ষণে বিধিনিষেধের পল্লব সহ বেদবাক্যের অভিনব সুন্দর—নব নব শাখাপল্লব বাহির হয়, অর্থ ও কামের বিস্তাব হয় এবং উহাতে নব নব পল্লব বাহির হয়, তাহাদেব পরিণতি হইলে সেখান হইতে 'পদান্তরে' (বিভিন্নদিকে) ইহলোকের ক্ষণিক সুখভোগের মঞ্জরী নির্গত হয়, প্রবৃত্তিমার্গের বৃদ্ধি হয়, এইজন্য শুভাশুভ নানা কর্মের যে কত শাখা বাহির হয় তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহার মধ্যে ভোগক্ষীণ পূর্বের দেহগুলি শুষ্ক ডালের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে এবং উহাদের স্থানে অনেক নূতন দেহের পল্লব উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে, (১৬০)

আর শব্দাদি সুখকর স্বাভাবিক রঙ্গে চিত্তাকর্ষক নূতন বিষয়-পল্লবগুলি নিত্য উৎপন্ন হয়, এইভাবে রজোগুণের বায়ুর প্রচণ্ড প্রবাহে সমস্ত মানবশাখার অত্যধিক প্রসার হয় এবং ইহাতে মনুষ্যলোকের প্রতিষ্ঠা হয়। রজোগুণের বায়ুব প্রবাহ একটু স্তব্ধ হইলে তমোগুণের ঘোর প্রভঞ্জন বহিতে থাকে, এই সময় মানবশাখার নীচের দিকে নীচবাসনা উৎপন্ন হইয়া কুকর্মেব শাখাগুলি বাড়িয়া উঠে, অপ্রবৃত্তির (নীচমার্গের) ঋজু ও সতেজ শাখা নির্গত হয় এবং

তাহাতে প্রমাদের পত্র, পল্লব ও ডাল উৎপন্ন হয়, নিয়ম ও নিষেধের বিধানকারী ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ এই শাখার উপরিভাগে দোদুল্যমান পল্লবের ন্যায় অবস্থিত, অথর্ববেদ—যাহা অভিচার (জারণ-মারণ) রূপ পরপীড়ক শাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছে—তাহার তিনটি পল্লব বাহির হয়, তাহা হইতে বাসনার লতাগুচ্ছ প্রসারিত হয়, যেমন যেমন বাসনার ক্রিয়া চলিতে থাকে তেমন কর্মের মূল বাড়িতে থাকে এবং জন্মের শাখা বাড়িয়া সম্মুখের দিকে ধাবিত হয়; নীচকর্মা জাতির একটি বৃহৎ শাখাও বাহির হয়, যাহা হইতে ভ্রমে পতিত ও কর্মভ্রষ্ট লোকের উৎপত্তি হয়; পশু, পক্ষী, শূকর, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প আদি অসংখ্য জীবের শাখাগুলিও এইসঙ্গে আড়াআড়িভাবে বাহির হইয়া বিস্তৃত হয়। (১৭০)

হে পাণ্ডব, এইভাবে এই বৃক্ষের সর্বাঙ্গে নিত্য নব নব শাখা উৎপন্ন হয়, যাহার ফলে নরকভোগ হয়, হিংসাদি বিষয় সম্মুখে করিয়া কুকর্ম সহযোগে এই সব অঙ্কুরগুলি জন্ম হইতে জন্মান্তর পর্যন্ত বাড়িয়া চলে, এইভাবে বৃক্ষ, তৃণ, লৌহ, মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতির শাখাও বাহির হয় এবং তাহা হইতেও ফল উৎপন্ন হয়, হে অর্জুন, এইভাবে মানবশাখা হইতে স্থাবরবর্গ পর্যন্ত অনেক শাখা-প্রশাখা নিম্নাভিমুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই মনুষ্যরূপী শাখার মূল অধোভাগে হওয়ায় তাহা হইতে সংসারতরু বাড়িতে থাকে, নতুবা হে পার্থ, যদি ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত প্রাথমিক মূলের বিষয় চিন্তা করা যায় তবে ঊর্ধ্ব হইতে অধোভাবে মধ্যস্থ শাখাগুলিকে এই (মানব) শাখা বলিয়া ধরিতে হইবে, পরন্তু সুকৃতদুষ্কৃতাত্মক সত্ত্ব ও তমোগুণের শাখাগুলি এই বৃক্ষের ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে বিস্তৃত, আর হে অর্জুন, বেদত্রয়ের যে পত্রগুচ্ছ যাহা অন্যত্র সংলগ্ন নহে, তাহারা মনুষ্য ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিধান দিতে পারে না, মানবতনুর শাখা যদিও ঊর্ধ্বমূল হইতে বাহির হইয়াছে, এই শাখাই কর্মবৃদ্ধির মূল কারণ, অন্য বৃক্ষের শাখা বাড়িলে মূল দৃঢ় হয়, এবং মূল পুষ্ট হইলে শাখার বিস্তার বাড়ে। (১৮০)

শরীর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়, যতক্ষণ কর্ম থাকে ততক্ষণ দেহের পরম্পরাও বজায় থাকে, আর দেহের অস্তিত্ব যতদিন থাকে ততদিন কর্মের ব্যাপার চলে না—এ কথা বলা যায় না, এই জন্যই জগজ্জনক শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এই মানবশরীরই এই সংসারের বিস্তারের মূল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই, যখন তমোগুণের প্রচণ্ড প্রবাহ স্থির হয় তখন সত্ত্বগুণের ঝড় জোরে বহিতে থাকে, তখন মনুষ্যাকার মূল হইতে সু-বাসনা (সদ্-বাসনা)-রূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং সৎকর্মের শাখা পল্লব প্রচুর পরিমাণে উদ্ভূত হয়, জ্ঞানের উদয় হইলে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাকুশলতার শাখাগুলি নিমেষের মধ্যেই বেগে নির্গত হয়, বুদ্ধির সবল ও দৃঢ় শাখা বিস্তার লাভ করে এবং উহাতে স্ফূর্তির শাখা-পল্লব উৎপন্ন হয়, আর বুদ্ধি—বিবেকের আশ্রয় লইয়া সম্মুখে বাড়িতে থাকে, মেধার রসে ভরা সুশোভিত আস্থাপত্র (নিষ্ঠাভক্তির পল্লব-রাজি) হইতে সদ্বৃত্তির সরল অঙ্কুর নির্গত হয়, সদাচারের বহু অঙ্কুর সহসা বাহির হয় এবং তাহা হইতে বেদমন্ত্রের নির্ঘোষ উত্থিত হয়, শিষ্টাচার, বেদোক্ত বিধি ও নানা যাগযজ্ঞাদি কর্মের অসংখ্য পত্রের মধ্য হইতে অনেক নূতন পত্র বাহির হইতে থাকে, তপস্যার শাখা হইতে শম দম ও সংযমের গুচ্ছ বাহির হয় এবং তাহা হইতে বৈরাগ্যের কোমল শাখা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, (১৯০)

বিশিষ্ট ব্রতের পল্লব ও ধৈর্যের তীক্ষ্ণ ফলাবিশিষ্ট অঙ্কুরগুলি উৎপন্ন হইয়া উর্ধ্বদিকে উঠিয়া যায়, মধ্যস্থলে বেদরূপী পত্রপল্লব-গুচ্ছ থাকে, সত্ত্বগুণের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকিলে তাহা হইতে পরাবিদ্যার প্রসার হয়, ধর্মের ডাল বিস্তারলাভ করে; জীব-জন্মের সরল শাখাসকল বাহির হইলে তাহা হইতে স্বর্গাদির ফলরূপী শাখাগুলি আড়াআড়িভাবে ফুটিয়া উঠে, উপরতি (বৈরাগ্য)-রূপ কিশলয় বাহির হইলে তাহা হইতে ধর্ম ও মোক্ষের শাখাপল্লব উৎপন্ন হয় এবং এইভাবে নিত্য বাড়িতে থাকে, সূর্যচন্দ্রাদি গ্রহ, পিতৃলোক, ঋষিকুল ও বিদ্যাধরাদির উপশাখাগুলি নির্গত হইয়া প্রসার লাভ করে, ইহাদের উর্ধ্বে ইন্দ্রলোকাদি ফলভারে অবনত পল্লবাচ্ছাদিত এক বৃহৎ শাখা থাকে, ইহারও উপরে মরীচি, কশ্যপ প্রভৃতি ঋষিগণ তপোজ্ঞান-প্রভাবে নিজ নিজ শাখা উর্ধ্বে বিস্তার করিয়া আছেন, এইভাবে অনেক শাখা উত্তরোত্তর উর্ধ্বদিকে প্রসারিত হয় এবং বৃক্ষটি মূলের কাছে ছোট দেখাইলেও উপরিভাগে ফলে আচ্ছাদিত হইয়া একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়, হে কিরীটী, উর্ধ্বাভিমুখী শাখায় যে ফল ভরিয়া যায় তাহার অগ্রভাগ হইতে ব্রহ্মা-শঙ্করাদি দেবতার অঙ্কুরোদ্গম হয়। উর্ধ্বের শাখাগুলি প্রচুর ফলভারে অবনত হইয়া যায় এবং বাঁকিয়া মূলের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। (২০০)

সাধারণ বৃক্ষেও এইপ্রকার হয়, ফলের ভারে শাখাগুলি বাঁকিয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে, ঠিক এইভাবে হে পাণ্ডব, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে এই সংসারতরুর বিস্তার তাহার মূলে আসিয়া আশ্রয় লয়, এইজন্য ব্রহ্মলোক ও শিবলোকের উর্ধ্বে জীবের আর কোন বৃদ্ধি বা উন্নতি নাই, তাহার উপরেই ব্রহ্মত্ব, এ কথা থাকুক, পরন্তু ব্রহ্মাদি দেবতাও আপনার সামর্থ্যে ঐ উর্ধ্বমূলের সমতা লাভ করিতে পারেন না। ইহাদের উপরে সনকাদি নামে বিখ্যাত একটি অপর (নিবৃত্তিমার্গের) শাখা আছে, যাহা ফলমূল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া ব্রহ্মে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এই প্রকারে মনুষ্যরূপ শাখা হইতে উর্ধ্বে ব্রহ্মাদি পর্যন্ত শাখাপল্লবগুলি উর্ধ্বদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, হে পার্থ, উপরের ব্রহ্মাদিরূপ শাখা মনুষ্যশাখা হইতেই উৎপন্ন হয়, এইজন্যই এই নিম্নের মনুষ্যশাখাকেই 'মূল' বলা হয়, এইভাবে তোমাকে এই অধোর্ধ্বশাখা অলৌকিক, উর্ধ্বমূল ভববৃক্ষের কথা বলিলাম, সঙ্গে সঙ্গে এই বৃক্ষের যে মূল উর্ধ্বদিকে এবং নীচের দিকে গিয়াছে সবিস্তারে তাহারও বর্ণনা করিলাম। এখন এই সংসার-বৃক্ষকে কি করিয়া সমূলে উৎপাটন করা যায় তাহাই শ্রবণ কর:

> ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
> অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

হে কিরীটী, তোমার মনে এই ভাবনা হইতে পারে যে এমন কোন সাধন কি নাই যাহার দ্বারা এই বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ফেলা যায়? (২১০)

ইহার উর্ধ্বমুখী শাখাগুলি বাড়িয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং ইহার মূল নিরাকার ব্রহ্মেই অবস্থিত, ইহার নিম্নাভিমুখী শাখাগুলি অন্তভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার মধ্যভাগে মানবরূপী একটি স্বতন্ত্র মূল অবস্থিত, এমন দৃঢ় ও বিশাল বৃক্ষকে কে বিনাশ করিতে পারে?—এই প্রকার দুর্বল ভাবনা তোমার মনে আসা উচিত নহে, এই বৃক্ষ (যতই বৃহৎ বা দৃঢ় হউক না কেন) ইহাকে উৎপাটন করা কি বিশেষ শ্রমসাধ্য? শিশুদের ভয় দূর করিবার জন্য কি 'বাগুল' (জুজু)কে

অন্যদেশে তাড়াইতে হয়? কল্পিত গন্ধর্বদুর্গ (আকাশে সঞ্চিত মেঘপুঞ্জ) ধ্বংস করিতে কিংবা খরগোসের শিং ভাঙিতে কিংবা আকাশকুসুম চয়ন করিতে কি বিশেষ চিন্তা করিতে হয়? ঠিক এইপ্রকার হে বীর অর্জুন, এই সংসাররূপী বৃক্ষ অবাস্তব ও অসত্য, তাহাকে উৎপাটন করিতে কোনও ভয় হইবে কেন? আমি ইহার মূল ও শাখার যে বর্ণনা করিয়াছি তাহা বন্ধ্যার ঘরে অনেক পুত্র আছে—এইপ্রকার বর্ণনারই সমান, স্বপ্নে দেখা ঘটনাবলী (স্বপ্নের কথাগুলি) কি জাগিলে কোনও কাজ দেয়? তেমনি এই বৃক্ষের কাহিনীকেও তুমি অলীক ও ব্যর্থ বলিয়া জানিও, তাহা না হইলে এই বৃক্ষটি সত্যই যদি আমি যেমন বর্ণনা করিয়াছি তেমনি অচলমূল ও দৃঢ় হয়, তবে কোন্ মায়ের সন্তান তাহাকে উৎপাটন করিতে সক্ষম হইবে? ফুঁ দিয়া কি আকাশ উড়াইয়া দেওয়া যায়? (২২০)

হে ধনঞ্জয়, কচ্ছপের ঘৃতে রাজাকে তুষ্ট করা যেমন, আমি যে সংসাররূপী বৃক্ষের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম তাহাও তেমনি মায়া বা ভ্রান্তিপূর্ণ, মৃগজলের সরোবর দূর হইতেই দেখিবার যোগ্য, কিন্তু উহার জলে কি ধানের চারা রোপণ করা যায়, কিংবা কদলীবৃক্ষ রোপণ করা সম্ভব? মূলতঃ অজ্ঞান যদি মিথ্যাই হয়, তবে অজ্ঞানপ্রসূত কার্যের কি মূল্য? এইজন্য এই সংসার-বৃক্ষের সমস্তই মিথ্যা, আর যাহারা বলে এই বৃক্ষের অন্ত নাই, একদিক দিয়া বিচার করিলে তাহারা ঠিকই বলে, নিদ্রা হইতে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কি নিদ্রার অন্ত হয়? রাত্রিশেষ না হইলে কি উষার আগমন হয়? তেমনি হে পার্থ, যতক্ষণ না জ্ঞানের উদয় হয় ততক্ষণ এই ভবরূপী অশ্বত্থের অন্ত হয় না, প্রবহমাণ বায়ু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাজি অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, এইজন্য যখন সূর্য অস্ত যায় তখন মৃগজলও অদৃশ্য হয়, দীপ নির্বাণ করিলে তাহার প্রভাও নষ্ট হয়, ঠিক ঐ প্রকার যখন মায়া বা অবিদ্যার বিনাশকারী জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখনই এই সংসাররূপী বৃক্ষের অন্ত হয়, তাহা না হইলে কখনও হয় না, এই সংসারকে যে অনাদি বলা হয়, ইহাও মিথ্যা নহে—উপরোক্ত বিচার অনুসারে ইহা ঠিকই। (২৩০)

এই সংসার-বৃক্ষটি যখন অবাস্তব ও অসত্য এবং তাহার আদি নাই, তখন ইহার আরম্ভ কেমন করিয়াই বা হইবে, এবং কে আরম্ভ করিবে? যাহার সত্যই উৎপত্তি আছে তাহার সম্বন্ধেই বলা যায় যে ইহার আদি আছে, পরন্তু যাহার অস্তিত্বই নাই তাহার মূল বা আদি কোথা হইতে আসিবে? যাহার জন্মই হয় না তাহার মাতা কে, কি করিয়া বলা যায়? এই বৃক্ষের কোন অস্তিত্বই নাই সেই জন্যই ইহাকে 'অনাদি' বলা যায়, বন্ধ্যার পুত্রের জন্মপত্রিকা কোথা হইতে আসিবে? আর আকাশের রং নীল—এই কল্পনাই বা কি প্রকারে করা যায়? হে পাণ্ডব, আকাশকুসুমের ডাঁটা কে ভাঙিবে? যে সংসারের বাস্তবিক কোন অস্তিত্বই নাই তাহার আদি কোথা হইতে আসিবে? মাটির ঘট তৈয়ারী না করিলে যেমন তাহার অস্তিত্বের আরম্ভই হয় না, তেমনি সমূল এই সংসার বৃক্ষটিকে অনাদি বলিয়া জানিবে; হে অর্জুন, তুমি বুঝিয়া রাখ ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, মধ্যস্থলে যে স্থিতির আভাস পাওয়া যায় তাহাও ব্যর্থ বা মিথ্যা; (গোদাবরী নদী যেমন ব্রহ্মগিরি পর্বত হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে) মরীচিকাজল ব্রহ্মগিরি হইতে বাহির হয় না এবং সমুদ্রেও গিয়া পড়ে না, মধ্যস্থলে ইহার ব্যর্থ আভাস দৃষ্ট হয়, তেমনি এই সংসারের কোন আদিও

নাই, অন্তও নাই, ইহার বাস্তব কোন অস্তিত্বই নাই, পরন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ইহার মিথ্যা অস্তিত্ব ভাসমান হয়, ইন্দ্রধনু যেমন নানা রঙে রঙীন দেখায় তেমনি এই সংসার অজ্ঞানের নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত দেখায়। (২৪০)

চতুর নট যেমন ভিন্ন ভিন্ন বেশে সজ্জিত হইয়া দর্শকদের মনোহরণ করে তেমনি এই সংসার আপনার মধ্যবর্তী আভাস দ্বারা জ্ঞানহীন লোকের চক্ষে ভ্রম উৎপাদন করে, আকাশের কোন রং না থাকিলেও কখনও কখনও নীলবর্ণ দেখায়, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া যায়, স্বপ্নে দৃষ্ট মিথ্যা দৃশ্যাবলী সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে কি তাহারা কার্যকরী হয়? সেই প্রকার এই সংসারের ক্ষণিক আভাসও মিথ্যা। জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বানর যেমন উহা ধরিতে যায়, কিন্তু ধরিতে পারে না—তেমনি এই সংসারের বিচিত্র দৃশ্যাবলী নয়নগোচর হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের কোনও অস্তিত্ব নাই, এই জগদাভাস চকিতে দৃষ্ট হয় এবং পরক্ষণেই লোপ পায়, ইহার চঞ্চলতা তরঙ্গভঙ্গের চঞ্চলতা এবং বিদ্যুতের গতিকেও হার মানায়, গ্রীষ্মের শেষে যেমন বায়ুর প্রবাহ সম্মুখ কি পিছন হইতে আসিতেছে বুঝা যায় না তেমনি এই ভবরূপ তরুবরের কোনও স্থিরতা নাই, ইহার আদি নাই, অন্তও নাই, স্থিতি নাই, রূপও নাই, ইহাকে উৎপাটন করিবার জন্য কোন তোড়জোড়ের (পরিশ্রম বা প্রযত্নের) কি প্রয়োজন? হে কিরীটি, আত্মস্বরূপের অজ্ঞানের জন্যই ইহা এত বলবান হয়, আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্রের দ্বারা ইহাকে কাটিয়া ফেলা উচিত, জ্ঞান ভিন্ন অন্য যে কোনও উপায়ে ইহাকে জয় করিবার চেষ্টা করিলে তাহা দ্বারা এই বৃক্ষের ফাঁদে আরও অধিক জড়াইয়া পড়িবে। ইহার কত শাখা প্রশাখায়, উর্ধ্বে এবং মধ্যভাগে ঘুরিয়া বেড়াইবে? সুতরাং সম্যক্‌জ্ঞান দ্বারা ইহার মূল যে অজ্ঞান তাহাকে ছেদন কর। (২৫০)

সর্পভ্রমে রজ্জুকে যষ্টিদ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে কি সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না? মৃগজলকে নদী (গঙ্গা) মনে করিয়া তাহা পার হইবার জন্য ডোঙা তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে যে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায় সে সত্য সত্যই নালায় ডুবিয়া মরে, ঠিক ঐ প্রকার হে বীর অর্জুন, এই মিথ্যা সংসারকে নাশ করিবার জন্য যে চেষ্টা করে সে আত্মজ্ঞান হারায় এবং তাহার বায়ু কুপিত হয় (আত্মজ্ঞান লোপ পাইবার ফলে তাহার এই সংসার সম্বন্ধে ভ্রম দিনে দিনে বাড়িতেই থাকে), হে ধনঞ্জয়, যেমন স্বপ্নে প্রাপ্ত আঘাতের একমাত্র ঔষধ জাগ্রত হওয়া তেমনি এই অজ্ঞানমূল সংসারের নিবৃত্তির উপায় তাহাকে জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন, আর এই জ্ঞানখড়্গ সহজভাবে চালনা করিতে হইলে বুদ্ধির (বৈরাগ্যের) নূতন ও অমিত শক্তি (অভঙ্গবল) আবশ্যক, বৈরাগ্যের উদয় হইলেই মনুষ্য (ধর্ম-অর্থ-কাম-রূপ) ত্রিবর্গের তাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, যেমন কুকুর বিষাক্ত অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বমন করিয়া সুস্থ হয়; হে পাণ্ডব, যখন সংসারের প্রত্যেক পদার্থ বিরক্তি উৎপাদন করে তখনই বুঝিতে হইবে যে বৈরাগ্য প্রবল হইয়াছে, দেহাভিমানের আবরণ ত্যাগ করিয়া প্রত্যগ্‌বুদ্ধি বা আত্মভাবনারূপ অস্ত্র দৃঢ়ভাবে হস্তে ধারণ করিতে হইবে; বিবেকরূপী শানের উপর 'ব্রহ্মাস্মি' এই আত্মবোধরূপী ভাবনাদ্বারা এই অস্ত্রকে শান দিতে হইবে এবং পূর্ণবোধের চূর্ণদ্বারা মার্জনা (পালিশ) করিতে হইবে, ইহার পর, নিশ্চয়ের মুষ্টিতে কিরূপ শক্তিলাভ হইল,

পরীক্ষা করিবার জন্য দু-এক বার প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে এবং মনন দ্বারা পরিষ্কারভাবে তাহাকে তৌল (পরীক্ষা) করিবে (২৬০), পরে নিদিধ্যাসন দ্বারা যখন এই শস্ত্র ও শস্ত্রধারী সম্পূর্ণভাবে একরূপ হইয়া যাইবে তখন ইহার আঘাত কেহই বা কিছুই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, অদ্বৈত তেজোদৃপ্ত আত্মজ্ঞানের এই অস্ত্র সংসারবৃক্ষের কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখিবে না (নির্মূল করিবে), শরতের প্রারম্ভে বায়ু যেমন আকাশকে মেঘমুক্ত করে বা উদিত সূর্য যেমন অন্ধকার বিনাশ করে, অথবা জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত খেলার অন্ত হয়, আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্রের ব্যবহার (বা স্বপ্রতীতি-প্রবাহ) তেমনিভাবে সংসারতরুকে নাশ করে, তখন চন্দ্রমার প্রকাশে যেমন মৃগজল অদৃশ্য হয়, তেমনি সংসারবৃক্ষের ঊর্ধ্ব ও অধোমূল এবং অধোভাগে শাখা-প্রশাখার বিস্তারও অদৃশ্য হয়, হে বীরোত্তম অর্জুন, এইভাবে আত্মজ্ঞানের খড়্গদ্বারা ঊর্ধ্বমূল এই সংসাররূপী অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করা উচিত। (২৬৬)

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

ইহার পর মনুষ্যের আত্মস্বরূপ দর্শন হয়, যাহার সম্বন্ধে 'ইহা অমুক বস্তু' এই ভাস নষ্ট হয় এবং যাহা 'অহং-ত্ব' বিনাই স্বয়ংসিদ্ধ, পরন্তু মূর্খব্যক্তিগণ দর্পণে আপনার একটি মুখের স্থলে দুইটি দেখে, তুমি তেমনি করিও না (দ্বৈতভাবকে কখনও স্বীকার করিও না), হে বীর অর্জুন, আত্মস্বরূপ দর্শন করিবার ইহাই রীতি, কূপখননের পূর্বেই যেমন জমির তলদেশ ঝরণার জলে ভরিয়া থাকে অথবা জল শুকাইলে প্রতিবিম্ব যেমন নিজবিম্বের মধ্যে মিলাইয়া যায় অথবা ঘট ভাঙিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে লীন হয়, (২৭০)

অথবা দহনকার্য শেষ হইয়া গেলে অগ্নি যেমন নিজের মূলস্বরূপে লীন হইয়া যায় তেমনি হে ধনঞ্জয়, আপনার স্বরূপকেও আত্মস্বরূপে দেখা উচিত, এই আত্মস্বরূপের দর্শন ঠিক তেমনি, যেমন জিহ্বা স্বয়ং আপনার স্বাদগ্রহণ করে অথবা নেত্র নিজের অক্ষিগোলকটি দেখে, কিংবা তেজ যেমন তেজের মধ্যেই মিলিয়া যায়, বা আকাশ আকাশেই ব্যাপ্ত হইয়া যায় অথবা নানাস্থানের জল যেমন জলাশয় ভরিয়া দেয়, তেমনি অদ্বৈত-দৃষ্টি দ্বারা আপনার স্বরূপ দেখিবার ইহাই রীতি—ইহা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি। না দেখিয়াই যাহাকে দেখা যায়, না জানিয়াই যাহাকে জানা যায়, যে বস্তুকে 'আদ্যপুরুষ' বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে উপাধির আশ্রয় লইয়া 'শ্রুতি' নানা কথা বলিয়াছেন এবং বৃথা তাহার নাম ও রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, স্বর্গসুখ ও সংসারে ঘৃণা উৎপন্ন হইলে মুমুক্ষুগণ যোগজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 'সেখান হইতে আর ফিরিব না' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যিনি আত্মস্বরূপের উদ্দেশ্যে বাহির হন, সংসারকে পদদলিত করিয়া—বৈরাগ্যসাধন করিয়া—কর্মমার্গের আচরণ দ্বারা যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই ব্রহ্মলোকের পর্বত পার হইয়া আরও আগে চলিয়া যান, অহংকারাদি ভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানিগণ সেই পরম স্থানে যাইবার ছাড়পত্র প্রাপ্ত হন, যে মূলবস্তু হইতে দৈবহীনের (দুর্ভাগার) শুষ্ক (ব্যর্থ) আশার ন্যায় এই বিশ্বপরম্পরা-রূপ মালিকার বিস্তার বাহির হয় (২৮০);

বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না হইলে এই মিথ্যা সংসার ভাসমান হয় এবং 'আমি' 'তুমি'

এই দ্বৈতভাবের প্রসার হয়; হে পার্থ, সেই যে আগু (মূল) বস্তু স্বয়ং সেই আত্মস্বরূপকে, বরফ দ্বারা যেমন বরফ জমানো যায় তেমনিভাবে দেখিবে, হে ধনঞ্জয় এই আত্মস্বরূপকে জানিবার আর একটি লক্ষণ এই যে একবার এই স্বরূপের দর্শনলাভ হইলে আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, মহাপ্রলয়ে যেমন সর্বত্র জলময় হয়, তেমনি যে মনুষ্য জ্ঞানে পূর্ণভাবে ভরিয়া যায় সেই এই আত্মস্বরূপের দর্শন লাভ করিতে পারে।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫

বর্ষার অন্তে যেমন আকাশ মেঘমুক্ত হয় তেমনি যে মনুষ্যের মন হইতে মান মোহ আদি বিকার অন্তর্হিত হয়, আত্মীয়বর্গ যেমন নির্ধন ও নিষ্ঠুর মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনি তিনি সর্ব প্রকার বিকারশূন্য, ফল ধরিলেই যেমন কদলীবৃক্ষ উন্মূলিত হয় তেমনি সম্পূর্ণ ফল-প্রাপ্তির জন্য তাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়, অগ্নি লাগিলে পক্ষীকুল যেমন বৃক্ষ হইতে পলাইয়া যায় তেমনি সর্বপ্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প তাঁহাকে ত্যাগ করে, যে ভেদবুদ্ধির ভূমিতে সকল দোষরূপ তৃণের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তিনি সেই ভেদবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত, সূর্যোদয় হইলে যেমন রাত্রির অন্ধকার আপনা-আপনি পলায়ন করে, তেমনি তাঁহার দেহাভিমান অজ্ঞানের সহিত নষ্ট হইয়াছে। (২৯০)

আয়ু ফুরাইলে জীব যেমন অতর্কিতে শরীরকে পরিত্যাগ করে তেমনি তিনি অজ্ঞানময় দ্বৈত ভাবকে পরিত্যাগ করেন, পরশপাথরের সহিত লোহের, সূর্যের সহিত অন্ধকারের যেমন মিল হয় না, তেমনি তাঁহার কাছে দ্বৈতবুদ্ধি টিকিতে পারে না, সুখদুঃখ আকারে দেহে যে দ্বন্দ্ব দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহার সম্মুখে সেই দ্বন্দ্ব ক্ষণমাত্র দাঁড়াইতে পারেনা, স্বপ্নে দৃষ্ট রাজ্য বা মরণ যেমন জাগ্রত অবস্থায় হর্ষ ও শোকের কারণ হয় না, তেমনি তাঁহার মনে সংসারের হর্ষশোক কোন প্রভাব বিস্তার করে না, সর্প যেমন গরুড়ের কাছে যাইতে পারে না তেমনি সুখদুঃখরূপী পুণ্য ও পাপউৎপন্নকারী দ্বন্দ্ব তাঁহাকে অভিভূত করে না, অনাত্মবস্তুরূপ জল ত্যাগ করিয়া যে সুবিচাররূপী রাজহংস আত্মানন্দরূপ দুগ্ধ পান করেন, সূর্য যেমন ভূতলে জল বর্ষণ করিয়া পুনরায় তাহাকে আপনার কিরণজাল দ্বারা নিজের বিম্বের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লয় তেমনি আত্মপ্রাপ্তির জন্য (অজ্ঞানের প্রভাবে) চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত আত্মবস্তুর সত্তাকে তিনি জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা অখণ্ডস্বরূপে একত্র করিতে সমর্থ, কিংবহুনা, তাঁহার বিবেক আত্মনির্ণয়ের মধ্যে ডুবিয়া যায়, যেমন গঙ্গার প্রবাহ সমুদ্রের মধ্যে মিশিয়া সমবায় হয়, সর্বত্র আত্মস্বরূপ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার অন্য কোনও অভিলাষ থাকে না—যেমন সর্বব্যাপী আকাশের অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব। (৩০০) যাঁহার মনে কোনও বিকারের উদয় হয় না, যেমন (অগ্নির) জ্বালামুখী পর্বতের উপর কোনও বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না; যাঁহার চিত্ত কামাদি বিকার-রহিত ও নিশ্চল, যেমন মন্দার পর্বতরূপ মন্থনদণ্ড উঠাইয়া লইলে ক্ষীরসমুদ্র নিশ্চল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার মধ্যে সমস্ত কামোর্মি শান্ত হয়।

ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি রূপায়ণে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

সম্প্রতি আমাদের ইতিহাস-সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি উন্নতির লক্ষণ। যে কোনও উন্নত ও গতিশীল জাতিই ইতিহাস-সচেতন না হ'য়ে পারে না। আমরা আমাদের স্মৃতির চেতনায় সমগ্র প্রবহমাণ অতীতকে বহন ক'রে চলেছি। তারই মধ্যে আছে আমাদের পরিচয়। এই অতীতকে আমরা জানতে চাই, চিনতে চাই—সে জানা আর সে চেনা নিজেকেই জানা, নিজেকেই চেনা। উন্নত মানুষমাত্রেই নিজেকে জানতে চায়, চিনতে চায়। কারণ উন্নত মানুষ অনায়ত্ত অন্ধ শক্তির হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকতে চায় না, সে নিজেই তার ভাগ্যনিয়ন্তা হতে চায়। সেইজন্য বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে এবং মননশীলতা-প্রসূত প্রজ্ঞা দ্বারা নির্ধারণ ক'রে সে আপন জীবনের কক্ষপথ গড়ে তুলতে চায়। এই জন্যই সে অতিমাত্রায় ইতিহাস-সচেতন। এই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত সচেতনতার ফলে আজ আমাদের দেশে নতুন ক'রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করবার যে বেগ এসেছে, তাকে আমরা শ্রদ্ধা না জানিয়ে ও কৃতজ্ঞচিত্তে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না।

এইরূপে যাঁরা ইতিহাস-রচনায় হাত দিয়েছেন তাঁরা নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান সহায়ে ও সমাজ-তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমাদের দেশের ইতিহাস-রচনায় এই সমাজতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কত যে অজানা সম্পদের সন্ধান দিয়েছে, কত যে দুর্বোধ্য বস্তুকে আলোকিত ক'রে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ফলে, পাঁচ হাজার বছরের পুরানো একটি বিরাট জাতির সমাজ-সংস্কৃতি নূতনভাবে আমাদের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই সমাজ-তাত্ত্বিক পদ্ধতির মূল প্রয়াস হ'ল ইতিহাসের একটি গতিক্রম নির্দেশ করা। সমাজ-তাত্ত্বিক মর্গানের মূল্যবান্ গবেষণা অবলম্বন ক'রে ইতিহাসের একটি গতিপথ নির্দেশ করেছেন মার্ক্স্ ও এঙ্গেলস্। এঁদের সিদ্ধান্তানুসারে ইতিহাসের গতিক্রম তিনটি স্তরে বিভক্ত: প্রথম আদিম সাম্যসমাজ, তারপর শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, তৃতীয় শ্রেণীবিহীন সমাজ। এই প্রত্যেকটি স্তরেরই আবার নানা উপবিভাগ আছে। তার বিশদ বর্ণনা এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এই স্তরবিভাগের ভিত্তি হ'ল উৎপাদন-পদ্ধতির বিভিন্নতা। এঁদের মতে উৎপাদন প্রথাই মানুষের ধ্যানধারণা, ধর্মকর্ম, শিল্পপ্রচেষ্টা প্রভৃতি মানসিক বিকাশের স্বরূপ নির্ণয় ক'রে থাকে। এঙ্গেল্সের 'পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র' নামক পুস্তকে এ তত্ত্ব বিস্তারিত হয়েছে। সমাজ-বিজ্ঞানীরা সকলেই অবশ্য এ তত্ত্ব মেনে নেননি। এর পেছনের যুক্তির ভিত্তিগত দৌর্বল্য তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা সমাজ-বিজ্ঞানী এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য:

'মার্ক্সবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যায় মধ্যে মধ্যে সমাজ সংস্কৃতির অর্থনৈতিক বাস্তব ভিত্তির উপর অত্যধিক অসম গুরুত্ব আরোপ করা হয় ব'লে তা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে, জীবন্ত সত্য হয়ে ওঠে না। যান্ত্রিক বাস্তবতায় সত্যের সমগ্রতা প্রতিফলিত হয় না।...নানাবিধ পরস্পর বিরোধী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ইতিহাসের রথচক্র ঘরঘরিয়ে চলে, তাতে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব অস্বীকার্য নয়। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ ক'রে তার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়েই ইতিহাসের বিশেষ ক'রে সংস্কৃতিক স্বরূপটি ফুটে ওঠে।[১]

১। বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৩৮

অর্থনৈতিক উপাদান ছাড়া ধ্যানধারণা, দেবদেবী কল্পনা, শিল্পকর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন মৌল উপাদান সমাজ-সংস্কৃতির রূপ প্রদান ক'রে থাকে,—এ কথা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে আজ স্বীকৃত।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সংস্কৃতি-বিজ্ঞানী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল জাতি-সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, তাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। তিনি বলেছেন[২] :

বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসকল প্রয়োগ করলেই যে সত্য আবিষ্কার করা যায় তা নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করলে আমরা পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত পেয়ে থাকি। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান করতে হ'লে বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে প্রথমে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটিকে যুক্তিসিদ্ধ ক'রে গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাছাড়া সমাজ একটি সক্রিয় ও সচল প্রতিষ্ঠান, তা প্রতি মুহূর্তে নব নব রূপ পরিগ্রহ করছে, তাকে কোনও প্রকার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব অনেক। তাদের হাতে মানুষের ভবিষ্যৎ, সভ্যতার ভবিষ্যৎ। সে দায়িত্ব তাকে পালন করতে হ'লে চাই স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি ও সত্য-দৃষ্টি।

আচার্য শীলের কথাগুলি অনুধাবন করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকল প্রয়োগ ক'রে আগে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি গড়ে তোলা চাই, এইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। ইতিহাসের গতি-ক্রম সম্বন্ধে কোনও প্রকার 'pre-conceived ideas' (পূর্বগঠিত ধারণা)-র বশবর্তী না হওয়াই ভাল।

ভারতবর্ষে সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই ধরা পড়ে তা হ'ল জনসাধারণের ধ্যান-ধারণায় অধ্যাত্মবাদের প্রাধান্য। অন্যদেশে এ রকম চোখে পড়ে না। এর কারণ কি? বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকল প্রয়োগ করেও আমরা কত পরস্পর বিরোধী উত্তরই না পাচ্ছি। সাধারণের পক্ষে তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। সমাজে এক শ্রেণীর মধ্যে 'বস্তুবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যা' (মার্ক্সীয় তত্ত্বানুযায়ী) প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু, ভারতের অধ্যাত্মবাদের প্রভাব ও সমাজসংস্কৃতি-রূপায়ণ সম্বন্ধে সে ব্যাখ্যা আমাদের যুক্তিকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অথচ সে ব্যাখ্যা-বিস্তারে বিপুল পরিমাণে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসকল প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং এ ব্যাখ্যার জনপ্রিয়তার মূল কারণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত-প্রয়োগ। অথচ যুক্তিকে যা সন্তুষ্ট করতে পারে না তা সত্যও নয়, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও নয়। সেইজন্য এখানে কিভাবে 'বস্তুবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যা' ভারতের ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তিকে অসন্তুষ্ট রেখে যাচ্ছে তা বিশদভাবে আলোচনা করব।

এই সকল বস্তুবাদীরা বলেন[৩] : ভারতবর্ষে লোকায়ত দর্শন-মতই প্রাচীনতম, এবং এই লোকায়ত দর্শনমত ও বস্তুবাদ—এক ও অভিন্ন। দেখা যায়, এ দেশে আদিযুগে দুই বিভিন্ন দল মানুষ ছিল। একদল মানুষ ছিল কৃষিজীবী, আর একদল পশুচারক। প্রথমোক্ত দল মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার উন্নত নগর-সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, দ্বিতীয় দল বৈদিক সভ্যতা। বহু বিদ্বানের গবেষণা অনুসারে এই আদিম কৃষি-সমাজ ছিল মাতৃ-প্রধান ও পশুচারক সমাজ ছিল পিতৃপ্রধান। কিন্তু আদিতে এই উভয় সমাজই ছিল সাম্য-সমাজ, শ্রেণীবিভাগ সেখানে ছিল না। এই মাতৃপ্রাধান্য হ'তে উদ্ভূত হয়েছে তন্ত্র, যোগ, সাংখ্যমত ও দেবীদের প্রাধান্য। আর পিতৃ-প্রধান সমাজ হ'তে উদ্ভূত হয়েছে বেদমত। দেখা যায় যে বৈদিক সমাজে ছিল পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য। কিন্তু, এই বিভিন্নতা

২। Brojendra Nath Seal—The meaning of race, tribe and nation.

৩ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন

সত্ত্বেও এই দুই সমাজ আদিতে মূলতঃ একটি ঐক্যরূপ প্রকটিত করে। আদিম সাম্য-সমাজে এই উভয় মানব-গোষ্ঠীর দার্শনিক মতবাদ ছিল সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদ। মার্ক্‌স্ এঙ্গেলস্ বহু প্রমাণ সহ দেখিয়েছেন যে প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্যান-ধারণার বৈশিষ্ট্যই হ'ল এই বস্তুবাদ। ভারতবর্ষে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখি না। পরবর্তী কালে এই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষের উপর শ্রেণীসমাজ উদ্ভূত হ'ল, তখনই এল অধ্যাত্ম-বাদ ও একেশ্বরবাদ। এই অধ্যাত্মবাদ উপস্থিত হয়েছে উপনিষদ্‌সমূহে। উপনিষদের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। এই অধ্যাত্মবাদ ও একেশ্বরবাদের ছায়া ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত দেবীসূক্তে দেখা গেলেও মনে রাখতে হবে যে দশম মণ্ডল অর্বাচীন রচনা এবং শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের রচনা। উপরোক্ত অধ্যাত্ম-বাদের প্রচারক রাজন্য-শ্রেণী। উপনিষদে তার সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।[৪] রাজন্য-শ্রেণী সর্ব-সাধারণকে ইহলোকবিমুখ করবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদের সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ ইহলোক-বিমুখ জনগোষ্ঠী শোষিত হলেও প্রতিবাদ করবে না। ভারতবর্ষে উৎপাদন-প্রথা বহুকাল ধরে অপরিবর্তনীয় ছিল। সেইজন্য সামাজিক বিবর্তনও অসম্পূর্ণ থেকেছে। এই কারণেই গ্রাম-সমাজ আদিম কৌম-জীবন অনেক ক্ষেত্রেই অতিক্রম করতে পারে নি। গ্রাম-সমাজে প্রাকৃত জনদের মধ্যে কৌম-জীবনানুগত ধ্যান ধারণা ধর্মবিশ্বাসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলি সমাজ-তাত্ত্বিক গবেষণা সহায়ে প্রমাণ করবার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাদের ধর্মমত-বিশ্বাস প্রধানতঃ বস্তুবাদী। পরবর্তী কালে অধ্যাত্মবাদীরা এগুলির উপর অধ্যাত্মবাদের প্রলেপ আরোপ করেছে। বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবক মতবাদসকলও অত্যন্ত প্রাচীন ও লোকায়ত মতবাদ, এবং এগুলি আদিতে বস্তুবাদী-ই ছিল।

এঁদের মোটকথা : আদিতে বস্তুবাদই ছিল মানুষের প্রধান দর্শন-মতবাদ। এর থেকে ইতিহাসের আদিম সাম্য-সমাজ স্তরটি ভারতের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এল অধ্যাত্মবাদ। পরবর্তী শ্রেণীবিহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধ্যাত্মবাদেরও অবসান ঘটবে। এই কয়টি হ'ল এদের মূলকথা।

এদের প্রথম মৌলিক প্রকল্পটি—অর্থাৎ আদিম সমাজে বস্তুবাদই ছিল মানুষের প্রধান দর্শন-মতবাদ এবং তার কারণ প্রাক্-বিভক্ত সমাজ—যথেষ্ট সন্দেহজনক। সন্দেহ নাই—আদিম মানুষের কাছে বেঁচে থাকাই ছিল প্রধান সমস্যা এবং জীবিকা-প্রয়াসই ছিল তার অনন্য প্রয়াস। অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তির কাছে মানুষ ছিল একান্ত অসহায়। ফলে, তার অপরিণত মনে নানা উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে জীব-জন্মের নিকটতম সম্পর্ক কল্পনা ক'রে আজকের দিনের পক্ষে নিদারুণ উৎকট ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব তারা করেছিল। এবং অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল কল্পনা করেছে। কিন্তু, তাদের এই প্রয়াসই কি এর মধ্যে প্রকটিত নয় যে তারা অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করবার প্রচেষ্টা করেছে? ধর্মবিশ্বাসের মূল কথা প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা। সেই মূল প্রচেষ্টা শুধু আহার্য-সংস্থানের সঙ্গেই আদিম কৌম সমাজে সংযুক্ত নয়। এই বিশ্ব-সৃষ্টি স্বভাবতই আদিম মানুষের কৌতূহল জাগিয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সে জানতে চেয়েছে, সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। মানুষের এই জানার তাগিদ

৪। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৩য় খণ্ড)—শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-জাবালি সংবাদ।

আহার্য-সংস্থানের তাগিদের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম মানুষদের গ্রন্থ ঋগ্বেদ। এই গ্রন্থে আদিম সমাজের মানুষের জীবিকা-প্রয়াস ও তার জীবন-জিজ্ঞাসা দুই-ই প্রকটিত।

ঋক্-মানব প্রশ্ন ক'রে চলেছে: 'দিনমানে তারারা কোথায় থাকে? বন্ধনহীন অবলম্বনহীন সূর্য কেন স্খলিত হয় না? দিবা ও রাত্রির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে; বাতাস কোথা হ'তে আসে, কোথায় যায়?' (ঋগ্বেদ: দশম মণ্ডল ১৬৮ সূক্ত)। আদিম মানুষের স্বাভাবিক প্রশ্ন নয় কি এগুলি? 'কেমন ক'রে এই সৃষ্টি হ'ল? সে কোন্ বনে, সে কেমন বৃক্ষ—যা দিয়ে ঐ দ্যুলোক, ভূলোক নির্মিত হ'ল?' (ঐ ৩১ সূক্ত—৭ ঋক)

মানুষ মননশীল জীব, বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে এবম্বিধ প্রশ্ন সে না ক'রে পারে না। এগুলির সঙ্গে আহার্য-সংস্থানের কি সম্পর্ক? কোন সম্পর্কই নেই। সে আরও প্রশ্ন করেছে: 'এই বিশ্বের অধিষ্ঠান কোথায়? আরম্ভই বা কোথায়? এখন কিভাবে আছে? পূর্বেই বা কিভাবে ছিল? যা থেকে সেই সর্বদর্শী বিশ্বকর্মা তাঁর মহিমাবলে ভূমিকে সৃষ্টি করলেন, দ্যুলোককে প্রকাশ করলেন? (ঋগ্বেদ: দশম মণ্ডল ৮১২)। তারপর তাঁরা উত্তর পেলেন: 'আছেন এক দেবতা জীবন ও বল যথায় বিস্ফুরিত, দিব্যধামবাসীরা যাঁকে সম্মান করেন, অমরত্ব ও মৃত্যু যাঁর ছায়া' (ঋগ্‌বেদ: দশম মণ্ডল)। অর্থাৎ ঋক্-মানবের কল্পনা বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, সাবিত্রী, রুদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতাদের নিয়ে এবং তাদের কাছে ঐহিক বাসনাসকল পূরণের প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হ'লেও ক্রমে তার বুদ্ধিপ্রগতি তাকে বিশ্ব-সত্তা উপলব্ধি করতে সহায়তা ক'রল। দশম মণ্ডলের উৎপত্তি শ্রেণী-সমাজে হ'তে পারে, কিন্তু, তার মধ্যে যে অদ্বৈতবাদ ও অধ্যাত্মবাদের স্ফুরণ দেখা যায়, তার মূল আরও সুদূর অতীতে প্রসারিত। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটি কথা ব'লেছেন:

It cannot be right to class every poem and every verse in which mystic or metaphysical speculations occur as modern, simply because they resemble the language of the Upanishads. These Upanishads did not spring into existence all on a sudden. Like a stream which has received many a torrent and is fed by many a rivulet, the literature of the Upanishads prove better than anything else that the elements of their philosophical poetry came from a more distant fountain (History of Sanskrit Literature).

বস্তুতঃ এই যুক্তির সারবত্তা আমরা ঋগ্বেদের প্রাচীন অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণ করলেই পাই। প্রাচীন অধ্যায়গুলির মধ্যে অদ্বৈতবাদের ছায়া যে না দেখতে পাওয়া যায়, তা নয়। যথা—প্রথম মণ্ডলে বলা হয়েছে যে 'আকাশে সর্বতোবিসারী চক্ষুর দৃষ্টির ন্যায় বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সর্বদা দর্শন করেন' (১।২২।২০)। 'স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন' (১।২২।২১)।[৫] মোটের উপর একথা অনস্বীকার্য যে আদিম প্রাক্-বিভক্ত কৌমসমাজেই মানুষের অস্ফুট চেতনায় একেশ্বরবাদ ও অধ্যাত্মবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। সুসভ্য মানুষ যে জটিল অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জটিলতর যুক্তিজাল সহায়ে বিস্তার করেছে তা তার মনে হঠাৎ গজাতে পারে না। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এই অর্থেই সনাতন তত্ত্ব, বিশ্বসত্য-উপলব্ধি তা শ্রেণী-

৫। এ সম্পর্কে এক তথ্যপূর্ণ সমালোচনা পাওয়া যায় ১৯৫৪ সালের মাসিক বসুমতীতে (আষাঢ়, শ্রাবণ) স্বামী বাসুদেবানন্দ কৃত "ঋগ্বেদ-পরিচয়" প্রবন্ধে।

সমাজের 'ভূত' নয়। সেইজন্য আদিম কৌম-সমাজেই তার স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দের 'Necessity of Religion' শীর্ষক আলোচনায় এ সম্পর্কে প্রচুর আলোক পাওয়া যায়। এই আলোচনায় তিনি ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রচলিত দুটি মতবাদ - (১) ধর্মের উৎপত্তি মৃতের উপাসনা হ'তে (২) ধর্মের উৎপত্তি প্রকৃতি-উপাসনা হ'তে—আলোচনা ক'রে তিনি বলছেন :

'Whichever is the case one thing is certain, that he (man) tries to transcend the limitations of the senses He cannot remain satisfied with his senses ; he wants to go beyond them.......Man is man, so long as he is struggling to rise above Nature, and this Nature is both internal and external.'

মানুষ ইন্দ্রিয়ের সীমবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে তাদের পিছনে ক্রিয়াশীল সত্যকে জানতে চেষ্টা করেছে। তার ধর্মতত্ত্ব তো এই নিয়েই আলোচনা করে। মানুষের এই বিশ্ব-সত্যকে জানবার প্রচেষ্টা তার স্বভাব-সিদ্ধ, তাই এ প্রয়াস তার মধ্যে চিরন্তন। এই প্রয়াস চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে উপনিষদের যুগে। অবশ্য একদিনে এই চরম উৎকর্ষ-লাভ ঘটেনি। হাজার হাজার বৎসরের প্রয়াসের ফলে মানুষ চরম সত্যকে জেনেছে। কাজেই আদিম কৌম ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুগে যুগে নূতন নূতন জ্ঞান সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু সে জ্ঞান প্রক্ষিপ্ত নয়, জোর ক'রে চাপানোও নয়। অর্থাৎ লোকায়ত দর্শনগুলির উপর আধ্যাত্মিকতার যে প্রলেপ পড়েছে তা মানবের দেহ-মন ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে হয়েছে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে লোকায়ত মতবাদের একটি দুটি শাখা বস্তুবাদী। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার্বাক মতবাদ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। কিন্তু তা থেকে লোকায়ত মতবাদ ও বস্তুবাদ যে এক ও অভিন্ন—এ প্রকল্প সিদ্ধ হয় না। চার্বাক মতবাদ ছাড়া অন্যান্য লোকায়ত মতবাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি—একটু বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে। বাংলার বাউল মত প্রাকৃত জনদের মধ্যে প্রচলিত একটি মত—অর্থাৎ লোকায়ত মত। তাদের মতবাদ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায় যে, তারা জাতি-পঙ্‌ক্তি মানে না, তীর্থ-প্রতিমা মানে না, গুরু-আচার্য বা শাস্ত্র মানে না।[৬] কিন্তু, তাদেরও মতে পরম-পুরুষার্থ অতীন্দ্রিয় সত্য লাভে। নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে তা পরিস্ফুট :

'গুরুর হাতের প্রদীপ লইয়া
দেখরে অথাই গুহায় বইয়া
আত্মযোগে সচেত হইয়া
তবে পরম মরম পাবি'—

অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ হ'ল 'আত্মযোগে সচেত' হয়ে 'পরম মরম' পাওয়াতে। এবং তাঁরা এ কথাও বলেন যে পরম-পুরুষার্থ হ'ল 'আত্মানাত্ম-ভেদ' ঘুচানোয়। এ যদি অতীন্দ্রিয়বাদ নয় তো কি? সহজ-পন্থীরা অপর একটি লোকায়ত সম্প্রদায়। তাঁদের মত 'শক্তি যখন (কায়াসাধনার দ্বারা) মহাসুক্ষ্ম স্থানে পৌঁছে তখন সাধনার শেষ ও সাধকের পরম চরম আনন্দ অর্থাৎ মহাসুখ লাভ হয়। সাধকের নিকট তখন বহির্জগৎ লুপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়াদির কিছুরই জ্ঞান থাকে না।' এও চরম অধ্যাত্মবাদের কথা। নাথযোগ-মত অপর একটি লোকায়ত ধর্মমত। নাথ-যোগীরা বলেন 'সঙ্কল্প-বিকল্প সকল চাঞ্চল্যের মূল। দেহ ও মনের চাঞ্চল্য দূর হইলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাকে নিরুত্থান-দশা বলা হয় অর্থাৎ চাঞ্চল্যের উত্থানরহিত অবস্থা।... এই অবস্থা সর্বানন্দময় নিশ্চল অবস্থা, এই পরম-

৬। ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা

৭। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলার ইতিহাস, ১৫০ পৃষ্ঠা।

পদে অবস্থানই জীবের অভীষ্টতম গতি।[৮] এ মতও বস্তুবাদীদের নয়, হ'তে পারে না।

এ কথাও সত্য নয় যে বৌদ্ধ ও জৈন মত আদিরূপে বস্তুবাদ। আদিতে এ মতগুলি নিরীশ্বরবাদী বটে, কিন্তু অধ্যাত্মবাদী। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে চিরদিনই মানুষের পরম পুরুষার্থ নির্বাণলাভে নির্দিষ্ট হয়েছে। আর জৈনমত বলেন '(সেই মুক্ত পুরুষ) দীর্ঘও নহে, হ্রস্বও নহে তাহার শরীরও নাই, পুনর্জন্মও হয় না, সে সম্বন্ধিতও হয় না। সে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসকও নহে, সে জ্ঞাতা, সে দ্রষ্টা, কোনও উপমার দ্বারা তাহাকে জানা যায় না, তাহার অস্তিত্ব আছে, সে নিরাকার নিরুপাধিক, তাহার কোনও উপাধি নাই, সে শব্দ রূপ-রস গন্ধ বা স্পর্শও নহে, এই সকলের মধ্যে সে কিছুই নহে।[৯] যারা আত্ম-স্বরূপ এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের কথা বলেছে নিঃসন্দেহে তারা চরম অধ্যাত্মবাদী।

সন্দেহ নাই—ভারতবর্ষে বেদ বা বেদবাহ্য জৈন-বৌদ্ধ মত বা লোকায়ত দর্শন-মতবাদ সব কিছুরই ভিত্তিতে বস্তুবাদ নয়, অধ্যাত্মবাদ পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণী-শোষণের উদ্দেশ্যে তা রচিত হয় হয়নি। শ্রেণী-শোষণের সঙ্গে তার উৎপত্তির কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। অবশ্য অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের কোনও সম্পর্ক নেই, এ কথা বলাও নিদারুণ ভুল হবে। অধ্যাত্মবাদ পুরোহিতশ্রেণীর হাতে পড়ে যে যুগে যুগে শ্রেণীস্বার্থ-সংরক্ষণে অত্যাচারের যন্ত্র হিসাবেও কাজ করেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।[১০] এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা খুব সচেতন। কিন্তু একথা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি যে অধ্যাত্মবাদকে শ্রেণী-স্বার্থ ভাঙবার ও সাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেও প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের দেশেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। উপনিষদের মানবতা ও জীবব্রহ্মবাদে তা পরিলক্ষিত হয়। মৈত্রেয়োপনিষৎ বলেন—"স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ"। সকল জীবই যেখানে কেবল শিব বলা হয়েছে, সেখানে মানুষে মানুষে শ্রেণী-বৈষম্য ভেদ অস্বীকৃত হয়েছে। সত্যকাম-জাবালির কাহিনীর ঋষি গৌতমের মধ্যে অধ্যাত্ম-বাদীদের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ বলছেন, "জটা গোত্র বা জাতিদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, যাঁহাতে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই সুখী, তিনিই ব্রাহ্মণ।"[১১]

বুদ্ধদেবকে বলা হয়, 'Thou breaker of castes, destroyer of privileges, preacher of equality to all beings'. বস্তুতঃ বুদ্ধের বাণী ও জীবনের মধ্যে 'বিশেষ সুবিধা' ও শ্রেণী-স্বার্থের উপর একটি নিদারুণ আঘাত সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতেও এ মনোভাব স্থানে স্থানে দেখা যায়। বনপর্বে যুধিষ্ঠির সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, 'সত্যকে যে পালন করে সেই ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ এ ব্রতচ্যুত সে শূদ্র, আর যে শূদ্র এ ব্রত পালন করে সে ব্রাহ্মণ।' ভাগবত মতবাদীরাও এই শ্রেণী-বৈষম্য দূর করবার জন্য বহু প্রয়াস করেছেন, তাঁরা বলেন 'ভগবদ্-আরাধনায় সবারই অধিকার আছে। কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খস, ভগবানের শরণে শুদ্ধ হন' (ভা ২।৪।১৮)। ধর্মব্যবস্থা ছাড়া ও সমাজ ও অর্থনীতিগত ব্যবস্থাতেও ভাগবতেরা খুব উদার। তাঁরা বলেন, 'সর্ব জীবে যথাযোগ্যভাবে অন্নাদির সংবিভাগও ধর্ম' (ভা ৭।১১।১০)। 'সকলেই ক্ষুধার প্রয়োজন অনুরূপ অন্ন পেতে পারে। তার

৮। ডাঃ কল্যাণী মল্লিক—নাথপন্থ ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা।

৯। আচারাঙ্গ-সূত্র—পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ উদ্দেশক, চতুর্থ বাণী (অনুবাদ—হীরাকুমারী বোথরা)

১০ স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান ভারত।

১১ ধর্মপদ—ব্রাহ্মণ-বগ্গো অধ্যায়

বেশী যে ছলে বলে অধিকার করে সে চোর, সামাজিকভাবে সে দণ্ডার্হ' (ভা ৭।১৪.৮)। মহাপ্রভুও শ্রেণীনিগড ভাঙ্‌বার প্রয়াস করেছিলেন। তাঁর কথা হ'ল—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ,' 'আচণ্ডালে করিহ কৃষ্ণভক্তি দান।' অধ্যাত্মবাদীদেব এ প্রয়াস আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন 'ভক্তের কোনও জাত নেই।' তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে এক অভিনব সাম্যবাদের সূচনা করেছেন। তাঁর কথা হ'ল: None can be a Vedantist and at the some time admit of privilege to any one, either mental physical or spiritual, absolutely no privilege for anyone The same power is in every man, the one manifesting more, the other less, the same potentiality is in every one That society we want, that order of state we want, which is based on the recognition of this all powerful presence latent in man. (Vedanta and Privileges)

তাহলে আমরা দেখছি প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ 'privilege-making' (সুবিধা-সৃষ্টি) নয়। 'privilege-breaking' (বিশেষাধিকার বিসর্জন) তা শুধু নয় অধ্যাত্মিত উন্নতির মাধ্যমেই আমরা বারবার আমাদের সমাজ-জীবনে মুক্তি ও সাম্যের পথে এগিয়ে যেতে পেরেছি। আমাদের দেশে অবদমিত শ্রেণী কেন কোনও দিন বিপ্লব করেনি—এ প্রশ্ন অনেক সমাজ-বিজ্ঞানীরই চিত্ত আলোড়িত করেছে। বর্তমান ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয় বলেছেন:

বর্ণগত সমাজের অন্তরে যে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বর্তমান ছিল, এবং স্বধর্ম-পালনের সে আশ্বাস বহু জাতি লাভ করিয়াছিল, তাহারই কারণে ভারতীয় সমাজে বিজিতের বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই।...অথচ ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে আপত্তি বা বিদ্রোহের কোনও কারণ ছিল না, একথা মনে করিবার কোনও হেতু নাই।

অর্থনৈতিক জীবনের নিশ্চিন্ততা ও স্বধর্ম আচরণ ও পালনের স্বাধীনতার দরুন নিম্নবর্ণেরা বিদ্রোহ করে না, একথা কিছুটা সঙ্গত বই কি। কিন্তু এক মাত্র এইটিই এর কারণ নয়। সময় সময় পুরোহিত-তন্ত্রের অত্যাচার কি সহ্যের সীমা অতিক্রম করেনি? রামায়ণে বর্ণিত শূদ্রকের কাহিনী এক ভয়াবহ অত্যাচার-কাহিনী। সে রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধেও কোন প্রকার বিপ্লব না হবার কারণ কি? সে সম্বন্ধেও একটি গূঢ় ইঙ্গিত অধ্যাপক বসু মহাশয়ের একটি উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন:

বুদ্ধদেব শূদ্র এবং স্ত্রী-জাতির মুক্তির অধিকার স্বীকার করার ফলে ভারতবর্ষে পরবর্তী কালে যে বিপুল প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটিল যাহার ফলে স্থাপত্যে, শিল্পে ধর্মান্দোলনে সৃজনী প্রতিভার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইলে বুঝা যায় কতখানি সৃজন-প্রতিভা সমাজের নিম্নস্তরে এতদিন অনাদৃত অবস্থায় চাপা ছিল।১২

এর অর্থ—বুদ্ধ একটি প্রচণ্ড সমাজবিপ্লবের নেতা ছিলেন। যে বিপ্লব অন্য দেশে অর্থনৈতিক উপাদানের মাধ্যমে কাজ করেছে, তা ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দেশে কার্যসিদ্ধি ক'রে গেছে। এজন্য মনে হয়, বিপ্লব সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যাঁরা করবেন তাঁদের ধর্মান্দোলন তাঁদের বিশেষ বিচারের বিষয় হওয়া উচিত। সমাজ-সংস্কৃতির রূপায়ণে অধ্যাত্মবাদের ভূমিকা শুধু অত্যাচারের যন্ত্র হিসাবে নয়, সাম্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভূমিকাই তার প্রধান ভূমিকা একথা ভুললে চলবে না।

এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গেই যদি অধ্যাত্মবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ হয়, তাহলে শ্রেণী-বিন্যাসের বিভিন্নতার সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের রূপ

১২ নির্মলকুমার বসু—হিন্দু-সমাজের গড়ন

বদলানো উচিত। চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্ত আমলে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃতির প্রসারের যুগ। এই যুগ আমাদের দেশে বাণিজ্য-নির্ভর নাগর সভ্যতার যুগ বলা যেতে পারে। পরবর্তী কালে পাল-আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ও অনুরূপ অধ্যাত্মবাদী বৌদ্ধ ধর্মের খুবই সম্প্রসারণ ঘটে, অথচ পাল-আমল প্রধানতঃ ভূমি-নির্ভর, কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ সভ্যতার আমল। বাণিজ্য-নির্ভর নাগর সমাজে সদাগরী ধনতন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে, আর ভূমি-নির্ভর কৃষি-সমাজে ভূম্যধিকারীর। শ্রেণীবিন্যাসের যথেষ্ট পার্থক্য এই দুই সমাজে প্রকটিত।[১১] কিন্তু ধর্মকর্ম, দার্শনিক চিন্তার যে রূপায়ণ এ দুই যুগে দেখা যায় তার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? গ্রাম-নির্ভর সমাজের ধর্মচেতনা ও নগর-নির্ভর সমাজের ধর্মচেতনার মধ্যে পার্থক্য নেই কি? অর্থনৈতিক উপাদানের সঙ্গে এখানে দার্শনিক মত ও ধর্মমতের কার্য-কারণ সম্বন্ধনির্ণয়—এখন পর্যন্ত কেউই করতে পারেন-নি। তা না করা গেলে ধ্যান-ধারণা ও ধর্ম-চেতনার সঙ্গে একমাত্র অর্থনৈতিক জীবনকে সংযুক্ত ক'রে দেখানো একান্ত অনুচিত।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বের ভিত্তিগত ত্রুটি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এর দরুনই ভারতীয় ইতিহাস-ব্যাখ্যায় তৎপন্থী বস্তুবাদীরা আমাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারেননি। উপরে আমরা যে ইতিহাস আলোচনা করেছি তা অসম্পূর্ণ, সন্দেহ নেই। আরও যুক্তি আছে, আরও তথ্য আছে যা এখানে আলোচনা করা হয়নি। পণ্ডিতেরা আরও দক্ষতার সঙ্গে বক্ষ্যমাণ যুক্তি-জাল বিস্তার করতে পারবেন, সন্দেহ নেই। সেই সকল উত্তম অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণের আশাতেই আমরা এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আশা করি যতটুকু আলোচনা করেছি তাতে এ কথা বলতে পেরেছি যে ঐতিহাসিকেরা যদি বাঁধা ছক হাতে নিয়ে অগ্রসর হ'ন, তাহলে তারা সত্য হ'তে দূরে চলে যাবেন। বিজ্ঞানকে যদি তাঁরা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেন, তাহলে তা মানুষের চিন্তায় মুক্তি না এনে আনবে কুসংস্কার। ধর্ম যেমন কুসংস্কারে পরিণত হ'তে পারে, বিজ্ঞানও পারে। পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের অভাব নেই। ধর্মের কুসংস্কার ভয়াবহ, কারণ তার ফলে সমাজ শ্রেণী-বৈষম্যের নিগড়ে আবদ্ধ হয়—নিষ্ঠুর পুরোহিত-তন্ত্রের অত্যাচারে জর্জরিত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার বোধহয় আরও ভয়াবহ, কারণ তা মানুষকে সত্যপথচ্যুত করে। যা সত্য নয়, তা কখনই মানুষের কল্যাণ-সাধন করে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু'—সত্যই হচ্ছে সর্বভূতের মধু, প্রকৃত কল্যাণের আধার। যে সত্যিকারের বিজ্ঞানী সে সত্যানুসন্ধানী, সত্যই তার লক্ষ্য। সেই সত্যই আমাদের হাতে সমাজ বিজ্ঞানীরা পৌঁছে দিন, তাঁদের কাছে আমাদের এই ঐকান্তিক দাবি।

[১১] ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস—গ্রাম ও নাগর বিন্যাস অধ্যায়।

Two attempts have been made in the world to found social life; the one was upon religion, and the other was upon social necessity. The one was founded upon spirituality, the other upon materialism, the one upon transcendentalism, the other upon realism. . . . Curiously enough, it seems that at times the spiritual side prevails, and then the materialistic side, in wave-like motions following each other

Indian Lectures **Swami Vivekananda**

বাংলা সাহিত্যে বিজয়া দশমী

শ্রীনিমাইচরণ বসু

বিজয়া দশমীর অন্তর্নিহিত করুণ মূর্ছনা মরমী মানবমাত্রকেই বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। সারা বৎসরের প্রতীক্ষার পর জননী দশভুজা নামিয়া আসেন মর্ত্যের মৃত্তিকায়। আনন্দ-উচ্ছল হইয়া উঠে বাঙালীর হৃদয়দেশ। উৎসবে আনন্দে এই উচ্ছল প্রাণের অভিব্যক্তি দেখা যায়। এমনিভাবে তিনটি দিন কাটিয়া যায়। তার পর আসে দশমী। এই দিন সন্তান-হৃদয় দুর্নিবার্য বিষণ্ণতায় মূর্ত হইয়া উঠে। আজ জননীর বিদায়-যাত্রা, প্রাপ্তির আনন্দ শেষ না হইতেই হারাইবার বেদনা আবার বড় হইয়া উঠে। বোধনের মিলন-রাগিণী বিজয়ার করুণ সুরে পরিবর্তিত হয়। উৎসব-রাত্রির উন্মত্ত মুখরতা উৎসবান্তিক বিষণ্ণ নির্জনতায় পর্যবসিত হয়। আসন্ন মাতৃ-বিরহের দারুণ উৎকণ্ঠা মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

বিজয়াদশমীর এই আবেদন বাংলা সাহিত্যেও যুগে যুগে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাংলাদেশের এই শাশ্বত কাহিনীর মর্মবিদারী রূপায়ণে বাঙালী কবিদের অন্তরও বারবার মথিত হইয়াছে।

আগমনী গানের উমা-মেনকা-সংবাদের আড়ালেই প্রধানতঃ বাঙালী কবিরা আশ্রয় লইয়াছেন। এই আগমনী-গানগুলির উপসংহার-পর্ব বিজয়া-গানগুলির মধ্যে। গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার একমাত্র কন্যা উমা তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া পুনরায় শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া যাইবে। উমা যতদিন আসে নাই ততদিন মেনকার মাতৃহৃদয় তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত ছিল। এখন উমা আসিয়াছে। সপ্তমী অষ্টমী দুইদিন কাটিয়াও গিয়াছে, কিন্তু নবমী না কাটিতেই মেনকার মাতৃহৃদয় এবার কন্যার বিচ্ছেদ-ভয়ে উৎকণ্ঠিত। নানারকম ফন্দি-ফিকির করিয়া তিনি উমাকে আটকাইতে চাহেন। কিন্তু সকল কিছুই ব্যর্থ হয়, কালচক্রের যথা-নিয়মে দশমীর অপরাহ্ণ উপস্থিত হয়, বুকভরা অশ্রুজলে উমা ভোলানাথের সহিত বিদায় নেয়। মাতৃহৃদয় শোকাকুল আর্তনাদে ভাঙিয়া পড়ে। বিষণ্ণ করুণ পরিবেশ চতুর্দিক ভারাক্রান্ত করিয়া করিয়া তোলে। ইহাই বিজয়া-গানের সংক্ষিপ্ত কাহিনী-কথা।

বিজয়া-গানগুলির মধ্যে অধিকাংশের রচয়িতা দাশরথি রায়, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ও কাঙাল ফিকিরচাঁদ। গিরিশ ঘোষ, নবীন সেন, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির ন্যায় খ্যাতকীর্তি লেখকবৃন্দও মেনকার দুঃখাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আপনার রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নবমী-নিশি অবসান-প্রায়। মেনকা খুঁজিয়াই পান না কেমন করিয়া উমার বিদায়-যাত্রা নিবৃত্ত করিতে পারেন। ব্যাকুল কণ্ঠে উমার সখীদের বলেন, তাহারা যেন উমাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ক্ষান্ত করে। ছ-মাস নয়, ন-মাস নয়, অন্ততঃ দশটি দিন তো উমা মায়ের কাছে থাকিবে। জামাই পরের সন্তান, মেনকার প্রাণ কাঁদিলে তাহার হয়তো তত মাথাব্যথা হইবে না—কিন্তু আপন সন্তান উমা, সে যদি মায়ের ব্যথা না বুঝে তাহা হইলে উপায় কি! ভাবিয়া চিন্তিয়া মেনকা স্থির করেন:

কালকে ভোলা এলে, বলবো,
উমা আমার নাই ঘরে।

কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে।
বলে বলুক যে যা বলে,
মানবো না আর জামাই ব'লে,
যায় যাবে সে গেলে চলে—
যা হয় তখন দেখবো পরে।
কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে রব' আর পরাণ ধ'রে।
(গিরিশচন্দ্র)

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি জোর করিয়া উমাকে লইয়া যায়। মায়ের প্রাণ আবার আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠে। অবশেষে নবমী-নিশিকে মিনতি করেন :

যেও না রজনী আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
(মধুসূদন দত্ত)

কাঙাল ফিকিরচাঁদও মেনকার এই আকুতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন :

শুনগো রজনি, করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে।
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমাশশী, হিমালয় আঁধার ক'রে।
কি বলবো তোমায় যামিনি, তুমি ত অন্তরযামিনি,
অন্তরের ব্যথা আপনি সকলি জান অন্তরে॥

আর একজন লিখিয়াছেন :

রজনি জননি, তুমি পোহায়োনা ধরি পায়—
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।
সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল,
শঙ্করী যাইবে কাল ছাড়িয়ে দুখিনী মায়।

কিন্তু নিষ্ঠুর নবমী-নিশি এই মিনতি শোনে না। প্রভাত হয় যথানিয়মে। দ্বারদেশে ডম্বরুর ধ্বনি শোনা যায়—হর আসিয়াছেন। গিরিরাজের নিকটে মেনকা বলেন, জামাতাকে বলিয়া দাও যে 'আমি পাঠাবো না উমায়'। স্বামীকে বারবার অনুরোধ করেন—'আশুতোষে আশু তুষে বিদায় করগো এখনি'। কিন্তু গিরিরাজ নির্বিকার। তখন মেনকা কন্যাকে আগলাইয়া বসিয়া থাকেন। যাত্রার সময় আসন্ন। জয়া খবর দিতে আসে। মেনকা বলিয়া দেন—'বল, পাঠানো হবে না, গৌরী আমার একমাত্র নয়নপুতলী। সে যদি সারা বৎসরে তিন দিনও পূর্ণভাবে আমার কাছে না থাকে —তবে ছার এ জীবন। তা ছাড়া রাজার কুমারী সে, যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে তাহা সে জানে না। কিন্তু শ্মশানচারী জন্মভিখারী ভোলানাথের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে মেয়ে আমার নাকালের একশেষ হইয়াছে। কোন লজ্জায় সে আবার আমার কন্যাকে লইয়া যাইতে আসে?

ক্রমাগত তাগাদা আসে মহেশ্বরের নিকট হইতে। গিরিরাজের কাছে গিয়া মেনকা তখন বলেন :

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হোলো বিদার।
(রামপ্রসাদ সেন)

পাষাণ গিরিরাজ হৃদয়ের বেদনা অব্যক্ত রাখিয়া যোগ দেন জামাতার সঙ্গে। মেনকার কোন আকুতি মিনতিই ফলপ্রসূ হয় না। অগত্যা তিনি উমাকে সাজাইয়া গোজাইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেন। তাহাতেও কি নিস্তার আছে! দ্বারপথে আসিতে আসিতে মেনকা কন্যাকে বলেন :

এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা,
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে,
বলে যাও, আসিবে আর কত দিনে এ ভবনে॥
(কমলাকান্ত ভট্টাচার্য)

দ্বারের বাহিরে আসিয়া উমা মায়ের মুখের পানে চাহিয়া শেষবারের মত কথা বলে—'যাই মা'। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় কল্যাণী জননীর মাতৃ-হৃদয় তখনই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। কন্যাকে বলেন :

এস মা, এস মা উমা, বোলো না আর 'যাই' 'যাই'।
মায়ের কাছে, হৈমবতী, ও কথা মা বলতে নাই ॥
বৎসরান্তে আসিস আবার,
ভুলিস না মায়, ওমা আমার।
চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর 'মা' বোল শুনতে পাই ॥

উমা চলিয়া যায়। চোখের জলে মেনকা ভাসিতে ভাসিতে কন্যার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গনিতে থাকেন।

রূপকাশ্রিত এই উমা-মেনকা-কাহিনীর আড়ালে ফুটিয়া উঠিয়াছে বাংলার সংসার-ছবি—অপরিণতবুদ্ধি কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া কন্যাবিধুরা মাতার মানসিক ব্যাকুল অবস্থা, আর কন্যার বিদায়কালে ভগ্ন মাতৃহৃদয়ের অব্যক্ত আর্তনাদ। গ্রাম্য বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের মর্মস্পর্শী পটভূমিকায় সহজ আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগিয়া বঙ্গজননীর কন্যাস্নেহই আগমনী ও বিজয়া গানে রূপ লইয়াছে। লোক-গীতিকায় মধুর মাতৃহৃদয়ের এত সুন্দর পরিচয় আর কোন দেশের লোকগীতিকার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা জানি না।

শ্যামাসঙ্গীত

কথা ও সুর :　　শ্রীরণজিৎকুমার রায়
স্বরলিপি :　　শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার

মিশ্র-বেহাগ : ঝাঁপতাল

\+ ০ + ০
| ১২ | ৩৪৫ | ৬৭ | ৮৯১০ |

পূজিতে বাসনা কালী ভক্তিজবা বিল্বদলে,
দেখে কি দেখনা মা ভাসি' সদাই আঁখিজলে।
ক্রিয়া মন্ত্র জানিনা মা, মন-তন্ত্রী ছিন্নবীণা,
ডাকি মা আজ কোথা তুমি যেওনা অকূলে ফেলে ॥
হৃদ্-কমলে ধ্যান-কালে, ভাসি আনন্দ-সাগর-জলে,
কালীর চরণ-কোকনদে সর্বতীর্থ যেথা মেলে ॥

II ক্মা ক্মা | ক্মা ক্মা ক্মা I পা ক্মপা | ধপা মা গা I
পূ জি | তে ০ বা স না | ০ কালী

গা গা | গমা গরা সা I সা সগা | ক্মপা ক্মা পা I
ভ ক্তি | জ ০ বা বি ল্ব | ০ দ লে

না না | না না না I ধা ধর্নর্সা না | ধপা । । I
দে খে | কি ০ দে খ না — | মা ০ ০

ক্মা ক্মা | পা পা পা I গা ধ পা মা । গা II
ভাসি | স দা ই আঁ খি জ লে ০

II { সা সা | গা পা না I র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
ক্রি য়া | ম ন্ ত্র জা নি | না ০ মা

না না | র্সা র্সা র্সা I না র্ র্সা | না ধা পা } I
ম ন | ত ন্ ত্রী ছি ন্ন | বী ০ ণা

র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা I র্গা র্মা | র্গা র্রা র্সা I
ডা কি | মা ০ আজ কোথা | তু ০ মি

না না | না না র্সা I নার্সা র্রার্সা | নধপা পা পা II
যে ও | না অ কূ লে ০ | ফে লে ০

II পা পা | সা সা সা I গা গা | গা গা গা I
হৃদ্ ক | ম ০ লে ধ্যা ন | কা ০ লে

গা মা | মা মা মা I গা মা | গা গা রা I
ভা সি | আ ন ন্দ সা গর | জ ০ লে

ধা ধা | ধা ধা ধা I না না | র্সা র্সা র্সা I
কালীর | চ ০ রণ কো ক | ন ০ দে

র্সা র্সা | র্গা র্ র্গা র্ র্সা I না ধা | না র্সা র্সা I
স র্ব | তী ০ র্থ যে থা | মে ০ লে

। । | । । । I । । | । । । II II
০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

সমালোচনা

ভগবৎ প্রসঙ্গ—শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ। প্রকাশক—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫। পৃষ্ঠা ২১০, মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত দেবেন্দ্র নাথ মজুমদারের শিষ্য হেমচন্দ্র রায়-কথিত তত্ত্ব-কথার প্রথম প্রকাশ। লেখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, হেমচন্দ্রের শিষ্য, তিনি গুরুসকাশে যে সব আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান পাইয়াছেন তাহাই সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

আলোচিত বিষয়সমূহ: অবতার, কর্মফল ও সমর্পণ-রহস্য, শ্রীগুরু, জন্ম-মৃত্যু। দুরূহ তত্ত্বগুলি গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে বিবৃত হওয়ায় বোধ-সৌকর্য সাধিত হইয়াছে। পুস্তকটির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন আচার্য যদুনাথ সরকার। প্রস্তাবনায় ধর্মের স্বরূপ ও ক্রমবিকাশের চিত্র সুপরিস্ফুট। গ্রন্থের আদিতে হেমচন্দ্র-জীবনস্মৃতি শিক্ষাপূর্ণ, ও পরিশিষ্টে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান উদ্দীপনাপূর্ণ। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

উপনয়নের উপহার—শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল শাস্ত্রী। প্রকাশক: শ্রীনীলাঞ্জনয়ন সান্যাল, ৪৫নং কামারপাড়া রোড, চুঁচুড়া। পৃষ্ঠা ৯০+২৬, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

দশবিধ সংস্কারের মধ্যে উপনয়ন ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ সংস্কার। ব্রাহ্মণ বালকগণ উপনয়নের পর যদি মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করিয়া নিয়মিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি অভ্যাস করিতে পারে তবে তাহারা যে স্বগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আলোচ্য পুস্তকে কোমলমতি বালক-দিগের বোধগম্য সরল ভাষায় ত্রিসন্ধ্যার উদ্দেশ্য সহ ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। উপনয়নকালে ছেলেদের হাতে দেওয়ার মত বইখানি মুদ্রণ-প্রমাদ বর্জিত হইলেই ভাল হইত। প্রচ্ছদপটে ব্রহ্মচারীর চিত্রটি উপযোগী হইয়াছে। —**জীবানন্দ**

বলরাম-মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জীবানন্দ প্রণীত। বলরাম-মন্দিরের ট্রাষ্টী-গণের পক্ষে স্বামী দেবানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। ঠিকানা: ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩, পৃষ্ঠা: ১৬+৶০, মূল্য: ৸০ (৭৫ ন প.)

বাগবাজারে বলরাম-মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলা এবং তাঁহার বাণী-বিকীরণের একটি বিশিষ্ট স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃতে ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে 'মন্দির' নামে অভিহিত হইয়া বলরামগৃহ এক অপার্থিব মর্যাদামণ্ডিত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকে ঐ সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে ঘটনা ও উদ্ধৃতি সহকারে বলরাম-ভবনের পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা ফুটানো হইয়াছে।

একটি অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন সময়ে বলরাম-মন্দিরে কালযাপনের কাহিনীও প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণিত। অতঃপর এই পুণ্যস্থানে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের সহিত এই ভবনের নিবিড় যোগাযোগ নিখুঁতভাবে বিবৃত। পুস্তকের আদিতে বলরাম-মন্দির ও ভক্ত বলরামের জীবন-কাহিনী এবং অন্তে বসুমহাশয়ের পুত্রবধূর 'স্মৃতিকণা' পুস্তকখানিকে মূল্যবান করিয়াছে। স্বামী নির্বাণানন্দজী পুস্তকটির ভূমিকা লিখিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-সংবাদ

কার্যবিবরণী

রাঁচি : রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-আরোগ্য-ভবনের ১০৫৭ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই স্যানাটোরিয়ামটি রাঁচি শহর হইতে দশ মাইল দূরে রাঁচি-চাইবাসা রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে—২,১০০ ফুট উচ্চতায় প্রায় ২৭০ একর পরিমিত বনময় ভূখণ্ডের উপর এই আরোগ্য ভবন গড়িয়া উঠিতেছে। এই স্থান হইতে কলিকাতা ও পাটনার দূরত্ব যথাক্রমে ২৬০ ও ২২০ মাইল। বৈদ্যুতিক আলো উপযুক্ত জল সরবরাহ, নিজস্ব টেলিফোন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৫১ খৃঃ ৫২টি শয্যা (Bed) লইয়া এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয়। সাত বৎসরের মধ্যে ইহা যুগোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য-ভবনে পরিণত হইযাছে। ইহা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যক্ষ্মা-চিকিৎসাকেন্দ্র।

বর্তমানে মোট শয্যা-সংখ্যা ১৭৭—

সাধারণ ওয়ার্ড	১২৪	কেবিন	১৮
বিশেষ „	৯	কটেজ	১৪
অস্ত্রোপচার	১০	অন্যান্য	২

এখানে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগের আধুনিকতম ফুসফুস-অস্ত্রোপচার সহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাদি আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত আছেন। কর্মী, চিকিৎসক ও রোগীসহ এখানে মোট চারশত জন থাকে।

১৯৫৭ খৃঃ ৩০৩টি রোগী চিকিৎসিত হয়, ইহার মধ্যে ৫৩টি বিনা ব্যয়ে। আলোচ্য বর্ষে ১০টি শয্যা সংযোজন ও ৬টি শয্যা-বিশিষ্ট নূতন ওয়ার্ড নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। নূতন পাকশালা, সংগ্রহ-ভবন, ল্যাবরেটরী কর্মী-ভবনের নির্মাণ কার্য চলিতেছে।

স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসায় কঠিন যক্ষ্মা রোগের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সুস্থ কতিপয় ব্যক্তিকে আরোগ্যভবনেরই বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। রোগমুক্ত ব্যক্তিদিগকে কর্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি কলোনীর আশু প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। কলোনীতে টাইপ-রাইটিং, টেলারিং, খেলনা তৈয়ারী, বই বাঁধাই, উদ্যান-সংরক্ষণ প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কলোনী নির্মাণ ও স্যানাটোরিয়ামে আরও ফ্রি-বেডের জন্য সরকার ও বদান্য ব্যক্তি-দিগের সহৃদয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

আসানসোল : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৬ ও '৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৫ খৃঃ এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কর্মধারা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত : ধর্মমূলক, সেবা-সম্বন্ধীয় ও শিক্ষা-বিষয়ক।

আশ্রমে প্রতি বৎসর প্রতিমায় দুর্গা কালী ও সরস্বতী পূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য মহাপুরুষগণের জন্মতিথি ও পর্বদিনের অনুষ্ঠান সমূহ যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে।

১৯৫৬ খৃঃ বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় বন্যার্তদের মধ্যে এবং '৫৭ খৃঃ উখরা গ্রামের সন্নিকটে অগ্নিকাণ্ডে উৎখাত লোকদের মধ্যে সেবাকার্য চালানো হয়।

আশ্রমের শিক্ষা-বিভাগটিই প্রধান। ১৯৩৯ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়টি '৫৭ খৃঃ বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। পশ্চিম-

বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষ ২১,৬০০৲ সরকারী সাহায্য পাইয়াছেন, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন।

উচ্চ বিদ্যালয়ের গত চার বৎসরের মোট ছাত্র সংখ্যা, প্রবেশিক পরীক্ষার্থী-সংখ্যা ও তাহাদের পাশের হার প্রদত্ত হইল :

১৯৫৪	৬৪২	৬২	৯৩.৫%
'৫৫	৬২৪	৫৫	৯৮.২
'৫৬	৬৮৬	৪৯	৯৪
'৫৭	৭৩৩	৫৯	৮৭.৭

পুরাতন ছাত্রাবাসে গত দুই বৎসরই ১৬ জন করিয়া ছাত্র ছিল। উপরের শ্রেণীগুলির ছাত্র-দিগকে বিদ্যার্থিভবনে রাখা হয়। মেধাবী অথচ দরিদ্র—এরূপ কয়েকটি ছাত্রকে ফ্রি রাখার ব্যবস্থাও আছে।

পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য আর একটি নূতন ছাত্রাবাস খোলা হইয়াছে, বিদ্যালয়েব প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পরি-চালনাধীনে বর্তমানে ৩৫টি বিদ্যার্থী এখানে অবস্থানের সুযোগ পাইয়াছে। আশ্রমের গ্রন্থাগারটির ক্রমোন্নতি লক্ষণীয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডক্টর ভগবান দাস

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বারাণসীতে ৯০ বৎসর বয়সে বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর ভগবান দাস পরলোক গমন করিয়াছেন, বৎসরাবধি তিনি হৃদরোগে শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বোম্বাইএর রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ বিমানযোগে অন্তিমকালে পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন।

১৮৬৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান দাস ১৮৮৫ খৃঃ বি এ পাশ করেন। দুই বৎসর পরে (Mental and Moral Science) এম. এ পাস করিয়া তিনি সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়াছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিয়া কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে যোগদান করেন, এবং ১৮৯৯ খৃঃ ঐ কলেজের ট্রাষ্টি বোর্ডের সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়া ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন।

১৯২০ খৃঃ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর যখন ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক সঙ্কটাপন্ন—তখন প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, দেশপ্রেম ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া দেশবাসী মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়। ১৯২১ খৃঃ হইতে তিনি কাশী বিদ্যাপীঠ ও হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের কাজের সহিত যুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি অল্প কিছুদিন কারারুদ্ধ থাকেন, পরে কাশী ম্যুনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

তাহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। ১৯২৯ খৃঃ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অব লিটারেচর' উপাধি দান করেন। ১৯৩৫ খৃঃ তিনি যুক্তপ্রদেশ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ভারত সরকার ১৯৫৫ খৃঃ তাঁহাকে 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ডক্টর ভগবান দাস বহু পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় দর্শন ও মনোবিজ্ঞান-সংক্রান্ত। 'Unity of all Religions' (—সকল ধর্মের একত্ব) সমধিক পরিচিত, কতকগুলি পুস্তক বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন হইতে 'Cultural Heritage of India' গ্রন্থের নূতন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইতেছে, তাহার চতুর্থ খণ্ডের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা ডক্টর ভগবান দাসের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

সিন্ধু: (সহরপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৫৭ ৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ:

১৯৫৩ খৃঃ এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ২০৫ খানি পুস্তক লইয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৪ হাজারের বেশী রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পূর্ব বৎসরের মতই অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের সভায় বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ বক্তৃতা করেন। দরিদ্র ব্যক্তিগণের মৃতদেহ-সংকারে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য কার্য।

ফুসফুসে ক্যান্সার

ফুসফুস-ক্যান্সারের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ডাঃ এডগার মেয়ার কলিকাতায় বলেন যে, ডিজেল ইঞ্জিন-যুক্ত মোটর হইতে বহির্গত ধোঁয়া ফুসফুসে ক্যান্সার রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। কলিকাতায় অধিকাংশ বাস-ই ডিজেল ইঞ্জিনে চলে। ডাঃ মেয়ারের মতে ধূমপান এবং কল-কারখানা ইত্যাদি হইতে উত্থিত ধোঁয়াও ফুসফুস-ক্যান্সারের কারণ।

শিশুকল্যাণ

শিশু এবং শিশু অপরাধীদের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন, চিকিৎসা, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকারকে দেশের সমস্ত রাজ্যে ও এলাকায় একই ধরনের আইন প্রবর্তন করিতে অনুরোধ করিয়া ভারতীয় শিশুকল্যাণ-পরিষদের সাধারণ সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অপর এক প্রস্তাবে শিশুকল্যাণের জন্য একটি ব্যাপক কার্যক্রম তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের মান অবনত হওয়ায় এবং তাহাদের ডাক্তারী পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত না থাকায় পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রত্যেক স্কুলে ও শিশুপ্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে এক প্রস্তাবে অনুরোধ করা হয়।

মেট্রিক সিস্টেম

টাকা কড়ি ওজন মাপ প্রভৃতিকে মেট্রিক বা দশমিক প্রণালী পৃথিবীতে ৭৭টি দেশে আইনতঃ গৃহীত, ১৬টি দেশে বিকল্পভাবে গৃহীত এবং ৪টি দেশে সরকারী ভাবে চালু। এশিয়ার যে সকল দেশে এবং যে বৎসর উহা গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯১১—শ্যাম (ভিয়েতনাম)	১৯৩৫ ইরান
১৯১৪—কাম্বোডিয়া	১৯৩৬ থাইল্যাণ্ড
১৯১৭—ফিলিপাইনস্‌	১৯৩৮ ইণ্ডোনেশিয়া
১৯২৬—আফগানিস্তান	১৯৫২ জাপান
১৯৩০—চীন	১৯৫৪ জর্ডন
১৯৩৫—সিরিয়া	১৯৫৪ ইস্রায়েল

ভারতে গত বৎসরে (১৯৫৭) দশমিক মুদ্রা চালু হইয়াছে, এ বৎসর দশমিক ওজন চালু হইল, প্রথম দুই বৎসর ঐচ্ছিক থাকিবে।

প্রাণের মহিমা

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজুংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥

প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি ॥

—প্রশ্নোপনিষদ্ (২।৫,৬,১৩)

এই প্রাণই অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত, সূর্যরূপে প্রকাশিত, এই প্রাণই মেঘরূপে বর্ষণ করে, ইন্দ্ররূপে দুষ্টের দমন করিয়া প্রজা পালন করেন, এই প্রাণই বায়ুরূপে প্রবাহিত, এই প্রাণই পৃথিবীরূপে সকলকে ধারণ করেন, চন্দ্রমারূপে সকলকে পোষণ করেন, এই প্রাণই স্থূল সূক্ষ্ম সব কিছু। মৃত্যুর পারে যে অমৃত জীবন তাহাও এই প্রাণ।

রথচক্রের নাভিতে শলাকাসমূহ যেমন যুক্ত থাকে তেমনই—শ্রদ্ধা, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য, তপস্যা, মন্ত্র, যজ্ঞ, কর্ম ও কর্মফল, লোকসমূহ ও নামরূপ সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। বেদত্রয়, যজ্ঞ এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ—সকলই এই প্রাণ।

ইহলোকে যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু সকলই প্রাণের অধীনে, পরলোকের যাহা কিছু তাহাও প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব হে প্রাণ, মাতা যেরূপ পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, তুমি আমাদের সেইরূপ রক্ষা কর! তুমি আমাদের জন্য সম্পদ্ ও প্রজ্ঞা বিধান কর।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি।

'আমরা ভারতবাসীরা কি ধার্মিক ?'

সম্প্রতি ভারতের একটি খ্যাতনামা সাপ্তাহিক পত্রিকায় (Illustrated Weekly of India) উপরি-উক্ত আলোচনার সূত্রপাতকারী প্রবন্ধের অভিজ্ঞ লেখক—প্রথমেই এই প্রশ্নের আওতা হইতে মুসলমান, খৃষ্টান, আদিবাসী ও বৌদ্ধদের বাদ দিয়াছেন। তাহা হইলে কাট ছাঁট দিয়া প্রশ্নটি দাঁড়াইল: 'হিন্দুরা কি ধার্মিক ?'

প্রশ্নবীজের অন্তর্নিহিত উত্তর বোধ হয়—'না'। —অথবা উদ্দেশ্য 'ধর্ম' শব্দের নূতনতর কোন সংজ্ঞার অনুসন্ধান। ইহা বোধ হয় একমাত্র হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেই সম্ভব। অন্যান্য প্রচলিত 'ধর্ম' সম্বন্ধে এ প্রশ্ন উঠে না, কারণ অধিকাংশ ধর্মই কতকগুলি স্থির বিশ্বাসের ও বাঁধাধরা রীতিনীতির বাণ্ডিল। হিন্দুধর্মই মানব-জীবনের মতো সংজ্ঞার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে চাহে না,—তাই ইহা এত ব্যাপক, এবং বোধ হয় সেইজন্যই ইহা সরল হইয়াও দুর্বোধ্য।

একদা জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন, 'From lowest fetishism to highest Advaitism—this is Hinduism'. নিম্নতম স্তরের পাথরপূজা ভূত-পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সকলই হিন্দুধর্ম নামে প্রচলিত। হিন্দুধর্ম বিশ্বজনীন মানব-ধর্মেরই নামান্তর—অন্যান্য সকল ধর্মকে সেই মহান্ ধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদায়বিশেষ বলা যায়। দেশভেদে, কালভেদে, ভাষাভেদে ধর্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করে—একথা বিশ্বাস করে বলিয়াই হিন্দুধর্ম প্রচারশীল হইলেও সংগ্রামশীল হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম সহনশীল ও উদার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মহৎ গুণই আজ তাহার দুর্বলতা বলিয়া প্রতিভাত হয়। নিরীহ হিন্দুর সমাজে সংহতি নাই, কেহ তাহাকে আক্রমণ করিলে কোথাও কোন প্রতিক্রিয়া নাই।

অন্য ধর্ম সম্বন্ধে কেহ ঐ প্রকার প্রশ্ন করিতেই সাহসী হয় না, সকলে জানে এখনই প্রতিক্রিয়ায় হট্টগোলে আকাশ বাতাস মুখরিত হইবে, হয়তো বা পত্রিকার আফিসই লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে। তাই বুদ্ধিমান্ লেখক সকলকে বাদ দিয়া হিন্দুকেই ধরিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ—হিন্দুর আত্মবিশ্লেষণও—হইতে পারে এবং কার্যতঃ তাহাই হইয়াছে। তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম হইতে চিন্তাপূর্ণ নানা আলোচনা আসিয়াছে, সেই দিক দিয়া আলোচনার সূত্রপাত করা সার্থক হইয়াছে। কিন্তু আলোচনাগুলি সমস্যার গভীর কেন্দ্রস্থান স্পর্শ না করিয়া অগভীর শৈবালাচ্ছন্ন কিনারাতেই ঘোরাফেরা করিয়া জল ঘোলা করিয়াছে, সুপেয় স্বচ্ছ শীতল জল সরোবরের অক্ষুব্ধ অন্তস্তলে।

ধর্ম বলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূজা-পার্বণ, তীর্থ-উপবাস প্রভৃতি ধর্মের উপরিভাগের খোলাটিকেই ধরা হইয়াছে; বড় জোর সমাজের রীতিনীতি আচারব্যবহারকে শেষ পর্যন্ত স্পৃশ্যা-স্পৃশ্য ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারকেই ধর্ম বলিয়া ভুল করা হইয়াছে, এবং এই ভুলের ব্যাপকতা যে

সমগ্র ভারত জুড়িয়া—তাহা এই আলোচনার মাধ্যমে ধরা পড়িয়াছে।

একটি আলোচনায় 'পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত' রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কর্মের প্রতি সামান্ত সহানুভূতিসূচক উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের নব বেদান্ত বা তাঁহার যোগ-গ্রন্থাবলী—যাহা গত শতাব্দীতে ইওরোপ ও আমেরিকাকে নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছে—ভারতের শিক্ষিত সমাজে কি তাহা এতই অজ্ঞাত যে হিন্দুধর্মের নবতর মূল্য-নিরূপণে তাহার কোনই উল্লেখ পাওয়া গেল না ?

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাহা সহজে স্থূলদৃষ্টিতে ধরা পড়িবার কথা নহে। নানা আচার-বিচারের জল ও জঙ্গলপূর্ণ তরাই-অঞ্চল হইতে উঠিতে শুরু করিয়া হিন্দু-ধর্মের হিমালয়-পর্বতশ্রেণী আধ্যাত্মিকতার শান্ত শুভ্র তুষার-শিখরে শেষ হইয়াছে। হিন্দু ভারত জানিয়াছে, বুঝিয়াছে—না থামিয়া পথ চলিতে পারিলে সকলেই একদিন একই মহাসত্যে উপনীত হইবে। ইহাতে বিরোধের কিছু নাই।

চিন্তাশীল লেখক অবশ্য আলোচনাটিকে ইচ্ছা করিয়াই দ্বিমুখী করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য: ভারতের সেকুলার রাষ্ট্রে দুইটি পরিকল্পনা কিরূপে হিন্দুসমাজের পরিবর্তন সাধন করিয়াছে—এবং হিন্দুধর্ম তাহার নীরব নিষ্ক্রিয় সাক্ষী, হয়তো তাহার কারণ—ঐ ধর্মে আর প্রাণশক্তি নাই, হয়তো শীঘ্রই হিন্দুনামধারীরা ধর্মহীন সমাজশক্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইবে।

তিনি বলিতে চাহেন: এক দিক দিয়া ভারতবাসীরা (হিন্দুরা) পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মপরায়ণ অর্থাৎ ঈশ্বরভীরু, আবার আর এক দিক দিয়া তাহারা সর্বাপেক্ষা ধর্মহীন—ঈশ্বরকে ও ধর্মজীবনকে তাহারা অর্থ-উপার্জনের ও জীবিকার অন্যতম উপায়রূপে ব্যবহার করে।

এই চিন্তা-দ্বন্দ্বের মূলে অসম্পূর্ণ শব্দার্থবোধ ও তজ্জনিত বিরোধ। পাশ্চাত্ত্য শব্দ 'religion'-কে যখন 'ধর্ম' বলি, তখনই আমরা আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা বিসর্জন দিয়া ফেলি।

বৌদ্ধ ত্রিশরণ মন্ত্রেও 'ধর্ম' প্রথম সোপান মাত্র। ধর্ম কখনই শেষ কথা নয়, বুদ্ধভাবে বিলীন হওয়াই শেষ কথা। গীতারও উক্তি: সকল 'ধর্ম' পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও! ইহা দ্বারা নিশ্চয় প্রমাণিত হয়, ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ ধর্ম অপেক্ষা উচ্চতর সাধনা। তবে ইহাও ঠিক —প্রথম সোপানেই সাধনার প্রথম স্তর আরম্ভ।

অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরপরায়ণতা-রূপ শেষ স্তরকেই 'ধর্ম' বলা হইয়াছে, আর হিন্দুধর্মে শেষ স্তরের প্রাপকস্বরূপ সোপানশ্রেণীকেই ধর্ম বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ধর্মই সংসারবিমুখ, তাহাদের মতে ধর্ম ও ঈশ্বর সংসারের বাহিরে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় হিন্দুই ধর্মের নামে ইহ-বিমুখ, যদিও প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর ধর্ম জীবনের সকল স্তরকে—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে স্বীকার করিয়া।

আজ তাই বড় প্রশ্ন উঠিয়াছে: ঐহিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি একই সঙ্গে সম্ভব কি না? সব কিছু ঈশ্বরভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ভারত একদিন এ সমস্যার সমাধান করিয়াছিল, সেদিন ভারতবাসী অভ্যুদয়ের সাধনা সাঙ্গ করিয়া ধীর স্থিরভাবে নিঃশ্রেয়সের সাধনায় মগ্ন হইত, ভোগের সাধনা শেষ করিয়া সে শান্তভাবে যোগের সাধনা করিত! আজ সে 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ'। আজ সে জানে না তাহার ধর্ম কি, কি করিয়া সে বুঝিবে তাহার কর্ম কি?—সে কি প্রলয়কালীন ঘূর্ণাবর্তে তৃণ-খণ্ডের মতো ভাসিয়া চলিবে? না কি—বিজ্ঞ নাবিকের নির্দেশে দূরাবস্থিত আলোকস্তম্ভের আলোকরেখা দেখিয়া দিগ্‌দর্শন যন্ত্রসহায়ে জীবন ও সমাজকে চালিত করিবে?

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী

আগামী ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের শততম জন্মদিন। এই শুভদিনটিকে ঘিরিয়া ভারতের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা এক দিন অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজ পত্রপল্লবের—ফলফুলের সমারোহে অঙ্কুরোদ্গমের সেই মহা-দিনটি বিস্মৃতির অন্তরালে।

যেদিন বিজ্ঞানের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা ভারতের বুকে আধুনিকতার অভিযান চালাইয়াছিল, জানিয়া শুনিয়া দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করিয়াছিল—সেদিন যে অজ্ঞাতকুলশীল বীর সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন এবং নিজের অক্লান্ত সাধনা দ্বারা বিজ্ঞানের জগৎসভায় ভারতের স্থান করিয়া দিয়াছিলেন তিনি শুধু সাধারণ অর্থে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নন, তিনি জড় ও চেতনের মধ্যে প্রাণ-লীলার আবিষ্কর্তা সত্যদ্রষ্টা ঋষিপ্রতিম,—প্রাচীন ভারতপ্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারীও বটে।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সেই নবজাগরণের ক্ষণে যখন পূর্ব দিগন্ত উষার অরুণিমাদীপ্ত,—যখন বঙ্গজননীর অঙ্গন আলোকিত করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছিলেন—ধর্ম বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প রাজনীতি প্রভৃতির সকল দিকের দিক্‌পাল-গণ—আমরা সেই শুভলগ্নটি স্মরণ করি। পূর্ব-দিগঙ্গনের আলো আজ সারা ভারতে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু পূর্বদিশা মেঘাচ্ছন্ন। জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রার্থনা করি এ মেঘ কাটিয়া যাক—মধ্যাহ্নের দীপ্তালোকে সারা আকাশ উজ্জ্বল হউক।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও ভগিনী নিবেদিতা

ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী

আগামী ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের জন্মের শতবার্ষিক উৎসবে সমস্ত দেশ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতিবেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবে। এই শুভলগ্নে ভারত-মাতার সেই বীর সন্তানের স্মৃতি-তর্পণ করতে গিয়ে পাশাপাশি ভেসে ওঠে পরমপ্রদীপ্তা মহীয়সী নারী ভগিনী নিবেদিতার দেবী মূর্তি। ভারতসভ্যতার ইতিহাসে এই দুই দুর্লভ ব্যক্তিত্বের একটি আদর্শ নিয়ে পাশাপাশি এসে দাঁড়ানো—এক ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা। তার যথাযথ গুরুত্ব বুঝতে হ'লে অর্ধ শতাব্দীরও কিছু বেশী পিছন দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ, ইওরোপের প্রাণকেন্দ্র প্যারিস মহানগরীতে আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্‌ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমাগত। সেই জগৎসভায় ভারতবর্ষের প্রতি-নিধিরূপে উপস্থিত নবীন বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশ-চন্দ্র বসু। আজকের দিনে এ কিছু অসাধারণ ঘটনা নয়, কিন্তু পরপদানত ভারতবর্ষে সেদিন একজন ভারতীয়ের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজ জন্মভূমির পরিচয় দেওয়া অভাবনীয় ছিল।

ঘটনাক্রমে পাশ্চাত্ত্যচিত্ত-বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন প্যারিসে, সঙ্গে রয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ কয়েকজন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের সম্মানে আনন্দিত দেশপ্রেমিক

সন্ন্যাসী বাংলায় লিখছেন 'পরিব্রাজকের' চিঠিতে:

এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরী ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি বোস! একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!

৫৮ বছর আগে উচ্চারিত হ'লেও স্বামীজীর সে আশীর্বাণী আজও কি আমাদের হৃদয়ে অনু-রণিত হচ্ছে না?

পূর্বেই বলেছি, ভগিনী নিবেদিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্বে ১৮৯৮ খৃঃ কলিকাতায় বসু-পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কথাও তিনি জানতেন। কিন্তু সেদিন প্যারিসের সভায় স্বামীজীর সঙ্গে ভারতের গৌরবে উদ্দীপ্তা ভগিনী নিবেদিতার বিমুগ্ধ প্রশংসাবাণী নিশ্চয় নূতন বৈজ্ঞানিককে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিল। সেদিন তিনি কী বলেছিলেন তা আমরা জানি না। কিন্তু মাত্র দশ বছর পরে ৩০শে নভেম্বর, ১৯১০ খৃঃ জগদীশচন্দ্রের এক জন্মদিনে ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে যে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। তিনি লিখলেন:

When you receive this, it will be our beloved 30th, the birthday of birthdays. May it be infinitely blessed and may it be followed by many many ever increasing sweetness and blessedness! Outside there is the great statue of Christopher Columbus and under his name only the words, 'La Patric' and I thought of the day to come when such words will be the speaking silence under your name—how spiritually you are already reckoned with him and all those other great adventurers who have sailed trackless seas to bring their people good. Be ever victorious! Be a light unto the people, and a lamp unto their feet, and be filled with peace! You, the great spiritual mariner who have found new worlds

এই প্রসঙ্গে আর এক ৩০শে নভেম্বরের কথা মনে আসছে। ১৯১৭ খৃঃ সেই দিনটী বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন-দিবস। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর উদ্বোধন-ভাষণে বলেন, 'আজ আমি এই ভবন উৎসর্গ করলাম, এটি শুধু গবেষণাগার নয়, এটি একটি মন্দির।' বিজ্ঞান ও চারুকলার অপূর্ব সমন্বয়ে নির্মিত এই মন্দির যথার্থই ভারতের নবযুগের নিদর্শন।

মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে চোখে পড়ে বাঁ দিকের ফোয়ারার সামনে দেওয়ালে খোদিত একটি মহিলার আবক্ষ মূর্তি—হাতে প্রদীপ, যেন পথ দেখিয়ে চলেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে একটি মাত্র 'Lady with the Lamp'-এর কথা আমরা জানি, তিনি ভগিনী নিবেদিতা। ভারতের দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প ইত্যাদির পাতায় পাতায় কত সম্পদ্ আমাদের বিস্মৃতির অন্ধকারে অবহেলিত, তার প্রত্যেকটির উপর তাঁর প্রদীপের আলো এসে পড়েছে।

আবার মন্দিরকে সামনে রেখে উপরে তাকালে মন্দিরচূড়ায় দেখা যায় বজ্র, যা ভগিনী নিবেদিতা ত্যাগ ও শক্তির প্রতীক ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। উল্লিখিত দুটি জিনিসই কি ভগিনীর প্রতি আচার্যের অন্তর-মথিত নির্বাক শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়? আচার্য বসুর জীবন আগাগোড়াই এক সাফল্যের সুরে বাঁধা ছিল না। চব্বিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, জয়-পরাজয়ের একাধিক সংঘাত তাঁর সফলতা-লাভের পথে বহু বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অনন্যসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তাবলে তিনি সব বিঘ্ন জয় করেন। পূর্বের সেই দুর্যোগে যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন, বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনে তাঁদের সকলকে তাঁর মনে পড়েছে। তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন: 'আমার জীবন-সংগ্রামে আমি একা ছিলাম না। জগৎ বার বার আমায় অবিশ্বাস করেছে, আমার আবিষ্কারের সত্যতায় সন্দেহ করেছে, কিন্তু তখনও কয়েকজন আমার পাশে উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের আমার প্রতি গভীর বিশ্বাস কখনও একবিন্দু টলেনি—আজ তাঁরা পরপারে।' আমরা জানি উল্লিখিত 'কয়েকজনের' মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা শুধু অন্যতমাই ছিলেন না, আরও কিছু ছিলেন।

আচার্য বসুর জীবনীকার অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস ১৯১৯ খৃঃ লেখেন, 'বিজ্ঞান গবেষণাগারের বিপুল সম্ভাবনায় ভগিনী নিবেদিতার অটল বিশ্বাস ছিল শুধু বিজ্ঞানের উন্নতি নয়—এটি ভারতের নবজাগরণের আশায় সমুজ্জ্বল।'

ভগিনী নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি জগদীশচন্দ্রের একখানি জীবনী লিখবেন। কিন্তু ১৯১০ খৃঃ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং ক্রমশঃ তাঁর ধারণা হয়, তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। সেই সময় তিনি তাঁর বন্ধু আমেরিকা-নিবাসী মিসেস বুলকে লেখেন:

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বার বছর শেষ হয়ে আসছে,… মনে হয় আমার জীবনের আর দু'এক বছর বাকী। আশঙ্কা হয়, বোধ হয় আমি জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখবার জন্য বেঁচে থাকব না। কিন্তু জানি তুমি অন্ততঃ একশত পাউণ্ড রেখে যাবে। এইটী ভারতের খরচে ভারতেই ছাপা হতে পারবে, আর আমার সমস্ত কাগজপত্র তাদের হাতে তুলে দেব। তবু আমি যে ভাবে তাঁকে দেখেছি, সে ভাবে বোধ হয় আর কেউ কোনদিন তাঁকে দেখবে না। বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে তাঁর প্রতিমুহূর্তের বিরামহীন সংগ্রাম এবং কি সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি ঐ সংগ্রাম করে গিয়েছেন, ন—বোধ হয় সব থেকে ভাল ক'রে তার বর্ণনা দিতে পারবে।

১৯১১ খৃঃ দেহত্যাগ করায় নিবেদিতার পক্ষে ঈপ্সিত জীবনী রচনা সম্ভব হয় নি। কিন্তু নিবেদিতার ইচ্ছানুসারে পরবর্তীকালে অধ্যাপক গেডিস কর্তৃক ঐ জীবনী রচিত হওয়ায় তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। সম্ভবতঃ তাঁর পত্রে উল্লিখিত কাগজপত্র ভাবী জীবনীকারের জন্য সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল।

এবার আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে ভগিনী নিবেদিতার আগ্রহের উৎস কোথায়? যাঁরা ভগিনীর জীবন-সঙ্গীতের ধারা প্রথম থেকে অনুসরণ করেছেন, তাঁরা জানেন—কেন তিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আচার্যের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আচার্য বসুর জীবনী তাঁর কাছে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ঘটনাবলী মাত্র নয়—নয় শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী, এ যেন স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানের ছবি, পুরাতন ভারতের শ্মশানভস্মের মধ্য থেকে নবীন ভারতের নব আবির্ভাবের সূচনা। রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীদের জন্মের পর থেকে যে ইতিহাসের অগ্রগতি শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও অব্যাহত, আচার্য বসুর জীবন কী তারই এক মহিমময় অধ্যায় নয়?

জানালায় আকাশকে ধরা যায় না, বাঁধানো ছবির সীমিত ফ্রেমের মধ্যে আঁকা যায় না প্রকৃতির অখণ্ড রূপটি, তেমনি জীবনচরিতের

নিয়মিত সীমার মধ্যে জীবনের আংশিক ছায়া মাত্র প্রতিবিম্বিত হ'তে পারে, পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব। জীবন তার অখণ্ডতায় জীবনীকে অতিক্রম ক'রে যায়, এই বৈজ্ঞানিকের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

আচার্য বসু জীবন-সাধনায় জয়ী হয়ে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেই বিজয়লাভ করতে তাঁকে সুদীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমাকে চিরকাল নানা বিরূপতার সঙ্গে, বাধার সঙ্গে লড়তে হয়েছে আর বরাবরই তা করতে হবে।'

*   *   *

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা পুত্রও পেয়েছিলেন। তাঁর জীবন-মধ্যাহ্নে নিজ জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে পিতার সে ঋণ অকুণ্ঠ-চিত্তে স্বীকার ক'রে তিনি বলেছিলেন, 'এ জীবন যদি সার্থক হয়ে থাকে, তবে একথা মানতেই হবে যে আমার পিতার যে চরিত্রবল ছিল তাই আমাকে জীবনের একাধিক আঘাতকে সইবার শক্তি দিয়েছে। আমার চেয়ে অনেক বেশী সংগ্রাম আমার পিতার মহত্তর জীবনে দেখেছি।'

জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর সহজাত কৌতূহল ও আকর্ষণ ও ঐ সকল বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ঐ সময় থেকেই পরিস্ফুট হ'তে থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ব'লে তখনও তিনি গ্রহণ করেননি, বরং পিতার আর্থিক সঙ্কট দূর করবার উদ্দেশে তখনকার দিনের ভাল ছেলেদের মত জগদীশচন্দ্র বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যাবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু পিতা ভগবানচন্দ্র ছিলেন দেশভক্ত ও জাতীয়ভাবাপন্ন। সুতরাং নিশ্চিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য প্রচুর অর্থাগমের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে বিজ্ঞানের উচ্চতর পাঠ নেবার জন্য তিনি ছেলেকে ইংলণ্ড যেতে উৎসাহিত করলেন। বলা বাহুল্য এই মেধাবী ছাত্র শীঘ্রই লণ্ডনস্থ অধ্যাপকদের কাছে এত প্রশংসা অর্জন করলেন যে ফিরে আসার সময় ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে (Indian Education Service) একটি চাকরির জন্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপনের নামে এক প্রশংসাপত্র নিয়ে এলেন। কিন্তু সে পরাধীনতার যুগে একজন ভারতীয়ের পক্ষে শুধু নিজের মেধা ও কৃতিত্বের দ্বারা উন্নতি করা সম্ভব ছিল না, এমনকি বড় লাটের পরিচয় পত্র থাকা সত্ত্বেও সে সময়ের শিক্ষা অধিকর্তা (D P.I.) তাঁকে স্থায়ী অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করতে অস্বীকার করলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিতান্ত উপরওয়ালার চাপে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রকে এক অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করলেন। জগদীশচন্দ্রের যোগ্যতার প্রতি কটাক্ষ ক'রে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এই নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। জগদীশচন্দ্র কিন্তু অবিচল নিষ্ঠায় তাঁর গবেষণার ও শিক্ষকতার কাজ ক'রে যেতে লাগলেন।

ভারতীয় অধ্যাপকদের আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠায় জগদীশচন্দ্রকে আর এক সংগ্রাম করতে হয়। তখনকার দিনে একজন ভারতীয় অধ্যাপক, ইওরোপীয় অধ্যাপকের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র পেতেন। জগদীশচন্দ্র অস্থায়ী পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর বেতন হ'ল তারও অর্ধেক। নিঃশব্দ প্রতিবাদে তিনি বেতন গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন, ফলে কতবড় অর্থ-সঙ্কটের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য তিন বছর পরে কর্তৃপক্ষ এই পার্থক্য তুলে দিতে বাধ্য হন এবং জগদীশচন্দ্রকে তিন বছরের বেতন একসঙ্গে দেওয়া হয়।

তারপর চলল বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার। চেতন ও অচেতনের ভিতর প্রাণের সাড়া (Response of living and non-living) নিয়ে পরীক্ষা ক'রে জগদীশচন্দ্র নিজের আবিষ্কারে নিজেই অভিভূত। এই সময়ে তাঁর মনের অবস্থা রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর এক পত্রে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন, "অনেক অত্যাশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে। আমি কি করিয়া সে সব ভাষায় প্রকাশ করিব, ভাবিয়া পাই না। এখন আরও যাহা যাহা নূতন পাইতেছি তাহা আমাকে নির্বাক্ করিয়াছে।" (ক্রমশঃ)

স্বামী নির্বেদানন্দের দেহাবসান

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৫-৫৮ মিঃ সময় রামকৃষ্ণ মিশন গভর্নিং বডির অন্যতম সদস্য ও রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাষ্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেণ্টস্ হোমের (কলিকাতা বিদ্যার্থি-আশ্রম) প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি স্বামী নির্বেদানন্দ ৬৬ বৎসর বয়সে রক্তচাপ-জনিত (cerebral haemorrhage) ব্যাধিতে বেলঘরিয়া বিদ্যার্থি-আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি ঐ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, চিকিৎসার যথাসম্ভব সুব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলেও সম্প্রতি মঠ মিশনের কর্মে অপেক্ষাকৃত সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেছিলেন, কিন্তু শেষ দিন ভোর বেলা হইতেই শরীর অসুস্থ বোধ করায় শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হন, এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ দরুণ সকালেই বাহ্য সংজ্ঞা লুপ্ত হয়, এবং সন্ধ্যার সময় প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। রাত্রেই কাশীপুরের মহাশ্মশানে তাহার শেষ কার্য সমাপ্ত হয়।

স্বামী নির্বেদানন্দ ১৮৯৩ খৃঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বরিশালবাসী এবং পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুল হইতে ১৯০৯ খৃঃ এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি এস-সি পাস করেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ সতীর্থদের মধ্যে অধ্যাপক সত্যেন বসু, ডাঃ জে, সি. ঘোষ, ডাঃ জে, এন্ মুখার্জি এবং স্বর্গত ডাঃ মেঘনাদ সাহা-র নাম উল্লেখযোগ্য। অতঃপর বি এ পাশ করিয়া ১৯১৬ খৃঃ তিনি ইংরেজীতে এম এ পাস করেন।

এই সময় তিনি রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন, বিশেষ করিয়া শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ এবং শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের পূতসঙ্গ লাভের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই ১৯১৯ খৃঃ ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন। ১৯২৩ খৃঃ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি স্বামী নির্বেদানন্দ নামে পরিচিত হন।

১৯১৬ খৃঃ কয়েকটি মাত্র বিদ্যার্থী লইয়া স্থাপিত আশ্রম নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া আজ বেলঘরিয়ায় এক শত বিঘা জমির উপর আশ্রম-পরিবেশের মধ্যে একটি আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার লাভের ছাত্রাবাসে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে প্রায় ৯০টি ছাত্র এখানে বাস করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করে। এই বিদ্যার্থি-আশ্রমে শিক্ষিত ছাত্রেরা সুগঠিত-চরিত্র হইয়া একদিকে যেমন সংসারে প্রবেশ করিয়া সমাজের সেবা করে, অন্যদিকে ৪০ বৎসরে প্রায় ৩০ জন বিদ্যার্থী ক্রমে ক্রমে রামকৃষ্ণসংঘে যোগদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে উহা প্রচারে নিরত আছে।

স্বামী নির্বেদানন্দ দেশের শিক্ষা-সমস্যার অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া বহু অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল পুস্তকাকারে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'Our Education,' 'Hinduism at a glance' 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' 'Religion and modern doubts,' 'The Holy Mother' একদিকে যেমন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি সরল অথচ সবল ভাষার রচয়িতারূপে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শান্ত সৌম্যদর্শন এই সরলস্বভাব সন্ন্যাসী শুধু মাত্র অক্লান্ত কর্মী বা মেধাবী লেখক ছিলেন না, তাঁহার আধ্যাত্মিক গভীরতার ও সহৃদয় ব্যবহারের জন্য বহু যুবক তাঁহাকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করিত।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন, দেওঘর বিদ্যাপীঠের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সারদাপীঠের তথা বেলুড় বিদ্যামন্দিরের আরম্ভকাল হইতেই তিনি ছিলেন সভাপতি। এতদ্ব্যতীত অনেক কাল ধরিয়া তিনি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও কালচার ইনষ্টিটুটের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনই ক্ষতিগ্রস্ত হইল না—পরন্তু ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর নিকটও এই ক্ষতি অপূরণীয়।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ।। শান্তিঃ।।।

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

স্বামী রাঘবানন্দ-লিপিবদ্ধ

[পূর্বানুবৃত্তি]

আলমোড়া—৯ই জুলাই, ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আমরাও আগে নির্বাণকে বলে সর্বশ্রেষ্ঠ জেনেছিলাম। তারপর ঠাকুরের কাছে কত ধমক খেয়েছি। তিনি বলেছেন, তোরা হীনবুদ্ধি। শুনে অবাক্ হয়েছি, নির্বাণলাভকে হীনবুদ্ধি বলেছেন। তবে এইজন্য তাঁর উপর খুব শ্রদ্ধা ও খুব বিশ্বাস ছিল।

১৮ই জুলাই

স্বামীজীর Lecture on Vedantism (বেদান্তবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা) পড়া হ'ল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তাঁর কথা সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এই তোমরা এত সব লেখাপড়া শিখে এলে—সব ত্যাগ ক'রে। কি করছ? দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কোন রকমে দিন যাপন হচ্ছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'মা দিন তো গেল, এখনো তোমার দেখা পেলুম না'—সেই রকম কে বলে? সে রকম ইচ্ছা কই? Damp, spiritless (ম্যাদাটে, নিস্তেজ) নিরুদ্যম হয়ে বসে আছ। এ সব পড়ে রক্ত গরম হয় না? তোমাদের যেন মাছের রক্ত। 'জীবন্মৃতঃ কোঽবা? নিরুদ্যমো যঃ।'

জীবনের সাতাশ বৎসর কেটে গেল। স্বামীজী বলেছিলেন, ঊনত্রিশ বৎসরের মধ্যে সব সেরে নিয়েছি। তা তোমাদের কোন দোষ নেই। আমাদের যেমন দেখছ, তেমনি তো তোমরা করবে। ভক্তদের কাছ থেকে টাকা আসছে, আর কোন রকমে দিন কাটছে। আমরা কি আর এখন সে রকম পরিশ্রম করছি? বলছি, বুড়ো হয়েছি—diabetes, nonsense (বহুমূত্র হয়েছে, বাজে কথা)! ও সব excuse (ওজর)। স্বামীজী শেষ দিন পর্যন্ত খেটে গিয়েছেন। দেখেছি, শেষ অসুখের সময় বুকে বালিশ দিয়ে হাঁপাচ্ছেন, কিন্তু এদিকে গর্জাচ্ছেন। বলছেন, 'ওঠ, জাগ, কি করছ?' আমরা excuse (ওজর) দিচ্ছি: diabetes (বহুমূত্র), শরীর তো যাবেই, নাহয় যাক্ না খেটে খেটে, পরিশ্রম ক'রে, rousing divinity in yourself and in others (নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মভাবকে জাগ্রত ক'রে)। এই তো সার। যদি তাই ঠিক ঠিক জেনে থাক তো লেগে যাও, বেরিয়ে পড়। এখন আর সব চাপা থাক। Now or never—(এখন না হ'লে কখনো হবে না)। উত্তরকাশী গিয়ে গঙ্গার ধারে পড়ে পড়ে তাঁকে ডাক, এই ব'লে—'মা তোমায় চাই, আর কিছু চাই না।' সেই রকম করবার জন্য এখন মনটা তৈয়ার ক'রে নাও। তারপর দেখা যাবে কাজকর্ম।

২০শে জুলাই

কি সাহায্য চাও? নিজেকেই সব করতে হবে। না তাও ক'রে দিতে হবে? তোমার মনকে তো তোমায় খাটাতে হবে। সেটা তো আর কেউ করবে না। ঠাকুর একবার বলেছেন, 'কিছু করতে হবে। তারপর গুরু বলে দিবেন, এই এই।' এ আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা যে, তাঁর দিকে এক পা এগোলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। এ আমাদের প্রত্যক্ষ। নিজে কিছু না করলে কারো সাধ্য নেই যে কিছু ক'রে দিতে পারে।

মহাপুরুষেরা রাস্তা দেখিয়ে দেন, পথ বাতলে

দেন। এই কি কম সাহায্য ? তোমার মনের ভাব খুলে বললে আমরা বলে দিতে পারি, আমরা এই রাস্তা দিয়ে এসেছি। সাহায্য করতে পারি। মাখন তুলে ওঁর মুখে ধর—তাও উনি মুখ বুজে আছেন॥ আবার খাইয়ে দিতে হবে!!!

ও-সব মনের ব্যাধি। একে 'স্ত্যান' বলে। মন কিছু করতে চায় না, খাটতে চায় না। যদি বল, ভগবান কি তাঁর ভক্তের জন্য কিছু করবেন না ? তা নিশ্চয়ই করেন। কিন্তু আগে ভক্ত হ'তে হবে, তাঁকে ভক্তি করতে হবে। আর ভক্তিও সামান্য নয়। তাঁকে মনপ্রাণ সমস্ত দিতে হবে। তা না পার তো কাঁদতে হবে এই বলে যে, তোমায় পেলাম না, তোমাতে ভক্তি হ'ল না। লোকে এক ঘটি কাঁদে টাকার জন্য, তবে তো টাকা হয়। তা না করলে ভগবান বা কেন করবেন ? ভগবানের জন্য যে নিরানন্দ হয় তারও তিনি অতি নিকট হন, তার ঈশ্বরদর্শন আর দেরি নেই। সে আনন্দ পেল ব'লে। Mind (মন)কে খুব analyse (বিশ্লেষণ) করতে হয়, তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে হয়।

ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'কাম আরও বাড়িয়ে দাও।' আমি তো শুনে অবাক্। বলেন কি, আবার বাড়াতে হবে ? তখন বললেন, 'কাম আর কি ? প্রাপ্তির কামনা তো ? তাঁকে পাবার জন্য কামনা কর, খুব কামনা বাড়িয়ে দাও। তখন অপর কামনাগুলি উপে যাবে।'

ভজন টজন তো কর না ? খালি কাজ। আমার সেবা করছ ? ঘোড়ার ডিম করছ। আমি বলি, তুমি জেনো যে, প্রভুর কৃপায় আমি নিজে এখনও সব করতে পারি। তোমার সেবার কিছু দরকার হয় না।

আমি তো কতবার বলেছি, ও কি কচ্ছিস্ ? ও যে চার টাকার একটা চাকরেও করতে পারে। নিজের মনের কথা কিছু আমায় বলবে না, নিজের মনের ভাব চেপে রাখছে, খালি আড়াল দিচ্ছে। প্রথম বৎসর খুব কথা কয়েছিলুম। তখন আমি নিজে ওকে (সেবককে) টানতুম। cell (গুহা) থেকে কি ওকে টেনে বার করতে হবে ? তাহলে কি হ'ল ? উনি নিজের সেলের ভিতর ঢুকে থাকবেন। সব মানুষের এই স্বভাব যে, খালি নিজের ভালটি লোককে দেখাবে, আর খারাপটি লুকিয়ে রাখবে। যে নিজের দোষগুলো টপটপ ক'রে বলে দিতে পারে, তার দোষগুলো শীঘ্র কেটে যায়। নিজের খারাপটা বলা বড় সোজা নয়। যে নিজের দোষগুলো বলতে পারে, জেনো তার ভিতর কিছু আছে।

সকলকে আপনার ক'রে নিতে হবে। সব আপনার হয়ে যাবে। যত তাঁর দিকে যাবে তত সরল উদার হবে। ঠাকুর সরলতার প্রতি-মূর্তি। ভাঙা হাত ঢেকে রেখেছিলেন। তা ডেকে বললেন, 'ও মধুসূদন, এই দেখ।'

* * *

একজনকে চিঠি লিখলেন : যদি ভগবানের জন্য নিরানন্দ হয়ে থাক তা হ'লে ঐ ভাব যত ঘনীভূত হবে, তত তাঁর কৃপা পাবে। ঐ ভাব আরও বাড়িয়ে দাও। আর যদি অন্য কোন কারণে ঐ ভাব হয়ে থাকে তাহলে তা সযত্নে পরিহার কর।

* * *

যে সগুণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করেছে সে নির্গুণ ভাব ইচ্ছা করলেই লাভ করতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছা ক'রে রসাস্বাদনের জন্য আমিটা রেখে দেয়। তাদের হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হয়েছে যাদের স্ব-স্বরূপ বোধ হয়েছে। তারা নির্বাণমুক্তি চায় না। তাদের সংসারে ভয় নেই। নির্বাণমুক্তি চাওয়াকে ঠাকুর হীন বুদ্ধি বলতেন। ও নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

ভক্তের ভগবান প্রীত হন, আবার রুষ্ট হন। ঠাকুর বলতেন, 'যার অভিমান আছে তার দিকে

চাইতে পারি না। যারা নির্বাণ না নিয়ে ঈশ্বরের দিকে গেল, তারাই ঈশ্বরকোটী।

২৯শে জুলাই

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। না হবে ত এসেছ কেন? কেঁদে কেটে তাঁকে অস্থির করবে। মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলবে। তাঁকে বলবে, তুমি ভিতর দেখ, যদি কিছু থাকে। এই বলতে পারা কি কম?

৩০শে জুলাই

ঠাকুর একদিন তাঁর গলার অসুখের কথা বলেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার কি ওসব অনুভব হয়? তিনি বললেন, 'তুমি কি কথা বললে গো? শরীর কি কখনও সাধু হয়? মনটাই সাধু হয়ে যায়।' তা না হ'লে শুধু idiot (মূঢ়)-এর মত শান্ত ভাব হবে। কষ্ট অনুভব হচ্ছে, খালি চেপে রয়েছি—ও বড় কিছু নয়। তবে এই বোধ যদি হয় যে এসব শরীরের—আমার নয়, আমি শরীর থেকে আলাদা, তবেই ঠিক।

'যাবৎ জরা দূরতঃ' তাবৎ ভজন টজন ক'রে নিতে হয়। 'সন্দীপে ভবনে কিং কূপ-খননম্?' —প্রহ্লাদ বলেছিলেন। শুধু suppression এ (চাপলে) কিছু হয় না। সংযমের সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চ ভাব থাকা চাই। তা না হ'লে আর একদিক দিয়ে বেরুবে। আর একদিকে direction (মোড়) দিতে হয়। তাহলে আপনি সরে যায়। 'মৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ'—তাঁকে পরম অবলম্বন ক'রে সংযম। যেমন কাম সমন্ধে: আমি তাঁর ছেলে, আমি কেন এত হীন হব? আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। এতে কাম জয় হয়। নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানে তাঁকে নিয়ে যে-আমি সেই আমিতে দাঁড়ানো। তা না হলে আমি অমুক,—বি.এ. পাশ, কি এম. এ. পাশ এতে দাঁড়ানো কিছু নয়। কর্ম যেন একটি যজ্ঞ। প্রত্যেক কাজটি perfectly (নিখুঁতভাবে) করতে হবে, প্রত্যেকটি যেন সুসম্পন্ন হয়। প্রত্যেক কাজটিকে সাধন ভাবতে হবে। তবে তো একটি character (চরিত্র) তৈরী হবে।

ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়াও ভাল। বিষ্ণুর এত গভীর ধ্যান হ'ত, কিন্তু ঠাকুর যেমনি ছুঁতেন অমনি জেগে উঠত তাঁর দিকে চেয়ে। নৃত্যগোপালের তো অত ভাব হ'ত, চোখ উলটে যেত, বুকখানা একেবারে লাল হয়ে উঠত। আর যখন ধ্যান করত সমস্ত রক্তটা মুখে উঠত, মুখ লাল হয়ে যেত। ঠাকুর বলতেন, ওরে অত নয়, অত নয়, লোকব্যবহার রাখতে হবে।

ঠাকুরের জ্যোতির্ময় শরীর ছিল। বোধ হ'ত যেন তাঁর একটুও জড়তা নাই। তাঁর কাছ থেকেই তো কষ্টসহিষ্ণুতা শিখেছিলুম। বীডন স্কোয়ার গার্ডেনে ও হেদোয় রাতভোর ধ্যানভজন ও তাঁর নাম ক'রে কাটিয়ে দিতাম, কখনো বা কালীঘাটে, কখনো বা কেওড়াতলায়।

আমি হৃদয় থেকে বলছি যে, এখনি আমি এই অবস্থায় উঠে যেতে পারি—কোন দিকে চেয়েও দেখব না যে কোথায় কি পড়ে রইল, এখনও মাধুকরী ক'রে খেতে পারি। এ বিশ্বাস না থাকলে তো আমি গেলুম! লোকে খালি নিজের সুবিধা খুঁজছে। সুবিধা খোঁজা শুধু এ জন্মে কেন, শত শত জন্ম ক'রে আসছে। আর এই সুবিধা খোঁজা ছেড়ে দেওয়াই হ'ল মুক্তি। কেউ কষ্ট করতে চায় না; প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছে। স্বামীজী বলতেন, 'একটা জীবন কি চারটি খানি কথা? কত সন্তর্পণে থাকতে হয়। চার দিকে নজর রাখতে হয়।' লোকে অনিষ্ট করলেও আমি অনিষ্ট ক'রব না। সব সহ্য ক'রে নিতে হবে। কারণ কিছু করলেই আবার rebound (প্রত্যাঘাত) করবে।

ছেলেখেলার কথা ? খালি জন্মমরণ. জন্মমরণ। এ যে একেবারে সব জীবনের বাইরে যাবার চেষ্টা। যে সচ্চিন্তা ক'রে যাবে সে বেঁচে যাবে।

২০শে আগষ্ট

যখন ধ্যান ধ্যেয় এক হয়ে সামনে দাঁড়ায় তখনই ঠিক ধ্যান হয়। যখন জপ আপনা আপনি হচ্ছে, মনের একটা অংশ সর্বদাই জপ করছে তখন জপের কিছু হয়েছে। সবেতেই 'আমি' ভুলতে হবে। যখনি তোমার মন elated (উৎফুল্ল) হয় কোন ভাবে, তখনি জানবে তাতে depress (অবসন্ন) করবার শক্তিও আছে। কোন ভাবের সঙ্গে identified (একীভূত) হ'লে চলবে না। ওদের পারে থাকতে হবে। একবার বুড়ী ছুঁতে হবে, তারপর আর কেউ ছুঁলেও তোমাকে 'চোর' হতে হবে না। এক সময়ে আমার এমন বোধ হয়েছিল এই যে, পা-টি ফেলছি—এও তাঁর শক্তিতে, আমার কোন শক্তি নেই, আমি ঠিক এটা দেখতে পেতুম। এই ভাব ছিল কিছু দিন।

কারো কাছে কিছু আশা রাখবে না, কিন্তু সকলকে দিবে। তা না হলে শুকনো ভাব এসে পড়বে। এইটি ঠাকুরের ঘরে পাবে। তা না হ'লে আমি অনেক সাধু দেখছি —যারা ভাবে আমি সাধু হয়েছি, আমার কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। 'আপনাতে আপনি থাকো মন, যেও না মন কারু ঘরে'—এই ভাব মনে সদা জাগ্রত রাখবে। অর্থাৎ মন কাউকে দেবে না, মন তাঁকেই দেবে। সেই জন্যই তো বিয়ে করিনি। মন কাউকে দিতে নেই। তাঁকে কেঁদে কেঁদে বলতে হয়, প্রভু! তোমায় পাঁচ সিকে পাঁচ আনা মন দিয়ে যেন ভালবাসতে পারি।' ঠাকুর আমাদের শেখাতেন—সব কাজ করবে হাত দিয়ে, কিন্তু মন তাঁর কাছে পড়ে থাকবে।

'তুলসী অ্যায়সা ধ্যান করো য্যায়সী বিয়ান কী গাই। মুহ্ সে তৃণ চাম চাটে—চখে বছাই।'

আমরা যে দূরে দূরে থাকি এ খুব ভাল। মহারাজ আজকাল একান্তে থাকেন। কারো সঙ্গে বেশী মেশেন না। মনের পারে একবার না গেলে ত্রাণ নাই। পরশমণি একবার ছুঁতে হবে, লোহা যতই ভাল হোক না কেন। বুড়ী ছুঁলে পর জানা যায় যে, এসব আমি নই। ভালমন্দ এসব মনের, আমি (আত্মা) আলাদা। সগুণ ঈশ্বর শেষ নয়। সব ভাবের অতীত, গুণাতীত হয়ে যেতে হবে। অভেদ ভক্তি, অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যে ভক্তি সেই শুদ্ধা ভক্তি। নতুবা যার সদ্ভাব আছে তার অসদ্ভাবও আছে।

ভগবান্ পক্ষপাতী নন, তাঁর দয়া শিষ্ট দুষ্ট সকলের উপর। যেমন সর্বত্র বৃষ্টি পড়ছে, যে ভূমি কর্ষিত থাকে সেই ফল লাভ করে। যদি কেউ বলে, 'আমি তাঁর বিশেষ কৃপাপাত্র' সে তার নিজের ভাবের কথা। সে নিজের জীবন দেখে হয় তো বলছে যে আমার উপর তাঁর বিশেষ কৃপা। আবার এক ভাব আছে: তিনি কাউকে বদ্ধ কাউকে মুক্ত করেছেন। যে সব 'এক দেখেছে সে মহা দুঃখে পর্যন্ত তাঁর কৃপা দেখতে পায়।

আর একভাব আছে: যা ভাল তাঁর, আর যা খারাপ তা আমার—নিজের কর্মফলের দোষ। এই রকম করতে করতে আবার 'আমি'টা চলে যায়। ওসব চালাকিতে কি হবে? কাক চতুর, কিন্তু বিষ্ঠা খায়। আমরা সব বুঝতে পারি। সময় সময় এত বুঝি যে, মনে ভয় হয়। মনে হয়, অত বুঝে দরকার নেই। এই জগৎটা একেবারে পচা, দেখতে পাচ্ছ না? নিঃস্বার্থ ভাব বড়ই বিরল। স্বার্থভাবে এ ভরা। লোকের মন ঈশ্বরে কতটা, অন্য জিনিসেই বা কতটা, দেখছ না? জগতের উপর বৈরাগ্য

না থাকলে জ্ঞানও হবে না। 'ভ্রান্তঃ যদিদং পরিদৃশ্যতে জগৎ তন্মিথ্যৈব।' তবে এও আছে, তিনি সত্য ব'লে জগৎ সত্য। জগতের সব জিনিসই যে তুচ্ছ মনে করতে পারে সেই বীর।

ঠাকুর বলতেন, 'সংসারের গোড়ায় দুইটি বস্তু—কামিনী ও কাঞ্চন।' কামিনীতে মাতৃবুদ্ধি, আর কাঞ্চনে ধূলিজ্ঞান—সচ্চিদানন্দ লাভের এই একমাত্র উপায়।—দেখনা, মন কত সৃষ্টি করছে—Building castle in the air (আকাশ কুসুম ভাবছে) এবং তাতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে—যেমন নিদ্রাতে। মনই আমাদের প্রত্যেকের জগৎ সৃষ্টি করছে বিচিত্র ভাবে। মনই মায়া। এক মনেই স্ত্রীকে একপ্রকার ভালবাসছে, মেয়েকে আর একপ্রকার। যদি আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় করতে পার তা হ'লে মনের নানাপ্রকার ভাবতরঙ্গ থাকতেও তা থেকে আলাদা হতে পারবে। তখন সব জিনিস থাকলেও কিছু নেই মনে হবে। জিহ্বা ও উপস্থ —এই দুইটিকে মনু প্রবল ইন্দ্রিয় বলেছেন, এই উভয়ের মধ্যে জিহ্বা প্রধান। জিহ্বা বশ না হ'লে রক্ষা নাই। অপরিমিত আহারকে ব্রহ্মহত্যার সামিল বলা হয়েছে।

৭ই সেপ্টেম্বর

যারা জ্ঞানী তারা মস্তকে ধ্যান করে। যারা ভক্ত তারা হৃদয়ে ধ্যান করে। We generally find so—(আমরা সাধারণতঃ এইরূপ দেখি)। হৃদয়ে ধ্যান করতে করতে যখন ভাব বিস্তীর্ণ হয়, তখন কোন জায়গায় location (সীমাবদ্ধ) থাকে না। ঠাকুরের দুই ভাব আছে। কোন সময়ে তিনি বলছেন, রূপটুপ ভাল লাগছে না, সব কেটে দিচ্ছেন। কালীও ভাল লাগছে না, মন অখণ্ডে লীন হয়ে যাচ্ছে। আবার কখনও রূপ না হ'লে তাঁর চলে না, বলছেন—চাইনে মা তোমার নিরাকার, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান। যে খালি নিরাকার দর্শন করেছে, এবং তাতে লয় হয়ে গেল সব বাদ দিয়ে, সেও একঘেয়ে। জ্ঞানীর ভয় আছে—পাছে জন্মাতে হয়, পাছে অজ্ঞানে পড়ে যায়। সাকার খেলোয়াড় কিছুকেই ভয় করে না। যে খালি সাকার রূপ দর্শন করেছে—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবাতীত ভাব দেখেনি সেও একঘেয়ে, যেমন গোঁড়া ভক্তেরা। তাদের পরব্রহ্ম বা নিরাকার বললে বলে, বাপ রে! পুরাণে আছে, সমস্ত জগৎ লয় হ'লে ভগবান্ সাকার স্বরূপে থাকেন। যেমন ঠাকুর বলতেন, এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না। সাকার নিরাকার সাক্ষাৎ হবার পর ভগবানের ভাব ও রূপ নিয়ে থাকলে এই বোধ হয়। এটি নিত্য সাকার। আমরা আগে কিছু মানতুম না, ঠাকুরের কাছে এসে এসব মানতে শিখলুম।

*　　*

প্রথমে কারো কাছ থেকে কিছু নেবে না। কারণ কিছু নিলেই তার দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হতে হয়, independence (স্বাতন্ত্র্য) চলে যায়। সে নিতে পারে যে হজম করতে পারে, নিলেও তার মনের কিছু হবে না। ভাল লোকের কাছ থেকে জেনে নিতে হয়, যে তোমার independence-এ (স্বাতন্ত্র্যে) হাত দেবে না বা তোমাকে control (বশ) করবার চেষ্টা করবে না।

সাধারণতঃ কি হয়? এ জীবনে কিছু একটা stage (অবস্থা) পর্যন্ত গিয়ে সেইখানে বসে পড়ে, আর উঠতে পারে না। এ জীবনের জন্য ঐ নিয়ে satisfied (সন্তুষ্ট) থাকে। নিজের মনকে ধরতে হ'লে খুব সাবধান না হ'লে পারে না। মন কত রকম প্রতারণা করছে। কেউ যদি ধরিয়ে দেয় তবু excuse (ওজর) দেয়। আমাদের কত রকম self-love (আত্ম-

প্রীতি) আছে বুঝতে পারিনা। তা পারা কি কম ? বাইরে নয়, ভিতরে—in spirit (ভাবে) তা করা খুব শক্ত। ঐ সব হ'ল character (চরিত্র)।

স্বামীজী এক সময়ে নিরামিষ আহার ক'রে বাইবেল পড়ছিলেন। তখন যিশুর মাংসাহার তাঁর ভাল লাগল না। তিনি ভাবলেন: ও। আমি নিজে নিরামিষ আহার করছি বলে অমনি একটু অহঙ্কার হয়েছে। খালি পাতা পাতা পড়ে যাচ্ছি, ধারণা হচ্ছে কই ?

গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর যখন বললেন, 'ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথা কি বলছ ? শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্র দর্শন স্পর্শন করেছেন। আর শিব তিন গণ্ডূষ জল পান ক'রে শব হয়ে পড়ে আছেন। গিরিশ ঘোষ বললেন, 'মহাশয় আর বলবেন না, (মাথায় হাত দিয়ে) মাথা ফেটে যাচ্ছে।'

প্রথম বয়সে বুড়ো হওয়াটাকে ঘৃণা করতুম। তারপর কিন্তু একটা মহাশক্তির অধীনে থাকতে ইচ্ছা হ'ল।

আমি এসব বলতে excited (উত্তেজিত) হচ্ছি। মনে করো না, এ সব এখন excited (উত্তেজিত) না হয়ে বলতে পারি না। Nerves (স্নায়ুমণ্ডলী) বড় weak (দুর্বল) হয়ে গেছে, কিন্তু ভিতরটা ঠিক আছে। আগে আরও বেশী ছিল। Nerves (স্নায়ুসমূহ) খুব fine (সূক্ষ্ম) ছিল, বুঝবার শক্তি খুব ছিল। কোন প্রশ্ন কর.ল প্রশ্নের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পেতুম। আর এক একটা কথায় flood of light (আলোকের প্লাবন) থাকত। Nerves (স্নায়ুসমূহ) আবার শক্ত হওয়াতে সে শক্তি চলে গেল।

ফাঁকি দেবে কাকে ? আপনি ফাঁকে পড়বে। যে যত শক্তি বার করতে পারবে সে তত পাবে। যতটুকু দেবে ততটুকু পাবে। বরানগর মঠে যখন খাওয়ার কিছু থাকত না তখন দোর বন্ধ ক'রে খুব কীর্তন হ'ত। রাতকে রাত ধ্যান ভজন চলত। সহজে কি আর মন স্থির হয়েছে। এখন লোক মঠে গিয়ে চোখ ভ'রে দেখে।

ঠাকুর। আমার বৈরাগ্যটুকু নষ্ট করো না। মনকে নূতন সংস্কার পাওয়াতে হবে। বৈষ্ণবদের মধ্যে মন্ত্র নেবার পর খুব জপ করিয়ে নেয়, ষোল আঠার ঘণ্টা জপ করায়। আমাদের মধ্যে ধ্যানটা খুব। মহারাজকে কত ধ্যান করতে দেখেছি বৃন্দাবনে। সুখের ভিতর থেকে জ্ঞান হয় না বলেই তো বৈরাগ্য ক'রে থাকতে হয়। ভাল থাকবার জায়গা ইত্যাদি হ'লে আর জ্ঞান হয় না। বৈরাগ্য সাধুর শোভা। তা না হ'লে বিষয়ের ভিতর থাকলে duplicity (কপটতা) প্রভৃতি সাংসারিক ভাব এসে পড়ে।

কালীঘাটে ত্রিকোণেশ্বর মন্দিরে থাকাকালে নবরাত্রির সময় মৌন ছিলাম। একটা নেশার মত হয়েছিল সর্বদা এক দিকে মন থাকত। মনুষ্যজীবনে যা করা উচিত তা করেছি। এই উদ্দেশ্য ছিল যে জীবনটা বিশুদ্ধ করতে হবে। খুব পড়তুম, আট নয় ঘণ্টা দিনে। পুরাণ-গ্রন্থ অনেক পড়েছি, শেষে বেদান্ত, বেদান্তে মন বসে গেল। ঠাকুর আমার সঙ্গে পরিহাসাদি করতেন। বলতেন, 'কি গো ! কিছু বল বেদান্তের কথা। বেদান্তে এই তো বলে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, না আর কিছু ? তবে আর কি ? মিথ্যা ছেড়ে সত্য নাও।' এই আমার life-এর (জীবনের) turning point (দিক্ পরিবর্তন) হ'ল।

হল্যাণ্ডে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সমাদর

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

ইওরোপের হল্যাণ্ড দেশের অধিবাসিগণ ডাচ্ বা ওলন্দাজ নামে পরিচিত। ১৬০২ খৃঃ প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য তাহারা ওলন্দাজ 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বাণিজ্য-সমিতি গঠন করে এবং ভারতে আসিয়া পর্তুগীজদের হাত হইতে বাণিজ্য ও সামুদ্রিক আধিপত্য কাড়িয়া লয়। ১৬১৮ খৃঃ যবদ্বীপের বাটাভিয়া নগরে একটি দুর্গ স্থাপিত হওয়ার পর এই নগর ওলন্দাজ অধিকারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশে চুঁচুড়া এবং দক্ষিণ ভারতে করমণ্ডল-উপকূলস্থ পলিকট ও নেগাপটম্ ওলন্দাজদের অধিকারে ছিল। সপ্তদশ শতকে দক্ষিণভারতের সমুদ্রোপকূলে ওলন্দাজ বণিকগণ যখন বাণিজ্য করিতে আগমন করে, তখন হইতেই তাহাদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ১৬০৯ খৃঃ দক্ষিণভারতের পলিকট বন্দরে ওলন্দাজদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই স্থানে বাণিজ্য করিবার জন্য হল্যাণ্ড হইতে বণিকগণ আসিয়াছিল। ঔপনিবেশিকদের মধ্যে খৃষ্টের বাণী প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে মিশনারিগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এব্রাহাম রোজারিয়াস্ (Abraham Rogerius) নামে জনৈক মিশনারি পর্তুগীজ ভাষায় অভিজ্ঞ দুইজন ব্রাহ্মণের সহিত পলিকটে পরিচিত হন। রোজারিয়াস দীর্ঘ দশ বৎসর পলিকটে বাস করিয়া এই দুই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দক্ষিণভারতের হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী, হিন্দুধর্মের পূজাপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পর ১৬৫১ খৃঃ তাঁহার একনিষ্ঠ অধ্যয়নের ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে এই পুস্তক জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়—ইহাতেই প্রথম দক্ষিণভারতের হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়। ১৮৯৩ খৃঃ বিখ্যাত পণ্ডিত বার্নেল এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—"এই পুস্তকখানি সম্ভবতঃ অদ্যাবধি দক্ষিণভারতের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল ও প্রাচীন।" অধিকন্তু রোজারিয়াসই ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতকম্' ও 'নীতিশতকম্' নামক বিখ্যাত পুস্তকদ্বয়ের ডাচ্ ভাষায় অনুবাদ এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়া সর্বপ্রথম ইওরোপীয় পাঠকদের নিকট ভর্তৃহরির রচনার পরিচয় প্রদান করেন। অবশ্য এই অনুবাদ সঠিক হয় নাই, কারণ এই অনুবাদের জন্য রোজারিয়াসকে পর্তুগীজভাষাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদ্বয়ের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে আরও অনেক ওলন্দাজ ধর্মপ্রচারক ও কর্মচারী ভারতে অবস্থানকালে অথবা কার্যব্যপদেশে মুঘলদের দরবার পরিদর্শন করিবার সময়ে হিন্দুদের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দীর্ঘ দুইশত বৎসরে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়ন তাঁহারা করেন নাই। যদিও কতিপয় ওলন্দাজ হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান

অর্জন করিয়াছিলেন, তথাপি একমাত্র হারবার্ট ছ্য জ্যাগার (Herbert de Jager) নামীয় একজন প্রতিভাবান্ পণ্ডিত ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কেহই সংস্কৃত জানিতেন না। এই পণ্ডিত লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে (Leyden University) প্রাচ্যদেশীয় ভাষাসমূহ, গণিত, উদ্ভিদ্ ও জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হারবার্ট (১৬৭০-৮০ খৃঃ) দশ বৎসর করমণ্ডলে অবস্থান করিয়া তামিল, তেলুগু এবং সম্ভবতঃ সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, কারণ বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ রাম্ফিয়াসের (Rumphius) নিকট লিখিত একখানি পত্রে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, যবদ্বীপের ভাষার অধিকাংশ বর্ণমালা সংস্কৃত ও তামিল হইতে গৃহীত। দুঃখের বিষয়, ছ্য জ্যাগারের কোনও লেখা সংরক্ষিত হয় নাই এবং তাঁহার সংস্কৃত অধ্যয়ন সম্বন্ধে অধিক কিছুই জানা যায় না। জ্যাগার ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সংস্কৃতি শিক্ষা করিবার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। অন্য কেহ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই এবং পরবর্তী অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যের প্রয়োজন, সরকারী সম্পর্ক ও প্রোটেষ্টাণ্টধর্ম-প্রচারের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন তাগিদে হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিবার তেমন উৎসাহ ওলন্দাজদের মধ্যে দেখা যায় নাই।

উনবিংশ শতকেই নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জ্ঞানসঞ্চয়ের অনুরাগ ওলন্দাজদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়। ইংলণ্ড, জার্মানি ও ফ্রান্স প্রভৃতি ইওরোপের দেশগুলি অপেক্ষা হল্যাণ্ডে অনেক পরে ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধে প্রণালীবদ্ধ পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক হন হাম্যাকার (Hamaker), উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে তিনি সংস্কৃত এবং তুলনামূলক ভাষাসমূহের অধ্যয়নে উৎসাহ দেখান। তাঁহার মৃত্যুর পর হিব্রুভাষার অধ্যাপক রাটগার্স (Rutgers) সংস্কৃত শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অন্যতম ছাত্র হেনড্রিক কার্ন (Hendrik Kern) সংস্কৃতশিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৫১খৃঃ কার্ন লাইডেনে আসিয়া জার্মান, স্লাভ ও ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলির অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান অনুরাগ ছিল সংস্কৃতশিক্ষায়। ১৮৫৫খৃঃ লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ্-ডি ডিগ্রি লাভ করিয়া তিনি বার্লিনে গেলেন। বার্লিনে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত ওয়েবার সংস্কৃতশিক্ষার প্রধান অনুরাগী ছিলেন। ওয়েবারের উপদেশে কার্ন বরাহমিহিরকৃত 'বৃহৎ সংহিতা' নামক বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাণ্ডুলিপিগুলির অনুলিপি রাখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৮খৃঃ কার্ন হল্যাণ্ডে ফিরিয়া কয়েক বৎসর কলেজে গ্রীক ভাষার অধ্যাপনা করেন, এবং অবসরকালে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ হল্যাণ্ডে বিপুল উদ্দীপনা ও অনুরাগ সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার 'চেয়ার' (Chair) স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তখনই কোন ফল হইল না। ক্ষুণ্ণমনা কার্ন হল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসিলেন এবং তথায় অবস্থানকালে বারাণসী কুইন্স্ কলেজে অধ্যাপকের পদগ্রহণের আহ্বান পাইলেন। বারাণসীতে দুই বৎসর থাকিয়া তিনি খুব আনন্দ অনুভব করে। পরবর্তী জীবনে তিনি বারাণসীতে অবস্থানকালের মধুর কাহিনী সর্বদাই বলিতে ভালবাসিতেন, কারণ এই সময়েই তিনি অনেক ভারতীয় ছাত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কার্নকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া

আহ্বান জানাইল। ভারতবর্ষ ও তাঁহার ভারতীয় ছাত্রগণকে ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক থাকিলেও কার্ন লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় ৪০ বৎসর কাল কার্ন বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা পণ্ডিত হইয়াছিলেন। একজন উৎসাহী অধ্যাপক হওয়া ছাড়াও কার্ন তদানীন্তন প্রায় সকল বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এবং পিটার্সবার্গ অভিধানে রচনা দিয়া কার্ন সংস্কৃত-অধ্যয়নের কাজ যথার্থভাবে আগাইয়া দিয়াছিলেন। কার্ন বরাহমিহিরের 'ব্রহ্মসংহিতা'রও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি লাইডেনে 'আর্যভট্টীয়' প্রকাশ করেন—ইহা হল্যাণ্ডে দেবনাগরী হরফে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। বৌদ্ধ গ্রন্থাদি অধ্যয়নের দিকেও কার্ন বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত একখানি সবিস্তার ইতিহাস 'লোটাস্ অব দি গুড্ লর্ড' নামক গ্রন্থের একটি সানুবাদ সংস্করণ, 'জাতকমালা' ও 'শিশুবোধ পালি অভিধানে'র মূল্যবান সংস্করণ এবং 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্তসার' প্রকাশ করেন। যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশী, এ সম্বন্ধেও কার্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯১৭ খৃঃ ৮৪ বৎসর বয়সে যখন কার্ন দেহত্যাগ করেন তখন হল্যাণ্ডে সংস্কৃতের পঠন-পাঠনের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। জ্ঞানালোক বহন করিবার উপযোগী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার উত্তরাধিকারী স্পেভার (Spever) সংস্কৃত-পদবিন্যাস, বৌদ্ধ সাহিত্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি বৌদ্ধ 'অবদানশতকে'র একটি সংস্করণ, 'জাতকমালা'র অনুবাদ, 'দিব্যাবদান' 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরিশেষে 'কথাসরিৎসাগর' প্রকাশ করিয়া গল্পসাহিত্যে প্রভূত কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। স্পেভার যখন লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আর একজন পণ্ডিত 'ব্রাহ্মণ' ও 'সূত্র'-সাহিত্য-সংক্রান্ত একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (Utrecht University) সুনাম অর্জন করেন। এই সাহিত্য-বিভাগের কার্যাবলীর সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই কালাণ্ডের (Caland) নাম জানেন। তিনি যদিও কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই, তথাপি তাঁহার গ্রন্থরাজির অনেক সংস্করণই এদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রাচীন ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় যে-সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, এগুলির অধ্যয়নে কালাণ্ড অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধে হল্যাণ্ডের জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারের জন্য তিনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।

অধ্যাপক ভোগেল (Vogel) ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি স্বতন্ত্র দিকের প্রতি মনোযোগী হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তিনি দীর্ঘ তের বৎসর প্রত্নবিদ্যা-বিভাগে কাজ করিবার সময় অনেক ভারতীয়ের সহিত সৌখ্য স্থাপন করেন। ১৯১৪ খৃঃ লাইডেনে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি সংস্কৃত-প্রত্নবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং সেই পদে আসীন থাকিয়া হল্যাণ্ডে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রত্নবিদ্যা-সংক্রান্ত অধ্যয়নের সৌকর্যার্থ তিনি ১৯২৫ খৃঃ কার্ন ইন্‌স্টিটুট নামে একটি ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় প্রত্নবিদ্যা-অধ্যয়নাগার স্থাপন

করিলেন। এই ইন্‌ষ্টিট্যুট্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 'দি এন্যুয়েল বিব্‌লিওগ্রাফি অব্‌ ইণ্ডিয়ান আর্কিওলজি' নামক মূল্যবান গ্রন্থ প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণায় বিদ্যার্থিগণকে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিতেছে। ১৯৫৭ খৃঃ অধ্যাপক ভোগেল শূদ্রকের 'মৃচ্ছক-টিকের' (Clay Cart) একটি সুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপক এখনও নিরলসভাবে অধ্যয়নকার্যে নিরত আছেন।

বর্তমানে হল্যাণ্ডের লাইডেন, ইউট্রেক্ট, আমাষ্টার্ডাম ও গ্রনিন্‌জেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক কুইপার ইন্দো-ইওরোপীয় ও ভারতীয় ভাষা-সমূহ, বৈদিক ও পারসিক সাহিত্য শিক্ষা দিবার কাজে নিযুক্ত আছেন। দ্রাবিড় ও মুণ্ডাভাষা-গুলি সম্বন্ধে যে-সকল পণ্ডিতের সম্যক্‌ পারদর্শিতা আছে তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক কুইপার অন্যতম। সপ্তদশ শতক হইতে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য-বিদ্যাশিক্ষার জন্য সক্রিয় প্রযত্ন লওয়া হইতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যাপনার জন্য আরও দুইটি পদে সৃষ্ট হইয়াছে—একটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রত্নবিদ্যা ও ইতিহাস সম্বন্ধে, অপরটি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে। প্রথম পদে নিযুক্ত আছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান পরিচালক অধ্যাপক বশ (Bosch)।

১৯৩২ খৃঃ হইতে ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদে আসীন আছেন অধ্যাপক গোণ্ডা। তিনি সংস্কৃত ও যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'ইন্দোনেশিয়ায় সংস্কৃত' নামক গ্রন্থখানি নাগপুরস্থ আন্তর্জাতিক আকাদামি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে 'প্রাচীন বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন দিক' নামক পুস্তকখানির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আমষ্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাডেগন (Faddegon) প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ সংস্কৃত শিক্ষা দিতেছেন। ভারতীয় দর্শন-সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর অধ্যয়ন আছে—'বৈশেষিক দর্শন' সম্বন্ধে তাঁহার রচিত বিরাট গ্রন্থ সুবিদিত। পাণিনি ব্যাকরণ ও সঙ্গীতবিদ্যাও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে ভারতীয় দর্শন হল্যাণ্ডে প্রায় অনাদৃতই ছিল। ডয়সনের পূর্বে কেবল রুইনিং শঙ্করের 'ব্রহ্মসূত্র' ভাষ্যের আংশিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। ডক্টর বাল্‌টেনান নামে জনৈক উদীয়মান যুবক পুনাতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খুব যোগ্যতার সহিত রামানুজের গীতাভাষ্যের অনুবাদ করিয়াছেন। বিশ্বযুদ্ধের পর অধ্যাপক স্কার্প (Scharpe) 'কাদম্বরীর' অনুবাদ করেন এবং মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

গ্রনিন্‌জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডক্টর এন্‌সিঙ্ক (Ensink) ইতঃপূর্বে বৌদ্ধ-মহাযান-মতের ইংরেজী ও ওলন্দাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইদানীং সাংখ্যদর্শন-অধ্যয়নে ব্যাপৃত আছেন।

হল্যাণ্ডে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার সামান্য পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল।

গঙ্গা ও যমুনা

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন

গঙ্গামাতা

গঙ্গা যদি আর কিছুই না করিতেন, শুধু দেবব্রত ভীষ্মের জননী হইতেন, তাহা হইলেও আর্যজাতির মাতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন। পিতামহ ভীষ্মের গৌরব, নিঃস্পৃহতা, ব্রহ্মচর্য ও তত্ত্বজ্ঞান সর্বদাই আর্যজাতির আদরণীয় লক্ষ্য হইয়া আসিয়াছে। আমরা গঙ্গাকে আর্যসংস্কৃতির আধারস্তম্ভ এই মহাপুরুষের মাতা বলিয়াই জানি।

নদীকে যদি কোনও উপমা মানায়, তাহা হইলে উহা মাতার উপমা। নদীকূলে বাস করিলে দুর্ভিক্ষের ভয় থাকে না। মেঘরাজ যখন বঞ্চনা করেন তখন নদীমাতাই আমাদের ফসল দেন। নদীর তীর বলিলেই বুঝি শুদ্ধ ও শীতল হাওয়া। নদীর তীরে তীরে বেড়াইতে গেলে প্রকৃতিদেবীর বাৎসল্যের অখণ্ড প্রবাহের দর্শন হয়। নদী যদি বড় হয় আর তাহার প্রবাহ যদি হয় ধীর ও গম্ভীর, তাহা হইলে তাহার তীরে যাহারা বাস করে তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ঐ নদীর উপরই নির্ভর করে। সত্যই নদী জনসমাজের মাতা। নদীতীরবর্তী শহরের অলিগলিতে বেড়াইবার সময় যদি কোনও এক কোণ হইতে নদীর দর্শন হইয়া যায় তবে আমাদের কতই না আনন্দ হয়। কোথায় শহরের সেই দুর্গন্ধ বায়ুমণ্ডল, আর কোথায় নদীর এই প্রসন্ন দর্শন। উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অচিরে বুঝিতে পারা যায়। নদী ঈশ্বর নহেন, তবে ঈশ্বরকে মনে করাইয়া দেন এমন দেবতা। যদি গুরুবন্দনার আবশ্যকতা থাকে, তবে নদীরও বন্দনা করা উচিত।

এই তো হইল সাধারণ নদীর কথা। কিন্তু গঙ্গামাতা তো আর্যজাতির মাতা। আর্যদের বড় বড় সাম্রাজ্য এই নদীর তীরেই স্থাপিত হইয়াছিল। কুরু-পাঞ্চাল দেশের সঙ্গে অঙ্গবঙ্গাদি দেশের যোগস্থাপন গঙ্গাই করিয়াছেন। আজও হিন্দুস্থানের ঘন বসতি গঙ্গাতীরেই বেশী।

যখন আমরা গঙ্গা দর্শন করি তখন আমাদের দৃষ্টিতে শ্যামল ধান্যক্ষেত্রই শুধু পড়ে না, দৃষ্টিপথে শুধু মালবোঝাই জাহাজই আসে না, এক সঙ্গে উদিত হয় স্মৃতিপথে—বাল্মীকির কাব্য, বুদ্ধ-মহাবীরের বিহার, অশোক সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষের মত সম্রাটদের পরাক্রম, তুলসীদাস বা কবীরের মত সন্তজনের ভজন। গঙ্গার দর্শন তো হৃদয় দিয়া দর্শন।

কিন্তু গঙ্গার দর্শন সর্বত্র একই প্রকারের নয়। গঙ্গোত্রীর নিকটে হিমাচ্ছাদিত প্রদেশে গঙ্গার ক্রীড়ারত কন্যারূপ, উত্তরকাশী ও চীড়-দেবদারুর কাব্যময় প্রদেশে মুগ্ধ রূপ, দেবপ্রয়াগের পাহাড়ী অঞ্চলে চমৎকারিণী অলকানন্দার সঙ্গে ইহার লুকোচুরি খেলা, লক্ষ্মণঝোলার করাল দংষ্ট্রা হইতে মুক্তি পাইবার পর হরিদ্বারের নিকটে তাহার বহুধারায় স্বচ্ছন্দ বিহার, কানপুর হইতে সহসা নিষ্ক্রমণের পর সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রবাহ, প্রয়াগের বিশাল তটে কালিন্দীর সঙ্গে তাহার ত্রিবেণী-সঙ্গম, প্রত্যেকের শোভা খানিকটা স্বতন্ত্রই। একটি দৃশ্য দেখিলে অন্যটির কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেকের সৌন্দর্য পৃথক, প্রত্যেকের ভাব পৃথক্, প্রত্যেকের বাতাবরণ পৃথক্, প্রত্যেকের মাহাত্ম্য পৃথক্।

প্রয়াগ হইতে গঙ্গা নূতন রূপ ধারণ করে। গঙ্গোত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়াগ পর্যন্ত বাড়িতে বাড়িতে চলিলেও গঙ্গা একরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রয়াগে যমুনা আসিয়া উহার সহিত মিলে। যমুনার তো প্রথম হইতেই দুই রূপ। *সে খেলে, লাফায়, কিন্তু ক্রীড়াসক্ত* বলিয়া মনে হয় না। গঙ্গা শকুন্তলার মত তপস্বিকন্যা-রূপে দেখা দেয়। কৃষ্ণবর্ণা যমুনা দ্রৌপদীর মত মানিনী রাজকন্যা বলিয়া মনে হয়। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা আমরা যখন শুনি, তখনই প্রয়াগের নিকটে গঙ্গা-যমুনা মিলনে শুক্ল-কৃষ্ণ প্রবাহের কথা মনে পড়ে। হিন্দুস্থানে অগণিত নদী, এইজন্য সঙ্গমেরও কোনও সীমা নাই। এই সকল সঙ্গমের মধ্যে আমাদের পূর্বজেরা গঙ্গাযমুনার এই সঙ্গমকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসিয়াছিলেন, আর সেই জন্য তাহার গৌরবের নাম দিয়াছিলেন 'প্রয়াগরাজ'। হিন্দুস্থানে মুসলমানেরা আসিবার পর যেমন হিন্দুস্থানের ইতিহাসের রূপ বদলাইয়াছিল, তেমনই দিল্লী-আগ্রা ও মথুরা-বৃন্দাবনের নিকটে আসিবার সময় যমুনার এবং যমুনার প্রবাহের জন্য প্রয়াগের পরে গঙ্গার রূপও একেবারে বদলাইয়াছে।

প্রয়াগের পর গঙ্গাকে কুলবধূর মত গম্ভীর ও সৌভাগ্যবতী দেখায়। ইহার পর বড় বড় নদী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিশিতেছে। যমুনার জল মথুরা-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করাইয়া দেয়। অযোধ্যা হইয়া আসিয়াছে সরযূ—আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের কীর্তিকাহিনীর সহিত সেই জীবনের করুণ স্মৃতি বহন করিয়া আনে। দক্ষিণ দিক হইতে আসে চম্বল সে বলে রন্তিদেবের যজ্ঞযাগের কথা। প্রচণ্ড কোলাহল করিতে করিতে শোণভদ্র গজগ্রাহের জন্য দারুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্মরণ ক্ষণিকের জন্য করাইয়া দেয়। এইভাবে পুষ্ট হইয়া গঙ্গা পাটলীপুত্রের নিকট মগধসাম্রাজ্যের মত সুবিস্তীর্ণ হইয়া যায়। আবার গণ্ডকী তাহার মহামূল্য করভার লইয়া আসিতে সঙ্কুচিত হয় না। জনক ও অশোকের, বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রাচীন ভূমি হইতে বাহির হইয়া অগ্রসর হইবার সময় গঙ্গা যেন মহাভাবনায় পড়িয়া যায়, *এখন কোথায় যাই!* যখন প্রচণ্ড বারিরাশি তাহার অমোঘ বেগে পূর্বদিকে বহিয়া চলে, তখন তাহার দক্ষিণদিকে ফেরা কি খুবসহজ কথা! সে ঐদিকে মুখ ফিরাইয়া সত্যই চলিল।

দুইজন সম্রাট বা দুইজন জগদ্‌গুরু যেমন হঠাৎ পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যেন তেমনই। ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের ঐ পারের সমস্ত জল লইয়া আসাম হইয়া পশ্চিমের দিকে আসিতেছে। আর গঙ্গা অগ্রসর হয় পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে। তাহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ কি করিয়া হইল? কে কাহার প্রতি প্রথমে মাথা নত করিল? কে কাহাকে প্রথমে রাস্তা দিল? উভয়েই স্থির করিল যে দক্ষিণ অবলম্বন করিয়া সরিৎপতির দর্শনে যাওয়া যাক এবং ভক্তি-নম্র হইয়া যাইতে যাইতে যেখানে সম্ভব হয়, পরে *পরস্পরে মিশিয়া যাওয়া যাইবে।*

এইভাবে গোয়ালন্দের নিকটে যখন গঙ্গার (পদ্মার) সহিত ব্রহ্মপুত্রের বিশাল জল আসিয়া মিলিত হয় তখন মনে সন্দেহ জন্মে যে সাগর আর ইহার চেয়ে বেশি কি হইবে। বিজয়ী সৈন্যদল বিজয়-লাভের পর সুসজ্জিত অবস্থায় যেমন অস্থির হইয়া পড়ে, আর বিজয়ী বীর মনের খেয়াল-খুশিতে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহার পর এই দুই প্রকাণ্ড নদীর ঠিক সেই অবস্থা হয়। বহু মুখের ধারায় উহারা আসিয়া সাগরে মিলিত হয়। প্রত্যেক প্রবাহের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কোনও কোনও প্রবাহের তো একাধিক নাম। গঙ্গার ধারায় ব্রহ্মপুত্র এক হইয়া পদ্মা নাম ধারণ

করিতেছে। ইহাই আর একটু আগে গিয়া মেঘনা নামে পরিচিত হইয়াছে।

এই বহুমুখী গঙ্গার ভাগীরথী ধারা যায় কোথায়? সুন্দরবনে আটকাইয়া যায় কি? না, সে যায় সগরপুত্রদের উদ্ধার করিতে। আজ যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই চোখে পড়িবে, মেয়েরা শনের বিড়ে তৈয়ারি করিতেছে, আর বিস্তর বিশ্রী কল কারখানা। যেখান হইতে এদেশে কারিগরির অসংখ্য বস্ত্র ভারতের জাহাজে করিয়া লঙ্কা বা যবদ্বীপ পর্যন্ত যাইত, সেই রাস্তায় এখন বিলাতি ও জাপানী ষ্টীমার বিদেশী কারখানায় নির্মিত বাক্সে মাল ভারতের পণ্যশালায় ছড়াইয়া দিবার জন্য আসিতেছে। গঙ্গামাতা পূর্বের মত আমাদিগকে নানাপ্রকারের সমৃদ্ধি প্রদান করিতে চান, কিন্তু আমাদের দুর্বল হাত তাহা লইতে পারে না।

যমুনারাণী

হিমালয় তো সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। যেখানে সেখানে সৌন্দর্য বিক্ষিপ্ত করিয়া অন্তরের সৌন্দর্যকে কম করিয়া দেখানোই যেন হিমালয়ের বৈশিষ্ট্য। আবার হিমালয়েও এমন এক স্থান আছে, যাহার উর্জস্বিতা হিমালয়বাসীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এমনই হইল যমরাজভগিনীর উৎপত্তি-স্থান।

খুব উচ্চস্থান হইতে বরফ গলিয়া এক প্রকাণ্ড প্রপাত পড়িতেছে। গগনচুম্বী বলিলেও ঠিক বলা হইবে না। উত্তুঙ্গ পাহাড় প্রহরীর মত রক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও জল জমিয়া বরফ হইয়া যাইতেছে, আর কখনও বরফ গলিয়া গিয়া জল হইয়া যাইতেছে। এমন স্থানে মাটির ভিতর হইতে জল এক বিচিত্র ধরনে টগ্‌বগ্‌ করিতে করিতে উপরে ওঠে ও ছড়াইয়া পড়ে। মাটির ভিতর হইতে এমন শব্দ বাহির হয় যে মনে হয় যেন কোনও বাষ্পযন্ত্র হইতে বাষ্প বাহির হইতেছে। আর ঐ সকল ঝরনা হইতে উত্থিত উড়ন্ত বিন্দুগুলি এত ঠাণ্ডার মধ্যেও মানুষকে যেন ঝলসাইয়া দেয়। এরূপ চমৎকারস্থানে অসিত ঋষি যমুনার মূল খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক প্রকার জলে স্নান করা প্রায় অসম্ভব। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে চিরকালের জন্য ঠাণ্ডা হইতে হইবে, গরম জলে স্নান করিলে তখন তখনই আলুর মত সিদ্ধ হইয়া মরিতে হইবে। এই জন্য সেখানে ঠাণ্ডা গরম মিশানো জলের কুণ্ড তৈয়ার করা হইয়াছে। এক একটি ঝরনার উপর এক এক গুহা। তাহাতে কাঠের তক্তা পাতিয়া শোওয়া যায়। তবে সারা রাত পাশ বদল করিতে হইবে, কারণ উপরের ঠাণ্ডা আর নীচের গরম, দুই-ই একেবারে অসহ্য।

দুই ভগিনীর মধ্যে গঙ্গা হইতে যমুনা বড়, প্রৌঢ়, গম্ভীর, কৃষ্ণা দ্রৌপদীর সমান কৃষ্ণবর্ণা ও মানিনী। গঙ্গা তো যেন সরলা মুগ্ধা শকুন্তলার মতই স্থির। কিন্তু দেবদেব তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যমুনা তাহার দিদিগিরি ছাড়িয়া গঙ্গাকেই অভিভাবিকার পদে বসাই-য়াছে। দুই বোনেরই একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কি কাতরতা। হিমালয়ে থাকিতে তো উভয়ে প্রায় কাছাকাছি আসিয়া জোটে। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ দণ্ডালু পর্বতের মধ্যে তির্যক্‌-গতিতে আসে বলিয়া সেখানে তাহাদের মিলন হইতে পারে না। এক কবিহৃদয় ঋষি যমুনার তীরে থাকিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। কিন্তু আহারের জন্য যমুনার ধারে ফিরিয়া আসিতেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হইলেন, ভয়ভীতা গঙ্গা তাহার প্রতিনিধিস্বরূপা এক ক্ষুদ্রকায়া ঝরনা যমুনার তীরে ঋষির আশ্রমে পাঠাইয়া

দেন। আজও সেই ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ প্রবাহ সেই ঋষির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সেইখানেই বহিয়া যাইতেছে।

দেরাদুনের নিকটেও আমাদের আশা ছিল যে নদী দুইটি পরস্পর আসিয়া মিলিত হইবে। কিন্তু না, নিজের শৈত্য ও পাবনত্ব দ্বারা অন্তর্বেদীর সমস্ত প্রদেশ পবিত্র করিবার কর্তব্য সম্পূর্ণ না করিয়া উহাদের পরস্পর মিলিত হইবার কথা মনেই বা আসে কি করিয়া? গঙ্গা তো উত্তরকাশী, টিহিরি, শ্রীনগর, হরিদ্বার, কানোজ, ব্রহ্মাবর্ত, কানপুর প্রভৃতি পুরাণে ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্থানগুলিকে তাহার স্তন্য পান করাইতে ছুটাছুটি করিতেছে, এদিকে যমুন কুরুক্ষেত্র ও পানিপথের নরহত্যার ভূমিভাগ দেখিতে দেখিতে ভারতবর্ষের রাজধানীর নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে যমুনার জলে সাম্রাজ্যের শক্তি থাকা চাই। তাহার স্মৃতির ভাণ্ডারে কুরুপাণ্ডব হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল সাম্রাজ্য পর্যন্ত, আর মধ্য যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস পড়িয়া আছে। দিল্লী হইতে আগ্রা পর্যন্ত এমনই বোধ হয় যে বাবরের অন্তরঙ্গ লোকেরাই বুঝি আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে চায়। উভয় নগরের দুর্গ—সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য নয়, বরং যমুনার শোভা দেখিবার জন্যই যেন নির্মিত হইয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের নাকড়া তো কবেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মথুরা-বৃন্দাবনের বাঁশরী এখনও বাজিতেছে।

মথুরা-বৃন্দাবনের শোভা অপূর্ব বস্তু। এই প্রদেশ যেমন রমণীয় তেমনি সমৃদ্ধ। হরিয়ানের গোরুরা তাহাদের মিষ্ট সরস দুধের জন্য সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধ। যশোদা মাতা বা গোপরাজা নন্দ নিজে এই জায়গাটি পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন। এই কথাটি যেন এখানকার ভূমি ভুলিতেই পারে না। মথুরা-বৃন্দাবন তো বালকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি, বীরকৃষ্ণের বিক্রমভূমি। দ্বারকাবাসের কথা ছাড়িয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে অধিক সহযোগিতা কালিন্দীই করিয়াছিল। যে যমুনা কালীয়দমন দেখিয়াছিল সেই যমুনা কংসের ধ্বংস দেখিয়াছিল। যে যমুনা হস্তিনাপুরের রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা শুনিয়াছিল, তাহা রণকুশল কৃষ্ণের যোগমূর্তি কুরুক্ষেত্রের উপর বিচরণ করিতে দেখিল। যে যমুনা বৃন্দাবনের প্রণয়-বাঁশরীর সঙ্গে আপনার তান মিলাইল, সেই আবার কুরুক্ষেত্রে রোমহর্ষণ গীতাবাণীর প্রতিধ্বনি করিল।

ভারতবর্ষের সমগ্র কুলনাশ বহুবার দেখিয়াছে যমুনা, তাহার পক্ষে পারিজাত ফুলের মত তাজবিবির অবসান কতই না মর্মভেদী হইয়া থাকিবে। তাহার উপর সে আবার প্রেমসম্রাট্ শাজাহানের জমাট অশ্রুর প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বৈদিক নদী চর্মণ্বতী হইতে করভার লইয়া যমুনা যেমনি অগ্রসর হইল, তখনি মধ্যযুগের ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন করাইতে ক্ষুদ্রকায়া কত নদী তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলিল।

এখন যমুনা অধীর হইয়া উঠিল। কতদিন হইয়া গিয়াছে, গঙ্গা-বহিনের সঙ্গে দেখা হয় নাই। বলিবার কত কথা আছে। জিজ্ঞাসা করিবার কত কথা ও জমিয়াছে। কানপুর ও কালপী বেশি দূরে নয়। এখানে গঙ্গার সংবাদ পাইয়াই খুশিতে সেখানকার মিশ্রীতে মুখ মিঠা করিয়া যমুনা এমনই দৌড়িল যে প্রয়াগরাজে আসিয়া গঙ্গাকে গলায় জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের কি উন্মাদনা! মিলনের পরও যেন তাহাদের জ্ঞান নাই যে তাহারা মিলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সকল সাধুসন্ত এই প্রেমসঙ্গম

দেখিবার জন্য একত্র হইয়াছেন। কিন্তু এই দুই ভগিনীর সেদিকে কোনও বোধ নাই। আঙিনায় অক্ষয়বট দাঁড়াইয়া আছে। তাহার জন্যও ইহাদের আগ্রহ নাই। বুড়া আকবর ছাউনি ফেলিয়া পড়িয়া আছে, কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। আর অশোকের শিলাস্তম্ভ আনিয়া ওখানে দাঁড় করাইলেই বা এই দুই বোন কি তাহার দিকে নজর উঠাইয়া দেখিবে।

প্রেমের এই সঙ্গম-প্রবাহ অখণ্ড বহিতেছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কবিসম্রাট্ কালিদাসের সরস্বতীও অখণ্ড বহিতেছে।

ক্বচিৎ প্রভা-লেপিভিরিন্দ্রনীলৈ
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপংকজানাম্
ইন্দীবরৈ-রুৎ-খচিতান্তরেব॥

ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাম্
কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥

ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভি-
শ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥

ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি। বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে সম্বোধন করিয়া রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া ফিরিবার সময় বলিতেছেন: দেখ, এই গঙ্গাপ্রবাহে যমুনাতরঙ্গ মিলিয়া কেমন দৃশ্য হইয়াছে। কোথাও মনে হইতেছে, মুক্তামালায় অনুবিদ্ধ ইন্দ্রনীলমণি মতির প্রভাকে খানিকটা ম্লান করিয়া চলিয়াছে। কোথাও মনে হইতেছে, শ্বেতপদ্মের মালায় নীল কমল গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও মনে হইতেছে মানসগামী শ্বেতহংসের সঙ্গে সঙ্গে কদম্ব ফুল উড়িয়া চলিয়াছে। কোথাও যেন শ্বেতচন্দনে লিখিত ভূমিতে কৃষ্ণাগুরুর পত্ররচনা করা হইয়াছে। কোথাও আবার চন্দ্ররশ্মির সঙ্গে ছায়ায় শয়ান অন্ধকারের খেলা চলিতেছে। কোথাও শরৎ-শুভ্র মেঘের পিছনে এদিকে ওদিকে আকাশ দেখা যাইতেছে। আর কোথাও এমনও দেখা যাইতেছে যে—মহাদেবের ভস্মভূষিত শরীরে কৃষ্ণাসর্পের আভরণ দেওয়া হইয়াছে।

কী সুন্দর দৃশ্য! উপরে পুষ্পক বিমানে মেঘশ্যাম রামচন্দ্র, আর ধবল-শীলা জানকী চৌদ্দবৎসরব্যাপী বিরহের পরে অযোধ্যায় পৌঁছিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, আর নীচে ইন্দীবরশ্যামা কালিন্দী ও সুধাসলিলা জাহ্নবী, পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াই সাগরে নামরূপ বিসর্জন দিয়া বিলীন হইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া স্বর্গ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, আর পৃথিবীতে কবিদের প্রতিভাসৃষ্টির উৎস খুলিয়া গিয়াছে।

শ্রীশংকরদেব ও নামধর্ম।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন শর্মারায়

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমগ্র পূর্বোত্তর ভারতে সনাতন হিন্দু ধর্মের এক ব্যাপক অভ্যুত্থান সূচিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবমুক্ত হইয়া এতদঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ ক্রমশঃ সনাতন ধর্মে ফিরিয়া আসায় বেদ-যজ্ঞাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ মুসলমান আক্রমণে বহু রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়ায় হিন্দু সমাজের একটি বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্মের কবলিত হইতেছিল, ইহাও পার্শ্ববর্তী নৃপতিগণের মনে স্বীয় ধর্মরক্ষার্থে তীব্র প্রেরণা জাগ্রত করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরে আসামের অধিপতি দুর্লভ নারায়ণ তৎকালীন গৌড়াধিপতি ধর্মনারায়ণের নিকট উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গোষ্ঠি হইতে কয়েকটি পরিবারকে আসাম রাজ্যে লইয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রীশংকরের পূর্বপুরুষ শুদ্ধাত্মা চণ্ডীভূঞা ইহাদের অন্যতম এবং কনোজী কায়স্থ গণের বংশধর। যে ছয়জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে আসাম রাজ্যে আনয়ন করা হয় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্তমান নওগাঁ জেলার মৈরাবারী অঞ্চলে লঙ্গমাগুড়ী নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। আসামাধিপতি কর্তৃক ইঁহারা এক একটি মৌজার শাসন কর্তা নিযুক্ত হন এবং ভূঞা উপাধিতে ভূষিত হন।

তৎকালে আসাম প্রদেশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং আর্য, অনার্য, অহম, কাছাড়ী প্রভৃতি নৃপতিগণদ্বারা শাসিত হইত। কোথায়ও শাক্ত, কোথায়ও শৈব, কোথায়ও বৌদ্ধ এবং কোথায়ও বা প্রকৃতি-উপাসকদের প্রাধান্য ছিল। কামরূপ শক্তি-সাধনার অতি প্রাচীন পীঠস্থান ও শাক্ত-ধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইলেও তৎকালে শাক্ত সাধনা বহু বীভৎসতা এবং অনাচারে দুষ্ট হইয়াছিল। তাই সনাতন ধর্মের গ্লানি দুর করিবার জন্য এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে শ্রীভগবানের লীলা প্রকট হইবার উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছিল।

বর্তমান নওগাঁ জেলায় ১৩৭১ শকে, শারদীয়া শুভ বিজয়া দশমী তিথিতে, পরম ভক্তিমান্ পিতা কুসুমদেব ও জাহ্নবীসদৃশা পবিত্রতার প্রতীক মাতা সত্যসন্ধ্যার পুত্ররূপে গৌরকান্তি অপূর্ব রূপ-লাবণ্যময় শ্রীশ্রীশংকরদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা উভয়েই পরমনিষ্ঠায় ভগবৎ দর্শনা-ভিলাষে আজীবন গভীর ব্যাকুলতা পোষণ করিতেন, এ-কথা শ্রীশংকরের প্রবন্ধাবলীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। মাতা সত্যসন্ধ্যার মনে এক অভিলাষ ছিল যে তিনি আপন অভীষ্ট দেবাদি দেবকে দর্শন করিতে করিতে দেহ রক্ষা করিবেন। শ্রীশংকরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া এবং তাঁহারই মুখচন্দ্রমা দর্শন করিয়াই মাতা সত্যসন্ধ্যা তাঁহার চিরাভীষ্ট শিবলোকে গমন করেন। মাতা শংকরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করায় পুত্রের নামও শংকর রাখা হইয়াছিল। মাতৃহীন বালক তদবধি পিতামহীর স্নেহযত্নে পালিত হইতে থাকেন।

অতিশৈশবকালেই বালক শংকরের ঐশ্বরিক শক্তিসকল প্রকাশ পাইতে থাকে। তিনি পিতামহীর দৈনন্দিন আচার ব্যবহার, ধর্মীয়

অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা প্রভৃতির বিষয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উহাদের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে বিচার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। শিশুর মুখে শিশুসুলভ সরল প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত হইলেও উহাদের অন্তর্নিহিত গভীর শাস্ত্র-সম্মত বিচার্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপস্থিত পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইতেন। পিতামহী সময় সময় বালক-দেহে ভগবদাবেশ অনুভব করিয়াও পরক্ষণে অপত্য-স্নেহে মুগ্ধ হইতেন।

অগ্নি যেমন ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া অধিক কাল গুপ্ত থাকিতে পারে না, আপনিই তাহার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক শংকরের বহুমুখী প্রতিভা ক্রমেই বিস্তৃত হইতে লাগিল। বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ হইলে অষ্টমবর্ষীয় বালক সংযুক্তাক্ষর শিক্ষা না করিয়াই তাহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা 'করতল কমল কমলদল নয়ন' রচনা করিয়া বাগ্‌দেবীর প্রিয়পুত্ররূপে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে শ্রীশংকর মহেন্দ্র কণ্ডলী নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হন। অদ্ভুত মেধাশক্তিসম্পন্ন বালক অতি অল্পকালেই হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় আচার্য মহেন্দ্র পণ্ডিতের বিস্ময় উৎপাদন করেন। মহেন্দ্র এমন শ্রুতিধরত্ব ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া বালকে কোন দেবতার আবির্ভাব অনুমান করিয়াছিলেন।

একদা মধ্যাহ্নে নিদ্রাকালে রৌদ্রকিরণ আসিয়া শংকরের মুখমণ্ডলে পতিত হইয়াছিল, এমন সময় এক বিশাল সর্প সম্মুখে আসিয়া ফণা উত্তোলন করত তাঁহার মস্তকে ছায়া বিস্তার করিয়া থাকে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য মহেন্দ্র স্বীয় শিষ্যকে দেবাদিদেব শ্রীশংকরের অবতার বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। শ্রীশংকরের পরবর্তী জীবনে এরূপ বহু অলৌকিক ঘটনা লোকে প্রত্যক্ষ করিত। যৌবনের প্রারম্ভেই সুঠাম সুন্দর কন্দর্পতুল্য দেহকান্তি সকলের মনপ্রাণ আকৃষ্ট করিত, তাঁহার সুকোমল দেহে কখন কখন আসুরিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়া সকলে তেমনই আশ্চর্য হইত। এমন কঠিন ও কোমলের একত্র সমাবেশ একমাত্র অবতার পুরুষগণের জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর শ্রীশংকর কিছুকাল দুষ্কর যোগাভ্যাস করিতে থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া যোগমার্গ পরিত্যাগ করত ভাগবতরসে আপনাকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করেন। এই সময় হইতেই শ্রীশংকরের জীবনে তাঁহার নবধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে।

দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সূর্যবতী নাম্নী এক রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু মাত্র তিন বৎসরকাল শ্রীশংকরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া মনু-নাম্নী এক কন্যারত্ন প্রসব করিয়াই এই পুণ্যবতী ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহারই অব্যবহিত পরে শ্রীশংকর তীর্থপর্যটনে বহির্গত হন। তিনি সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁহার নবধর্মে সিদ্ধি লাভ করেন। দ্বাদশ বৎসর পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীশংকরদেব দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন ও আদর্শ গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালন করিয়া বিশ্ববাসীর সমক্ষে এক প্রকৃষ্ট জীবনাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সময় আপন ধর্মমত প্রচার করিয়া তৎকালীন অগণিত সমাজপতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এমনকি অনেক দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিকেও আপন উদার বৈষ্ণব ধর্মমতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

যে উন্নত, সর্বজনগ্রাহ্য, অনাড়ম্বর, পৌরোহিত্যের কঠিন নিপীড়ন-বর্জিত প্রেমধর্মে তিনি সমগ্র আসামকে ভাসাইয়াছিলেন তাহা প্রচার

করা তৎকালে সহজসাধ্য ছিল না। শত্রুগণকে দুরভিসন্ধিমূলক কার্যের অবকাশ না দিয়া এই সময় তিনি স্বেচ্ছায় সপরিবারে আসামের নিম্নভূমিতে ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে চলিয়া আসেন। এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিয়াই কামরূপের বরপেটা মৌজাকে তিনি পুণ্য তীর্থে পরিণত করিলেন।

শ্রীশংকরের দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণ এক অদ্ভুত ঘটনা। শতশত ভক্ত, শিষ্য ও পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি যখন যে তীর্থে গমন করিতেন তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার সহিত যুক্তিতর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার উদার মতবাদ গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে এই তীর্থ পর্যটন-কালেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীশংকরের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় ও ধর্মমত সম্বন্ধে উভয়ের দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সমসাময়িক দুইটি ভিন্ন-মতাবলম্বী আচার্যদ্বয়ের পুরুষোত্তমধাম শ্রীক্ষেত্রে একত্র অবস্থিতি যেন হরিহর-মিলনে রূপায়িত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীকবীরের সহিতও শ্রীশংকরের এই ভ্রমণ-কালে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার তীর্থ-ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া শ্রীশংকরদেব একমাত্র নাম-ধর্মই প্রচার করিতে লাগিলেন। সমগ্র দেশে ছত্র ও নামঘর প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীমাধবদেব, রামদাস, রামরাম, হরিদেব, নারায়ণ দাস, রত্নাকর, দামোদর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিভিন্ন ছত্রে ঘুরিয়া এই সর্বার্থ-দায়ক সর্বজনীন 'নামধর্ম' প্রচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীশংকর গীত, কাব্য, নাটক, সাহিত্য ও ধর্ম-গ্রন্থ-রচনায় যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহাই পরবর্তীকালে অসমীয় সাহিত্যের মূল উৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছন্দ ও ভাষার দিক দিয়া উহা ছিল এক নূতন সৃষ্টি। এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীশংকরদেবই অসমীয় সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা, ধারক ও পোষক ছিলেন। ইতিপূর্বে আসাম প্রদেশে গ্রন্থাদি মৈথেলী ভাষায় রচিত হইতে দেখা গিয়াছে। শ্রীশংকরের বহুমুখী প্রতিভা—আধ্যাত্মিক সামাজিক সাংস্কৃতিক—সর্ববিষয়েই পথপ্রদর্শক। যে ভাগবত ও পুরাণাদি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকট উহাদের পঠন-পাঠন একপ্রকার অসম্ভব ছিল, শ্রীশংকরদেব সহজ ও সরল মাতৃ-ভাষায় উহাদের অনুবাদ করত সর্বসাধারণের নিকট তাহার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। অতি শ্রুতিমধুর অনবদ্য পদ্যছন্দে রচনা করিয়া তিনি যে অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন তাহার ভাষা, ভাব, মধুরতা ও আধ্যাত্মিক গভীরতা অনন্তকাল অসমীয় ভাষাভাষীর অন্তরে জাগ্রত থাকিবে।

শ্রীশংকরদেবের প্রচারিত ধর্ম বৈষ্ণব গোষ্ঠী-ভুক্ত হইলেও কোন কোন বৈষ্ণব শাখার সহিত উহার যেরূপ মতৈক্য বিদ্যমান, তেমনই কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই শাংকর বৈষ্ণবধর্ম 'নামধর্ম' বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শ্রীশংকরদেবে ঈশ্বরাবতারের অভিব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহাকে অবতার না বলিয়া 'মহাপুরুষ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অপরাপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালীর সহিত বহু বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল ভিন্নরূপ। ঈশ্বরের যে কোন মূর্তি-চিন্তায় অনন্ত, অচিন্ত্য, সর্বব্যাপী ভগবানকে খর্ব করা হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মে অনন্ত ভাবরাশির প্রতীক শব্দব্রহ্ম বা নামই একমাত্র উপাস্য। নাম ও নামী অভেদ বলিয়া 'নামধর্ম' গ্রহণ করিতে তৎকালীন যে কোন মূর্তি-উপাসকের কোন দ্বিধা

বা সঙ্কোচ ছিল না, বরং পূজাপদ্ধতির মাধ্যমে যে বীভৎসতা বা ব্যভিচার ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হইত তাহা বিদূরিত হইয়াছিল। ধর্মসমন্বয়ের এই সহজ পন্থাই শ্রীশংকর প্রবর্তন করিয়াছিলেন। নামধর্ম-প্রচারের পূর্বেই—শ্রীবিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে অপ্রাকৃত লীলামাধুর্য-বর্ণন ভাগবত-রচনার মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শ্রীরাধার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা তিনি অনুমোদন করেন নাই। এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সহিত তাঁহার বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান।

জীব ঈশ্বরাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ—ইহা তিনি স্বীকার করিতেন, কেন না ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। তাই স্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর অভেদ, কিন্তু জীবাংশে মায়া বর্তমান ও ঈশ্বর মায়াতীত। এই নিমিত্ত ভেদ-জ্ঞানও বর্তমান। এ বিষয়ে তিনি ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিতেন বলিয়া শ্রীশংকরদেবের মতকে 'ভেদাভেদ'-বাদও বলা যায়। ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীশংকরদেবের আদর্শ স্পষ্টতঃ গীতোক্ত 'পুরুষোত্তম'। ক্ষর ও অক্ষর উপাধিদ্বয় হইতে স্বতন্ত্র নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষোত্তমই অনন্ত নামরূপী ভগবান। নামধর্মের ইহাই এক বিশেষত্ব।

বহু স্থানে বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি তাঁহার রচিত 'বৈকুণ্ঠ' নামক নাটক প্রদর্শন করিতেন। এই নাটকের ভাব ও ভাষা তাঁহারই অনুগত শিষ্যভক্তগণের দ্বারা গীত হইয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রীবৈকুণ্ঠধামের যথার্থ ধারণা জন্মাইতে পারিত। ত্রিগুণাতীত বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত চিত্র অঙ্কিত করিলেও বৈকুণ্ঠকে মানবের চরমগতি বলিয়া তিনি সমর্থন করিতেন না। প্রেমভক্তি লাভ করিয়া জন্মে জন্মে নামধর্ম প্রচার ও অনন্ত বিশ্বে অনন্ত ভাগবত লীলার রসাস্বাদন করাকেই জীবমাত্রের পরম আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া তিনি স্বীয় মত প্রচার করিতেন। চরম অদ্বৈত-বাদীদের ন্যায় জগৎকে মিথ্যা বলিয়া তিনি উড়াইয়া দেন নাই, আবার এ বিশ্বকে অনন্ত ভগবানের স্বরূপজ্ঞানে নিত্য বা শাশ্বত বলিয়াও ঘোষণা করেন নাই। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি অনন্তরূপে বিরাজ করেন, তাঁহাকে যে কোন একটি খণ্ডরূপে নির্দেশ করিয়া কিংবা ভাবনা করিয়া তিনি অনন্ত রূপকে খর্ব করিতে প্রয়াস পান নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা-প্রণয়নকালে তিনি প্রধানতঃ শ্রীধরস্বামীর মত অনুসরণ করিলেও সূক্ষ্ম আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে শ্রীধরস্বামীর মতাবলম্বী ছিলেন না। শ্রীশংকরদেবের 'নামধর্ম' বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে বৈষ্ণব মতাবলম্বিগণের চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ের পার্শ্বে শ্রীশংকরের এই সম্প্রদায়কে নিঃসংকোচে পঞ্চম শাখা আখ্যা দান করা অযৌক্তিক নহে। এই নামধর্ম যেমনই যুক্তিবাদে পূর্ণ, তেমনই সম্পূর্ণ বেদবিহিত। আবার তৎকালীন দেশ, কাল ও সমাজের পক্ষে যেমন উপযোগী, তেমনই হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার পক্ষে ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ সর্বজনীন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার না করিলে সমগ্র আসাম ও উত্তরবঙ্গে আজ হিন্দুর চিহ্নমাত্র থাকিত কি না, তাহা বলা দুষ্কর।

শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় আপামরে নামধর্ম প্রচার করায় ব্রাহ্মণের ও পৌরোহিত্যের প্রাধান্য খর্ব হইতেছিল। এই কারণেই শ্রীশংকরদেবকে বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। রাজা ও ধনিগণকে শিষ্যত্বে বরণ করা তাঁহার নীতি-বহির্গত ছিল। কুচবিহারাধিপতির আগ্রহে

এই নীতি ভঙ্গ করিতে হইবে বুঝিয়া তিনি স্বেচ্ছায় সমাধিতে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন। যে নীতিকে তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে আপন ভাগবতী তনু পরিত্যাগ করিয়া জগতে সত্য রক্ষার এক জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

মূর্তি-উপাসনা বা মূর্তি-চিন্তার বিরোধী হইয়া তিনি প্রকারান্তরে সাকার ও নিরাকার উপাসনাকারিগণের দ্বন্দ্বই যে কেবল দূর করিয়াছিলেন—তাহা নহে, এই বিরোধী মতাবলম্বিগণের মধ্যে নামধর্ম প্রচারে এক মহাসমন্বয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে একত্র বসিয়া সমবেতভাবে যাহার যে নামে ইচ্ছা ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা থাকায় তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই নামধর্ম একাধারে অস্পৃশ্যতা বর্জন, সকল মানবের ধর্মীয় সমান অধিক র, পৌরোহিত্যের দুর্নীতি হইতে পরিত্রাণ প্রভৃতি বহুবিধ সামাজিক সংস্কার সাধন করিয়াছিল।

রামপ্রসাদ

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

ফুটেছিল ফুল হ'য়ে ভক্তি তাঁর বুকের বাগানে,
পূজার মাধুরী তাই প্রাণে
মাতৃরূপা অসীমের পরম পরশখানি চেয়ে—
আলো-আঁধারের পথ বেয়ে
জেগে ছিল রাতদিন ধ'রে,
মায়ের নামের ডাক নয়নের জল হ'য়ে ঝরে।
আরতির দীপখানি আঁখির দৃষ্টিতে ছিল জ্বালা,
ভুবন-জড়ানো মাতৃ-বিভূতির রশ্মিধারা ঢালা
প্রকৃতির সবুজে সবুজে।

সেই রূপজ্যোতি দেখি ধ্যানের জগতে চোখ বুজে'।
ধ্যান তাঁর আকাশের নীলিমার মমতায় মাখা,
কালোর অমৃত-আলো প্রাণের গহনে নিতি আঁকা,
কথা তাঁর ফুটে ওঠে বেদনা-ব্যাকুল অভিমানে,
ত্যাগের গৈরিক জাগে চেয়ে দিগ্‌বসনার পানে।
প্রলয়ের নৃত্যচ্ছন্দে চরণ দু'খানি দোলে যাঁর—
ঝটিকার কলরোলে পদক্ষেপ যাঁর অবিচার—
'জয় মা' বলিয়া ঝাঁপ দিল বুকে তাঁরি,
তহবিলদার এক অমৃতের চির-কারবারী।
স্বর্গের মনে তাঁর মিতালি গানের সুরে সুরে,
মায়ের প্রাণের হ'ল প্রতিষ্ঠা তাঁরি তো প্রাণপুরে।
তিমির-রাত্রির তাই অবসান প্রাণের অতলে,
ঘরে ফিরে সন্ধ্যাবেলা বসেছে কোলের ছেলে কোলে।

পদ্মপুরাণ

অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

[চৈত্রসংখ্যার পর]

বস্তুতঃ প্রচলিত তালিকায় [৩৪] অষ্টাদশ পুরাণের যে ধারা দেখা যায় তাহাতে পদ্মপুরাণ[৩৫] অবশ্যই যুক্ত হইবে এবং যেহেতু বায়ুপুরাণের[৩৬] ন্যায় পদ্মপুরাণের একবারও কোন বিকল্প নাই সেই হেতু ইহার উৎপত্তিকাল কিছুতেই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্বে হইতে পারে না। মৎস্যপুরাণে (৫৩ ১২-৫৭) অষ্টাদশ পুরাণের যে বিবরণী আছে তাহা খৃঃ পূঃ ৫৫০ হইতে ৬৫০ এর [৩৭] মধ্যে রচিত, বিষ্ণুপুরাণ খৃঃ পূঃ ১০০ হইতে ৩৫০ [৩৮] এর মধ্যে রচিত—ইহার তালিকা নিশ্চয়ই পরবর্তী যুগে সংশোধিত হইয়াছিল, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১৩৭ সর্গে অষ্টাদশ পুরাণের তালিকা আছে, কিন্তু সকল সংস্করণে না থাকায় উহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, বায়ু পুরাণের ১০৪ সর্গে ভিন্ন তালিকা বিদ্যমান, কিন্তু উহা অনেক পরবর্তী যুগে পুরাণের সহিত সংযুক্ত হয়।[৩৯] যাহা হউক মৎস্যপুরাণ স্পষ্টই প্রমাণ করে যে বর্তমান পদ্মপুরাণ খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হয়। এই কালটি মৎস্যপুরাণের অন্য একটি উক্তিতে প্রমাণিত হয়, মৎস্যপুরাণে (৫৩ ৫৯) [৪০] পদ্মপুরাণের একটি অংশরূপে (উপভেদ) 'নারসিংহ পুরাণের' নাম করা হইয়াছে। যেভাবে এই দুইটি পুরাণ পরস্পর সম্পৃক্ত তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পদ্মপুরাণ এতটা জনপ্রিয় হয় যে মূলতঃ স্বতন্ত্র ও প্রামাণিক গ্রন্থ নারসিংহ পুরাণও প্রমাণের জন্য পদ্মপুরাণের সহিত একত্র উল্লিখিত হয়। [৪১] ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'পদ্ম-পুরাণ' নামধেয় রবিসেনের গ্রন্থ পদ্মপুরাণের প্রাচীনতার আরেকটি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। গ্রন্থটির শিরোনাম এবং 'পদ্ম-' নামধারী রামদাশরথির উপাখ্যান হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে রবিসেনের কালে

৩৪ পুরাণের তালিকার জন্য এই গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য: আর সি হাজরা—Puranic Records on Hindu Rites and Customs পৃঃ ১৩ (পাদ টীকা ১৩) এম্. উইন্টারনিট্জ—History of Indian Literature I পৃঃ ৫৩১ (পাদটীকা ১) হাজরা—Our Heritage Vol I পৃং ২

৩৫ একমাত্র স্কন্দপুরাণের (সপ্তম—প্রবেশ খণ্ড) তালিকায় পদ্মপুরাণের নাম নাই। অষ্টাদশ পুরাণের স্থলে সপ্তদশ পুরাণের উল্লেখ আছে, কিন্তু স্কন্দপুরাণের ঐ সর্গেরই ২৮-৭৬ শ্লোকে পদ্মপুরাণের নাম থাকায় মনে হয় ভ্রমবশতঃ ঐ তালিকায় পদ্মপুরাণের নাম বাদ পড়িয়াছে।

৩৬ অষ্টাদশ পুরাণের বিভিন্ন তালিকায় বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, বায়ুপুরাণ বা বায়বীয় পুরাণ স্থলে শিব বা শৈব, কোথাও ব্রহ্মাণ্ডের বদলে শিব ও বায়ু পুরাণ, কোথাও বা শিবের স্থলে ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ। দ্রষ্টব্য—কূর্মপুরাণ I ১.১৩-১৫; বরাহপুরাণ ১১২ ৬৯-৭২, বিষ্ণুপুরাণ III ৬২; লিঙ্গপুরাণ I. ৩৯.৬১ পৃঃ, ভাগবত পুরাণ XII ৭ ২৩ পৃঃ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৩৮' ৮ পৃঃ এবং শিবপুরাণ ১.৩৮ স্কন্দপুরাণ VII. ১২.৫.৭২ প্রভৃতি।

৩৭ দ্রষ্টব্য আর সি হাজরা Puranic Records on Hindu Rites and Customs পৃঃ ৩৯—৪২

৩৮ ঐ পৃষ্ঠা ১৯—২৪

৩৯ ঐ পৃষ্ঠা ৯০—৯১

৪০ শ্লোকটি এইরূপ—

উপভেদান্ প্রবক্ষ্যামি লোকে যে সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
পাদ্মে পুরাণে তত্রোক্তং নরসিংহোপবর্ণনম্।
তচ্চাষ্টাদশসাহস্রং নারসিংহমিহোচ্যতে।

অথবা আরও পূর্বে রামের আখ্যান-বর্ণিত হিন্দু পুরাণ খুবই লোকপ্রিয় ছিল। বিমলসূরীর গ্রন্থের শিরোনাম (পউম চরিঅ) এবং বিষয়-বস্তুও ইহা সমর্থন করে। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে আমাদের আলোচ্য 'পদ্মপুরাণের' উৎপত্তি খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের পরে নহে। সম্ভবতঃ ইহার উৎপত্তি আরও প্রাচীন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন কালের পদ্মপুরাণের সব সর্গ বর্তমানে প্রচলিত পদ্মপুরাণে নাই। আলোচ্য গ্রন্থটির উপাদান বিশেষরূপে আলোচনা করিলে দেখি যে যুগে যুগে এই গ্রন্থটি অনেক পরিবর্তনের সম্মুখীন হইযাছে এবং ইহার সর্গ ও শ্লোকগুলি অনেক কালের ব্যবধানে লেখা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের প্রাচীনত্ব ইহার প্রাকৃতান্ত্রিক 'ব্রহ্মা'-সম্প্রদায়ের প্রভাব হইতে অনুভূত হয়, এই প্রভাব প্রাচীন সংস্করণের সৃষ্টিখণ্ডের কয়েকটি সর্গে বিদ্যমান। বস্তুতঃ প্রচলিত পুরাণে 'ব্রহ্মা'-সম্প্রদায়ের প্রভাব অনুভূত হয় এবং এই কারণেই সৌরপুরাণে আছে (৯ ১৮খ ১৯ক)—"যিনি ব্রহ্মাকে উৎসর্গ করার নিমিত্ত দিব্যগুরু বৃহস্পতির দিবসে বেদজ্ঞ দ্বিজকে পাদ্ম (পুরাণ) উৎসর্গ করেন তিনি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করেন।"[৪২] ভি. আর রামচন্দ্র দীক্ষিতর তামিল শব্দকোষ 'পিঙ্গলন্দই'র মতানুযায়ী ৪২ক বলিয়াছেন—ব্রহ্মাই পদ্মপুরাণের আসল দেবতা। পদ্মপুরাণের সংজ্ঞা এবং সৃষ্টি খণ্ডের পুরাতন আখ্যা 'পুষ্কর পর্ঠন' হইতেও ব্রহ্মাপূজকদের সহিত মূল সম্পর্ক অনুমান করা যায়। ব্যক্তিগত দেবতা হিসাবে ব্রহ্মার জন্মস্থল পদ্ম এবং আদিকাল হইতেই এই দেবতা পুষ্কর নামের সহিত সম্পৃক্ত। যদিও ব্রহ্মা-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এবং কর্মের অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায় তথাপি ব্রহ্মা-বিশ্বাসী শ্রেণীর উৎপত্তি অতি প্রাচীনকালে এবং তাঁহারা বরাহমিহিরের আমলে সক্রিয় ছিলেন, এ বিষয়ে অল্প সন্দেহের অবকাশ আছে। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় (৬০ ১৯) সমসাময়িক জনপ্রিয় ধর্মসম্প্রদায়সমূহের নাম করিয়াছেন এবং তাহাতে 'বিপ্র'[৪৩] অভিহিত ব্রহ্মা-পূজকদের নাম করা হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে ব্রহ্মার প্রতি-কৃতি ও পূজা পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে।[৪৪] বহু গ্রন্থেই প্রচলিত জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে—তাহাতে দেখি ব্রহ্মা কৃতযুগের দেবতা (ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবঃ), বিষ্ণু ও শিবের পূর্ববর্তী।[৪৫]

৪১ স্মৃতি টীকাকার ও নিবন্ধলেখক কর্তৃক বহু আলোচিত এই পুস্তকটি খৃষ্টীয় ৪০০ হইতে ৫০০ শতকের মধ্যে রচিত। দ্রষ্টব্য আর সি হাজরা Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute XXVI ১৯৪৫ পৃঃ ১২—৮৮

৪২ পাদ্মং ব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য যো দদাতি গুরোর্দিনে।
দ্বিজায় বেদবিদুষে জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ॥

৪২ক দ্রষ্টব্য Indian Historical Quarterly VIII. পৃঃ ৭৭৩

৪৩ বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভা স্ম দ্বিজান্।
মাতৃণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রহ্মণঃ॥
শাক্যান্ সর্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু।
যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ সবিধিনা তৈস্তস্য কার্যা ক্রিয়া॥

৪৪ দ্রষ্টব্য মৎস্যপুরাণ ২৬০ ৪০-৪৪ এবং ২৬৭ ৩৭, ৩৯, বিষ্ণুধর্মোত্তর তৃতীয় ১৬

মৎস্যপুরাণের ২৬০ এবং ২৬৭ সর্গ ৫৫০ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত (দ্রষ্টব্য হাজরা—Puranic Records on Hindu Rites and Customs পৃঃ ৪৭) এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর ৪০০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দে রচিত (দ্রষ্টব্য হাজরা—Journal of the Gouhati University Vol III, ১৯৫২ পৃঃ ৫৮)

৪৫ ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবস্ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ।
দ্বাপরে ভগবান্ বিষ্ণুঃ কলৌ দেবো মহেশ্বরঃ॥

শ্লোকটি হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণি III II পৃঃ ৬২৯এ অবস্থিত। অন্যান্য শ্লোক—ঐ পৃঃ ৬৬১ দ্রষ্টব্য।

স্মার্তদের পূর্ববর্তিগণ পঞ্চায়তন বা পঞ্চদেবতার উপাসক ছিলেন, খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভযুগে ব্রহ্মা এই পঞ্চ বা ষড্‌দেবতার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খৃষ্টযুগের প্রথমদিকে ব্রহ্মা-পূজকদের অবস্থিতি[৪৬] এবং শৈব ও বৈষ্ণবদের সহিত তাঁহাদের বিরুদ্ধতার সম্পর্কে বহু উল্লেখ পুরাণে দৃষ্ট হয়। 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'তে উদয়নাচার্য বলিয়াছেন যে পুরাণকারদের প্রধান দেবতাই হইলেন 'পিতামহ' (ব্রহ্মা) [৪৭], নাট্যশাস্ত্রেও ভরত ব্রহ্মার সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশ করিয়াছেন—ব্রহ্মাই একমাত্র দেবতা যিনি 'জর্জর' পতাকার উচ্চে অবস্থান করেন। [৪৮] এই সমস্ত এবং অনুরূপ তথ্য সমূহই যে শুধু তৎকালে ব্রহ্মা-পূজার বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে তাহা নহে—দেশের বিভিন্ন অংশে ব্রহ্মার বহু প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মা-পূজক সম্প্রদায় বিপুল প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এই সম্প্রদায়ের প্রচারের জন্য নিজস্ব পুরাণ ছিল—অন্যান্য প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়গুলি হইল পঞ্চরাত্র, পাশুপত, ভাগবত এবং সৌর।

৪৬ দ্রষ্টব্য মৎস্যপুরাণ ২৭৪ সর্গ (বিভিন্ন মহাদানানুযায়ী ব্রহ্মামূর্তির পূজার নির্দেশ আছে), ২৬৫ ৪ (পুরোহিতকে 'ব্রহ্মোপেন্দ্রহরপ্রিয়' হইতে হইবে), এবং ২৬৬ ৩৯ (ব্রহ্মা-মূর্তির অভিষেকের কালে ইহার মতে ব্রহ্মামন্ত্র পাঠ করিতে হইবে), কূর্মপুরাণ ১২. ১০৪ (ব্রহ্মোপাসকগণ মস্তকে ঐ সম্প্রদায়ের চিহ্ন ধারণ করিবেন), ১২৮ ১৯ (কলিযুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্যোপাসনার সংবাদ এখানে পাওয়া যায়) এবং ২ ১৮ ৯০–৯১ এবং ২৬ ৩৯ (ইহাতে ব্রহ্মা পূজার নির্দেশ আছে)"।

৪৭ দ্রষ্টব্য—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি (টি. বীররাঘবাচার্য, তিরুপতি ১৯৪১) প্রথম স্তবক (পৃঃ ৪)—ইহ যত্তপি যং কমপি পুরুষার্থমর্থয়মানাঃ) পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ উপাসতে তস্মিন্ ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ? দ্রষ্টব্য Bi 61. Ind. ed. ১৮৯০ পৃঃ ১৬

৪৮ দ্রষ্টব্য নাট্যশাস্ত্র ১.৫৯

বর্তমান পদ্মপুরাণ কখন রচিত হয় ইহা বলা খুবই কঠিন। মহাভারত, পদ্মপুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে যে ভাবে ব্রহ্মার সম্পর্কে পুষ্করতীর্থকে গৌরবান্বিত করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় পুষ্করের ব্রহ্মোপাসকগণ কর্তৃকই প্রথম ইহা রচিত হইয়াছিল এবং এই দেবতার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপুরাণও জনসমাজে এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করিতে থাকে যে বৈষ্ণবগণ পরবর্তীযুগে এই গ্রন্থটিকে স্বমত-প্রচারে ব্যবহার করিতে প্রলুব্ধ হন।

বর্তমান পদ্মপুরাণ কয়েকটি বিরাট খণ্ডে বিভক্ত একটি বিপুলকলেবর পুস্তক, বাংলা সংস্করণে পাঁচটি খণ্ড—সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল এবং উত্তর খণ্ড। আনন্দাশ্রম প্রেস (পুনা) ও বেঙ্কটেশ্বর প্রেস (বোম্বাই) হইতে প্রকাশিত দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে ছয়টি খণ্ড, বাংলা সংস্করণের স্বর্গখণ্ডের পরিবর্তে আদিখণ্ড (বেঙ্কটেশ্বরে স্বর্গখণ্ড) ও ব্রহ্মখণ্ড। যদিও আনন্দাশ্রম ও বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণে খণ্ডের নামসমূহ সম্পূর্ণ মেলে না এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণের খণ্ড-বিন্যাস সম্পূর্ণ আলাদা তবুও বাংলা পাণ্ডুলিপি এবং এই দুইটি সংস্করণ বহু শ্লোকে খণ্ডগুলির নাম ও বিন্যাস বাংলা সংস্করণের অনুরূপ। উপরি-উক্ত খণ্ডগুলি ছাড়া আরও অসংখ্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে সেগুলি অবশ্যই পদ্মপুরাণের অংশবিশেষ বহুকাল হইতে প্রচারিত পুরাণের এই বিপুল কলেবরের জন্যই মৎস্য বায়ু ও অন্যান্য পুরাণ উল্লেখ করিয়াছে যে পদ্মপুরাণে ৫৫০০০ শ্লোক আছে। [৪৯] এমনকি পদ্মপুরাণও উহার এই বিস্তৃতি স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম

৪৯ মৎস্য পুরাণ ৫৩.১৪, বায়ুপুরাণ ১০৪ ৯, ভাগবত পুরাণ ১২ ১৩ ৪, স্কন্দ পুরাণ ৫ ৩ (রেবা খণ্ড) ১.৩২ এবং ৭ ১ ২ ১৩, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ৪ ১৩৩ ১১ ইত্যাদি।

বিশ্লেষণ হইতেই বোঝা যায় যে মূলতঃ পদ্ম-পুরাণের এত বিপুল আকৃতি কিংবা খণ্ডবিভাগ ছিল না। পদ্মপুরাণের বিভিন্ন অংশ এবং বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সৃষ্টিখণ্ডে কয়েকটি খুব চিত্তাকর্ষক শ্লোক আছে, সেখানে সূত বলিতেছেন :

ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্বং যবনমাত্রং মরীচয়ে ॥
এতদেব চ বৈ ব্রহ্মা পাদ্মলোকে জগাদ বৈ।
সর্বভূতাশ্রয়ং তচ্চ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
পাদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণি হি পঠ্যতে।
পঞ্চভিঃ পর্বভিঃ প্রোক্তঃ সংক্ষেপাদ্ ব্যাসকারণাৎ ॥
পৌষ্করং প্রথমং পর্ব যত্রোৎপন্নঃ স্বয়ং বিরাট্।
দ্বিতীয়ং তীর্থপর্ব স্যাৎ সর্বগ্রহ-গণাশ্রয়ম্ ॥
তৃতীয়পর্বগ্রহণা রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
বংশানুচরিতং চৈব চতুর্থে পরিকীর্তিতম্ ॥
পঞ্চমে মোক্ষতত্ত্বং চ সর্বতত্ত্বং নিগদ্যতে।
পৌষ্করে নবধা সৃষ্টিঃ সর্বেষাং ব্রহ্মকারিতা ॥
দেবতানাং মুনীনাং চ পিতৃবর্গস্তথাপরঃ।
দ্বিতীয়ে পর্বতশ্চৈব দ্বীপাঃ সপ্ত চ সাগরাঃ ॥
তৃতীয়ে রুদ্রসর্গস্তু দক্ষশাপস্তথৈব চ।
চতুর্থে সম্ভবো রাজ্ঞাং সর্ববংশানুকীর্তনম্ ॥
অন্ত্যেঽপবর্গ-সংস্থানং মোক্ষশাস্ত্রানুকীর্তনম্।
সর্বমেতৎ পুরাণেঽস্মিন্ কথয়িষ্যামি বো দ্বিজাঃ॥[৫০]

৫০ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, বঙ্গবাসী প্রেস সংস্করণ ১.৫৮খ-৬৬ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণ ১.৫৮খ—৬৬— আনন্দাশ্রম প্রেস সংস্করণ ১.৫২খ—৬০)

আনন্দাশ্রম প্রেস সংস্করণ হইতে বঙ্গবাসী ও বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণের পাঠ ভাল, অন্য দুইটির 'ব্যাসকারিতাৎ' পাঠ অপেক্ষা আনন্দাশ্রম সংস্করণের 'ব্যাসকারণাৎ' (৫ পঙ্‌ক্তি পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। বঙ্গবাসী ও বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণের অংশ উপরের অংশের অনুরূপ। উপরের শ্লোকগুলি বাংলা পাণ্ডু-লিপির সৃষ্টিখণ্ডে আছে। দ্রষ্টব্য—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ —পাণ্ডুলিপি নং ৭৫৫ পৃষ্ঠা ৩ক, প্রথম সর্গ 'ব্যাসকারিতঃ' ৫ পঙ্‌ক্তি ; 'সর্বতীর্থগুণাশ্রয়ম্' ৭ম পঙ্‌ক্তি এবং 'তৃতীয়ং পর্ব স্বর্গশ্চ' ৮ম পঙ্‌ক্তি; ষোড়শ পঙ্‌ক্তিতে আছে—'ব্রহ্মাগীতানুকথনং পঞ্চমেঽপ্যনুকীর্তনম্।'

এই শ্লোকে সূতের বিবৃতি এবং পদ্মপুরাণের বিভিন্ন পর্বের বিবরণী হইতে প্রাচীন পদ্ম-পুরাণ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় জানিতে পারি :

(১) মূলতঃ এই পুরাণ ব্রহ্মা কর্তৃক মরীচির নিকট উক্ত এবং ইহাতে ৫৫০০০ শ্লোক আছে।

(২) ইহা ব্যাসের জন্য সংক্ষেপে পর্বনামে পাঁচটি ভাগে (মরীচিদ্বারা) বিবৃত হইয়াছে।

(৩) পাঁচটি পর্বের মধ্যে (ক) প্রথম পুষ্কর-পর্বনে বিরাজের মানুষের বর্ণনা, (খ) দ্বিতীয় তীর্থ-পর্বনে আকাশের গ্রহনক্ষত্র, পর্বত, মহাদেশ ও সপ্ত সমুদ্রের বর্ণনা (পৃথিবী পৃষ্ঠ), (গ) তৃতীয় খণ্ডে যে নৃপতিগণ বহু অর্থ যাজকদের দান করিতেন তাঁহাদের বর্ণনা, রুদ্রের সৃষ্টি ও দক্ষের শাপের বর্ণনা আছে, (ঘ) চতুর্থ খণ্ডে নৃপতিদের উৎপত্তি ও রাজকীয় পরিবারের ইতিহাস এবং (ঙ) পঞ্চম খণ্ডে পরমমোক্ষের প্রকৃতি ও উহা লাভ করিবার উপায় বর্ণনা আছে।

বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত এবং ব্রহ্মা ও মরীচির কথোপকথন সহ পদ্মপুরাণ এত বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ ছিল না, ইহা যে শুধু উল্লিখিত শ্লোক[৫১] (পদ্মপুরাণের পাঁচটি পর্বে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি) হইতে বুঝা যায় তাহা নহে—কৃত্রিম অগ্নিপুরাণ এবং বর্তমান পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ড হইতেও জানা যায়। এই দুইটির মধ্যে প্রথমটির মতে পদ্ম-পুরাণের বিস্তৃতি ১২০০০ শ্লোক[৫২] পদ্মপুরাণেই ইহাতে কৃতযুগে ১ লক্ষ ২৫ হাজার শ্লোক, ত্রেতাযুগে ৫২ হাজার, দ্বাপরে ২২ হাজার এবং

৫১ ঐ সৃষ্টি খণ্ড ২.৫৮ক (বঙ্গবাসী সংস্করণ ২.৫৭খ এবং বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ ২.৫৮খ এই দুইটিতেই এই পাঠ আছে—'পর্ব বাপ্যথ পর্বার্ধং সমগ্রং বা প্রভাষিতম্।')

৫২ অগ্নিপুরাণ ২৭২.২
বৈশাখ্যং পৌর্ণমাস্যং চ স্বর্গার্থী জলধেনুমৎ।
পাদ্মং দ্বাদশসাহস্রং জ্যৈষ্ঠে দদ্যাচ্চ ধেনুমৎ ॥

কলিযুগে ১২ হাজার শ্লোক আছে, চারযুগের পুরাণেই একই মতবাদ এবং ধারণা বিদ্যমান, শেষে একটি বৃহৎ বিবৃতি আছে যাহাতে বলা হইয়াছে যে কলিযুগে এই দ্বাদশসহস্র শ্লোকযুক্ত পুরাণ বিনষ্ট হইবে এবং ঐ যুগেই উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।৫৩ সুতরাং প্রাচীন পদ্মপুরাণ অনেক ক্ষুদ্র ছিল এবং বর্তমানে পদ্মপুরাণ নামক এই বৃহৎ গ্রন্থটি একটি নতুন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রহ্মা ও মরীচির কোন কথোপকথন নাই, বস্তুতঃ এই গ্রন্থটির সহিত পুরাতন পদ্মপুরাণের খুব অল্প সাদৃশ্যই আছে। এই ক্ষুদ্র পদ্মপুরাণের পূর্বে অন্য কোন এই জাতীয় গ্রন্থ ছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। উল্লিখিত ভূমিখণ্ডের বিবৃতি (ও বাংলা সংস্করণের উত্তর খণ্ড) এবং বর্তমান পদ্মপুরাণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পদ্মপুরাণ নানাবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক পুনর্লিখিত হইতে হইতে আমাদের নিকট আসিয়াছে।

পদ্মপুরাণের পর্ববিভাগ নূতন কিছু নহে, ভবিষ্যপুরাণেও অনুরূপ বিষয় বিদ্যমান, ভবিষ্যৎপুরাণের মুদ্রিত সংস্করণে চারিটি বিভাগ

৫৩ পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড (১২৫ ৩৯ ৪৫):

সপাদং লক্ষমেবং তু ব্রহ্মাণ্যং পুষ্করং শৃণু।
কৃতে যুগে তু নিষ্পাপাঃ শৃণ্বন্তি মনুজা দ্বিজাঃ॥
লক্ষস্যার্ধং তত কৃৎস্নং পুরাণং পদ্মসংজ্ঞকম্।
শ্লোকানাং তু সহস্রাভ্যাং দ্বাভ্যামেব তথাধিকম্॥
ত্রেতাযুগে তথা প্রাপ্তে শৃণ্বন্তি মনুজা দ্বিজাঃ।
চতুর্বর্গফলং ভুক্ত্বা তে যাস্যন্তি হরিং পুনঃ॥
দ্বাবিংশতি সহস্রাণাং সংহিতা পদ্মসংজ্ঞকা।
দ্বাপরে কথিতা বিপ্র ব্রহ্মণা পরমাত্মনা॥
দ্বাদশৈব সহস্রাণাং পদ্মাখ্যাং চ সুসংহিতাম্।
কলৌ যুগে পঠিষ্যন্তি মানুষা বিষ্ণুতৎপরাঃ॥
একোহপ্যেকভাবশ্চ চতুর্ণাপি প্রবর্তিতঃ।
সংহিতাস্বপি বিপ্রেন্দ্রাঃ শেষাখ্যানপ্রবিস্তরঃ॥
দ্বাদশৈব সহস্রাণি নাশং যাস্যন্তি সত্তমাঃ।
কলৌ যুগে তু সংপ্রাপ্তে প্রথমং হি ভবিষ্যতি॥

দ্রষ্টব্য বঙ্গবাসী সংস্করণ ১২০, ৩৯খ – ৪৬ক এবং বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ ১২৫. ৪০-৪৬, উভয় সংস্করণেই বিভিন্ন পাঠ আছে, যেমন ২য় পঙ্ক্তিতে 'দ্বিজাঃ' স্থলে 'দ্বিজ', পঞ্চম পঙ্ক্তিতে 'বেদা প্রোক্তস্থি মানবা.', ৭ম পঙ্ক্তিতে 'দ্বাবিংশতি সহস্রাণি সংহিতা পদ্মসংজ্ঞিতা', নবম পঙ্ক্তিতে পদ্মাখ্যা সা তু সংহিতা', দশম পঙ্ক্তিতে 'মানুষাঃ' স্থলে 'মানবাঃ', দ্বাদশ পঙ্ক্তিতে 'অপি বিপ্রেন্দ্র'র স্থলে 'বিপ্রেন্দ্র' এবং ত্রয়োদশ পঙ্ক্তিতে 'সত্তমাঃ' স্থলে 'সত্তমঃ'। আনন্দাশ্রম সংস্করণ হইতে বঙ্গবাসী ও বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণের পাঠ অনেক ভাল। নিম্নলিখিত পরিবর্তন সহ বাংলা পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত শ্লোকগুলি আছে:

৭০-১৪ দ্বাত্রিংশচ্চ সহস্রাণাং সহিতা পদ্মসংজ্ঞিকা।
ধর্মাখ্যা কথ্যতে সা তু দ্বাপরস্য দ্বিজর্ষভাঃ॥
ততো দ্বাপরশেষে তু ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
শ্লোকানাং পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্রাণি দয়াপরঃ॥
পূরয়ামাস লোকানাং হিতায় পরমার্থতঃ।
দ্বাদশাথ সহস্রাণি পাষণ্ডাপহৃতানি চ॥
কলৌ নাশং প্রযাস্যন্তি প্রথমং দ্বিজসত্তমাঃ।
বিনা দ্বাদশসাহস্রপদ্মাস্যপি মহাফলম্॥
কলৌ যুগে পঠিষ্যন্তি পুরাণং পদ্মসংজ্ঞকম্।
পঞ্চ পঞ্চশতাং ধীরাঃ সাহস্রাণাং যথা ফলম্।
ন্যূনৈরপি ফলং বিপ্রাস্তথৈব জনয়িষ্যতি॥

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড Society Asiatic (কলিকাতা) পাণ্ডুলিপি নং জি ৪৪১৬ পৃঃ ৩৬৫প উত্তরখণ্ডের এই শ্লোকের ১ম পঙ্ক্তি ও ৩য় হইতে ৫ম পঙ্ক্তি পর্যন্ত ভূমিখণ্ডের চারিটি বাংলা পাণ্ডুলিপির একটিতে আছে। দ্রষ্টব্য এশিয়াটিক সোসাইটি—পাণ্ডুলিপি নং ৪৪২৩ পৃঃ ২৩৩খ।

এই শ্লোকসমূহে আছে—(১) দ্বাপরযুগে পদ্মপুরাণের ৩২০০০ শ্লোক, (২) দ্বাপরযুগের শেষে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য উহা বাদরায়ণ কর্তৃক ৫৫০০০ শ্লোকে পরিণত হয়, (৩) কলিযুগে পাষণ্ডদের দ্বারা অপহৃত হওয়ায় ইহার ১২০০০ শ্লোক বিনষ্ট হয় (৩) কলিযুগে ১২০০০ শ্লোকবিহীন পদ্মপুরাণ লোকে পাঠ করে (৫) ৫৫০০০ শ্লোকের বৃহৎ পদ্মপুরাণ পাঠ ও ক্ষুদ্র পদ্মপুরাণ পাঠের ফল একই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই শ্লোকের লেখক সংক্ষিপ্ত পদ্মপুরাণকে অতি প্রাচীনকালে স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহার ১২০০০ শ্লোকের বিনাশও স্বীকার করিয়াছেন।

আছে—ব্রাহ্মপর্বন্, মধ্যমপর্বন্, প্রতিসর্গপর্বন্ এবং উত্তরপর্বন্, ইহার দুইটি শ্লোকে এমন কি নারদীয় পুরাণের একটি সর্গেও ইহার পাঁচটি পর্ব বিভাগ করা হইয়াছে—ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ত্বাষ্ট্র (অথবা নারদীয় পুরাণের মতে সৌর) এবং প্রতিসর্গ।[৫৪] খুব সম্ভবতঃ বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ যেমন অধ্যায়বিভাগ সত্ত্বেও চারিটি বৃহৎ পাদে (প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্‌ঘাত এবং উপসংহার) বিভক্ত হইয়াছে সেইরূপ পদ্মপুরাণও প্রসংগানুযায়ী অধ্যায়বিভাগ সত্ত্বেও অধ্যায়গুলি সুবিন্যস্ত হইয়া পর্বে বিভক্ত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণান্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থের পূর্বভাগ ও উত্তরভাগের উল্লেখ আছে।[৫৫] পূর্ব ও উত্তরভাগ বিশিষ্ট কোন পদ্মপুরাণ গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই না, যেহেতু উক্ত প্রবন্ধগুলি ব্যতীত অন্য কোথাও এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই—সেইহেতু বায়ুপুরাণের ন্যায়[৫৬] পদ্মপুরাণের পর্বগুলিও কোন বাংলা পাণ্ডুলিপিতে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সম্ভবতঃ উক্ত প্রবন্ধগুলির লেখকগণ পদ্মপুরাণের 'উত্তরখণ্ড' বুঝাইতে 'উত্তরভাগ' এবং অবশিষ্টাংশ বুঝাইতে 'পূর্বভাগ' নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

উল্লিখিত ভূমিখণ্ড হইতে জানিতে পারি যে চারযুগের পদ্মপুরাণের চার সংহিতাতেই 'শেষে'র দীর্ঘ বিবৃতি বিদ্যমান। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই গ্রন্থের প্রাচীন সংস্করণগুলিতে 'শেষ'ই প্রধান বক্তা, তিনি বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, যেমন—সৃষ্টি, আকাশসম্বন্ধীয় ও পার্থিব ভূগোল, রাজবংশের বিবরণী প্রভৃতি। যদিও প্রাচীন পুরাণের সহিত বর্তমান পদ্মপুরাণের সাদৃশ্য খুব কম, তথাপি পদ্মপুরাণে একাধিকবার শেষ ও বাৎস্যায়নের কথোপকথনের উল্লেখ থাকায় আমাদের অনুমান যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ বাংলা পাণ্ডুলিপির ভূমিখণ্ডের নাম করা যাইতে পারে। উহার শেষের কয়টি সর্গ পৃথিবীর বিস্তৃতি, স্বর্গ ও পাতালের সংখ্যা-সম্বন্ধীয় শেষের নিকট বাৎস্যায়নের প্রশ্ন দিয়া আরম্ভ হইয়াছে।[৫৭] সেখানে শেষ বাৎস্যায়নকে 'ভূমিসংস্থানের' কথা বলিতেছে,[৫৮] বাংলা পাণ্ডুলিপির স্বর্গখণ্ড—সূত কর্তৃক বিবৃত শেষ ও বাৎস্যায়নের কথোপকথন দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে,—তাহাতে বাৎস্যায়নের নিকট পার্থিব ভূগোল-সম্বন্ধীয়[৫৯] শেষের বিবৃতি।

৫৪ দ্রষ্টব্য—ভবিষ্যৎপুরাণ ১ ২ ২-৩ নারদীয় পুরাণ ১ ০০ সৌর পুরাণ ৯ ৮ এবং স্কন্দপুরাণ ৫ ৩ (রেবাখণ্ড) ১ ৩৪—৩৫ক—এর মতে ভবিষ্যৎপুরাণের চারিটি পর্ব।

৫৫ 'কদলীপুর মাহাত্ম্য' গ্রন্থের শেষাংশ দ্রষ্টব্য (১ম সর্গ—ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে পূর্বভাগে শ্রীরামমাহাত্ম্যসংবাদে কদলীপুর মাহাত্ম্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ—এ বি. কীথ, India Office Catalogue Vol. II নং ৬৬২০) এবং 'বেদসার-সহস্রনামস্তোত্র' দ্রষ্টব্য (—ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎ সাহস্রিকায়াং সংহিতায়ামুত্তরভাগে……হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—Descriptive Catalogue of the Sanskrit mss. in the Govt Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta Vol V, নং—৩৪৯১ ৯২ এবং ৩৪৯৫ পৃঃ ২১৯ ২২১)

৫৬ 'ভাগ সম্বন্ধে' বায়ুপুরাণ দ্রষ্টব্য, আর সি হাজরা—Our Heritage Vol I, Pt I, (১৯৫৩) পৃঃ ৫০

৫৭ দ্রষ্টব্য এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা) পাণ্ডুলিপি নং ৪৫১৭ পৃঃ ২২৮খ বাৎস্যায়ন উবাচ—
কিয়ৎ প্রমাণং ভূখণ্ডং স্বর্গশ্চ কতি ভূধর।
পাতালানি চ কানীহ কৃপয়া তৎ বদস্ব নঃ॥

৫৮ ঐ পৃষ্ঠা ২০৮ক দ্রষ্টব্য

৫৯ দ্রষ্টব্য—স্বর্গখণ্ড (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি নং ১৬২৫) প্রথম সর্গ শ্লোক নং ১—৩, সূত উবাচ—
শেষভাষিতমাকর্ণ্য তথা ভূগোলবর্ণনম্।
পিতা মে পুনরপৃচ্ছৎ প্রণতো বাদরায়ণম্॥
স নিশম্য তু ভূগোলং মুনির্বাৎস্যায়নঃ পুনঃ।
কিমপৃচ্ছচ্ছেষনাগং তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি॥
ব্যাস উবাচ—ভুবো মানং নিশম্যাথ কৃতাঞ্জলিপুটো মুনিঃ।
ভূধরং শেষমপৃচ্ছদ্ব্রহ্মা বাৎস্যায়নঃ পুনঃ॥

উল্লেখ আছে। বাংলা পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত সংস্করণে শেষ ও বাৎস্যায়নকেই প্রধান কথোপকথনকারী বলা হইয়াছে এবং কয়েকটি শ্লোকে[৬০] 'শেষ' কর্তৃক বাৎস্যায়নের নিকট বর্ণিত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সূত উল্লেখ করিয়াছেন:

পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ধ্বংস-প্রক্রিয়া, পার্থিব ভূগোল, স্বর্গীয় ভূগোল, জ্যোতিষ্কপদার্থের (গ্রহ-নক্ষত্র) সংবাদ, সৌরবংশীয় এবং অন্যান্য রাজাদের বিবরণী এবং রামের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

বর্তমান পদ্মপুরাণে ভূগোল-সম্বন্ধীয় সর্গ, কোন কোন ক্ষেত্রে কথোপকথনকারীরূপে শেষ ও বাৎস্যায়নের উল্লেখ, শেষ-বিবৃত ঘটনা সমূহের সুশৃঙ্খল বর্ণনা,—ভূমিখণ্ডের উক্তি এবং পদ্মপুরাণের বিভিন্ন পর্ব সম্বন্ধে সৃষ্টিখণ্ডের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করে। সৃষ্টিখণ্ডে শেষ বা বাৎস্যায়নের অনুল্লেখের কারণ সম্ভবতঃ পদ্মপুরাণের পূর্ব পর্বে কথোপকথনকারীরূপে তাহাদের উপস্থিতি অথবা বর্তমান গ্রন্থের অব্যবহিত পূর্ব গ্রন্থে তাহাদের পরিচিতি।

কখন কিভাবে পদ্মপুরাণ বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে তাহা যথার্থ জানা যায় না। সৃষ্টিখণ্ডের বাংলা পাণ্ডুলিপি ও আনন্দাশ্রম সংস্করণে খণ্ড-বিভাগের উল্লেখ নাই। কিন্তু পর্ব-বিভাগ-সম্বন্ধীয় শ্লোক আছে।[৬১] পদ্মপুরাণের বেঙ্কটেশ্বর ও বঙ্গবাসী সংস্করণে[৬২] পর্ববিভাগ-সম্বন্ধীয় এবং এবং পাঁচটি খণ্ডের নামযুক্ত নয়টি পঙ্‌ক্তি আনন্দাশ্রম সংস্করণে ও বাংলা পাণ্ডুলিপিতে নাই। সুতরাং পদ্মপুরাণের পর্ববিভাগ নিশ্চয়ই পরবর্তী যুগের ঘটনা। পাঁচটি খণ্ডে ৫৫০০০ শ্লোকের সমগ্র পদ্মপুরাণ শুধুমাত্র বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-বর্ণন (বিষ্ণুমাহাত্ম্যনির্মলম্) এবং ব্রহ্মার নিকট হরির এই পুরাণকথন 'দেবদেবো হরির্যদ্বৈ ব্রহ্মণে প্রোক্তবান্ পুরা'—বেঙ্কটেশ্বর ও বঙ্গবাসী সংস্করণে এই পঙ্‌ক্তিগুলির উল্লেখ স্পষ্টতই বিষ্ণুপূজকদের প্রতি ইঙ্গিত করে, তাঁহারাই পরিশোধন ও সংযোজন দ্বারা পদ্মপুরাণকে বিপুলকলেবর করিয়া পাঁচটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত করেন। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের পর্ববিভাগ ইহার দীর্ঘবিস্তৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে জৈন গ্রন্থকারগণ রামদাশরথিকে পদ্ম বা পউম বলেন এবং পুরাণ লেখেন, অনুরূপ রামের কাহিনীযুক্ত গ্রন্থকে 'পুরাণ' বলা হইয়াছে। হিন্দু পদ্মপুরাণ যে বিস্তৃত রাম-উপাখ্যানের সহিত সংযুক্ত তাহা বিমলসূরীর গ্রন্থের 'পউম-চরিঅ' শিরোনাম (বহু স্থলেই লেখক কর্তৃক 'পুরাণ' বলিয়া অভিহিত), রবিসেনের পদ্মপুরাণ এবং ঐ গ্রন্থগুলিতে রাম-উপাখ্যানের আলোচনা হইতে বোঝা যায়, বিমলসূরীর কালের পূর্বেও ইহা লোকপ্রিয় ছিল, জৈনগ্রন্থকারগণ স্বকীয় ধর্মমত প্রচারের জন্য এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করেন, আলোচ্য গ্রন্থটির যশের কারণই হইল এই। সুতরাং দেখা যাইতেছে খৃষ্টবর্ষের প্রারম্ভ হইতেই এই পদ্মপুরাণ বিষ্ণুপূজকদের হস্তে পতিত হইয়া সংশোধিত হইতে হইতে আকৃতি পরিবর্তন করিতে থাকে। বিষ্ণুপূজকদের হস্তে প্রাচীনকালে পদ্মপুরাণের এই পরিবর্তনের আভাস শুধু যে মৎস্য, স্কন্দ ও অন্যান্য পুরাণ (৫৫০০০ বিস্তৃতি যাহারা বলিয়াছে) হইতে জানা যায় তাহা নহে, খাঁটি বৈষ্ণবগ্রন্থ—'পদ্ম' যাহার 'উপভেদ' সেই নরসিংহ-পুরাণ হইতেও জানা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দীর্ঘ সংস্করণের মূলগ্রন্থ আমরা

৬০ পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড (আনন্দাশ্রম, বেঙ্কটেশ্বর এবং বঙ্গবাসী সংস্করণ) ১|৩ ৭ পাতালখণ্ডের বাংলা পাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোক আছে। দ্রষ্টব্য—এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা) পাণ্ডুলিপি নং জি. ১৩১৬ক, ২৯ সর্গ পৃষ্ঠা ৩২ক খ।

৬১ এই শ্লোকগুলি ৬০ নং পাদটীকায় দ্রষ্টব্য

৬২ দ্রষ্টব্য বেঙ্কটেশ্বর ও বঙ্গবাসী সংস্করণ ১.৫৪.৫৮ক

পাই নাই। বর্তমান পদ্মপুরাণের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারি যে এই সংস্করণও বিভিন্ন পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে এবং সৃষ্টিখণ্ডের প্রাকৃতান্ত্রিক ব্রহ্মাপূজাসম্বন্ধীয় সর্গগুলি অনেক পরবর্তীকালে ব্রহ্মাসম্প্রদায় কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবদের সহিত বর্তমান পদ্মপুরাণের সম্পর্ক এবং প্রাচীনকাল হইতেই ইহার বিপুল জনপ্রিয়তা আমরা আলোচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাঁহাদের ধর্মমত প্রচারের জন্য বহুযুগ হইতেই আলোচ্য গ্রন্থটির সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁহারা গ্রন্থটির পরিবর্তন ও নূতন সর্গ সংযোজন করিয়াছেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করিয়া পদ্মপুরাণের অংশরূপে প্রচার করিযাছেন। বৈষ্ণবগণ এইভাবে যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহাতে অবৈষ্ণবগণ যেমন শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক, ব্রহ্মা প্রভৃতি সম্প্রদায়ও এই গ্রন্থটি হইতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদের মতো তাহারাও বিভিন্ন দেশ ও কালানুযায়ী গ্রন্থটির পরিবর্তন করিয়াছে, এবং প্রমাণের জন্য বহু নূতন অংশের সংযোজনও করিয়াছে। এইরূপে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপুরাণ এত দীর্ঘ হয় যে ইহার শ্লোক-সংখ্যা ৫৫০০০ হইতেও অনেক বেশী হইয়া যায়।

বিভিন্ন দেশে ও কালে বিবিধ সম্প্রদায়ের,—বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের বারংবার হস্তক্ষেপের, ফলে ভারতের বিভিন্ন ভাগে মূল পদ্মপুরাণ গ্রন্থটির পরিবর্তন হইয়াছে এবং বাংলা ও দেবনাগরী এই দুইটি সংস্করণের উদ্ভব হইয়াছে। বাংলা পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত এখনও অমুদ্রিত গ্রন্থটি অবশ্য বাংলা অক্ষরে[৬৩] লিখিত এবং তাহাতে সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল এবং উত্তর এই পাঁচটি খণ্ড আছে। অন্যপক্ষে দেবনাগরী সংস্করণ আনন্দাশ্রম প্রেস (পুনা), বেঙ্কটেশ্বর প্রেস (বোম্বাই) বঙ্গবাসী প্রেস (কলিকাতা) এবং কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দুইটি সংস্করণে আদি ও ব্রহ্মা সহ ছয়টি খণ্ড আছে উহারা বাংলা সংস্করণের স্বর্গখণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, যদিও বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণে আদিখণ্ডের নামই স্বর্গখণ্ড। অপরপক্ষে শেষের দুইটি সংস্করণে পদ্মপুরাণ পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত এবং স্বর্গখণ্ড অন্য সংস্করণের আদি ও ব্রহ্ম-খণ্ডের অনুরূপ। বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ ও বঙ্গবাসী সংস্করণে উত্তরখণ্ডের পরে 'ক্রিয়াযোগসার' নামে একটি অধ্যায় আছে—উহা বাংলাদেশে লিখিত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়।

৬৩ যতদূর জানা যায় একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি বাংলায় লেখা—তাহাতে বাংলা সংস্করণের সৃষ্টিখণ্ড আছে।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

গভীর রাতে গান যে তারার বাজল কী ঝংকারে,
লাগল আমার কত কালের নীরব তারে তারে।
নয়ন মেলে দেখি চেয়ে, নীল অনন্ত গেছে ছেয়ে
অসংখ্য ওই প্রদীপমালার জ্যোতির ধারে ধারে।

একটি যে তার মৌন আজো তারি অপেক্ষায়
অযুত তারা আমন্ত্রণের মন্ত্র যেন ছায়।
পরশ করে আপন হাতে, সাধে আমায় কোন সে সাধে
জ্বালায় সুরে আজ নিশীথে জাগায় বারে বারে।

শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উপক্রমণিকা

'যেই খানে শ্রীপ্রভুর পড়ে পদধূলি।
সেই মহাপুণ্য ধাম মহাতীর্থ বলি॥'
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য সান্নিধ্যলাভে যেসকল স্থান পবিত্রতীর্থে পরিণত হয়েছে, উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর তাদের অন্যতম। পরমহংসদেব চিকিৎসার্থ কলকাতায় এসে এই পল্লীতে কয়েক মাস বাস করেছিলেন। তিনি ঐসময়ে যে বাড়িতে ছিলেন, ৫৫এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে সেই পুণ্যধাম আজও বিরাজিত। ঐ বাড়ির দেয়ালে একটি মর্মর ফলকে লেখা আছে: 'HERE LIVED FOR SOME TIME SREE SREE RAMKRISHNA PARAMHANGSA DEV' [এই বাড়িতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিছুকাল বাস করেছিলেন]। ঐ পথে যাতায়াত কালে নিত্যই অগণিত নরনারী ঐবাড়ির সম্মুখে এক পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করেন।

ঠাকুরের পুণ্য অবস্থান উপলক্ষে ঐ সময়ে এই বাড়িতে প্রায় প্রত্যহই রামকৃষ্ণ-ভক্তসংঘের মহামেলা বসেছে। অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তগণসহ ঠাকুরের দিব্যলীলার পুণ্যক্ষেত্রগুলির মধ্যে দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরের পরেই শ্যামপুকুরের স্থান।

শ্যামপুকুর পরমহংসদেবের কেবল প্রাগন্ত্য-লীলা-ক্ষেত্ররূপেই নয়, এই পল্লীতে তাঁর শুভাগমনের বহু অমিয় স্মৃতিও বিজড়িত রয়েছে। পূজনীয় কথামৃতকার 'শ্রীম', শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ (দানা কালী), বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (কাপ্তেন) প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (মোটা বামুন), ছোট নরেন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তগণের বাস এই পল্লীতেই ছিল। তাঁদের কল্যাণে শ্যামপুকুর কতবার যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যপদরেণুলাভে ধন্য হয়েছে, তার ইয়ত্তা করা যায় না। যাহোক, আমরা এখন শ্যামপুকুর পল্লীর সঙ্গে জড়িত ঠাকুরের দিব্যলীলার কয়েকটি মনোরম চিত্র অনুধ্যান ক'রব।

প্রাণকৃষ্ণের বাটীতে

'জনায়ের প্রাণকৃষ্ণ সহরেতে বাড়ী।
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তেঁহ পরম আচারী॥
ব্রাহ্মণের রীতিনীতি সব আছে তাঁয়।
দ্বিতীয় তাঁহার মত মেলা মহা দায়॥
সময়ে সময়ে প্রায় এখন তখন।
তাঁহার ভবনে শ্রীপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥' —পুঁথি

শ্যামপুকুরে ভক্তবর প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার শুভাগমন করেন। 'কথামৃত' ৫ম ভাগে একটি সুন্দর বিবরণী পাওয়া যায়। সেদিন ২রা এপ্রিল, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, ২১শে চৈত্র, ১২৮৮ সন, রবিবার। ঠাকুর ঐদিন সকালে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণের গৃহে এসেছেন। মধ্যাহ্নে ভক্তসঙ্গে তিনি এখানেই আহার ক'রে দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসে রয়েছেন। বেলা প্রায় একটা দুটা হবে। শ্রীযুক্ত রাখাল, বলরাম, রাম, মনোমোহন, মাষ্টার, সুরেন্দ্র, কেদার, গিরীন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এবং কয়েকজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকও সেখানে রয়েছেন। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পানের জন্য উৎসুক।

ঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বলছেন—এই জগৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তাঁর ঐশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে আছে। তাঁকে কেউ খোঁজে না। সকলেই ভোগ করতে চায়। কিন্তু দুঃখ অশান্তিতে যেন ঝল্‌সাপোড়া হ'য়ে যাচ্ছে।

'সংসারের দুঃখ অশান্তির জ্বালা থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি?'—জনৈক ভক্তের বিনীত জিজ্ঞাসার উত্তরে ঠাকুর বললেন, উপায় মধ্যে মধ্যে নির্জন বাস, সাধুসঙ্গ আর ভগবানের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা।

'সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?' এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: অবশ্য পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা সর্বদা করতে হয়। ভগবানের জন্য কাঁদলে মনের ময়লাগুলো ধুয়ে মুছে যায়। তখন তাঁর দর্শন হয়। তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস দরকার।

কাপ্তেন-ভবনে

প্রাণকৃষ্ণের বাড়ি হ'তে বিদায় নিয়ে ঠাকুর সেদিন (২রা এপ্রিল, ১৮৮২) ঐ পল্লীতে অবস্থিত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের ভবনে শুভাগমন করেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, মাষ্টারমশায় প্রভৃতি ভক্ত। ঠাকুর এখানে অল্পক্ষণ অবস্থান ক'রে ভক্তগণসহ শ্রীযুক্ত কেশব সেনের কমলকুটীরে গেলেন।

ভক্তবর বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কলকাতায় নেপালের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে 'কাপ্তেন' বলতেন ও খুবই ভালবাসতেন। ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঠাকুরের পুণ্য সান্নিধ্যে প্রথম আসেন, তিনি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ও সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

'অবসর পাইলেই আসে দরশনে।
কখন লইয়া যায় আপন ভবনে॥
ভক্তিভরে প্রভুবরে করায় ভোজন।
গৃহিণী আপুনি করে স্বহস্তে রন্ধন॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণকে কাপ্তেন প্রায়ই শ্যামপুকুরস্থিত নিজ ভবনে সাদরে আনয়ন ক'রে পরম ভক্তিভরে তাঁর সেবাবন্দনাদি করতেন। পরমহংসদেবও কলকাতায় এলে মধ্যে মধ্যে ভক্তগণসহ কাপ্তেন ভবনে উপস্থিত হতেন। এইরূপে তিনি বহুবার উপাধ্যায়ের গৃহে শুভাগমন করেন।

কাপ্তেনের সেবা ও প্রীতি সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজমুখের উক্তি: খুব ভক্তি! আমি বরাহ-নগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে! ও বাড়িতে ল'য়ে গিয়ে কত যত্ন!—বাতাস করে—পা টিপে দেয়—আর স্ত্রী নানা তরকারী ক'রে খাওয়ায়।

পুঁথিকার এ প্রসঙ্গে গেয়েছেন:

'মনে নাই কোন ঘৃণা আচারী ব্রাহ্মণ।
অপরূপ প্রভুপদে ভক্তি আচরণ॥
মানামান নাই গ্রাহ্য প্রভুর সেবায়।
শ্রীপদে এতেক মত্ত ভক্ত উপাধ্যায়॥'—পুঁথি

ছোট নরেন্দ্রের সন্ধানে

'জুটিয়া নরেন্দ্র ছোট এবে দিল দেখা।
কায়স্থ-কুমার অঙ্গে সরলতা মাখা॥
গড়নে সরল যেন অন্তরে সরল।
ভিতরের ভাব বাহে ব্যক্ত সমুজ্জ্বল॥
স্বতই প্রভুর প্রতি ভক্তি হৃদে ভরা।
প্রভুর সকাশে হয় বড়ই পিয়ারা॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কলকাতায় এলে প্রিয় ভক্ত ছোট নরেন্দ্রের খোঁজে প্রায়ই শ্যামপুকুরে তাঁদের রামধন মিত্র লেনের বাড়িতে শুভাগমন করতেন। তিনি একদা কাপ্তেন-ভবনে উপস্থিত হন এবং ছোট নরেন্দ্রের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন। তিনি তখন তাঁকে ডেকে পাঠান। ঠাকুরের আহ্বানে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হন।

পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে (১৩ই জুন, ১৮৮৫খৃঃ) প্রসঙ্গতঃ ভক্তগণকে ঐ বিষয়ে বলেন—'কাপ্তেনের বাড়িতে ছোট নরেনকে ডাকলুম। বললাম, তোর বাড়িটা কোথায়? চল যাই।—সে বললে, আসুন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চলতে লাগল সঙ্গে,—পাছে বাপ জানতে পাবে।'　—কথামৃত

বিদ্যাসাগরের স্কুলে

১৫ই নভেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, ৩০শে কার্তিক, ১২৮৯ সন, বুধবার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঘোড়াগাড়ি ক'রে শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগরের স্কুলের (মেট্রো-পলিটন শাখা) দ্বারদেশে এসে উপস্থিত। সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখাল এবং আরো দু'একজন ভক্ত। তখন বেলা প্রায় ৩টা হবে।

ঠাকুর আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখতে যাচ্ছেন। তিনি ঐ স্কুল থেকে মাষ্টার মশায়কে (কথামৃতকার) তাঁর গাড়িতে তুলে নিলেন। গাড়ি ক্রমে চিৎপুর রাস্তা দিয়ে গড়ের মাঠে গেল।

'শ্রীম'-আলয়ে

'নেহারিয়া ভক্তবরে প্রভুর আমার।
অন্তরে বহিল জোরে সুখের জোয়ার॥
লীলা-কাজে সাজা সাজ বাহ্যিক লক্ষণে।
লুকায়ে রেখেছে তাঁর সাধ্য কার চিনে॥'
—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তপ্রবর মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্যামপুকুরস্থিত তেলিপাড়ার বাড়িতে কয়েকবার শুভাগমন করেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রই ভক্তসমাজে কথামৃতকার 'শ্রীম' বা মাষ্টারমশায়-রূপে সুপরিচিত।

পরমহংসদেব ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর মাষ্টার মশায়ের শ্যামপুকুর তেলিপাড়ার বাড়িতে শুভাগমন করেন। ঐ দিন তাঁর সাত আট বছরের দুটি কন্যা ঠাকুরকে কয়েকটি ভক্তিমূলক গান গেয়ে শোনায়। তাদের সুমধুর কণ্ঠের ভজন শুনে তিনি পরম আহ্লাদিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন সেবকসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে রাত্রে শ্যামপুকুর 'শ্রীম'-আলয়ে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, তাই তাঁকে দেখবার জন্য তিনি দক্ষিণেশ্বর হ'তে রাত্রে ছুটে এসেছেন।

ঠাকুরের আজ্ঞায় মাষ্টার মশায় কিশোর ভক্ত (ঈশ্বরকোটি) পূর্ণকে তাঁর বাড়ি গিয়ে ডেকে আনেন। ঠাকুর তাঁর পরম প্রিয় ভক্তকে দেখে মহা আনন্দিত হলেন। তাঁর প্রাণ শীতল হ'ল। ঈশ্বরকে কিভাবে ডাকতে হয়, এই বিষয়ে ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিলেন। সেই রাত্রেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন।

'দানাকালী'র গৃহে

'ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার তরে।
কালীকে কহেন তিনি, 'লয়ে চল ঘরে'॥
ভাগ্যবান প্রভুভক্ত মহানন্দ মনে।
গাড়ীতে তুলিয়া ল'য়ে বিভু ভগবানে॥
ত্বরিতে চলিলা তাঁর আবাস যেথায়।
বাসনা করিতে পূর্ণ ভিক্ষা দিয়া তাঁয়॥'
—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্যামপুকুরে শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের গৃহে কয়েকবার শুভাগমন করেন। কালীপদ ঘোষ ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে 'ম্যানেজার' আখ্যা দিয়েছিলেন, স্বামীজী তাঁকে বলতেন 'দানা কালী'। ভক্ত-গণের নিকট তিনি শেষোক্ত নামেই সমধিক পরিচিত।

ভক্ত কালীপদ ঘোষের গৃহে ঠাকুর প্রথম শুভ পদার্পণ করেন ১৮৮৪ খৃঃ নভেম্বর মাসে। ২০নং শ্যামপুকুর লেনে সেই পবিত্র বাটী ও পুণ্য অঙ্গন এখনও বিদ্যমান। ঐ বাটীর দ্বিতলের একটি

কক্ষে ভক্তগণসহ ঠাকুরকে বসানো হয়। সেই ঘরের দেয়ালে বিভিন্ন দেবদেবীর কয়েকখানি বৃহৎ তৈলচিত্র টাঙানো ছিল। ঐ ছবিগুলি দর্শন ক'রে তিনি দিব্যভাবে গদগদ হ'য়ে করযোড়ে ঐ সমস্ত চিত্রস্থ দেবদেবীর সুমধুর স্তবস্তুতি আরম্ভ করেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ঐ সময়ে লক্ষ্য করেন যে, ছবিগুলি দেখতে দেখতে যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠল।

সুখের বিষয়, এখনো ঐ বাড়িতে সেই তৈল-চিত্রগুলি রয়েছে। তাদের অন্যতম 'মহিষ-মর্দিনী' দুর্গার প্রতিকৃতিটি উদ্বোধনে (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৪ সন) প্রকাশিত হয়েছে।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটে

শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের ভগিনী শ্রীমতী মহামায়া দেবী একদা একান্ত অভাবনীয় উপায়ে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনলাভে কৃতার্থ হন। এই ঘটনাটি একদিকে যেরূপ বিস্ময়কর অন্যদিকে সেইরূপ নিতান্তই অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক রহস্যে পরিপূর্ণ। কালীপদ ঘোষের গৃহে ঠাকুরের প্রথম পদার্পণের কয়েক মাস পূর্বে মহামায়া দেবী একদিন ৫১নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থিত বাড়ির দ্বিতল হ'তে ঐ রাস্তার ধারের জানালা দিয়ে দেখেন যে ঐ পথ ধরে সন্ধ্যার সময় একটি ঘোড়াগাড়ি যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে এক অতীব সৌম্যদর্শন মহাপুরুষ। গাড়ি হ'তে মুখ বের ক'রে তিনি চালককে বলছেন—'থামাও, থামাও। এখানে একটু থামাও দেখিনি। এইখানেই মনে হচ্ছে'।

মহামায়া দেবী দেখলেন, সেই সৌম্যের মুখশ্রী অতি মনোহর এবং দিব্য আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। মানবের ঐরূপ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল দর্শন ক'রে তিনি অতিশয় চমৎকৃত হলেন। তিনি তখন মহা আনন্দ-বিস্ময়ে বাড়ির সকলকে ডাকতে থাকেন, ঐ দিব্য অলৌকিক দৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইত্যবসরে সেই সৌম্য তাঁর শ্রীমুখ গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেন এবং গাড়িটিও ক্রমশঃ অগ্রসর হ'য়ে রামধন মিত্র লেনে প্রবেশ করে। ফলে, ঐ স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনের সৌভাগ্য আর কারুরই হ'ল না।

এই ঘটনাটি মহামায়ার ভক্তিস্নাত কোমল হৃদয়ে গভীর আধ্যাত্মিক আলোক সম্পাত করে এবং চির অঙ্কিত হ'য়ে থাকে। কিছুদিন পরে ঘটনাক্রমে, তাঁদের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন হ'ল। তখন তাঁকে দর্শনমাত্রই মহামায়ার স্মৃতিপটে ঐ দিনের আলৌকিক দর্শনের চিত্র সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। ফলে তিনি সহজেই চিনতে পারলেন, ইনিই তিনি—সেই সৌম্য, আদিত্যবর্ণ মহান্ত পুরুষ। ইনিই সেদিন অপার করুণাবশতঃ একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে পুণ্য দর্শনদানে ধন্য করেছেন।

উপমায় শ্যামপুকুর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে দেখা যায়, পরমহংসদেব দুরূহ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-প্রসঙ্গে শ্যামপুকুর ও তেলিপাড়ার বড়ই চমৎকার উপমা দিয়েছেন। ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সিঁথিতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্ম-সমাজের অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করছেন। ঈশ্বর 'সাকার' না 'নিরাকার'—এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, 'তাঁর চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছলে তেলিপাড়াও জানতে পারবে। জানতে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।'

'শ্যামপুকুর বাটী'তে ঠাকুরের অবস্থানকালের পুণ্য কথা পরে আলোচিত হবে।

'গীতা জ্ঞানেশ্বরী'

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ষোলকলায় পূর্ণ চন্দ্রমার কোনও অঙ্গে যেমন ন্যূনতা দেখা যায় না, তেমনি তাঁহার মনে কোনও বাসনা উৎপন্ন হয় না। এই বর্ণনার আর কত বিস্তার করা যায়? ইহা বলিয়া বুঝানো যায় না। যাঁহারা জ্ঞানের অগ্নিতে আপনার সমস্ত কলুষ দহন করিয়া নির্মল হইয়া যান তাঁহারা পূর্ণস্বরূপে মিশিয়া যান, যেমন খাঁটি সোনা সোনাতে মিশিয়া যায়। যদি প্রশ্ন কর সে কোন্ ঠাঁই? তাহার উত্তর—এই সেই 'অব্যয়পদ' যাহার কোনও নাশ নাই, যাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না বা জ্ঞানের গোচর হয় না, যাহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে ইহা 'অমুক' বস্তু।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬

পরন্তু দীপের শিখায় যাহা কিছু দেখা যায়, চন্দ্রমা যাহা কিছু প্রকাশিত করে অথবা, কি আর বলিব—অংশুমালী সূর্য যে জগৎ প্রকাশিত করে—যাঁহার দেখা পাওয়া যায় না বলিয়াই এ সমস্ত বস্তু দৃশ্যমান হয়, যাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান লোপ হইলে এই বিশ্ব ভাসমান হয়, শুক্তির ভাস যেমন যেমন মন্দীভূত হয় তেমন তেমন উহাতে রৌপ্যের ভাস প্রকাশিত হয়, অথবা যেমন যেমন রজ্জুর জ্ঞান লোপ পায় তেমনই উহার সম্বন্ধে সর্পভ্রম দৃঢ় হয়। (৩১০)

ঠিক ঐ প্রকার যে বস্তু হইতে চন্দ্রসূর্যাদির প্রখর তেজ উদ্ভূত এবং যে স্বরূপের অন্ধকার লোপ পাইলে তাহা প্রকাশিত হয় সেই যে বস্তু তাহা কেবল তেজোরাশি, যাহা সর্বভূতে সমানভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এবং যাহা চন্দ্রসূর্যে প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ যাহার প্রভাবে চন্দ্র সূর্য আলো বিকীরণ করে), চন্দ্র ও সূর্য এই ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশেরই প্রতিফলিত আংশিক প্রকাশ মাত্র, এইজন্য, সমস্ত তেজোময় পিণ্ডের যে তেজ তাহা এই ব্রহ্মবস্তুরই একটি অংশ, সূর্যোদয় হইলে যেমন চন্দ্রমাসহ সব নক্ষত্র লুপ্ত হয় তেমনি ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ হইলে সূর্য-চন্দ্রসহ সমস্ত জগতের লোপ হয়, অথবা জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের ধূমধাম তিরোহিত হয় বা সন্ধ্যাকালে যেমন মৃগজল অন্তর্হিত হয় তেমনি সেই বস্তুর প্রকাশ হইলে আর কোনও বস্তুর আভাস থাকিতে পারে না, সেই আমার মুখ্য স্থান, যাঁহারা ঐস্থানে পৌছিয়া যান তাঁহারা সাগরে লীন জলপ্রবাহের ন্যায় আর কখনও ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া আসেন না, অথবা লবণে প্রস্তুত হস্তিনী যেমন লবণসাগরে পড়িয়া আর উঠিয়া আসে না অথবা যেমন অগ্নির শিখা আকাশে উঠিয়া গেলে আর নামিয়া আসে না—কিংবা যেমন উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের উপর জল নিক্ষেপ করিলে ঐ জল আর ফিরিয়া আসিতে পারে না তেমনি শুদ্ধজ্ঞান হইলে যে ব্যক্তি আমার সহিত একরূপ হইয়া যান, তাঁহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হয়। (৩২০)

তখন প্রজ্ঞারূপ পৃথিবীর রাজা পার্থ বলিলেন, 'হে দেব, আপনি আমাকে অত্যন্ত কৃপা করিয়াছেন, পরন্তু আমার আর একটি প্রার্থনা আছে, আপনি শ্রবণ করুন: যাঁহারা আপনার সহিত মিলিত হইয়া একরূপ হইয়া যান এবং পুনরায় ফিরিয়া আসেন না, তাঁহারা কি আপনার

স্বরূপ হইতে ভিন্ন—না আপনার সহিত অভিন্ন হইয়া যান ? যদি তাঁহারা অনাদিসিদ্ধ ভিন্নই, তবে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন না—একথা বলা যায়না, ভ্রমর ফুলে বসিলেই কি ফুল হইয়া যায় ? যে বাণ লক্ষ্য হইতে ভিন্ন, সেই বাণ লক্ষ্য স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসে, তেমনি জীব যদি আপনা হইতে ভিন্ন হয়, তবে আপনাকে স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিবে, নতুবা যদি আপনি এবং জীব স্বভাবতঃ একই, তবে কে কাহার সহিত মিলিবে ? অস্ত্র আপনা হইতে কি করিয়া আপনাকে বিদ্ধ করিবে ? সুতরাং যে জীব আপনা হইতে অভিন্ন তাহার সম্বন্ধে আপনার সহিত সংযোগ বা বিয়োগের কথা উঠিতে পারে না—যেমন অবয়বগুলি শরীর হইতে ভিন্ন, একথা বলা যায় না ; আর যদি জীব আপনা হইতে সর্বদা ভিন্নই, তবে কখনই আপনার সহিত মিলিয়া একরূপ হইতে পারে না, তাহারা (আপনাকে লাভ করিয়া) ফিরিয়া আসে বা আসে না, এ কথার বিচার সম্পূর্ণ ব্যর্থ, এখন হে বিশ্বতোমুখ দেব, আপনি আমাকে বুঝাইয়া বলুন যাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আর ফিরিয়া আসে না তাহাদের স্বরূপ কি ?

অর্জুন এই আক্ষেপ প্রকাশ করিলে শিষ্যের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া সর্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সন্তোষ হইল এবং তিনি বলিলেন, 'হে মহামতে, যাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া আর ফিরিয়া আসেন না, তাঁহারা আমা হইতে ভিন্ন এবং অভিন্নও—দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই দুই কথাই বলা যায়। (৩৩০)

গভীরভাবে বিচার করিলে স্বভাবতঃ তাঁহারা ও আমি সম্পূর্ণভাবে একই, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহারা আমা হইতে ভিন্ন—এইরূপ দেখা যায়, যেমন জলের উপর তরঙ্গ উঠিলে তাহাদের জল হইতে ভিন্নই দেখায়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে জল ও তরঙ্গ অভিন্নই, অলঙ্কার স্বর্ণ হইতে ভিন্নই দেখায়, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে অলঙ্কার সোনা ভিন্ন কিছুই নহে, তেমনি হে কিরীটী, যদি জ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করা যায় তবে তাঁহারা আমা হইতে অভিন্নই, ভিন্নতা যাহা দেখা যায়—অজ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ, ব্রহ্মবস্তুকে যদি সঠিক বিচার করা যায় তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আমা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ কি থাকিতে পারে—যাহাকে ভিন্ন ভিন্ন বিচারে আমা হইতে পৃথক করা যায় ? যদি সূর্যের বিম্ব সারা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া নিজের উদরের মধ্যে ভরিয়া নেয় তবে উহার প্রতিবিম্ব কোথায় পড়িবে ? উহার কিরণজালই বা কিসের উপর পড়িবে ? হে ধনঞ্জয়, প্রলয়কালের জলে কি জোয়ার ভাঁটা হয় ? তেমনি বিকাররহিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' যে আমি—তাহার কি কোন অংশ হইতে পারে ? পরন্তু, প্রবহমাণ জলের বহু ধারা একত্র হইলে ঋজু প্রবাহও বাঁকিয়া যাইবে, অথবা জলের উপাধির জন্য সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া দুইটি সূর্যের মত দেখাইবে (দ্বৈতভাব হইবে)। আকাশ চতুষ্কোণ না গোলাকার, কি করিয়া বলা যায় ? পরন্তু ঘট ও মঠের উপাধির জন্য তাহাকে তেমনি দেখায়, আরও দেখ, যখন কোন মনুষ্য স্বপ্নে রাজা হইয়া যায় তখন কি নিদ্রার বশে সে একলাই সমস্ত জগৎ ভরিয়া দেয় না ?—(জগতে ব্যাপ্ত হয় না ?) (৩৪০)

যদি মিশ্রিত হইলে খাঁটি সোনার কস (ষোল আনা হইতে) নামিয়া যায়, তেমনি শুদ্ধস্বরূপ আমি, মায়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মায়ার উপাধি দ্বারা যেন বিকারপ্রাপ্ত হই, তখন এক অজ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং এই অজ্ঞান হইতেই মনে 'কোঽহং' (আমি কে ?)-রূপ বিকল্প (সংশয়) উৎপন্ন হয়, আর তখন জীব এই কথা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করে যে এই দেহই আমি।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭

এইভাবে আত্মা শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে সেই সীমাবদ্ধ স্বল্প পরিমাণ জ্ঞানই আমার অংশরূপে ভাসমান হয়, বায়ুপ্রবাহের জন্য সমুদ্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহারা যেমন সমুদ্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া দেখায়, সেইরূপ হে পাণ্ডুসুত, আমিই জড়পদার্থে চৈতন্য প্রদান করি এবং দেহাভিমান উৎপন্ন করি বলিয়া জীবলোকে আমিই (জীবাত্মা) জীবরূপে ভাসমান হই; এই জীবের দৃষ্টিতে চতুর্দিকে যে অখণ্ড ব্যাপার ঘটিতেছে দেখা যায়, তাহার জন্যই 'জীবলোক' (অর্থাৎ সৃষ্টি)—এই কথায় ব্যবহার হয়, জন্ম আর মৃত্যুর ব্যাপারকে বাস্তব ও সত্য বলিয়া মানিযা লওয়াকেই আমি 'জীবলোক' বা 'সংসার' বলিতেছি, এবংবিধ জীবলোকে তুমি আমাকে তেমনিভাবে দেখিবে—যেমন জল হইতে পৃথক্ হইয়াও চন্দ্রমা জলে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। হে পাণ্ডব, স্ফটিকমণিকে কুমকুমের উপর রাখিলে সাধারণ লোকে তাহাকে লাল রংএর দেখে, যদিও উহা লাল রংএর নহে, তেমনি যদিও আমার অনাদিত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব (ক্রিয়াহীনত্ব) অবিকৃত থাকে, তথাপি আমাকে যে কর্তা ও ভোক্তারূপে দেখা যায় তাহা শুধু ভ্রান্তি মাত্র। (৩৫০)

কিং বহুনা, (ইহার তাৎপর্যই এই যে) শুদ্ধ এই আত্মা প্রকৃতির সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া স্বয়ং এই প্রকৃতি-ধর্মের অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, তখন এই আত্মা—মন ও শ্রোত্রাদি ছয় ইন্দ্রিয় যেন তাহারই—ইহা মনে করিয়া সাংসারিক ব্যাপারাদি আরম্ভ করে, যেমন কোন পরিব্রাজক স্বপ্নে আপনি আপনার কুটুম্বপরিবার হইয়া তাহাদের মোহে যেখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে, তেমনি আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি হইলে জীবাত্মাও আপনাকে প্রকৃতি বা মায়ার সমান জ্ঞান করিয়া তাহাকে অনুসরণ করে; তখন মনের রথে আরোহণ করিয়া সে শ্রবণের রন্ধ্রপথে বাহির হইয়া শব্দরূপী বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, প্রকৃতির লাগাম ধরিয়া ত্বকের দ্বার দিয়া স্পর্শের ঘোর বনে প্রবেশ করে, কখনও কখনও নেত্রের দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া রূপ-বিষয়ের পর্বতে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, অথবা হে অর্জুন, জিহ্বার পথে বাহির হইয়া রসবিষয়ের গুহায় প্রবেশ করে, অথবা মদংশরূপী জীবাত্মা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সুগন্ধের দারুণ অরণ্যে প্রবেশ করে, এইভাবে দেহেন্দ্রিয়ের নায়ক জীবাত্মা মনকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করিয়া শব্দাদি বিষয়সমুদয় উপভোগ করে। (৩৬০)

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮

পরন্তু জীবাত্মা যখন এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে, তখনই তাহার কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব দৃষ্টি-গোচর হয়, হে ধনঞ্জয়, রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিলে যেমন একটি সম্পন্ন ও বিলাসী পুরুষের ঐশ্বর্য দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি জীবাত্মা যখন দেহধারণ করে তখনই তাহার 'আমিই কর্তা' এই অহংকারের বৃদ্ধি ও বিষয়েন্দ্রিয়ের ধুমধাম নিঃসন্দেহে জানিতে পারা যায়, অথবা জীব যখন দেহত্যাগ করে তখন (মন ও) ইন্দ্রিয়াদি সামগ্রী আপনার সম্পত্তির মত নিজের সঙ্গে লইয়া যায়, অতিথিকে অপমান করিলে সে যেমন গৃহস্থের পুণ্যসম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়া যায়, অথবা কাষ্ঠপুত্তলীর গতি (চলনশক্তি বা ক্রিয়াবলী) যেমন তাহার সূত্রতন্তুর উপর নির্ভর করে, অথবা অস্তগামী সূর্য যেমন দৃশ্যমান বস্তুর 'দর্শন' আপনার সঙ্গে লইয়া

যায়, অথবা বায়ু যেমন সুবাস হরণ করিয়া লয়, তেমনি হে ধনঞ্জয়, দেহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দেহের স্বামী জীবাত্মাও মন ও শ্রোত্রাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়কে আপনার সঙ্গে লইয়া যায়। (৩৬৭)

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

তাহার পর এখানে বা স্বর্গলোকে যেখানে যেখানে জীব যে দেহধারণ করে সেখানেও সেই শরীরে মনাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিস্তার করে, হে পাণ্ডব, দীপশিখা নির্বাপিত হইলে যেমন তাহার প্রভাও তাহার সহিত চলিয়া যায়, পরন্তু পুনরায় জ্বালাইলে ঐস্থানে প্রভাসহ তেমনিভাবে প্রকটিত হয়, হে কিরীটী, অবিবেকের দৃষ্টিতে এমনি ভাবে সর্বকার্যে জীবেরই কর্তৃত্ব দেখা যায়। (৩৭০)

লোকে মনে করে আত্মা সত্যসত্যই দেহে প্রবেশ করে, সত্যসত্যই বিষয় ভোগ করে এবং সত্যই এই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, নতুবা (যদি বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা যায়) এই আসা যাওয়া ক্রিয়া ও ভোগ—এ সমস্তই প্রকৃতির ধর্ম।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি
ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢা নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো
নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

লোকে যখন দেখে সম্মুখে দেহের বোঝাটি খাড়া হইয়া আছে, তাহাতে চেতনাসঞ্চার হইয়াছে এবং চেতনাশক্তির প্রভাবে দেহ নড়িতেছে, তখনই তাহারা বলে ইহা আসিয়াছে, তেমনি হে সুভদ্রাপতি, তাহার সংযোগে যখন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় আপন আপন কর্মে লিপ্ত হয় তখনই বলে জীব ভোগ করিতেছে, পরে যখন ভোগ ক্ষীণ হইয়া দেহ আপনা হইতেই চলিয়া যায়, তাহা না বুঝিয়া তাহারা চিৎকার করিয়া বিলাপ করে, 'জীব চলিয়া গেল,' 'জীব চলিয়া গেল', হে পাণ্ডব, বৃক্ষ দুলিতেছে দেখিয়া কি বলিবে বায়ু বহিতেছে, আর বৃক্ষের কম্পন না থাকিলে কি বায়ু বহে না? দর্পণ সামনে রাখিয়া নিজের রূপ দেখিলেই কি তখন রূপের সৃষ্টি হয়? দর্পণে মুখ দেখিবার পূর্বে কি রূপ থাকে না? আর দর্পণ দূরে সরাইয়া লইলে যখন প্রতিবিম্বের আভাস নষ্ট হইয়া যায় তখন কি বুঝিতে হইবে যে নিজের অস্তিত্বই লোপ হইল? শব্দ আকাশেরই গুণ কিন্তু, যখন মেঘ গর্জন করে তখন ঐ শব্দ মেঘেই আরোপ করা হয়, তেমনি মেঘের বেগ চন্দ্রে আরোপ করা হয়, তেমনি লোকে মোহবশতঃ দেহে যে জন্মমৃত্যু হয় তাহা নিশ্চিতভাবে ঐ বিকাররহিত আত্মসত্তার উপর আরোপ করে,—তাহারা অন্ধ। (৩৮০)

এই শরীরে আত্মা, নিজস্থানে থাকিয়া (শুধু সাক্ষীভূত হইয়া) দেহের ধর্ম যাহা দেহে অনুষ্ঠিত হয় তাহা দেখে, এই দৃষ্টিতে যাহারা সঠিকভাবে দেখিতে পায় তাহারা (পূর্বে কথিত অজ্ঞান ব্যক্তিগণ হইতে) স্বতন্ত্র, জ্ঞানের প্রভাবে যাঁহাদের দৃষ্টি শুধু দেহরূপ থলিতেই আবদ্ধ নয়, গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যকিরণের ন্যায় বিবেকের বিস্তৃত প্রকাশে যাঁহাদের অন্তরে স্বরূপের স্ফুরণ হইয়াছে, সেই সব জ্ঞানী পুরুষই ঐ শুদ্ধ আত্মাকে দেখিতে পান, নক্ষত্রে ভরা আকাশের প্রতিবিম্ব যখন সমুদ্রে পড়ে, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে আকাশ আসিয়া সমুদ্রে পড়ে নাই (পরন্তু উহা আকাশের প্রতিবিম্ব মাত্র), আকাশ যেখানকার সেখানেই থাকে, সমুদ্রে তাহার প্রতিবিম্ব—উহার মিথ্যা আভাস মাত্র, ঠিক তেমনি—শরীরের সহিত যদিও আত্মার সম্বন্ধ দেখা যায়, উহা কেবল আভাস মাত্র, অগভীর

জলের বিক্ষুব্ধতা (যাহাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব টুকরা টুকরা দেখায়) জলে মিলাইয়া গেলে দেখা যায় চন্দ্রমা স্বস্থানে স্থির হইয়া আছে, অথবা জলের গর্ত কখনও ভরিয়া থাকে, কখনও শুকাইয়া যায় (যখন জল থাকে তখন সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, যখন জল শুকাইয়া যায় তখন প্রতিবিম্বও দেখা যায় না), পরন্তু সূর্য যথাস্থানে ঠিক একভাবেই থাকে, তেমনি জ্ঞানী পুরুষ বুঝিতে পারেন যে দেহে জন্মমৃত্যু থাকিলেও আমি সর্বদা যথাস্থানে অধিষ্ঠিত থাকি, ঘট ও মঠ তৈয়ারী করা যায়, পরে ভাঙিয়াও ফেলা যায়—কিন্তু আকাশ যেমন ছিল তেমনিই থাকে, ঠিক ঐ প্রকার আত্মসত্তা অখণ্ড ও অব্যয়, আর অজ্ঞান দৃষ্টিতে কল্পিত দেহেরই জন্মমৃত্যু হয় জ্ঞানিগণ এবিষয় সম্যক্ অবহিত, নির্মল আত্মজ্ঞানের প্রভাবে তাঁহারা জানিতে পারেন যে চৈতন্যের ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উহা কর্ম করায়ও না, করেও না। (৩৯০)

মনুষ্য যতই জ্ঞানলাভ করুক না কেন, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হউক না কেন, বুদ্ধির প্রভাবে অণু-পরমাণুও বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হউক না কেন, যতক্ষণ না তাহার মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় ততক্ষণ আমার সর্বাত্মক স্বরূপের দর্শন লাভ করিতে পারে না।

হে ধনুর্ধর, মনুষ্য মুখে বিবেকের বাক্য বলিতে পারে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে যদি বিষয়-ভাবনার লেশমাত্র থাকে, তবে ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আমার স্বরূপ কখনও প্রাপ্ত হইবে না, স্বপ্নে প্রাপ্ত গ্রন্থ দ্বারা কি সংসারে সমস্যাগুলির মীমাংসা হয়? বংশোপার্জিত পুস্তক গৃহে রক্ষা করিলেই কি উহা পড়িবার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া শুধু নাকের সহিত লাগাইলেই কি মুক্তার মান ও মূল্য বলা যায়? ঠিক তেমনি যদি চিত্তে অহংকার ভরা থাকে, আর মুখে সর্বপ্রকার শাস্ত্রচর্চা করিতে থাকে, তাহা হইলে কোটি জন্ম গেলেও আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, একমাত্র আমিই কি করিয়া সর্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া আছি এখন তাহাই তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শুন:

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসযতেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ
তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

সূর্যসমেত এই সারা বিশ্বরচনা যাহা—প্রকটিত হয় তাহা—আদ্যন্ত আমারই তেজ বলিয়া জানিবে, হে পাণ্ডুসুত, জল শোষণ করিয়া সবিতা যখন অস্ত যায়, চন্দ্রমা তাহাতে পুনরায় আর্দ্রতা আনয়ন করে, এই চন্দ্রের কিরণ আমারই তেজ, অগ্নির যে তেজোবৃদ্ধি (প্রচণ্ড তেজ) নিরবধি দহন ও পাচন কর্ম করে তাহাও আমারই। (৪০০)

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃসর্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥১

আমিই ভূতলে প্রবেশ করিয়া পৃথ্বীকে ধারণ করিয়া আছি, সেইজন্যই ইহা মাটির ঢেলা হইয়াও মহাসাগরের জলে গলিয়া যায় না, আর পৃথ্বী যে অসংখ্য চরাচর ভূতগ্রামের ভার বহন করিতেছে আমিই তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধরিয়া আছি, হে পাণ্ডুসুত, আকাশে চন্দ্রমার রূপে আমিই একটি চলন্ত অমৃতের সরোবর, সেখান হইতে চন্দ্রের যে কিরণজাল নিক্ষিপ্ত হয় তাহাতে অমৃত ভরিয়া আমিই সমস্ত বনস্পতিকে পোষণ করি, এই ভাবে ধান্যাদি সকল শস্য প্রচুরভাবে উৎপন্ন করিয়া অন্নদ্বারা প্রাণিমাত্রকেই জীবন দান করি, অন্নের প্রাচুর্য হইলে যে জঠরাগ্নি সেই অন্ন পাক করিয়া জীবের পুষ্টিসাধন করে, অগ্নির সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল?

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥১৪

হে কিরীটী, প্রাণিমাত্রেরই শরীরে নাভিদেশে অগ্নি জ্বালাইয়া আমিই তাহাদের জঠরের মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া থাকি, আর দিনরাত প্রাণ ও অপান বায়ুর যুক্ত হাপর চালাইয়া প্রাণিগণের পাকস্থলীতে যে কত খাদ্যদ্রব্য পাক করিয়া থাকি তাহার ইয়ত্তা নাই, শুষ্ক স্নিগ্ধ, সুপক্ব ও অর্ধ সিদ্ধ [চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়] এই চারি প্রকার অন্ন আমি পাক করি, এইভাবে জগতের যত জীব আছে সে-সব আমিই, তাহাদের ধান্যরূপে জীবনও আমি, আর এই জীবনধারণের মুখ্য সাধন যে জঠরাগ্নি তাহাও আমিই। (৪১০),

আমার বিচিত্র ব্যাপকতা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কি বলিব ? এই বিশ্বে আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, আমিই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে প্রাণিগণের মধ্যে একজন সদা সুখ ভোগ করে, অন্য একজন বহু দুঃখে ডুবিয়া থাকে—এমন কেন হয় ? সারা নগরে যদি একটি দীপের দ্বারা অন্য দীপগুলি জ্বালানো হয় তবে তাহার মধ্যে একটির প্রকাশ নাই এইরূপ হয় কেন ?—তোমার মনে যদি এরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, তবে তোমার শঙ্কা ভালভাবে দূর করিতেছি, শুন : বাস্তবিক পক্ষে সর্বত্র আমি ব্যাপ্ত হইয়া আছি এবং আমা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, পরন্তু প্রাণিগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে আমাকে কল্পনা করে, যেমন আকাশ-সঞ্জাত ধ্বনি একই, অথচ বাদ্য যন্ত্রের ভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নাদ উৎপন্ন করে, অথবা একই সূর্য উদয় হইলে লোকের ব্যবহারে উহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উপযোগী হয়, অথবা বীজের ধর্মানুসারে একই জল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ উৎপন্ন করে, তেমনি আমার স্বরূপ জীবের বিভিন্ন রূপে পরিণত হয়, একটি মূর্খ— অপরটি চতুর, ইহাদের সম্মুখে একটি নীলমণির দোনুতী হার পড়িলে মূর্খ ব্যক্তি সর্প ভাবিয়া ভীত হয়, পরন্তু চতুর ব্যক্তি আনন্দিত হয়, আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই, স্বাতী নক্ষত্রের জল শুক্তির মধ্যে গিয়া মুক্তা হয় আর সর্পের মুখে বিষে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি আমি জ্ঞানী পুরুষের সুখের ও অজ্ঞান ব্যক্তির দুঃখের কারণ হই। (৪২০)

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ।।১৫

সর্ব প্রাণীর হৃদয়দেশে 'আমি অমুক' এই যে বুদ্ধি (অহংকার) রাত্রিদিন স্ফুরিত হয় সে বস্তুও আমিই, পরন্তু সাধুসঙ্গ করিয়া যোগজ্ঞানের অভ্যাস করিয়া এবং বৈরাগ্যের সহিত গুরুচরণ উপাসনা করিয়া এবং এইরূপ অন্য সদাচরণ করিয়া যাঁহাদের অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় আর যাঁহাদের অহংভাব আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করে তাহারা আপনা হইতেই আমাকে জানিতে পারেন এবং আত্মস্বরূপেই সদাসুখী হইয়া থাকেন, ইহাদের এইরূপ (আনন্দময়) স্থিতির জন্য আমা ভিন্ন অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে ? হে ধনঞ্জয়, সূর্যোদয় হইলে যেমন সূর্যের প্রকাশেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, তেমনি আমাতে আমাকে জানিবার কারণ আমিই, অপরপক্ষে দেহের সেবা করিয়া এবং সর্বদা সংসার গৌরব (সংসার-সুখের প্রশংসা) করিয়া যাহাদের অহংতা (অহংভাব) দেহেই ডুবিয়া আছে তাহারা স্বর্গ ও সংসারের জন্য (ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য) কর্মমার্গে ধাবিত হয় এবং সেইজন্য তাহারা দুঃখের ভাগী হয় (তাহাদের ভাগ্যে দুঃখের শেল পড়ে); পরন্তু হে অর্জুন, অজ্ঞানজনিত এই স্থিতি

তাহারা আমার সত্তা হইতেই প্রাপ্ত হয়, যেমন জাগ্রত অবস্থার বিষয়গুলিই নিদ্রায় স্বপ্নের কারণ হয়, মেঘের জন্যই দিনের আলো কমিয়া যায়, পরন্তু দিনের (আলোর) জন্যই মেঘ দেখা যায়, তেমনি আমার সম্বন্ধে যে অজ্ঞানের জন্য প্রাণী বিষয়ভোগ করে তাহা আমার সত্তা হইতে হয়, হে ধনঞ্জয় যেমন মূলজ্ঞানই (জাগ্রৎ অবস্থাই) নিদ্রা ও জাগরণের কারণ, তেমনি জীবের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মূল কারণ আমিই। (৪৩০)

যেমন সর্পের আভাস ও রজ্জু-জ্ঞানের মূল কারণ রজ্জুই, তেমনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রসারের নিশ্চিত কারণ আমিই, এইজন্যই হে ধনঞ্জয় আমার বাস্তব স্বরূপ না জানিয়া যখন বেদ আমাকে জানিবার প্রয়াস করিল, তখন উহাতে ভিন্ন ভিন্ন শাখা উৎপন্ন হইল, তথাপি এই তিনটি শাখাই (ঋক্, সাম, যজু) আমাকে সম্যগ্‌ভাবে জানিয়াছে, যেমন পূর্ব ও পশ্চিমগামী নদীগুলি সব সমুদ্রে গিয়াই আশ্রয় পায়—যেমন সুগন্ধ বহন করিয়া বায়ুপ্রবাহ আকাশে লীন হয়, তেমনি "ব্রহ্মাস্মি"-রূপ মহাসিদ্ধান্তের কাছে শ্রুতিও শব্দের সহিত হারাইয়া যায় (ঐ মহা সিদ্ধান্তে লীন হয়), সমস্ত শ্রুতি যাহার সম্মুখে লজ্জিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া যায়—সেই ব্রহ্ম-স্বরূপকে আমিই যথাবৎ প্রকট করি, তারপর যেখানে শ্রুতির সহিত সারা জগৎ নিঃশেষে লয় প্রাপ্ত হয় সেই শুদ্ধজ্ঞানের প্রকৃত জ্ঞাতা আমিই। নিদ্রা হইতে জাগিলে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় ও ব্যক্তি যেমন অন্তর্হিত হয় এবং জাগ্রত মনুষ্য আপনাকে একাই দেখিতে পায়, তেমনি কোনও প্রকার দ্বৈতাভাস বিনাই আমি আমার অদ্বৈততত্ত্ব জানিতে পারি, এবং এই আত্মবোধের মূল কারণ আমিই, হে বীর, যেমন কর্পূরে অগ্নি লাগিলে কাজল পড়ে না আর অগ্নিও থাকে না, তেমনি যে জ্ঞান সমস্ত অবিদ্যাকে (ভক্ষণ) ভস্ম করে সেই জ্ঞান যখন স্বয়ং লুপ্ত হয় তখন কিছুই থাকে না—একথা বলা যায় না, আর আছে—তাহাও বলা শোভা পায় না। (৪৪০)

অমৃতের পুত্র

শ্রীনারায়ণ পাত্র

মাঝে মাঝে দু'একটি মহৎ হৃদয়
অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হয়।
তাঁহাদের দীপ অনির্বাণ।
ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা ভেদি'—
মন-গড়া বাধাবিঘ্ন ছেদি'—
প্রতিকূলতার মাঝে আনিবারে সত্যের সন্ধান
তাঁহাদের হয় অভ্যুত্থান।
সঙ্কীর্ণ এ জীবনের সুখ দুঃখ হাসি
দুদিনেই হয় জানি বাসি।
তবু সেই দুদিনের ঘরে
চিরতরে
তাঁহারাই আসি' গেয়ে যান—
অপার্থিব অমৃতের গান।
কোটী কোটী তারা পুঞ্জ মাঝে
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সম তাঁরা
কলুষ ধরায় আসি' আনি দেন শান্তিজলধারা!
অবোধ দুর্বল ওই মানবেরা তবু
হন্তারক তাঁহাদের। যদি কভু
তাঁহাদের প্রাণ-বিনিময়ে—
শান্তি নেমে আসে এই ধরার আলয়ে;
মৃত্যু তাই তুচ্ছ তাঁহাদের,
অমৃতের পুত্র তাঁরা, সত্য-দ্রষ্টা ক্ষণ-জীবনের।

'আমি' ও 'তুমি'

'দীপঙ্কর'

[এই প্রবন্ধে 'আমি' জীব ও 'তুমি' ঈশ্বর]

সংসারের অভাব-অভিযোগে উদ্বিগ্ন, দুঃখ-দারিদ্র্যে উৎপীড়িত, রোগে শোকে অবসন্ন, ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আমি শান্তি চাই, তুমি শান্তির নিলয়। শান্তি চাওয়াই তো তোমাকে চাওয়া, তাই তোমাকে আমি চাই।

বাগানে এসে শুধু পাতা গুনে গুনে সারা হলাম, আম খাওয়া আর হল না। কেবল হিসাব-নিকাশ। হীরে ফেলে তুচ্ছ কাচখণ্ডের দিকেই ঝোঁক। জানি হিসাবে কিছুই লাভ হবে না, তবু হিসাবের দিকেই কেবল নজর।

কখনও কখনও কত প্রশ্ন জাগে: আমি কোথায় ছিলাম, কেমন ক'রে এখানে এলাম, যাব কোথায়, তুমি কে, তুমি আমাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছ কি, তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? এ সব প্রশ্নের উত্তরে নানা লোকে নানা কথা বলে, বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার কথা। বিশ্বাস করি কতক—কতক করি না। সংশয় মেটে না। কার কাছে জানব এ সব—কোথায় পাব সদুত্তর? কেন তুমি এই সুন্দর জীব-জগৎ, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছ—কে উত্তর দেবে? যদি কেউ এর উত্তর দিতে পারে তো সে তুমি।

তোমার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নিয়ে তর্ক করতে ইচ্ছা হয় না। আমার বিশ্বাস তুমি আছ, যেমন আমার মধ্যে তেমনি সকলের মধ্যে। তুমি যে অন্তর্যামী।

তুমি নির্লিপ্ত, নির্বিকার, চিরন্তন। পাপী পুণ্যাত্মা, শিষ্ট দুষ্ট, সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র সকলেরই উপর তোমার সমান অহেতুক কৃপা। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বাবস্থায় সকলেই তোমার কৃপার অধিকারী। জগতে এত প্রতিযোগিতা, নিষ্ঠুরতা, উৎপাত, অনাচার, অবিচার—এর জন্যে তো তুমি দায়ী নও। এই বৈষম্য ও বিভিন্নতার কারণ তো আমরাই—আমাদের কর্মফল। তোমার আলো, তোমার বাতাস সকলেরই জন্যে। হে কৃপাময়, তোমার কৃপাবাতাস বয়েই চলেছে, যে পাল তুলে দেবে সে-ই বুঝতে পারবে। আমি পাল তুলতে পারিনে, সংসার-সমুদ্রে তরঙ্গাঘাতে আহত হই। বুঝতে পারিনে তোমার কৃপার কী শক্তি।

তুমি রসস্বরূপ, পরম আনন্দস্বরূপ, অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ। আমি রসপিপাসু, রসের আস্বাদ ক'রে ধন্য হব। আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি। তোমাকে আস্বাদ করতে চাই—রূপে রসে ছন্দে বর্ণে গন্ধে গানে। ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো আমার অবস্থা। এক দানা চিনিতেই আমি ভরে যাই, চিনির পাহাড়ে আমার কি কাজ?

তুমি আমার ভেতরে থেকে অন্তরের দ্বার বন্ধ ক'রে দিলে কেন? আমার অভিমান—আমার অহংকারের জন্যে? তোমার দেওয়া রঙ-বেরঙের খেলনা নিয়ে ভুলে রইলাম ব'লে? আমি তোমাকে চাইছি না ব'লে আমার মায়ামোহের বেড়া ভেঙে দেবে না? আমার আকূতি ঐকান্তিকতা নেই ব'লে কি তোমার দেখা পাব না? আমার অহং কার? সে তো

তোমারই। তুমি সেই অহংকারকে নিঃশেষে নাশ ক'রে দিয়ে আমাকে সম্পূর্ণভাবে তোমার ক'রে নাও। আমার মনের সব মলিনতা মুছিয়ে দিয়ে আমার শরীরকে তোমার মন্দির ক'রে দাও।

তুমি নিরাকার নিরাধার—আবার সাকার সর্বাধার। আমি কিন্তু তোমাকে সাকাররূপেই চাই। তোমার প্রেমময় নয়নানন্দকর মোহনরূপ দেখতে আমার সাধ। দাও দিব্যচক্ষু, সর্বত্র তোমার ঐশ্বর রূপ প্রত্যক্ষ করি—সর্ব জীবের মধ্যে তোমাকে দেখে আনন্দতীর্থে স্নান করি।

তুমি তো পিঁপড়ের পায়ের নূপুরধ্বনিও শুনতে পাও, আর আমার অন্তরের বেদনগুঞ্জন তোমার কানে কি পৌছায় না?

তুমি আমাকে যে ধরে রয়েছ এ তো বুঝতে পারিনে, তুমি যে আমাকে নিরন্তর রক্ষা ক'রে চলেছ—এ বোধ হয় কই? তাই আমি তোমাকে ধরতে চাই, কিন্তু তোমার দেখা পাইনে—তোমাকে ধরতে না পেরে পড়ে যাই, আছাড় খাই। বিপদে আপদে দুঃখের দিনে পথ হারিয়ে ফেলি। সম্পদের দিনে ধন বিদ্যা মান যখন আসে তখন মনে হয়, আমার শক্তিতেই পেলাম এ-সব, বিপদের সময় তোমাকে দোষ দিই। তোমার অলক্ষ্য হস্তের ক্রীড়নক যে আমি তা মনে থাকে কই? সম্পদে বিপদে প্রতি পদক্ষেপে তুমি আমায় ধরে থাক, তুমি ধরে থাকলে আমার আর পড়বার ভয় থাকবে না।

যখন আহার করি মনে করি তোমাকেই অর্পণ করছি, তুমি যে আমার ভেতরে রয়েছ, কিন্তু শুধু মনে করাই সার—তুমি যে গ্রহণ করছ, তা তো বুঝি না। সন্ধ্যারতির সময় তোমার মধুর স্তব গান করি, মুখে উচ্চারিত হয় তোমার পূজার মন্ত্র, অন্তর স্পর্শ করে না একটুও। দিন রাত কত কথা শুনি—সে সব কি তোমার বাণী? বিশ্বব্যাপী তুমি, আমার ভ্রমণ কি তোমাকে প্রদক্ষিণ করা হবে না?

মন্দিরে মন্দিরে ছুটোছুটি করি তোমাকে পাব ব'লে, গঙ্গাস্নানে পূজা-পাঠে ধ্যান-জপে কাজকর্মে সময় কাটাই তোমার স্পর্শ অনুভব ক'রব ব'লে—কিন্তু আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়, তোমার দীপ্তিতে আমার অন্তরলোক আলোময় হয় না।

শাস্ত্র পড়া হয়েছে, যুক্তিতর্কও কত হ'ল—অনুভূতি কই? তবে কি সবই নিষ্ফল? ধর্ম-জীবনের পূর্ণতা যে অনুভূতিতে। এই অনুভূতি তোমার কৃপা-সাপেক্ষ। আমার সমস্ত অহংকার দূর ক'রে আমায় তোমার যোগ্য ক'রে নাও।

ঊষর মরুভূমির মতো তোমার স্নিগ্ধ শ্যামল স্পর্শে আমায় সরস শ্যামল করবে না? তুমি অমৃত, আমি অমৃতের সন্তান। তবু আমার ভয় কাটে না।

আমি জীব মায়ার অধীন, তুমি ঈশ্বর মায়াধীশ। তুমি মায়ার সাক্ষী—প্রকাশক, তাই মায়া তোমার বশীভূত। অনির্বচনীয়া মায়া তোমারই শক্তি। আমার দুইটি রূপ—ব্যক্ত, অব্যক্ত। আমার ব্যক্ত রূপটিই আমি জানি। জাগ্রৎকালে আমার যা কিছু অনুভূতি এই ব্যক্ত রূপটি নিয়েই। সুষুপ্তির অজ্ঞানে যখন জগতের সকল পদার্থই অব্যক্তভাবে অবস্থান করে তখন সংস্কার সমষ্টিরূপ সেই অজ্ঞানের দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা তো তুমিই। তোমার থেকেই জগৎ ব্যক্ত হয়, তুমিই সর্বত্র সমভাবে অনুস্যূত থেকে সৃষ্টির বীজাবস্থা সূক্ষ্মাবস্থা ও স্থূলাবস্থা প্রকাশ কর। সকল জগৎকে এক কালে জানছ ব'লে তুমি সর্বজ্ঞ। আমি জীব—খণ্ডে আমার অভিনিবেশ, তাই আমি অল্পজ্ঞ। খণ্ডদেহে অভি-মান-বশতঃ আমি অপূর্ণ হয়ে 'হায় হায়' করছি।

এ জগৎ তোমার সৃষ্টি, সঙ্কল্প, লীলা। জগৎ সৃষ্টির জন্যে বাইরের কোন উপাদানের প্রয়োজন হয়নি তোমার—বাইরের কোন বস্তুর অপেক্ষাও করনি তুমি। তোমার বাহিরই বা কোথায়? যদি সৃষ্টির জন্যে বাইরের কোন বস্তুর উপর তোমাকে নির্ভর করতে হ'ত, বাইরের বস্তু সংগ্রহ করতে হ'ত তাহ'লে তো তুমি সৃষ্টিকর্তা হতে না। তাই সৃষ্টি তোমার সঙ্কল্প। সৃষ্টির পূর্বে মায়াশক্তি তোমাতেই লীন থাকে। অনাদি সংস্কার থেকেই তুমি এই জগৎ সৃষ্টি করেছ।

মহাপ্রলয়ে কর্মবাসনা নিয়ে জীবগণ অজ্ঞানে লীন থাকে। জীবগণের কর্মসকল ফলদানে উন্মুখ হ'লে তোমার সৃষ্টি করবার ইচ্ছা হয়, তখন তুমি আপনার মায়াশক্তিকে ঈক্ষণ কর। মণির প্রভার মতো তোমার ঈক্ষণ স্বাভাবিক, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি করণের উপর তোমার ঈক্ষণ নির্ভর করে না।

সুষুপ্তি-অবস্থা থেকে আমার যে ব্যষ্টি-বুদ্ধি জাগরিত হয়, এরও মূলে রয়েছে তোমার অনুগ্রহ। তোমার অভেদ দৃষ্টি নিত্য অবাধিত। তোমার স্বরূপ-জ্ঞান অগ্নির উষ্ণতার মতো তোমার নিত্য সহচর, তোমার জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক।

নাট্যকার যেমন নিজের সঙ্কল্পে নাটক রচনা করেন এবং নাটকের প্রত্যেক ব্যক্তি বস্তু ও ব্যাপারের মধ্যে অনুস্যূত থেকে তাদের ধরে থাকেন, তুমিও তেমনি তোমার সঙ্কল্প-রচিত জগৎ-নাট্যের প্রত্যেক ব্যক্তি ও ব্যাপারের মধ্যে অনুস্যূত থেকে সব কিছুকে ধরে আছ। নাট্যকার যেমন নাটকের সব কিছু জানেন, সেই সব কিছুর সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অবগত থাকেন, তুমিও তেমনি জগতের সব কিছু জানো, তোমার সৃষ্টির সব কিছুর সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অবগত আছ। নাটকের সৃষ্টি-স্থিতি-ও লয়-বিষয়ে নাট্যকার স্বাধীন, তুমিও সেইরূপ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-বিষয়ে স্বাধীন—তোমার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।

নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ যেমন আপন আপন ব্যষ্টিভাবে অভিনিবিষ্ট থেকে নাটকের সর্বত্র অনুস্যূত নাট্যকারকে এবং নাটকের সর্বাংশ দেখতে পায় না ও পরস্পরের ভাব অবগত নয়, সেইরূপ জগৎনাট্যে স্থিত একটি জীব আমি ব্যষ্টিভাবে অভিনিবিষ্ট ও মুগ্ধ ব'লে জগৎ-নাট্যের সর্বত্র অনুস্যূত তোমাকে এবং তোমার সৃষ্ট জগতের সর্বাংশ দেখতে পাই না ও জীবসকলের অন্তরের ভাবও অবগত নই।

তুমি ছাড়া আমার বা কোন জীবের পৃথক্ সত্তা নেই, অহংকারবশে পৃথক্ সত্তা কল্পনা ক'রেই নানা দুঃখ ভোগ। তোমার কৃপায় অজ্ঞান-প্রসূত খণ্ডভাব চিরতরে দূর হয়ে যাক আমার।

কার্য-কারণ-ভাবের মূলে তোমার সঙ্কল্প, তোমার মায়া। তুমিই কার্য, তুমিই কারণ। কার্য-কারণ-ভাব তোমার শক্তির খেলা—তোমার মায়া। কার্য-কারণ দেশ-কাল ব্যাপ্ত ক'রে থাকে, তুমি দেশকালাতীত,তোমার সৃষ্টিতে কার্যকারণের অবকাশ কোথায়? বিকল্পের দ্বারা তোমার সঙ্কল্প প্রতিহত নয়, যেহেতু তুমি স্বাধীন। সঙ্কল্প-কর্তা তুমি ছাড়া তোমার সঙ্কল্পেরও পৃথক্ সত্তা নেই। মায়াশক্তিকে বশে রেখে সৃষ্টি কর ব'লে সঙ্কল্পে বহু হয়েও তুমি অভিন্নই থাক, তোমার পূর্ণত্ব কখনও খণ্ডিত হয় না।

জলে যখন স্থিরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন নানা আকারের তরঙ্গ দেখেও বুঝি ঐ তরঙ্গগুলি জল ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি যদি আমায় দিব্য দৃষ্টি দাও তবেই তো বুঝতে পারব—তোমার সৃষ্টির যা কিছু আমার নয়নগোচর হচ্ছে সবই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর তুমি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকাশময় সূর্যরশ্মি পেচকের নিকট যেমন অন্ধকাররূপে প্রতীত হয়, তোমার মায়াশক্তিও আমার কাছে অজ্ঞান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাই আমি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে—তোমার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারছি না।

তুমি অবিনাশী, নিয়ত-ক্রিয়াশীল, সদা-জাগরিত। জগৎ-সংসার যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখনও তোমার চক্ষু নিদ্রাহীন। তুমি প্রতিনিয়ত কর্ম করেই চলেছ অনলস ক্লান্তিহীন ভাবে। জগতে যা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ সবই তোমার কার্য। জগতের বিলয় হলেও তুমি অবিনাশী শাশ্বত পরমপুরুষ।

তোমার শক্তি অনন্ত, অনন্ত তোমার ঐশ্বর্য ও প্রেম। সমস্ত ঐশ্বর্য বীর্য যশ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্যের অধিকারী তুমি প্রাণিগণের উৎপত্তি বিনাশ পরলোক-প্রাপ্তি ও ইহলোকে আগমন, বিদ্যা অবিদ্যা সবই জান, তাই তো তুমি ভগবান। আমি নুনের পুতুল তুমি সাগর, তোমার পরিমাপ আমি করব কি ক'রে?

তুমি অনন্ত শুদ্ধ নিত্যমুক্ত সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ, আমি অল্পশক্তি অল্পজ্ঞ। তুমি তিনকালে—অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে চিরবিদ্যমান। তুমি স্বপ্রকাশ, তোমারই আলোয় আমি প্রতিভাত—প্রকাশিত।

সমালোচনা

গদাধর (প্রথম খণ্ড) : লেখক—অজাতশত্রু। প্রকাশক—শ্রীকমলেশ চক্রবর্তী, কল্পতরু প্রকাশনী, ৮নং কে কে. রায়চৌধুরী রোড (বড়িষা), কলিকাতা—৮। পৃষ্ঠা—২৭০। মূল্য—৪.৫০ টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন আজ দেশে-বিদেশে নানাভাবে নানা দিক দিয়া আলোচিত হইতেছে। সাহিত্যে-দর্শনে, কাব্যে-কথিকায়, সঙ্গীতে-নাটকে, গল্পে-উপন্যাসে—বিচিত্র উপায়ে তাঁহার চরিত্র-চিত্রণের একটি আন্তরিক প্রয়াস ইদানীং সর্বত্রই দেখা যাইতেছে। রূপায়ণের সফলতা সকল ক্ষেত্রে সমান না হইলেও, এরূপ দুরূহ প্রয়াসের উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্য-লীলার বিভিন্ন ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া লেখক তাঁহার কল্পনার তুলিকায় এই জীবন-চিত্রটি আঁকিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। সহজ সুন্দর ভাষা ও ভাব গ্রন্থখানিকে মনোরম করিয়াছে। তথাপি এ-কথাও ঠিক যে, ইহাকে জীবনীগ্রন্থের পর্যায়ে ফেলা ঠিক হইবে না। ঘটনাবলীকে এত বেশী কল্পনাশ্রয়ী করা হইয়াছে যে অনেক স্থলে মূল আখ্যান বা সত্য ঘটনা অপেক্ষা লেখকের কাল্পনিকতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চরিত্র, পটভূমিকা ও কথাপুষ্টিতে লেখকের যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ পাইলেও বাস্তব জীবনেতিহাসের ধারা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে এবং সমগ্র গ্রন্থ-খানিকে কিঞ্চিৎ উপন্যাসধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। স্থানে স্থানে হিন্দী ও সংস্কৃত কথার মধ্যে ব্যাকরণদোষ পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক।

ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়, কিন্তু প্রুফ-সংশোধনে আরও সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

—শ্যামাচৈতন্য

Hinduism: Its meaning for the liberation of the spirit—By Swami Nikhilananda, New York—Harper & Brothers Published 1958 Pp. 196. Price $4

হার্পার ব্রাদার্স হইতে প্রকাশিত নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দ প্রণীত—এই পুস্তকখানি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক হিন্দু ধর্মের এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান—যাহার সহিত ওতপ্রোত রহিয়াছে একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী।

রুথ নন্দ আনশেন সম্পাদিত World Perspective Series (বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী পর্যায়) জনসাধারণের সমীপে সংক্ষিপ্ত পুস্তকাকারে আধুনিক চিন্তারাজি উপস্থাপিত করিতেছে, যাহার সহায়ে সাধারণ মানুষ বুঝিবে বর্তমান সভ্যতার গতিবেগ কোন্ দিকে এবং মৌলিক আবেগই বা কি, ইহারই সহায়ে সম্ভব মানুষে মানুষে বোঝাপড়া এবং বিবিধ বিরোধের সমন্বয়।

আলোচ্য গ্রন্থ উক্ত পর্যায়ের ১৭তম পুস্তক। বিশ্বকৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদই ভারতপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান এবং অদ্বৈতবাদই দার্শনিক চিন্তার সর্বোচ্চ সীমা—এই ভাবধারা হইতে শুরু করিয়া অনুভবী লেখক দেখাইয়াছেন প্রকৃত হিন্দুধর্মের ভিত্তি এই অদ্বৈতবেদান্ত, তাই হিন্দু সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল—কারণ সে জানে একেরই বিচিত্ররূপ এই বিশ্বজগৎ। আত্মার মুক্তি সাধনার পথে নীতিশাস্ত্র, যোগচতুষ্টয় ও তন্ত্রের আলোচনা বিভিন্ন অধ্যায়ে করিয়া শেষে বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করিয়া লেখক বলিতেছেন : সত্য শত-সহস্র ভাবে প্রকাশ করা যায়, সকল প্রকাশভঙ্গী ধর্মতত্ত্বের পুরাতন পথে নাও যাইতে পারে। হয়তো বিজ্ঞানের প্রণালীতে, নয় শিল্পের সহায়ে—না হয় দর্শনের পথে অথবা কর্তব্য-সম্পাদনের দ্বারাও উহা প্রকাশিত হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠেঃ প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজা যথরীতি গম্ভীর ও শুচিসুন্দর পরিবেশে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সপ্তমী পূজার দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। শেষ দুইদিনেব পূজায় বহু ভক্তের সমাগম হয়। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, কযেক সহস্র ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রেঃ আসানসোল, বালিযাটি, বরিশাল, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, দিনাজপুর, জামসেদপুব, জযরামবাটী, হবিগঞ্জ, কামাবপুকুর, করিমগঞ্জ, মালদহ, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শিলং, শিলচব, সোনার গাঁ এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বেলুড় মঠে ত্রৈবার্ষিক সাধুসম্মেলন

গত ১লা নভেম্বর হইতে তিন দিন বেলুড় মঠে ত্রৈবার্ষিক সাধুসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে ভারতেব বিভিন্ন প্রান্ত হইতে এবং ব্রহ্ম, সিংহল ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে রামকৃষ্ণসংঘের বহু সন্ন্যাসী সমবেত হন। বিজয়াদশমীব পরই ভ্রাতৃগণ পরস্পব মিলিত হওয়ায় মঠ আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল।

দেহত্যাগ-সংবাদ

স্বামী শেখরানন্দঃ আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী শেখরানন্দ (রামন্) ৭১ বৎসর বয়সে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রে তিরুভাল্লায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন তাঁহাকে মাভেলিকারাব নার্সিং হোমে রাখা হয়।

১৮৮৭ খৃঃ তিনি ত্রিবাঙ্কুর (বর্তমান কেরল) রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা-সমপনান্তে কিছুকাল একটি অফিসে কাজ কবাব পর ১৯১৮ খৃঃ তিরুভাল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করিযা ১৯২৩ খৃঃ স্বামী নির্মলানন্দজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি বহু বৎসর কুইল্যাণ্ডি আশ্রমের কর্মী ছিলেন এবং কালিকটে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বৎসর তিনি কালাডি কেন্দ্রেরও কর্মী ছিলেন।

১৯৫১ হইতে ১৯৫৫ পযন্ত তিন বৎসরেব অবিককাল স্বামী শেখরানন্দ তিরুভাল্লা আশ্রমসমূহের সভাপতি ছিলেন। সবল অনাডম্বব এই সন্ন্যাসীর আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী দুর্গানন্দঃ অপর একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদও আমরা গভীর দুঃখেব সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি। স্বামী দুর্গানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ৭৮ বৎসর বয়সে গত ২২শে অক্টোবব বেলা ১০।১৪ মিনিটের সময় হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ কবেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি হৃদ্‌রোগে পীড়িত ছিলেন।

তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯১২ খৃঃ কনখল সেবাশ্রমে যোগদান কবেন, এইখানেই তাঁহাব জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়। ১৯১৬ খৃঃ শ্রীশ্রীমহারাজেব নিকটে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বাঙ্গালোর আশ্রম এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমেরও তিনি কর্মী ছিলেন। তাঁহার আত্মা পরম শান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী জ্যোতীরূপানন্দঃ স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের (পিম) দেহত্যাগের সংবাদও আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি। গত ৩০শে অক্টোবর

সন্ধ্যা ৬॥টায় কলিকাতা কার্নানি (পি, জি,) হাসপাতালে ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি হৃদ্‌রোগে ও পাকস্থলীর ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। ১৫ই অক্টোবর হাসপাতালে তাঁহাকে ভরতি করার পর তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু ৩০শে বৈকাল ৬টায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন এবং করোনারি থ্রম্বোসিসে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

তিনি ১৯২৪ খৃঃ বেলুড় মঠে যোগদান করেন, ১৯২৯ খৃঃ তাঁহার মন্ত্রগুরু শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দেওঘর বিদ্যাপীঠের সঙ্গেই তিনি অধিককাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির সহকারী সম্পাদকও ছিলেন। কিছু-কাল জামসেদপুর কেন্দ্রের ভার লইয়া কাজ করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। চিকাগো-বাসী তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষের আহ্বানে একবার তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা ভগবৎপদে চির শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সেবাকার্য

কচ্ছে ভূকম্প-সেবাকার্যের বিবরণীতে প্রকাশিতঃ ১৯৫৬ খৃঃ ২১শে জুলাই সন্ধ্যায় সহসা ভূমিকম্পে আঞ্জার শহরের ঘনবসতি অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ও বহু নরনারী প্রাণ হারায়। ক্রমশঃ সংবাদ আসে নিকটবর্তী গ্রাম-সমূহও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

কচ্ছের এই বিপদে দেশের নানাদিক হইতে সাহায্য আসিতে থাকে। বোম্বাই ও রাজকোট আশ্রম হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মিগণও শীঘ্রই সেবাকেন্দ্র খুলিয়া অস্থায়ী কুটির নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। শহরের ৬০টি দরিদ্র পরিবারের জন্য এক-কুটিরের বাসস্থান নির্মাণকার্য দ্রুত সম্পন্ন হইলে ১৮ই আগষ্ট শ্রীজওহরলাল নেহরু উহার উদ্বোধন করেন। এতদ্ব্যতীত মিশন খাদ্যশস্য, লণ্ঠন, সাবান, জামাকাপড় ও বিছানা বিতরণ করে।

শহরের কাজের পর মিশন পল্লীর কাজে হস্তক্ষেপ করে, ভুজপার, সুখপার, ধামাদকা প্রভৃতি গ্রামকে আধুনিকভাবে পুনর্গঠিত করিয়া পাকা রাস্তার দ্বারা উহাদিগকে যুক্ত করিয়া দেয়। গ্রামে প্রায় ৬৭টি দুই-কক্ষের বাড়ী ৪০টি এক-কক্ষের বাড়ী ব্যতীত ১টি বিদ্যালয়-গৃহ, ১টি কম্যুনিটি হল, ১টি মন্দির, ১টি মসজিদ ও ৪টি দোকানঘর নির্মিত হইয়াছে। ১৯৫৭ খৃঃ মে মাসের মাঝামাঝি গ্রামের এই গৃহগুলি বসবাসের জন্য উন্মুক্ত হয়। দশমাসব্যাপী এই সেবাকার্যে গৃহনির্মাণে ৫,০০৭০৩৲, কুটিরনির্মাণে ৩,৩৮৩৲, রাস্তানির্মাণে ৭,২৭৪৲ ব্যয়িত হইয়াছে। জন-সাধারণের দান, সরকারী গ্র্যাণ্ট ও ধার প্রভৃতিতে আদায়ীকৃত মোট টাকা ৫,২৫,৬০৩ ৯২।

কার্য-বিবরণী

শিলংঃ এই কেন্দ্রের গত ১০ বৎসরের (১৯৪৭-৫৭) সুমুদ্রিত কার্য-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৪ খৃঃ এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কর্মধারা প্রধানতঃ চিকিৎসা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক। আধুনিক সরঞ্জাম সম্পন্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ে ল্যাবরেটরি ইলেকট্রো-থেরাপি ইউনিট এবং হোমিওপ্যাথি বিভাগ আছে। সমুদয় চিকিৎসাবিভাগের ভার মঠের একজন সন্ন্যাসী চিকিৎসকের উপর সমর্পিত। চক্ষুচিকিৎসার জন্য একটি বিভাগ সংযোজিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ৩০,০০০ টাকার সাহায্যে এক্স-রে-প্ল্যাণ্ট স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।

গত তিন বৎসরের চিকিৎসিতের সংখ্যা :

বর্ষ	নূতন	মোট
১৯৫৫	১২,৮২৮	২৫,০৭১
১৯৫৬	২০,৫০৩	৩৯,১৪০
১৯৫৭	২৮,৩৩৬	৫০,০২৩

রোগীদের ৫০% এর বেশী শিলং শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়িয়া অঞ্চলের আদিবাসী। এই চিকিৎসালয়টি এখানে অতি জনপ্রিয়।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য (হরিজন কলোনিতে) অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ লাইব্রেরি ও পাঠাগার, ২৫টি ছাত্রের বাসোপযোগী বিদ্যার্থি-ভবন, সারদা-সংসদ (শিশুদের জন্য) পরিচালিত হয়।

আশ্রম-কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক আলোচনা-সভা ও ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বৎসরে গড়ে ১০৪টি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে , খাসি ও জয়ন্তিয়া জেলায় এই কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব এবং অন্যান্য পুণ্য দিনের অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়।

একটি ছোট প্রকাশন-বিভাগও এই কেন্দ্র-কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। খাসিয়া ও বাংলা ভাষায় কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। এখানে অসমিয়া ও খাসিয়া ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠক-সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

শিলং কেন্দ্রের বন্যার্ত-সেবাকার্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ খৃঃ লখিমপুর ও কামরূপ জেলায় বন্যার্তদের সেবা করা হয়। ১৯৫৫ খৃঃ গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ এবং লখিমপুর জেলায় রিলিফ-কার্য চালানো হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দেও হোজাই ও নওগাঁ জেলায় রিলিফ করা হইয়াছিল। এই সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১,৬০,১০০ টাকা।

১৯৫৭ খৃঃ মার্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শিলং কেন্দ্রে প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করেন।

জাপানে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এ বৎসর জাপানে নবম আন্তর্জাতিক ধর্মেতিহাস সম্মেলনে (Ninth International Congress of History of Religion) ২৯টি দেশের বিদ্বান্ বুধমণ্ডলী যোগদান করেন। তাহাতে আহূত হইয়া ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ আগস্টের শেষ সপ্তাহে জাপান যাত্রা করেন।

২৮শে আগষ্ট টোকিও নগরীর শাঙ্কেই কাইকন (মহল)-এ পক্ষকালব্যাপী সভার উদ্বোধন হয়। 'বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য বুঝিতে হইলে ধর্মের ইতিহাস-আলোচনা একটি প্রশস্ত পথ, এবং মানবজাতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে বোঝাপড়া করিতেও ধর্মবিষয়ক অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন' এই সূত্রে—আলোচনা, গোলটেবিল বৈঠক ও সমবেত সম্মেলনের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান যুগে উহাদের পারস্পরিক প্রভাবও আলোচিত হয় , এতদ্ব্যতীত প্রতিনিধিবর্গকে জাপানের বিভিন্ন স্থানে গবেষণা-মূলক যাত্রীরূপে লইয়া যাওয়া হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর সম্মেলন সমাপ্ত হইলে শুরু হয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর চার সপ্তাহব্যাপী জাপান সফর। হিরোশিমা, ওকায়ামা, কিয়োটো, নাগোয়া, তামাগয়া, টোকিও, ওয়াসেদ, হোক্কাইডো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওসাকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইনষ্টিট্যুটে, কিয়োটো ও টোকিওয় জাপান-ভারত সোসাইটিতে, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, বেদান্ত, ভারতের কৃষ্টি ও দর্শন, ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন, হিন্দুধর্মের উৎস, গণতন্ত্র, বিজ্ঞান ও ধর্ম, শিল্পযুগে এবং আণবিকযুগে ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন , অধিকাংশ স্থলে দোভাষীর প্রয়োজন হইয়াছিল, বিশেষতঃ প্রশ্নোত্তরের সময়।

৭ই অক্টোবর টোকিও হইতে সিঙ্গাপুর পৌছিয়া চার দিন পরে সিডনি হইয়া তিনি ফিজি-দ্বীপে নাদী পৌছান। উভয় স্থানেই রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের উদ্যোগে আহূত সভায় তাঁহাকে ধর্ম ও কৃষ্টি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে পোপ দ্বাদশ পায়াস

গত ৯ই অক্টোবর রাত্রে দক্ষিণ রোমে ক্যাস্টেল গ্যাণ্ডলেস-এ রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মগুরু পোপ দ্বাদশ পায়াস ৮১ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। শুধু রোম্যান ক্যাথলিকগণ নয়, সারা বিশ্ববাসী আজ শোকাহত।

সেণ্ট পীটর্‌ হইতে পর্যায়ক্রমে তিনি ২৬২তম ধর্মগুরু। ১৯৩৯ খৃঃ পোপের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে শান্তভাবে কার্য পরিচালনার জন্য, এবং পরেও শান্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার জন্য তিনি 'শান্তির পোপ'—এই স্বনাম অর্জন করিয়াছিলেন। যুযুৎসু পৃথিবীতে তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইবে।

১৮৭৬ খৃঃ ২রা মার্চ বিখ্যাত একটি ক্যাথলিক্‌ বংশেই ইউগনেনিও মারিয়া জিওভ্যানি জোসেপ পাসেলি জন্মগ্রহণ করেন, এবং পাঁচ বৎসর বয়সেই বালক ঈশ্বরার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার বাসনা ব্যক্ত করে। নূতন নূতন ভাষা শিক্ষা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকায় ক্রমশঃ তিনি ছয়টি ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন।

সংঘে যোগদান করিবার দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি পোপের প্রধান দফতরের কাজে গৃহীত হইয়া পরবর্তী ৩৬ বৎসর বিভিন্ন রাষ্ট্রে—ঐ বিভাগের কার্যেই প্রেরিত হন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ও ইওরোপের প্রায় সব দেশে কাজ করিয়া ১৯২৯ খৃঃ রোমে ফিরিবার পর তিনি কার্ডিনাল পদে উন্নীত হইয়া পোপের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি বরাবর ভ্যাটিকান প্রাসাদেই ছিলেন। তিনি কখনই সুস্থ বা সবল ছিলেন না, পোপের পদে উন্নীত হইবার পর তাঁহার অনলস কর্মক্ষমতা দেখিয়া ডাক্তারগণ বিস্মিত হইতেন—কিভাবে তিনি অহোরাত্র অবিচ্ছিন্নভাবে ঐ কার্যক্রম পালন করেন। সারা বছরই দেখা যাইত রাত্রে তাঁহার ঘরের জানালা দিয়া একটি আলোর রেখা অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছে। যাত্রী এবং প্রহরীরা জানিত পোপ এখনও সজাগ এবং কর্মরত। দ্বাদশ পায়াস শান্তির নির্ভীক প্রচারক ছিলেন, ভাষাবিৎ ও পণ্ডিত ছিলেন, ক্যাথলিক চার্চের ধর্মগুরু ও লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনের পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলিতেন: বাস-কণ্ডাক্টরকে শিখাইতেন কিভাবে কর্মে সততা রক্ষা করিয়া ধর্ম পালন করিতে হয়, সংবাদ-প্রেরককে বলিতেন—বাহুল্য বর্জন করিয়া সত্য সংবাদ পরিবেশন করিতে, আবার বৈজ্ঞানিকগণকে চমকিত করিতেন তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ দিয়া।

ক্যার্ডিন্যালদের নির্বাচন দ্বারা নূতন পোপ ত্রয়োবিংশ 'জন' (John XXIII) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী

গত ৭ই নভেম্বর হইতে তিন দিন ধরিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নেতা, চিন্তানায়ক, বঙ্গমাতার বরেণ্য সন্তান, অসাধারণ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৭ই নভেম্বর প্রাতঃকালে ৪৩ নং চৌরঙ্গী রোডস্থিত অনুষ্ঠান-মণ্ডপে কলিকাতার মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উৎসবের উদ্বোধন করেন। সায়াহ্নে ডাঃ সি, পি. রামস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে এক সভায়

সমবেত কলিকাতার নাগরিকগণ বিপিনচন্দ্রের উদ্দেশে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ডাঃ রাধাবিনোদ পাল অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে এক সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন।

সভাপতির ভাষণে ডাঃ আয়ার বলেন: বিপিনচন্দ্র ভারতীয় ঐতিহ্যে পুষ্ট ছিলেন, আবার পরিবর্তনশীল নবযুগের চিন্তাধারার সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। এই সমন্বয় তাঁহার বক্তৃতায় এবং রচনাবলীতে পরিস্ফুট। অবিচল সংগ্রাম করিয়া যাওয়ার মত বলিষ্ঠতা তাঁহার চরিত্রে ছিল।

উৎসব-কমিটির নিকট প্রেরিত এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে দেশবাসী চিরকাল আধুনিক ভারতের অন্যতম সংগঠকরূপে এই মহামনীষীকে স্মরণ করিবে। যে সকল পথিকৃৎ তাঁহাদের আজীবন প্রচেষ্টার দ্বারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার অনুকূল পরিবেশ রচনা করিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র তাঁহাদের পুরোভাগেই ছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি ও শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী প্রভৃতি বাণী প্রেরণ করেন।

৮ই নভেম্বর শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বদেশী আন্দোলন এবং বিপিনচন্দ্র পাল' সম্পর্কে এক তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন।

৯ই নভেম্বর উৎসবের শেষ দিনে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বসু বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ও দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন:

বিপিনচন্দ্রের মধ্যে ছিল একটা অনমনীয় দৃঢ়তা। তাঁহার মতে স্বরাজ প্রথমতঃ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্র বলিতে তিনি দেশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া শাসন-পরিচালনাই বুঝিতেন। মুসলমানদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের সতর্কবাণী ব্যর্থ হইয়াছে, শ্রেষ্ঠ নেতাগণও তখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাহারই ফলে 'দুই জাতি'-তত্ত্বের উদ্ভব হয়, এবং শেষ পর্যন্ত ভারত বিভক্ত হয়।

—নিবেদন—

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নূতন (৬১ তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা সহ বার্ষিক ৫৲ (পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি পি-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। কুপনে **গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ
১, উদ্বোধন লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা-৩

শ্রীসারদামণি-স্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমলচতুধুর্বীণ-বিরচিতা

সাবদে জন্মদাত্রি ।
যুগযুগস্থভগাস্তে সুন্দবঃ পুণ্যবাসঃ ।

বসসি পবমহংসে সর্বসিদ্ধিস্বরূপা
পবিহবসি চ যত্নান্ নাথদূবপ্রযাণম্ ।
ভুবনবনবিহাবানন্দপূর্ণাস্তবা ত্বং
পবিহৃতস্থতশল্যা নেত্রকূল্যা বিধাত্রি ॥১
সপদি ভব প্রসন্না সাবদে সাবদাত্রি ।

নিযত-সকৃপ-দৃষ্টির্মন্ত্রদান-প্রহৃষ্টা
তনযসম-মমত্বা শ্যামলীচন্দনাস্থ ।
পথি পথি বিচরন্তী সাধনাধাবভূতা
যুগযুগ-মণি-রত্নং রামকৃষ্ণাঙ্গভূষা ॥২
ভুবনকুশলমোদে সাবদে সারদাত্রি !

সাবদে শান্তিদাত্রি !
ত্বয়ি চ সুখনিদানে দুঃখিতা হা ধরিত্রী
চবমবিলয়মায়াদ্ দেশদেশান্তহিংসা ।
ভবতু তব সুতানাং ভ্রাতৃবোধ-প্রবোধো
ববস্থখ-চিবধাত্রি স্নিহ্য মাতর্যতীন্দ্রে ॥৩
সপদি ভব প্রসন্না সাবদে সারদাত্রি !*

* [বঙ্গানুবাদ ৬৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী—সেকুলারিজ্‌ম্

ধর্মের স্বপক্ষে কিছু বলিতে যাওয়া আজকাল বিপদকে ডাকিয়া আনা। নানা দিক দিয়া আজ 'ধর্ম' আক্রান্ত। নাস্তিকতাকে বাদই দিতেছি। কারণ 'ঈশ্বর-বিশ্বাসে'র সহিত সমান্তরাল ভাবেই পৃথিবীতে 'ঈশ্বরে অবিশ্বাস' চলিয়া আসিতেছে এবং চলিতে থাকিবে। মানব-মনের ক্রমবিকাশে উহা একটা অবস্থা।

দেহাতীত কোন সত্তা অস্বীকারকারী বৈজ্ঞানিক জড়বাদ (Scientific materialism) ছাড়াও বর্তমান যুগে ধর্মের বিরুদ্ধে আরও তিনটি প্রধান চিন্তাধারা দেখা যায়: সেকুলারিজ্‌ম (Secularism), মানবতাবাদ (Humanism) ও উদাসীনতা (Indifference)। তন্মধ্যে 'সেকুলারিজ্‌ম্' সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান—ইহার সঠিক বাংলা বা ভারতীয় প্রতিশব্দ এখনও সৃষ্ট হয় নাই, কারণ জিনিসটি ভারতে নূতন আমদানী। ধর্মবিরোধী নয়, তবে ধর্মনিরপেক্ষ—ইহাই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব। ইতিবাচক ধর্মসমন্বয়ের পথে না গিয়া রাজনীতিকরা নেতিবাচক এই পথ ধরিয়াছেন।

বহু ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ, পুরাকালে না হউক—পরবর্তীকালে, ধর্মের জন্য না হউক—রাজনীতিক কারণে ধর্ম লইয়া সংঘর্ষ, পীড়ন প্রভৃতির জন্য রাষ্ট্র যদি আজ ধর্মনিরপেক্ষই থাকিতে চায় তবে কাহারও কিছু বলিবার নাই, কারণ রাষ্ট্র তো প্রকাশ্যভাবে ধর্মবিরোধী নয়—পরন্তু রাষ্ট্র কোনও ধর্মের পক্ষও লইবে না। ধর্মাচরণে প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকিবে—যতক্ষণ না উহা অপরকে আঘাত দেয়!

একটি শব্দের ভাব বুঝিতে গেলে এবং উহা ব্যবহার করিতে গেলে তাহার অন্তর্নিহিত অর্থের সহিত ব্যুৎপত্তিগত অর্থও জানা প্রয়োজন।

'Secular' * শব্দটির মূলে ল্যাটিন শব্দ Saeculum (an age বা যুগ), ইহার আভিধানিক অর্থ: 'Lasting for ages (esp. in Astronomy and Geology—of slow changes)— অর্থাৎ বহুকালব্যাপী। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চে শব্দটির অর্থ: opposite to 'regular' applied to monk —অর্থাৎ অ-সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ ভক্ত। বর্তমানে শব্দটির পারিভাষিক অর্থ: 'Concerned with affairs of the world'—পার্থিব ব্যাপার-সংক্রান্ত। সময়ের পরিবর্তনের সহিত শব্দার্থের এই রূপান্তর, অর্থের বিকাশ বা সঙ্কোচ লক্ষণীয়।

এই সঙ্গে আমাদের জানা প্রয়োজন 'Secularism' *শব্দটিই বা কি অর্থ বহন করিতেছে: (1) Doctrine that the basis of morality should be non-religious, (2) Policy of excluding religious teachings from schools under state control ইহার অর্থ:

(১) এই বিশ্বাস—যে নৈতিক জীবনের ভিত্তি ধর্ম নয়। (২) এই নীতি—যে রাষ্ট্র-পরিচালিত বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা চলিবে না।

এতক্ষণে বোধ হয় বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে—কেন সেকুলারিজ্‌ম্‌কে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচলিত চিন্তাধারার মধ্যে প্রধান বলা হয়। এই মতবাদীরা নাস্তিকদের মতো প্রকাশ্যভাবে ধর্মের বিরোধী নন, ইহারা ধর্মের ও ধর্মবিশ্বাসীদের দোষ দর্শন করিয়া রাষ্ট্রজীবনে উহাকে বর্জন করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন।

* দ্রষ্টব্য: Pocket Oxford Dictionary.

ঈশ্বর বা পরলোক ছাড়িয়া ইহলোকে মনুষ্যত্ব অর্জন কর, মানুষের সেবা কর—এই ভাবের 'মানবতাবাদ' মোটামুটি 'সেকুলার' চিন্তাধারারই অনুসিদ্ধান্ত; অতএব ইহার পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বক্তব্য যে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ ও মানবসেবা চিরদিন ধর্মেরই অঙ্গীভূত।

ধর্মবিষয়ে উদাসীনতা আমাদের আলোচ্য নয়, কারণ উদাসীনতা ঠিক ঠিক বিরোধিতা নয়। আজ যে উদাসীন, আগামী কাল ঘটনাচক্রে হয়তো তাহার প্রবল আগ্রহ দেখা যাইবে। তবে উদাসীনতার কয়েকটি কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে: অনিচ্ছা, অক্ষমতা, আলস্য বা অন্যান্য নানা বিষয়ে আকর্ষণ। দর্শনশাস্ত্র ঈশ্বরকে অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয় বলিয়াছে, অতএব কি কাজ ঐ আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া, তদপেক্ষা দু-দিনের জীবন সুখে কাটাইয়া দেওয়াই ভাল। এই ভাবের মানুষ যখন দেখে, নিরঙ্কুশ সুখভোগ বাস্তব জীবনে নাই, অথবা কোন রোগ বা শোকের আঘাত পায়—তখন সে ধর্মের অভিমুখী হয়।

কিন্তু সেকুলার-মতবাদিগণ? —ইহাদের প্রধান ক্ষেত্র রাজনীতি। ব্যক্তিগত জীবনে বা পারিবারিক পরিবেশে হয়তো ইহারা ধর্ম আচরণ করেন, কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে ইহারা ধর্মকে আমল দিতে চান না। তাঁহারা ইতিহাসের সাক্ষ্য অস্বীকার করিয়া মনে করেন ধর্ম ব্যতীতই মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করিতে পারে। ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহাদের চক্ষে করুণার পাত্র, নিজেদিগকে তাঁহারা উদার ও বিজ্ঞ মনে করেন। তাঁহাদের ধারণা—বর্তমান যুগে ধর্ম একটা অনাবশ্যক কুসংস্কার।

সত্যই কি তাই? কোন বিধি বা নিয়ম প্রাচীন হইলেই যদি কুসংস্কার হয়—তবে সমাজ সংসার হইতে অনেক কিছুই বাদ দিয়া পশুর মতো জীবন যাপন করিতে হয়। মানুষেরই সংস্কার আছে, পশুর আছে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কোন সংস্কার ভাল না মন্দ—'রায়' দিবার পূর্বে বিচার প্রয়োজন, বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সহসা দেখিয়া, না বুঝিয়া বা অপরের মন্তব্য শুনিয়া কোন কিছু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা আর যাহাই হউক—সুবিচার নয়।

ব্যাপকজীবনে প্রচলিত ধর্মগুলির বিফলতাই সেকুলারিজম্‌-জাতীয় চিন্তাধারার কারণ। গোষ্ঠী-পতিগণ আদিম মানবকে নৈতিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিতেন বিধিনিষেধের দ্বারা, দণ্ডের ভয় ও পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া। সমাজনীতির এই প্রথম পাঠের সহিত প্রাকৃতিক ও অতি-প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কারণস্বরূপ ঈশ্বরের এক প্রকার ধারণা যুক্ত হইয়া সৃষ্ট হইল গোষ্ঠীগত ধর্ম, পরে তাহাই দলগত বা জাতিগত ধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছে। দুচার জন অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন মনীষী সূক্ষ্মবুদ্ধিসহায়ে ইন্দ্রিয়-জগতের পারে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার বার্তা মানুষকে শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহা সকলে ধারণা করিতে পারে নাই, কেহ কেহ না বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। ইহাই ধর্মের দ্বিতীয় বা দার্শনিক স্তর।

অতঃপর আসিয়াছে উপর হইতে এক ভাবের প্রবাহ, 'ঈশ্বর জগৎকে ভালবাসিলেন'—ভগবান মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হইলেন এবং বহু মানবকে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ করিলেন। মানুষ জানিল বুঝিল: আছে, আছে এক মহাশক্তি, যাহার কাছে মানুষের সকল চেষ্টা বালকের ক্রীড়ার মতো। কিছুদিন পরে মানুষ আবার ভুলিয়া যায়, আবার অবিশ্বাস করে। বর্তমানে আমরা এইরূপ এক অবস্থার মধ্য দিয়াই চলিয়াছি।

সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস বা সেকুলারিজম্‌ ইহার প্রতীকার নয়। এই বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক মানুষের অভ্যন্তরেই নিহিত রহিয়াছে। আজ বুদ্ধি ও যুক্তির সহিত ভাব ও ভক্তির সমন্বয় করিতে হইবে। ধর্মবিশ্বাস নয়, আধ্যাত্মিক অনুভূতিই ইহা করিতে সক্ষম। ধর্মের তৃতীয় স্তর এই আধ্যাত্মিকতা, যেখানে মানুষ বুঝিতে পারে: কে আমি? কেন আমি? আধ্যাত্মিকতার আলোকেই মানুষ বুঝিতে পারে: কেন নৈতিক জীবন যাপন করিব? কেন প্রতিবেশীকে ভালবাসিব? বুঝিতে পারে: পবিত্রতাই মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, স্বার্থশূন্যতাই রুদ্ধ সীমা চূর্ণ করিয়া অসীমের আনন্দময় অনুভূতি আনিয়া দেয়।

গৈরিক আতঙ্ক

কার্তিক মাসের 'প্রবাসীতে' চোখে পড়িল 'আচার্য-সংলাপিকা'। পরলোকগত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'অনুলেখক' বলিয়া লেখক নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

সংলাপিকার প্রথমাংশে আচার্যের জীবন, চিন্তা ও কর্মধারার অনেক নূতন কথা জানা যায়, কিন্তু শেষাংশ যেন ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। একজন সর্বজন-সম্মানিত ব্যক্তি তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তির (হইতে পারে সেই ব্যক্তি তাঁহার অনুলেখক) সহিত যদি এমন কোন ঘরোয়া প্রসঙ্গ করেন, যাহা লিখিতে বা লিখাইতে গেলে হয়তো তিনি তিন বার ভাবিতেন, যাহা প্রকাশিত হইলে তাঁহার চিন্তার ও শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবে—এমন জিনিস ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার কি সার্থকতা আছে?

সন্ন্যাস ভারতীয় কৃষ্টির একটি সর্বজনমান্য আদর্শ, যুগে যুগে মহাপুরুষগণ-সেবিত আশ্রম-চতুষ্টয়ের শেষ ও শ্রেষ্ঠ এই সন্ন্যাস-আশ্রম সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে উপনিষদাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-পরিমার্জিত গভীর ও গম্ভীর মন লইয়াই করা উচিত। সন্ন্যাসের বিরূপ সমালোচনা ভোগপরায়ণ মনেরই অভিব্যক্তি। আর্যগণের জীবন-পরিকল্পনায় ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস ছিল শেষ সিদ্ধান্ত, স্বাভাবিক পরিণতি। জীবনের যে কোন অবস্থায় সংসারে অর্থাৎ জাগতিক জীবনে অনিত্যত্ব বোধ আসিলে পরমার্থ বা জ্ঞানলাভের জন্য সেই অবস্থা হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করা চলে।

অতএব সকলকেই বিদ্যা এবং ধন অর্জন করিয়া, দার পরিগ্রহ করিয়া তবে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে—এ-কথা শাস্ত্র-সমর্থিত নয়! 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—এই শ্রুতি কি তবে নিরর্থক?

অনুলেখকের লিখিত বিদ্যানিধি-মহাশয়ের উক্তি: আর যার কিছুই নাই সে যদি বলে 'আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী'—আমি তাকে বলি মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

আজ পর্যন্ত কোন সন্ন্যাসীর মুখে এরূপ দম্ভের কথা শুনি নাই, কখনও শুনিব বলিয়া মনে করি না। প্রত্যেক সন্ন্যাসী জানেন, সন্ন্যাস আজীবন অগ্নিপরীক্ষা। গৈরিক আগুনের রঙ। সন্ন্যাস অগ্নিশুদ্ধি—জ্ঞানাগ্নি-বেষ্টিত হইয়া দেহমন-শোধনরূপ সাধন। গেরুয়া গিরিমাটি-সঞ্জাত গিরি ত্যাগ-তপস্যার স্থান, গৈরিক সর্বদা সেই কথাই মনে করাইয়া দেয়। জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছিলাম: এই মাটির রঙ সাধককে মাটির মতো বিনীত ও সহিষ্ণু করিবে। – তাই বলিয়া অন্যায় বা অসত্য সহ্য করা কাহারও ধর্ম নয়, সন্ন্যাসীর তো নয়ই।

বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য বিবেকানন্দকে আদর্শ করিয়া যাহারা সন্ন্যাসী হইবে তাহাদের সকলকেই ঐ সকল যুগপ্রবর্তক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের মতো হইতে হইবে, নতুবা 'সাধারণ মানুষের চেয়েও অনেক নীচে তারা'—এ কোন্ বিজ্ঞের কথা? এক জন সেনাধ্যক্ষের পিছনে সহস্র সৈন্য যুদ্ধ করে, শতকরা প্রায় আশী জনই মরিয়া যায়—অবশিষ্ট যাহারা থাকে তাহারাই যুদ্ধজয়ের ফল ভোগ করে, ইতিহাসে সেনাপতির নামই লিখিত থাকে, সৈন্যদের নয়। আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ মহান্ আচার্যের অনুগামিগণ নবযুগের বাণীকে সমাজ-জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য জীবন দিয়া যায়—তাহারা সকলেই মহাপুরুষ নাও হইতে পারে, তবে তাহাদের জীবনাহুতির ফলেই দেখা যায় পরবর্তী যুগের জনমানসে ব্যাপক জাগরণ। ইহাই 'শত শত ছোকরার অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হওয়ার' সার্থকতা!

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে

স্বামী জীবানন্দ

পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি—শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের দিনটি বৎসরান্তে আমাদের হৃদয়-দ্বারে আঘাত ক'রে তার শুভাগমন-বার্তা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্থিরলক্ষ্য মাতৃগতপ্রাণ ও পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত সন্তান সকলেরই কাছে এই দিনটি মাতৃশক্তি ও মায়ের অপার করুণার অনুভূতির দিন—যে চাইবে সেই-ই বুঝতে সমর্থ হবে। ১০৫ বছর আগে আবির্ভাব, ধরণীতে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার জন্য অবস্থিতি, কঠোর তপশ্চর্যা ও লীলাবসান—সব একে একে একে সন্তানের মানস-পটে ভেসে ওঠে। কী অপার করুণা। এ করুণা—যাঁরা তাঁর নরলীলার সহায়ক হয়েছিলেন শুধু তাঁদেরই উপরে নয়, কৃতী অকৃতী সুকৃতী দুষ্কৃতী সকলেরই উপর অজস্রধারায় বর্ষিত।

আজ স্মরণ করি—জয়রামবাটীতে বালিকা-রূপে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবারতা সারদামণিকে। শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃদেব পরদুঃখকাতর দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খোরাকীর জন্য সঞ্চিত ধানের চাল তৈরী ক'রে তাই দিয়েই অন্ন-সত্র খুলে দিয়েছেন। নিজের পরিবারবর্গের কি হবে—এ চিন্তা তাঁর সংবেদনশীল অন্তঃকরণকে ব্যথিত করেনি। হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রান্না হয়েছে—কঙ্কালসার মানুষগুলোর খিদের জ্বালায় আর সবুর সইছে না—গরম খিচুড়ি তারা গোগ্রাসে গিলছে। মা দুহাতে পাখা ধরে বাতাস দিয়ে জুড়িয়ে দিচ্ছেন।

জ্যৈষ্ঠের সেই অমানিশার কাহিনী চির-স্মরণীয়। সেই ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে জগজ্জননী-জ্ঞানে মহাবিদ্যা ষোড়শীরূপে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন, নিজের দীর্ঘ বার বৎসরের কঠোর সাধনার ফল জপমালা সহ তাঁর পায়ে নিবেদন করলেন। পূজক ও পূজিতা উভয়েই সমাধিতে নিমগ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার পরিসমাপ্তি ষোড়শীপূজায়। সেই দিন জেগেছে এ যুগের কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি—জগতে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার জন্য।

এ ছবিটিও মানস-পটে চির-উজ্জ্বল : জ্যোৎস্না-লোকিত পূর্ণিমা-রাত্রে মা শ্রীভগবানের কাছে যুক্তকরে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, 'আমার মনটি ঐ জোছনার মতো নির্মল ক'রে দাও।' আবার গঙ্গাজলে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখে কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে', যিনি চিরশুদ্ধা, অশেষ-মঙ্গলময়ী, অপাপবিদ্ধা—তাঁর আবার নির্মলতা প্রার্থনার কি প্রয়োজন। এ যে সন্তানের শিক্ষার জন্য। সংসারের আবিলতা-মলিনতার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে যে অন্তরের অধ্যাত্ম-সম্পদ উদ্‌ঘাটিত হয় না। তাঁর আরও একটি প্রার্থনা 'নির্বাসনা চাওয়া' আমাদের মনকে যেন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়। যিনি সকলের মুক্তিদাত্রী, সর্বদা নির্বাসনায় অধিষ্ঠিতা তাঁরও প্রার্থনা বাসনাশূন্যা হবার জন্য।

আশৈশব শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে সকল কর্ম ও ঘটনার মধ্যে দয়া সেবা নিষ্ঠা ধৃতি ক্ষমা সত্য ত্যাগ সরলতা তিতিক্ষা ও তপস্যার জলন্ত রূপ প্রকটিত। মাতাপিতার সেবা, পশুপক্ষীর পরিচর্যা, ডাকাতবাবার কাহিনী, দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কঠোরতার জীবন-যাপন, দক্ষিণেশ্বর-শ্যামপুকুর কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণপণ সেবা, ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর শত ঝামেলার

মধ্যে কূটস্থবৎ অবস্থান, শত শত সন্তানের সহস্র আবদার পূরণ, সন্তান-কল্যাণকামনায় অসুস্থ শরীরেও মহানিশায় অনলস জপ-ধ্যান—শ্রীশ্রীমায়ের সব কিছুই যেন অশেষ মহিমা ও অলৌকিকতায় ভরা। ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের মধ্যে সুখদুঃখে উদাসীন ভালোবাসার প্রতিমূর্তি মা আমাদের!

ধ্যাননিমগ্না শ্রীশ্রীমায়ের চিত্রগুলিও সন্তান গণের হৃদয়ে চির-ভাস্বর। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীর ছাদে ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থা মা দেহভূমিতে নেমে এসে বলছেন: 'দেখলুম কোথায় যেন চলে গেছি, সেখানে আমার যেন সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন, বাবা যেন আমায় আদরযত্ন ক'রে ডেকে নিলে, বসালে ঠাকুরের পাশে। সে যে কী আনন্দ, বলতে পারিনে। একটু হুঁশ হতে দেখি, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি ওই বিশ্রী শরীরটার মধ্যে কি ক'রে ঢুকবো।'

আর একখানি চিত্র: বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে তপস্যার সময় ধ্যানকালে মা গভীর-সমাধিনিমগ্না। বুথিতা হয়ে মা পার্শ্ববর্তিনী যোগীন-মাকে বললেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?' যোগীন-মা, গোলাপ-মা দুজনে টিপে টিপে দেখাতে লাগলেন—'এই যে পা, এই যে হাত', তখন ধীরে ধীরে দেহবুদ্ধির উদয় হ'ল। নীলাম্বরবাবুর বাগানে তাঁর 'পঞ্চতপা' কী কঠোর তপশ্চর্যা!

বৃন্দাবনে ও অন্যান্য তীর্থস্থানে শ্রীশ্রীমায়ের ভাব-সমাধির চিত্রগুলিও সন্তান-হৃদয়ে ভেসে ওঠে।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও অতি তাৎপর্যপূর্ণ। দূর মফস্বলের একটি ভক্তসন্তানের দারুণ অসুখ, এই দুঃখের সংসারে আর থাকতে ইচ্ছা নেই, মৃত্যুর স্নেহশীতল ক্রোড়ে চিরদিনের মতো সে চক্ষু মুদ্রিত করতে চায়—চিঠি লিখল করুণাময়ী মাকে: এই পৃথিবীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে একটিবার আপনার দর্শন চাই। নিঃসম্বল পীড়িত চলচ্ছক্তিহীন সন্তানের আর্তি মাতৃহৃদয়কে ব্যথিত ক'রল। মায়ের দৃষ্টিতে ছায়া কায়া সমান, তাই তিনি পাঠিয়ে দিলেন নিজের একখানি প্রতিকৃতি, লিখে দিলেন: ভয় পেও না, অসুখ সেরে যাবে।

ভক্তসন্তান মায়ের অভয়বাণী আর সেই ছবিখানি পেয়ে তাঁর আর্তিহরণ ক্ষমাসুন্দর মূর্তির ধ্যান করতে লাগল। তার যন্ত্রণা দূর হ'ল। পীড়িত সন্তান নিরাময় হ'ল করুণাময়ী জননীর আশীর্বাদে।

আর একটি ঘটনা: একবার জয়রামবাটীতে দারুণ অনাবৃষ্টি। প্রখর সূর্যের অগ্নিবৃষ্টি—কাঠফাটা রৌদ্রে মাটি চৌচির হয়ে গেছে। কি হবে চাষী গরীব দুঃখীদের? নিষ্করুণ দেবতা! আকাশের কোথাও একটুও মেঘ নেই। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। চাষীরা বাঁচবে কি ক'রে?

করুণাময়ী একবার তাকালেন নিষ্করুণ আকাশের পানে—আর একবার সন্তপ্ত তৃষিত দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে। তাঁর নয়নে অশ্রুধারা ঝরে পড়ল, প্রার্থনা করলেন: 'ঠাকুর একি করলে? শেষটায় এরা কি না খেয়ে মরবে?' আহা, মায়ের অন্তরের ব্যথা বিচলিত ক'রল দেবতার হৃদয়। সেই রাত্রে প্রবল বর্ষণে ধরণী সুশীতল হ'ল। গৃহে গৃহে আনন্দের বন্যা। পৃথিবী শস্যসম্ভবা হ'ল। যথাসময়ে সারা ক্ষেত ধানে ভরে গেল।

পানাসক্ত পদ্মবিনোদের উপর মায়ের কৃপা স্মৃতিপটে উদিত হয়। অভাজনও মায়ের স্নেহ-ভাজন। আপামর সকলেরই উপর তাঁর সমান কৃপা। গভীর রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর (উদ্বোধনের) পাশ দিয়ে মত্ত পদ্মবিনোদ গান গাইতে গাইতে চলেছে:

'ওঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটীর-দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে,
আমি, ডাকিতেছি মা-মা ব'লে,
নিদ্রা ভাঙে না তোমার?'

সন্তানের ব্যাকুলতা-ভরা ডাক জননীর অন্তর স্পর্শ ক'রল,, উঠে জানালার কাছে গিয়ে মা তাকে দর্শন দিলেন। পদ্মবিনোদ ভক্তি-প্রণতি নিবেদন ক'রে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

জয়রামবাটী থেকে সন্তানদের বিদায়কালীন দৃশ্য যেমন করুণ তেমনি মর্মস্পর্শী। কিছুদিন মাতৃসন্নিধানে অবস্থানের পর কোন মাতৃগতপ্রাণ ভক্তসন্তান হয়তো মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। সন্তান-গতপ্রাণ মা-ও তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন, যতদূর দৃষ্টি যায়—অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি একস্থানে এসে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন পথের পানে শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে।

কি অভাবনীয় অহৈতুকী ভালবাসা! কোনও ভক্তসন্তান হয়তো মাতৃদর্শনের জন্য জয়রামবাটী আসছেন, জানতে পেরে মা আগে থেকেই রান্নাবান্না ক'রে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। হয়তো পথে ঝড়জল এসেছে। সন্তান দুঃখ পাচ্ছে জেনে মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। সন্তানগণ অনুভব করতেন গর্ভধারিণী জননীর থেকেও তাঁর ভালবাসা অধিক—অনুভব করতেন এ মা জন্মজন্মান্তরের মা চিরকালের মা।

শ্রীশ্রীমাকে লেখা ভগিনী নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর অনুভূতি প্রাণে এক অপার্থিব আনন্দ এনে দেয়: 'মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মতো উত্তেজনা ও উগ্রতা। তোমার ভালবাসা হচ্ছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ।'

শ্রীশ্রীমা মৃদুতা পবিত্রতা লজ্জা মাধুর্য ও জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। একটি কর্কশ বাক্য কখনও তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি। তিনি কঠোর ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত। মায়ের কাছে যাঁরা উপস্থিত হতেন তাঁদের প্রত্যেকেরই অনুভব করতে বিলম্ব হ'ত না যেন এক বিরাট দৃষ্টির তাঁরা সম্মুখীন, যা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যলাভে শান্ত।

অশেষ দুঃখপূর্ণ এই সংসারে কিভাবে জীবন যাপন করলে সর্ববিধ অমঙ্গলের উর্ধ্বে থাকা যেতে পারে ও প্রকৃত সুখ এবং শান্তিলাভ হতে পারে শ্রীশ্রীমায়ের নিষ্কাম কর্মময় জীবনের মধ্যে এই পথনির্দেশ পাওয়া যায়—তাঁর সকল কর্ম সকলের কল্যাণের জন্যই নিয়োজিত ছিল।

শ্রীশ্রীমা ব্যক্তিগত সকল সুখ এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে অশেষ দুঃখ বরণ করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলুপ্তিই ছিল তাঁর তপস্যা। তাঁর সাধনা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, আর সেই সাধনার প্রবাহ ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো। মর্ত্যে অবতীর্ণা দেবীর স্বেচ্ছাকৃত দুঃখবরণ ও তপস্যা তাঁর দেবীত্বেরই মহিমময় প্রকাশ।

সতীর ধর্ম, পতির সেবা, সহধর্মিণীর কর্তব্য, সন্তান-স্নেহ—হিন্দু সংস্কৃতির পূর্ণ রূপ ও ভারতীয় নারীর পূর্ণ আদর্শ সমগ্রভাবে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে রূপায়িত। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার যথার্থ উক্তি: 'নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা এবং শ্রীশ্রীমা ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক ও এক নূতনের সার্থক সূচনা।' স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করেই জগতে আবার গার্গী-মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, 'চারদিকে লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল

করছে, তুমি এদের দেখবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শন-দিন থেকে শ্রীশ্রীমা যতদিন স্থূলশরীরে ছিলেন ততদিন এই দেখার বিরাম ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরুভাবের পূর্ণ বিকাশ তিনি স্থির জ্যোতিষ্কের মতই দীপ্যমান। তাঁর স্নেহ ক্ষমা আশীর্বাদ অভয় ও আশ্বাস-বাণী সবই অজস্র ধারায় বর্ষিত হ'ত। ঘোর দুষ্কৃতিকারীকেও তিনি ধুয়ে মুছে পবিত্র ক'রে নিতেন। মায়ের ত্যাগী সন্তান-গণ সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন, তাঁদের আর কেউ কিংবা আর কিছু না থাকলেও একজন আছেন, তিনি মা—যিনি ইহলোক-পরলোকের সকলকে ও সব কিছুকে নিয়ে নিত্য বিরাজমানা, —শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পরেও যিনি সংসারে বাস করছেন মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার জন্য, সন্তানকে সংসারের পারে শাশ্বত শান্তির রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য। আদ্যাশক্তির পূর্ণ বিকাশ শ্রীশ্রীমায়ের দোষদৃষ্টিরহিত জীবনে বিশ্বমাতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত অমিয়ধারা পতিতপাবনী গঙ্গার মতো বসুধাতলকে পবিত্র করেছে। অদোষ-দর্শন শিক্ষাই ছিল তাঁর উপদেশের বৈশিষ্ট্য।

শান্তি ও সামঞ্জস্যের পূর্ণতম আদর্শ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনই ছিল তাঁর ব্রত। তাঁর প্রাত্যহিক চিন্তা ও কর্মে ছিল পরম ভাগবতী দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে সাধারণ অসাধারণ সর্ব স্তরের মানুষ এমনকি পশুপক্ষী ইতর প্রাণীকেও তিনি আপনার সন্তান বোধ করতেন। সকলের উপর ছিল তাঁর মাতৃত্বের অধিকার।

শ্রীশ্রীমাকে স্থূল শরীরে দেখার ও তাঁর কৃপালাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা মহা ভাগ্যবান্, তাঁদের অনেকে পরম জ্ঞান ও ভক্তির পথে অগ্রসর হয়ে জীবন মধুময় করেছেন, কিন্তু যাঁরা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত তাঁদেরও ক্ষোভের কিছু নেই, কারণ সর্বকল্যাণসাধনের ব্রত নিয়েই সর্বমঙ্গলা মা আবির্ভূতা হয়েছিলেন। স্থূলদেহে অবস্থান ও লীলা সেই ব্রতের একটি দৃশ্য মাত্র, আজ তিনি সূক্ষ্ম শরীরে সকলের উপর সমভাবে স্নেহধারা বর্ষণ ক'রে চলেছেন।

মা শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, দয়ারূপে, মানুষের হৃদয়দেশ পরিপূর্ণ করছেন, সর্বোপরি বরাভয়করা মাতৃরূপে দুর্বল ভীরু সন্তানকে তিনি আশার আলো দেখাচ্ছেন ও অভয়বাণী শোনাচ্ছেন।

'শ্রীসারদামণি-স্তুতিঃ'র অনুবাদঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী

জননি সারদে। তোমার এবারের অবতার-লীলার পুণ্য জীবন যাপন অন্যান্য যুগের থেকে কত অধিক সুন্দর। এবার শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সর্বসিদ্ধি-রূপে তাঁর মধ্যে তো তুমি রয়েছ-ই, তদুপরি একান্ত আনন্দ সহকারে তুমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছ, স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকাটা এবার পরিহার করেছ। এবারের অবতারে তুমি সংসার-অরণ্যে আনন্দপূর্ণ অন্তরেই ভ্রমণ করেছ। তোমার নেত্রযুগল বিস্ফারিত ক'রে যেখানে যেখানে পুত্র-কন্যাগণের যত দুঃখ তুমি দেখেছ, সমস্তই নিজে হরণ করেছ। হে জ্ঞানদায়িনি জননি সারদে। শীঘ্র তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।

এবারের অবতারে তুমি সর্বদা কেবল কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেই নিশ্চিন্ত থাকনি, পুত্র-কন্যাগণকে মন্ত্রদান পূর্বক তাদের নতুন আধ্যাত্মিক জন্ম দান ক'রে অথবা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে তাদের মুক্ত ক'রে তুমি প্রভূত আনন্দ লাভ করেছ। শ্যামলী-ধেনু, চন্দনা-পক্ষী প্রভৃতির প্রতিও তোমার সন্তানবৎ মমতা। স্বয়ং কৃপার আধার-স্বরূপ হয়ে কৃপাদানের নিমিত্ত তুমি পথে পথে বিচরণ করেছ। হে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভূষণ, যুগযুগান্তরের মা-মণিদের তুমি শ্রেষ্ঠ মণি। সমস্ত জগতের কুশলেই তোমার একমাত্র আনন্দ, হে জ্ঞানদায়িনি মাতঃ সারদে।

হে শান্তিদায়িনি জননি সারদামণি। এই দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে তুমি সকল সুখের আকর। দেশদেশান্তরব্যাপিনী হিংসার আজ হোক চরম অবসান। তোমার পুত্রগণের মধ্যে জাগ্রত হোক সৌভ্রাত্র, সমস্ত মঙ্গলপ্রদ সুখের সনাতন আধার তুমিই। জননি, তুমি যতীন্দ্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশিত কর। হে সারদায়িনি সারদে। সত্বর তুমি প্রসন্না হও।

'গণ্ডিভাঙা মা'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

১৯০৫ খৃঃ, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। স্বামীজীর শিষ্য শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ঠাকুরের ভাইপো রামলালদাদাকে প্রশ্ন করছেন, "মা কেমন আছেন?"—উত্তরটা আমার মনে নেই, কিন্তু ঐ প্রশ্নটি শোনামাত্র মনে হ'ল যেন কত কালের—কত জন্মের আকাঙ্ক্ষিত একটি শব্দ আমার কানে বেজে উঠল, মা। প্রাণ ব্যাকুল হ'ল। মা এখনও রয়েছেন, তাঁকে দেখতে হবে, তাঁর কৃপা পেতেই হবে। তিনি একবার মাথায় হাত বুললেই সব হয়ে যাবে। মন স্থির ক'রে ফেললাম তাঁর চরণদর্শন করতে যাব।

খবর নিয়ে জানলাম, তখন তিনি তাঁর পিত্রালয় জয়রামবাটীতে রয়েছেন। পথের নিশানাও পেলাম রামলালদাদার কাছ থেকে। এখনকার মতো সোজা পথ তখন ছিল না।

হাওড়া থেকে ট্রেনে চড়ে বর্ধমান গিয়েছি। সেখান থেকে গরুর গাড়ী সম্বল ক'রে ৩২ মাইল পথ যেতে হ'ত। পথে চোর ডাকাতের খুবই ভয় ছিল। উচালনের দীঘিতে লেঠেলরা মার-ধোর ক'রে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলত যাত্রীদের। সাহস ক'রে ঐ পথেই রওনা হলাম। বর্ধমানে পৌঁছে স্থানীয় একজন মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ারকে খুঁজে বার করলাম, তাঁর পরিচিত একটি গরুর গাড়ী ঠিক করা হ'ল। বিপদ্-সঙ্কুল রাস্তায় পরিচিত গাড়ী নেওয়াই ভাল। মা'র জন্য নিলাম সের পাঁচেক মিহিদানা—মাটির হাঁড়িতে ক'রে।

যাত্রা শুরু হ'ল। অতি সন্তর্পণে—হাঁড়িটি কোলে নিয়ে সেই দীর্ঘ পথে চললাম—পথ তো নয়, শুধু এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নীচু পথের নামমাত্র। কিন্তু মনে অপূর্ব আনন্দ থাকায় কোন কষ্টই টের পাইনি। একটি রাত্রি পথেই কেটে গেল, পরদিন কামারপুকুর পৌঁছলাম। পরমপুরুষের জন্মস্থান। তখন ঢেঁকিশালে জন্মস্থানের ওপর একটি তুলসীগাছ ছিল। অপরদিকে গৃহদেবতা রঘুবীরের বিগ্রহ, তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বৈঠক-খানায় মালপত্র রেখে একটু জিরিয়ে নিলাম।

সেখানে তখন রামলালদাদার এক দূর সম্পর্কের মাসী কি পিসী থাকতেন। তাঁকে বলে একখানি রেকাবে ৺রঘুবীরের জন্য কিছু মিহিদানা বার করতে যাচ্ছি, এমন সময় ভেতর থেকে তিনি ডাক দিলেন—কি কাজের জন্য, ছুটে গেলাম, মিহিদানা খোলাই পড়ে রইল। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আমার তো চক্ষু স্থির। একটা কুকুর কোথা থেকে এসে মিহিদানার হাঁড়িতে মুখ দিয়ে বসে আছে। তখন বোঝ মনের অবস্থা। এতটা রাস্তা কোলের ওপর বসিয়ে সযত্নে নিয়ে এলাম, মায়ের জন্যে—আর শেষে কিনা তীরে এসে তরী ডুবল! কি আর করি? সমস্ত অভিমান পড়ল মায়ের ওপর। কেন তিনি এমন করলেন? কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নেই, কি ভাবে আলাপ ক'রব, চিন্তা হ'তে লাগল। আমরা শহুরে ছেলে! কেউ যদি একটু introduce (পরিচয়) করিয়ে দিতে পারে তো

*সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৫.৫.৫৮ তারিখে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর ধর্মপ্রসঙ্গ—শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত

বেশ হয়, এই সব ভাবতে ভাবতে কামারপুকুর থেকে বিদায় নিয়ে মায়ের বাড়ী—জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে চললাম।

প্রায় দেড় ক্রোশ রাস্তা, পথে ঐ এক চিন্তা—কিভাবে কথা বলব। যাই হোক এসে তো পৌঁছনো গেল। মা তখন পুরানো বাড়ীর রোয়াকে বসে তরকারি কুটছিলেন। তখন তাঁর প্রায় ৫৩ বছর বয়েস, আমার ২২।২৩, মায়ের শরীর একটু রোগা, পায়ে বাত, কপালের ওপর ঘোমটা। হাতে সোনার বালা, ঠাকুর তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণতঃ বাইরের ভক্তদের কাছে মা অনেকখানি ঘোমটা দিয়ে থাকতেন, আমরা অল্পবয়সী বলে ঘোমটা আর বেশী নামাননি। আগে তাঁর পা ছাড়া কেউ মুখ দেখতে পেত না। 'লজ্জাপটাবৃতা নিত্যা' তিনি, —দক্ষিণেশ্বরের ঐ ড্যাম্প-লাগা নহবৎ ঘরে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী কতকাল কাটালেন কিভাবে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। 'সীতারাম' বলে কত পাপীতাপী দুঃখনদী পার হয়ে যাচ্ছে—আর সীতা কিনা জনমদুঃখিনী, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। রামময়-জীবিতা সীতা, মা-ও তেমনি। বিন্ধ্য-বাসিনী তিনি কিনা। ঠাকুর বলতেন মায়ের সম্বন্ধে, 'ও ছাইমাখা বেড়াল, ও সারদা সরস্বতী, একটু সাজতে গুজতে ভালবাসে'—তাই নিজেই গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন মাকে, তাঁর দেহত্যাগের পরও দর্শন দিয়ে হাতের বালা খুলতে নিষেধ করেছিলেন তিনি। আবার বলছেন, 'ও কি আমার থেটে-শাক*-খাকী পরিবার? ও আমার শক্তি।' সেই মা সাক্ষাৎ জগদম্বা—সামনে বসে তরকারি কুটছেন। কি আর করি, দোনামনা হয়ে প্রণাম ক'রে ফেললাম। প্রণাম করতেই মা একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, 'কেমন আছ বাবা?' দেখ ব্যাপার। আমার মনের সংশয় বুঝে নিয়ে কতদিনের পরিচিতের মতো প্রশ্ন করলেন, 'পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?' যেন ঘরের ছেলে বহুদিন পরে মায়ের কোলে ফিরে এলে মায়ের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন। কত চেনার মত আলাপ করতে লাগলেন। কোথায় রইল আমার সংশয় আর চিন্তা। চোখ জলে ভরে এল অভিমানে—হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে ফেললাম, 'মা, কেন এমন হ'ল? তোমার জন্য সামান্য মিহিদানা আন-ছিলাম, ৺রঘুবীরকেও কিছু দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তা তোমাদের কারও সেবাতেই লাগল না কেন?' মা সব শুনলেন, শুনে বললেন, 'বাবা, কিসে এসেছিলে, গাড়োয়ান কে ছিলেন?' অমুক গাড়োয়ানের গাড়ীতে এসেছি বলায়, মা বললেন, 'দেখ বাবা, ৺রঘুবীরকে ঠাকুর আর শ্বশুর মশাই কত যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করতেন। তাঁর ভোগের জন্য যার তার ছোঁয়া মিষ্টি আনায় ঐ রকম হ'ল।' শুনে আমি ভাবলাম, ৺রঘুবীর না নিলেও বোধহয় তুমি নিতে পারতে। যাই হোক মা'র কথায় মনটা শান্ত হ'ল। আমার মনের সংশয় নিবৃত্ত হয়েছে। পরমানন্দে মায়ের কাছে দিন কাটাতে লাগলাম। সে যাত্রা প্রায় এক সপ্তাহ ছিলাম মা'র কাছে। সে কি আনন্দ—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভুলে গেলাম যে দুদিনের দেখা, মনে হ'ল যেন জন্মজন্মান্তরের চির-আপনার মা। তখন বাড়ীর মাও ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিলাম। জগন্মাতা ঐ প্রথম সম্বোধনেই আপনার ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁর ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েছিল তিনি গর্ভধারিণীর কত উপরে—আসল মা! কিছুর অপেক্ষা তিনি রাখেন না, কিছু চান না তিনি। অহৈতুকী কৃপা তাঁর, আর কি অপূর্ব ত্যাগ! নিজের কথা এতটুকু ভাবতেন না। তাঁর জীবনধারণ—তাঁর

* পাটজাতীয় এক প্রকার স্থানীয় শাক

শ্বাস-প্রশ্বাসও যে সন্তানের মঙ্গলের জন্য। সকলের মা তিনি। আমার ফিরবার দিন এসে গেল—এই মাতৃস্নেহের রাজ্য ছেড়ে সেবারের মত বিদায় নিলাম দুঃখভারাক্রান্ত মনে।

* * *

১৯১১ খৃঃ। শ্রীশ্রীমা দক্ষিণভারতে আসবেন। শশীমহারাজ সব প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন মায়ের সেবার জন্য। বাঙ্গালোর আশ্রমে মা এলেন। আমিও সে সময় মা'র কাছে ছিলাম। মায়ের বাঙ্গালোরে আগমন-সংবাদ খুব গোপন রাখা হয়েছিল, পাছে ভিড়ে মা'র কষ্ট হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মায়ের ছেলেরা মায়ের কথা কি না জেনে থাকতে পারে? দলে দলে ভক্ত মেয়ে-পুরুষেরা আসতে লাগল মায়ের দর্শন-আশায়। সন্ধ্যা আটটার পর তবে ভিড় ক'মত। সে এক কল্পনাতীত ব্যাপার। জয়রামবাটীর এক ছোট্ট গ্রাম্যবালার কি প্রভাব। আশ্রম মুখরিত হয়ে থাকত বিচিত্র মাতৃনামধ্বনিতে। একদিন এক বড় হল-ঘরে মাকে বসানো হয়েছে, সেই ঘরে আর তার পাশের ঘরেও মায়ের ছেলেরা ঠাসাঠাসি ক'রে বসেছে। সকলেই চুপ। নিস্তব্ধ অত বড় হল-ঘরটা। সকলে একদৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে রয়েছেন। অনেকক্ষণ পরে মা আমাকে বললেন, 'বাবা,তুমি ওদের একটু বলতো। ওদের ভাষা যদি একটু জানতুম, তবে ওদের মনে হয়তো আনন্দ হ'ত।'—মায়ের সেই কথাগুলি ইংরেজী ক'রে ভক্তদের বলামাত্র তাদের মধ্যে থেকে দুজন বয়স্ক ভক্ত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বললেন, 'কিছু প্রয়োজন নেই, আমাদের সব ভরে গেছে। মাতৃসত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করছি।' কি অপূর্ব ব্যাপার। স্নেহের রাজ্যে ভাষার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মায়ের স্নেহ অঝোর ধারায় ঝরে তাদের হৃদয় পূর্ণ ক'রে দিয়েছে, ভাষার প্রতিবন্ধকতা সেখানে নেই। মায়ের অস্তিত্বই তাদের কাছে সব। যে কয়দিন মা সেখানে ছিলেন—নিত্যই চলতো এই ভাবের খেলা।

* * *

১৯১৭ খৃঃ। এতদিন প্রায় বাইরে বাইরেই ছিলাম। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এতদিনে সুযোগ এল। শ্রীধাম দ্বারকা ঘুরে কাশী এলাম। হাতে গোটাকতক টাকা রয়েছে। মনে হ'ল—মা'র কাছে একবার যাই, বহুদিন মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিনি। কাশীতে তখন পূজনীয় অচলানন্দ স্বামী রয়েছেন। তাঁকে বললাম, 'চলুন কেদারবাবা, মা কেমন ক'রে ঠাকুরের তিথিপূজা করেন—দেখে আসি।' তখন বোধহয় ফাল্গুন মাস। কেদারবাবাও রাজী হয়ে গেলেন। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ট্রেনে—তারপর ২২ মাইল গরুর গাড়ীর পথ। বাস তখনও হয়নি। সে বেশ মজার ব্যাপার, যেতে যেতে গাড়োয়ান গরু—সবই ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ী চলে না, কি হ'ল। শেষে দেখা গেল সব নিদ্রিত। অনেক ডাকডাকি-হাঁকাহাঁকির পর আবার যাত্রা। মায়ের দেশে পৌঁছে জগদানন্দ স্বামীকে প্রথম দেখলাম। তখনও তিনি সাধু হননি। তাঁর সঙ্গে শ্রীহট্টের আরও কয়েকজন ভক্ত ছিলেন। ফেব্রুআরি মাস। তিথিপূজার দিন ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। অথচ বিশেষ কোন উদ্যোগ আয়োজন নেই। আমি তো মনে মনে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম, কি না জানি হবে তিথিপূজায়। শেষে আর স্থির থাকতে না পেরে একদিন মাকেই জিজ্ঞেস ক'রে বসলাম, 'মা, ঠাকুরের তিথিপূজা হবে না?' শুনে মায়ের মুখে অদ্ভুত এক হাসি দেখা গেল, আহা! সেই হাসিটি এখনও মনে আছে। বললেন, 'বাবা। কি হবে জানি না। শক্তিও নেই, ভক্তিও নেই।' উত্তর শুনে তো হতাশ হয়ে গেলাম।

আর মাত্র দুদিন বাকী—কোনও আয়োজন আজ পর্যন্ত দেখছি না। হঠাৎ সেইদিন বাঁকুড়ার ভক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ এসে উপস্থিত। সঙ্গে দুই গরুর গাড়ী ভরতি নানা জিনিস। পূজার উপচার থেকে শুরু ক'রে প্রায় হাজার লোকের খাওয়াদাওয়ার সমস্ত উপকরণ নিয়ে এসে হাজির।

দেখ কাণ্ড। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা॥ বলেন কিনা শক্তিও নেই, ভক্তিও নেই॥! শক্তি-ভক্তি সবই তো তুমিই মা। ঠাকুর আর মা কি আলাদা? টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বিভূতিবাবুর উৎসাহে—মা অপূর্বভাবে ঠাকুরের তিথিপূজা করলেন, যা আমার কল্পনাতীত ছিল। ভাষা দিয়ে কি তার প্রকাশ সম্ভব? তাঁর পূজায় বিধিনিয়ম নেই, রাগ-ভক্তির পূজা—পূজক পূজ্যকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করছেন, জীবন্ত-জাগ্রত ভাবে সেবা করছেন। ঠাকুর যেমন মা ভবতারিণীকে পূজা করতেন—বালকের বিশ্বাস সরলতা অনুরাগ পবিত্রতা নিয়ে আত্মভাবে সেবা, মায়েরও ঠিক তেমনিভাবে ঠাকুরের সেবা-পূজা। সেই রাগভক্তি প্রেমের অনুরাগের পূজা দর্শন ক'রে জীবন ধন্য হ'ল।

ভারত-নারী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা)

কে বলে তোমারে বন্দী করিয়াছে অন্তঃপুরে
পুরুষ সবল?
তুমি স্বেচ্ছাবন্দিনী যে এড়াইতে লোলুপের
দৃষ্টির গরল।
কে বলে তোমার মুখে গুণ্ঠন টানিয়া দিল
সমাজ শাসন?
চাহেনাক তব মুখ পতি ছাড়া অন্য কারো
ভুলাতে নয়ন।
সজ্জা তব, রূপ তব সঞ্চারিয়া দর্প নিত্য
লইত হরিয়া
লজ্জা যদি শ্রী সঞ্চারি না দিত তোমার কান্তি
দ্বিগুণ করিয়া।
সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা চিরদিন
যেই মহামায়া।
সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তব নারীত্বে দেবীত্ব দিল,
হেরি তাঁরি ছায়া।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও ভগিনী নিবেদিতা

ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভারতীয় দৃষ্টিতে 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু' সকলের ভিতর প্রাণসত্তা অনুভব—অতি পুরাতন সত্য। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চেতন ও অচেতনের ভিতর তিনি যে একই চৈতন্যের প্রকাশ আবিষ্কার করলেন, তা পাশ্চাত্য জগতে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টায় জীবনের প্রবলতম বাধার সম্মুখীন হলেন। বিজ্ঞান-গবেষণায় অগ্রগামী বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম হলেও কেবল ভারতীয়—এই অপরাধে বৈজ্ঞানিকরা নানা বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁর বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির বিরুদ্ধ সমালোচনা শুধু নয় সে গুলিকে চাপা দিয়ে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অগ্রগতিকে রোধ করবার চেষ্টাও সেদিন হয়েছিল।

তাঁর এই প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামে (নিবেদিতা যার নাম দেন, The Bose War) যথার্থ ভগিনীর মত পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি, তিনি আইরিশ-দুহিতা মার্গারেট নোবল—তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মানস কন্যা ভগিনী নিবেদিতা।

১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজীর আহ্বানে ভারতীয় নারীর শিক্ষা ও কল্যাণকল্পে জীবন উৎসর্গের ব্রত নিয়ে তিনি এদেশে আসেন। এই সাধনায় গুরুর প্রথম আদেশ ছিল তাঁকে তাঁর অতীত—স্বধর্ম স্বজাতি ও স্বদেশ সবই ভুলতে হবে এবং ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে। গুরুদেবের সে আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং গভীর একনিষ্ঠভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে ভারতীয় জীবনযাত্রা অনেকাংশে নিজ জীবনে গ্রহণ করতে সমর্থা হন। স্বামীজীর কাছে ভারতকে ভালবাসার এমন দীক্ষা তিনি নিলেন যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার মুহূর্ত পর্যন্ত ভারত-কল্যাণের বাসনা তাঁর হৃদয়ের কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। ভক্তি ও ভালবাসায় ভারতের স্বার্থের সঙ্গে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের অবমাননা যেমন গভীর হয়ে বেজেছে তাঁর বুকে, তেমনি ভারতের গৌরবে তাঁর হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তাই জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় তাঁর প্রেরণা ও সাহায্য কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্যই যেন নয়, এ যেন তাঁর ভারতীয় প্রতিভার প্রতি বিমুগ্ধ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, যে দেশকে প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছেন, তার প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন মাত্র।

কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের বিরূপতায় রয়্যাল সোসাইটিতে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ঘটনাক্রমে লিনিয়ান সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি তাঁর গবেষণা দেখে চমৎকৃত হয়ে তাঁদের সমিতিতে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করেন। এ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন :

'সমবেত Physiologist Biologist প্রমুখ বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষ-কুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে ··অনেক উৎসাহবাক্য শুনিলাম।···President অনেক সাধুবাদ করিলেন। সুতরাং এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য হইয়াছি। আরও অনেক করিবার আছে···।'

কিন্তু যুদ্ধ তখনও অনেক বাকী। ঐ সমিতির ব্যবস্থায় তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হ'ল জুন মাসে। পূর্ব বৎসর মে মাসে রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি 'Plant Response' সম্বন্ধে প্রথম লিখেছিলেন। এখন তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হওয়া মাত্র বিরুদ্ধ দল প্রচার করলেন, এটি পুরাতন থিওরি। কারণ গত নভেম্বর মাসে Waller ঐ কথা প্রকাশ করেছেন। কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র! ভাগ্যে রয়্যাল

সোসাইটিতে যে গবেষণা-প্রবন্ধ পড়া হয় তার সাক্ষী ছিল, এবং Linnean Societyর সম্পাদকের কাছে তার প্রতিলিপি ছিল, তাই বসুর থিওরি প্রথম প্রামাণ্য Paper (প্রবন্ধ) বলে গ্রাহ্য হ'ল। এ-রকম ঘটনা বহু ঘটেছে। এদিকে তিনি লণ্ডনে কাজের জন্য যে-ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন সে-ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে বিপন্ন করবার জন্য ভারত সরকার ছুটি বাড়াতে অস্বীকার করছেন। আর একদিকে জগদীশচন্দ্র বুঝতে পারলেন, তিনি যদি তাঁর থিওরি ভালভাবে প্রকাশিত হবার আগেই চলে যান তবে তা চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। জগদীশচন্দ্র সময় সময় যেন অবসাদ ও হতাশায় ভেঙে পড়তেন আবার নিজ সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁকে নূতন শক্তিতে গবেষণা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করত।

ভগিনী নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের নিদারুণ অশান্তির নিশ্চেষ্ট দর্শকমাত্র ছিলেন না, বরং পরিচিত প্রভাবশালী পাশ্চাত্ত্য বন্ধুদের সাহায্যে বাধা দূর করতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য জাতিদের কাছে নিজ গৌরব প্রতিষ্ঠা করুক, যে পাশ্চাত্ত্য জাতি অহংকারে মদমত্ত হয়ে ভারতবর্ষকে শুধু শোষণ করেই ক্ষান্ত নয়—তার উন্নতির সব পথ বন্ধ ক'রে রাখতেও বদ্ধপরিকর। ভগিনীর ন্যায়-নিষ্ঠ মনের কাছে—এ অবিচার অসহ্য। সুতরাং দিনের পর দিন জগদীশচন্দ্রের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি যখন জগৎ সমক্ষে প্রকাশের পথ পাচ্ছে না, এবং দিনের পর দিন এই সংঘাতে বসুর স্নায়ুগুলি যখন অবসন্ন তখন তিনি ভগিনীর মধ্যে এক দৃঢ় সমর্থক পেলেন। ভগিনীর কাছে এটি ভারতের লড়াই। কেবল ভারত-বাসী—এইমাত্র অপরাধে এমন সব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার ধ্বংস হয়ে যাবে? বসুর বিরুদ্ধে এই আচরণের পূর্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের নগ্ন রূপ এমনিভাবে তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তখনও তাঁর আশা ছিল যে তাঁর স্বজাতির দ্বারা ভারতের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে। পরাধীন ভারতের মর্মবেদনা তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত ক'রে তুলল। ক্রমশঃ তিনি দিনের পর দিন এই জাতির অসহায় অবস্থা নীরবে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ১৯০১ খৃঃ উত্তেজিত হয়ে মিস্ ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখলেন:

'…আমি ভারতের জন্য কিছুই করছি না, কেবল লিখছি। আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর করার মত কিছু দেখছি না। আমার ধারণা ভারতবর্ষ যখন স্বাধ্যায়ে নিমগ্ন ছিল তখন একদল দস্যু এসে সেই দেশ ধ্বংস করেছে, ভারতের সেই একাগ্র সাধনা বিঘ্নিত করেছে। সেই দস্যুরা ভারতকে কি শিক্ষা দিতে পারে? ভারত তাদের বিতাড়িত ক'রে স্বস্থানে ফিরে আসুক। সেইরকম কিছু করাই তার কর্তব্য হওয়া উচিত বলে মনে হয়। সুতরাং যতদিন শাসকরা বিদেশী, ততদিন খৃষ্টানদের সঙ্গে বা শাসকদের সঙ্গে আমার করবার কিছু নেই। যত নির্বোধের মত মনে হোক্ বা নগণ্য হোক্, যা কিছু ভারতীয়—আমি ভারতের পক্ষ থেকে তারই প্রশংসা করি। আর কিছু করতে গেলে হয়ত সামান্য মঙ্গল হতে পারে, কিন্তু অমঙ্গল হবে অনেক বেশী…ভাল বা মন্দ যা হোক্, সে তাদের নিজের ধরনে হোক্, অপরের ধরনে নয়।'

আর এক জায়গায় তিনি তীব্রতর ভাষায় লেখেন: "ইংলণ্ডের ভিতর যা কিছু মহৎ ছিল, তা যেন ধ্বংস হয়ে গেছে—মনে হয়—" ভাবাবেগে আকুল হয়ে তিনি লিখলেন:

হায় ভারতবর্ষ! আমার স্বজাতি তোমার প্রতি যা অত্যাচার করেছে, কে তার প্রতিকার করবে? বীরত্ব ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ তোমার সন্তানদের প্রতি প্রতিদিন যে তিক্ত অপমান বর্ষিত হচ্ছে, তার লক্ষ ভাগের এক ভাগের জন্যই বা প্রায়শ্চিত্ত কে করবে?

কিন্তু কেবল অধীরতা প্রকাশ ক'রে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। ভারতের আত্মমর্যাদার যুদ্ধ—তিনি ভারতীয়দের পাশে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ক'রে গিয়েছেন।

১৯০১ খৃঃ থেকে ১৯১১ খৃঃ পর্যন্ত বসু-পরিবারের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০১, ৪ঠা জানুয়ারিতে ভগিনীর লেখা এক পত্রে আমরা জানতে পারি—ডাঃ বসু তদীয় সহধর্মিণীর সঙ্গে নিবেদিতার মায়ের উইম্বলডনের বাড়ীতে লুপ্ত স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বাস করছেন।

এর পর বসু-দম্পতী ও ভগিনী নিবেদিতা প্রত্যেক ছুটি একত্র যাপন করতেন, হয় দেশ-পর্যটনে নয় তীর্থ-দর্শনে। বসুর বিজ্ঞান-গবেষণার কাজকে ভগিনী তাঁর নিজের কাজ মনে করতেন। ১৯০৫ খৃঃ লিখছেন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের উপর একটি বই লেখা হবে শরৎকালে, আর সেই বই সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করবে। এই সময়ে বসুর প্রবন্ধগুলি সম্পাদনা ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ তিক্ত বিরূপ সমালোচনার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বসুর অন্তর্দ্বন্দ্ব উল্লেখ ক'রে ভগিনী লিখেছেন :

আমি বসুকে বলেছি তাঁকে অতীতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। যে সব প্রবীণ বৈজ্ঞানিককে তিনি অতিক্রম করেছেন, তাঁর প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ স্বাভাবিক ; কিন্তু যুবকরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনবে এবং তাঁকে অনুসরণ করবে। জানা কথা যিনি নেতা বা আচার্য তিনি নিঃসঙ্গ হবেন…।

১৯০০ খৃঃ প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সভায় জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে জগদীশচন্দ্রের বাণী "শ্রোতৃবর্গকে চমকিত করবে ও সমস্ত দেশবাসীকে আলোড়িত করবে"—ভগিনী নিবেদিতা সে কথা ভোলেননি। সত্যই স্রোত ফিরে গেল, সত্যের জয় হ'ল। একটির পর একটি—যশের সোপান অতিক্রম ক'রে জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনলেন। বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী তাঁর প্রতিভা স্বীকার করলেন। প্রতি কাজে নিবেদিতা তাঁর শক্তি ও প্রেরণা নিয়ে পাশে পাশে ছিলেন। ভগিনী দেবমাতা তাঁর "Days in an Indian Monastery নামে বইএ লিখেছেন :

ভগিনী নিবেদিতা বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ (Botanist) ডাঃ জে সি বসুর 'Plant Life' নামক পুস্তক-রচনায় সাহায্য করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ডাঃ বসু প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা নিবেদিতার স্কুলে কাটাতেন এবং কখনও কখনও দিনের বেলা এখানেই আহারাদি করতেন।

বইগুলির সম্পাদনা ছাড়া ডাঃ বসুর গবেষণার কাজের জন্য মিসেস বুল প্রমুখ বান্ধবীদের কাছে তিনি অর্থ সাহায্য চাইতেন। মিসেস বুলের দানশীলতার প্রশংসা ক'রে ১৯১০ খৃঃ এক পত্রে তাঁকে লেখেন :

তুমি জানো এই স্কুল (নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুল) সত্যি তোমার, আমার বইগুলিও তোমারই, বিজ্ঞান বই-গুলিও তোমারই এবং বিজ্ঞান বইগুলি ও ভবিষ্যৎ গবেষণাগারও তোমারই হবে। তোমার কি মনে হয় না যে তোমার অর্থ দিয়ে অনেক ভাল কাজই হয়েছে? আমাকে বলতেই হবে তোমার অর্থের যে ভাবে সদ্ব্যয় হয়েছে তাতে প্রমাণ হয়—অর্থ একটি বড় ভাল জিনিস।

১৯১১ খৃঃ পূজাবকাশে বসু-দম্পতীর দার্জিলিঙ-এর শৈলাবাসে ভগিনী আতিথ্য গ্রহণ করেন। নিবেদিতার শরীর তখন প্রায় ভেঙে পড়েছে। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীযুক্তা বসুর আপ্রাণ চেষ্টাতেও ভগিনীর স্বাস্থ্য আর ফিরল না। তাদের কাছেই ১৩ই অক্টোবর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মুখের শেষ কথা ছিল : 'তরী ডুবছে, কিন্তু আমি সূর্যোদয় দেখব,—
"The boat is sinking,
But I shall see Sun-rise.'

* * *

নিবেদিতার স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে লেডি বসু লিখেছেন :

"ভগিনীর বন্ধুত্ব লাভ ক'রে ধন্য হবার মাস খানেক পরে আমি জানতে পারি—মার্গারেট নোবলের জীবনের পিছনে কতখানি শক্তি সঞ্চিত ছিল। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছিলেন

তাঁদের উপর তাঁর আশীর্বাদ কত ভাবেই না বর্ষিত হয়েছে। আর কত বিভিন্ন দিক থেকে তিনি মাতৃভূমির যথার্থ সেবা করেছেন, তা বলবার সময় এখনও আসেনি।'

ডাঃ বসুর মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকেও ভগিনীর এই অকস্মাৎ দেহত্যাগ কত বিচলিত করেছিল তা জানতে পারি ১৯১৩ খৃঃ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা সিস্টার ক্রিষ্টিনের এক পত্রেঃ ডাঃ বসু শারীরিক ও মানসিক এখন অনেক ভাল আছেন। এখন আর আশঙ্কা করবার দরকার নেই যে তিনি আমাদের মধ্যে অধিকদিন থাকবেন না। কিন্তু জীবন যেন তাঁর কাছে বড় নিরানন্দ। তিনি কেবল বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না— কী ক'রে দিনগুলি কাটাব।' মার্গট তাঁকে সহানুভূতি, আশ্বাস উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন এবং তাঁর সব কাজে সহায়তা করতেন। তুমি বুঝতেই পারছ তাঁর অভাব শূন্যতা সৃষ্টি ক'রে গেছে।

অসাধারণ প্রতিভার আচার্য বসুর আবিষ্কার ভগিনী নিবেদিতাকে ভাবী ভারতের অনন্ত সম্ভাবনার আশায় উদ্দীপ্ত করেছিল। প্রাচ্য জাতির সামনে তাঁর জীবনময়ী বাণীঃ

হে মহীয়সী ভারতভূমি। আর তুমি পাশ্চাত্যের দিকে ভিক্ষুকের মত কাঙ্গাল হাত বাড়িও না—সেই অতীতের স্বর্ণযুগের মত তুমি আবার তোমার দানের উদার হাতখানি প্রসারিত কর। আধুনিক জগতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তোমার অনবদ্য দান অবিস্মরণীয় হোক্।

ভগিনীর দেহত্যাগের ছাব্বিশ বছর পরে ১৯৩৭ খৃঃ ডাঃ বসুর জীবনাবসান হয়। তাঁর পরলোকগমনের খবর শোনামাত্র তাঁর আজীবন বন্ধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তাঁর সাধনার কালে জগদীশ ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে একজন দুর্লভ প্রেরণাদাত্রী ও সাহায্যকারিণী পেয়েছিলেন এবং বসুর যে কোনও জীবনচরিত-রচনায় ভগিনীর নাম এক সম্মানের আসনে বসাতে হবে।'

আচার্য জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিক উৎসবে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতির প্রতিও যথোচিত শ্রদ্ধা না জানালে আয়োজন অসম্পূর্ণ থাকবে।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন নিবেদিতাকে আশীর্বাদ ক'রে লিখেছিলেনঃ

Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one

(ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা বান্ধবী মাতা হও একাধারে।)

—আচার্য বসুর জীবনে ভগিনীর উপস্থিতি কী স্বামীজীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর এক সার্থক সমুজ্জ্বল চিত্র নয়?

সে কোথায়?

শ্রীমতী বসুধারা গুপ্তা

মন মোর নিশিদিন কেবলি শুধায়
সর্বভূতে ব্যাপ্ত যেই
সে রহে কোথায়?
মুমুক্ষু মহর্ষিগণ
যাঁর লাগি অনুক্ষণ
নীরব নির্জনে বসে সতত ধেয়ায়
সে রহে কোথায়?
অন্তরীক্ষে গ্রহতারা—
কার অন্বেষণে তারা
আবর্তিছে নিরন্তর গাঢ় নীলিমায়?
ঊর্ধ্ব শিরে গিরিবর
রহে চির নিরুত্তর
অন্তহীন প্রতীক্ষায়, সে রহে কোথায়?

বিশাল বিটপীরাজি
নিরবধি কারে খুঁজি
মর্মরিছে নিশিদিন পল্লবে পাতায়?
নিজ গৃহ ছাড়ি নদী
ধাইছে জনমাবধি
উল্লঙ্ঘিয়া সর্ব বাধা উন্মাদের প্রায়
কল্লোলি' খুঁজিছে যারে সাগর-বেলায়—
সে আছে কোথায়?
বিশ্বময় রূপ তাঁর রহে সব ঠাঁই
তবু হায়, একি দায়
ধরা তাঁরে নাহি যায়—
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ওই পাগলের প্রায়—
খোঁজে যারে নিরন্তর—সে রহে কোথায়?

প্রেমানন্দ-স্মৃতিচিত্র

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

১৯০৫ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশে বহু সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি' এবং ময়মনসিংহে 'সুহৃৎ সমিতি'ই প্রধান, কিন্তু ১৯০৮ খৃঃ সমিতি-আইন পাস হওয়ার পর সমিতিগুলি ভাঙিয়া গেলে যুবকদের সমবেত হইবার আর সুযোগ রহিল না। তখন আমাদের অনেকের মনে হইল এমন একটি স্থান দরকার, যেখানে আমরা মিলিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করিতে পারি। ময়মনসিংহের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় ও সাহায্যে তথায় দুর্গাবাড়ীর পুকুরের দক্ষিণদিকে একটি ইষ্টকনির্মিত গৃহে 'মহাকালী পাঠশালা' নামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯১১ খৃঃ আমরা ১৫।২০ জন পাঠশালার একটি ঘরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমবেত হইয়া ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা করিতাম। ভজনসঙ্গীতের পর রাত্রি ১০ টায় বাসায় ফিরিতাম। কয়েক দিন পাঠ চর্চা ও ভজনগানের পর আমরা জানিতে পারিলাম পুলিশের গুপ্তচরেরা কর্তৃপক্ষকে আমাদের সংবাদ দিয়াছে। আমরা সরাসরি পুলিশসাহেবের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত 'Words of the Master'—এক কপি উপহার দিয়া বলিলাম, আমরা যাঁহার বিষয় আলোচনা করি এই পুস্তিকাতে তাঁহার উপদেশ লিখিত আছে। ইহাতে রাজনীতির কিছুই নাই। দু-এক দিন পরেই আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এক কপি 'Complete Works of Swami Vivekananda—Vol. II উপহার দিলাম; এই গ্রন্থেই 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Spry (মিঃ স্প্রাই) ছিলেন অক্স্‌ফোর্ডের এম্. এ.। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমাদের বিরুদ্ধে যে-সকল রিপোর্ট পাইয়াছেন তাহা সর্বৈব মিথ্যা। আমরা রাজনীতির চর্চা করি না। যাঁহাদের বিষয় আমরা আলোচনা করি, আপনি এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছু আভাস পাইবেন। আমার কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, কোনও প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠানের কার্যে আমি কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিব না। তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে পাঠ চর্চা ও ভজনাদি চালাইয়া যাইতে লাগিলাম।

ইতঃপূর্বে কতিপয় উদ্যোক্তার চেষ্টায় ময়মনসিংহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বৈরাগী বৈষ্ণবদের খাওয়ানো হইত। আমি প্রস্তাব করিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে যাহাতে যুবকেরা যোগদান করে—তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমার প্রস্তাবানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করা হইল। ময়মনসিংহের হিন্দুসমাজে তখন গোঁড়ামির চূড়ান্ত ছিল; সর্বশ্রেণীর লোকেরা একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে আপত্তি করিত। ছাত্রেরা প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায় দুই হাজার ছাত্র বসিয়া প্রসাদ পাইল। তার পর এক সভায় স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক যোগদান করিলেন। তৎকালে সদ্যপ্রকাশিত স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব, পূর্বার্ধ' হইতে স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত

'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক নিবন্ধটি পাঠ করিলাম। ময়মনসিংহে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব প্রথম বৎসর এইভাবেই উদ্‌যাপিত হইল।

কাশীধামে

১৯১৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে কাশীধামে পৌঁছিয়া স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শন করিলাম। পরমপূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ তখন সেখানে ছিলেন।

অদ্বৈত আশ্রমের খোলা হলঘরে একখানা চেয়ারে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং নীচে ফরাসের উপর বাবুরাম মহারাজ বসিয়া রহিয়াছেন। আমি প্রথমে রাখাল মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলিয়া উঠিলেন এবং পরে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিলে তিনি সেখানেই আমাদের বসিতে বলিলেন ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

'ঠাকুর স্বামীজী চলে গেলেন, এখন আর কি দেখতে এসেছ?'—বলিয়া বাবুরাম মহারাজ কথা আরম্ভ করিলেন। পরে বলিলেন, স্বামীজী বলে গেছেন, 'এখন কথা বন্ধ হোক, কাজ কথা বলুক।' আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি 'নিভৃত চিন্তা' বই পড়েছ?" আমি 'না' বলায় বলিলেন, "এই পুস্তকে আছে 'নীরব কবি'র কথা। সেই প্রকার নীরব কবি হতে হবে। সমস্ত জীবনটাই কবিত্বময় করতে হবে।" প্রায় দুই ঘণ্টা তিনি ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষা আলোচনা করিয়া এমন অমৃত পরিবেশ করিতে লাগিলেন যে, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া রহিলাম। আমার মা-ও খুব মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। রাত্রি ৮টায় আমরা প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাবুরাম মহারাজের আদেশে একদিন দ্বিপ্রহরে আশ্রমে প্রসাদ পাই। একদিনের আলাপেই বাবুরাম মহারাজ আমার হৃদয়-মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন আপনার হইতেও আপনার।

* * *

কাশীধাম হইতে ময়মনসিংহে ফিরিয়াই বন্ধুগণের সহিত পরামর্শক্রমে স্থির করিলাম এ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বাবুরাম মহারাজকে বেলুড় মঠ হইতে আনিতে হইবে। তদনুসারে দুইজন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন, মঠে পৌঁছিয়াই তাঁহাদের একজন সংকল্প করিলেন যে, যতক্ষণ না বাবুরাম মহারাজের নিকট হইতে ময়মনসিংহে যাওয়ার স্বীকৃতি আদায় করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তিনি কিছুই আহার করিবেন না। মঠে সেদিন প্রায় ত্রিশ হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছিল, তিনি কিন্তু কিছুই খাইলেন না। অপরাহ্ণে বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, প্রসাদ পেয়েছ?' ভক্তটি বলিলেন, 'মহারাজ যতক্ষণ না আপনি ময়মনসিংহে যাবার স্বীকৃতি দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কিছুই খাব না।' ইহা শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ অস্থির হইলেন এবং বলিলেন, 'বলিস্ কিরে। আজ সহস্র সহস্র লোক ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়ে গেল, আর তুই প্রসাদ পাবি না। এ কখনো হতে পারে না। আগে প্রসাদ পেয়ে আয়, তারপর আমায় যাওয়া বা না যাওয়ার বিষয় ঠিক করব।' কয়েক বার বলা সত্ত্বেও ভক্তটি প্রসাদ গ্রহণ করিতে রাজী না হওয়ায় বাবুরাম মহারাজ অগত্যা ময়মনসিংহে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ভক্তটি তখন আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

ময়মনসিংহে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের দুই তিন দিন পরই বাবুরাম মহারাজকে লইয়া ভক্তেরা নারায়ণগঞ্জের পথে ময়মনসিংহ রওনা হইলেন। স্বামী

প্রেমানন্দজীর সঙ্গে কৃষ্ণলাল মহারাজ, ব্রহ্মচারী রাসবিহারী মহারাজ ও ইণ্টালী অর্চনালয়ের কৃষ্ণবাবু ছিলেন। ঢাকার ভক্তেরা বাবুরাম মহারাজকে পথে ঢাকা শহরে নামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ময়মনসিংহের ভক্তদের বিশেষ আপত্তিতে বাবুরাম মহারাজ ঢাকায় নামিলেন না। ঢাকা হইতে কয়েকজন ভক্ত মহারাজের সহিত ময়মনসিংহে গেলেন। সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে ভক্তগণ 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকী জয়' ধ্বনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরকে অভ্যর্থনা করিলেন। বাবুরাম মহারাজের প্রেমময় মধুর মূর্তি দর্শন করিয়া সকলের প্রাণেই একটা অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। তিনি যে ঘোড়ার গাড়ীতে আসীন ছিলেন সেই গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া ভক্তগণ নিজেরাই গাড়ী টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। মহারাজ আমাদের বাসাবাড়ীতেই অবস্থান করিলেন।

বাবুরাম মহারাজের উপস্থিতিতে ঐ বৎসর ময়মনসিংহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব খুব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়। টাউন-হলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে আহূত ধর্মসভায় শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। আমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ইংরেজীতে কিছু লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও বাবুরাম মহারাজ জনসভায় কিছু বলিতে স্বীকৃত হন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়। বাবুরাম মহারাজকে দর্শন এবং তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ প্রাতে বহু নরনারী আমাদের বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হইতেন। ইণ্টালি অর্চনালয়ের দেবেন্দ্র মজুমদার-রচিত 'দেবগীতি' হইতে ভজনাদি গীত হইত এবং পরে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার অপূর্ব মধুর ভঙ্গীতে ও ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ঠাকুরের জীবনের নানা ঘটনা ও উপদেশ শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যাইত।

বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, 'আমি যেখানে যাব সেখানে ঠাকুরকে বাইরে বসাব না, মানুষের হৃদয়ে তাঁর আসন পাতব।' এই কথা সত্যসত্যই বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রায় বলিতেন, 'তোমরা আগে স্বামীজীকে বুঝতে চেষ্টা কর, পরে ঠাকুরকে বুঝবে। ঠাকুর সূত্র, স্বামীজী তাঁর ভাষ্য।'

তখনকার দিনে যে-সকল যুবক দেশের স্বাধীনতার জন্য নানা ভাবে কাজ করিতেছিল, মহারাজ তাহাদের সাহস, বীর্যবত্তা ও ত্যাগের প্রশংসা করিতেন। যুবকরা যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে দেশের শিক্ষা সেবা ও অন্যান্য মঙ্গলজনক কার্যে আত্মনিয়োগ করে সে-জন্য তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন, সর্বদা শ্রদ্ধাবান হইতে উপদেশ দিতেন, আরও বলিতেন সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকারের কথায় বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন:

প্রথম দিন সারারাত্রি নরেনের অদর্শনে তাঁর মনের বেদনার কথা বলছিলেন। আমি দেখে একেবারে অবাক! ভাবলুম, মানুষ মানুষকে এতটা ভালবাসতে পারে? আর সে লোকই বা কি কঠিন যে ঠাকুরের এতটা ভালবাসার পাত্র হয়েও বহুদিন যাবৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে না। নরেন্দ্রের সঙ্গে তখন পর্যন্ত আমার আলাপ-পরিচয় হয়নি।· ·আরও একদিন রাত্রে আমি ঠাকুরের ঘরে শুয়েছি, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে জেগে দেখি, ঠাকুর বিছানা হতে উঠে ন্যাংটো হয়ে পরনের কাপড় বগলে ক'রে ঘরের ভেতর

পায়চারি করছেন এবং কেবল বলছেন, 'লোক-মান্যি দিস্‌নে, মা! থাক্ থু, থু।' কেবল বারবার এ কথাই বলছেন এবং থুথু ফেলছেন। সারারাত্রি এভাবেই কেটে গেল। আর একদিন আমি ঠাকুরের নিকট গিয়েছি। যাওয়ামাত্রই ঠাকুর বললেন, 'তোকে তো আজ ছুঁতে পারছি না। বল্—তুই আজ কি করেছিস্।' আমি বললাম, 'আজ কিছু অন্যায় কাজ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।' তাতে ঠাকুর বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় করেছিস, নতুবা তোকে আজ ছুঁতে পারছি না কেন?' ভাবলাম, ঠাকুর যদি ছুঁতেই না পারেন তবে তো মৃত্যুই ভাল। এরূপে কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর মনে হ'ল যে সেদিন প্রাতে এক বয়স্যকে ঠাট্টা ক'রে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। একথা ঠাকুরকে বলাতেই তিনি বললেন, 'তাই হবে, এ-জন্যেই তোকে আজ ছুঁতে পারছিলাম না।' ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা কত গভীর ছিল—এ ঘটনা হতেই বুঝতে পারলুম এবং তাঁর পার্ষদ-সন্তানদিগকে পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁর কি আগ্রহ ছিল তাও সেদিন হৃদয়ঙ্গম হ'ল। তোমরা purity কে (পবিত্রতা) ভাবতে ভাবতে pure (পবিত্র) হয়ে যাও।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহগুণ শিক্ষা-দান সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, "সহ-গুণের মতো আর গুণ নাই। শ, ষ, স— যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।" এইরূপে ঠাকুরের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি শ্রোতা-দের মনে যে শুদ্ধ ভাগবত ভাবের উদ্রেক করি-তেন তাহা বলিবার নয়। তাঁহার সেই পবিত্র সাত্ত্বিক প্রেমমূর্তি, ততোধিক পবিত্র ঠাকুরের কথামৃত—উভয়ে মিলিয়া যে পরিবেশের সৃষ্টি করিত, তাহাতে শ্রোতাদের মন যে সংসারের গ্লানি হইতে বহু উর্ধ্বে উঠিয়া যাইত—তাহা সকলেই অনুভব করিতেন। বাবুরাম মহারাজ সর্বদাই বলিতেন, 'কারও দোষ দেখতে নেই, দোষ দেখবে নিজের। ঠাকুর তাঁর ভক্তদিগকে কখনও অপরের দোষ চর্চা করতে দিতেন না।'

আর একদিন বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "জনৈক তার্কিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সঙ্গে খুব তর্ক করছিলেন। ঠাকুর যতই বুঝাচ্ছিলেন, তার্কিক ব্রাহ্মণ তা কিছুতেই মানছিলেন না। এমন সময় ঠাকুর গাড়ু হাতে ঝাউতলার দিকে গেলেন এবং একটু পরেই একটা ভাবাবস্থায় অতি দ্রুত পদক্ষেপে ফিরে এসে ঐ তার্কিকের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'কিগো, আমি বলছি, আর তুমি কিনা আমার কথাগুলি নিচ্ছ না।' ঐ দিব্যস্পর্শেই পণ্ডিতের ভাবান্তর হ'ল এবং তিনি বললেন, 'আপনার কথাগুলি নিলুম বই কি। এতক্ষণ কেবল তর্কের খাতিরে তর্ক কর-ছিলুম।' বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, কখনো ঠাকুর কোন কোন ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, 'পাপ করেছিস? ভয় কি? আর পাপ করবি না—কেবল এই প্রতিজ্ঞা কর্। আমি তোর সমস্ত পাপ খেয়ে ফেলবো।'

ঢাকায়

বাবুরাম মহারাজ সাত দিন ময়মনসিংহে অবস্থান করিয়া ঢাকা গমন করেন। দুই তিন দিন পরেই আমিও ঢাকায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হই। তিনি ঢাকা শহরের ফরাশগঞ্জ সবজি-মহল্লায় জমিদার মোহিনীদাসের বাড়ীতে অবস্থান করেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকায় গিয়া এই বাড়ীতেই ছিলেন। ঢাকার বিশিষ্ট ভক্ত যতীন্দ্র দাস বাবুরাম মাহারাজের সেবার ভার গ্রহণ করেন। মহারাজ প্রায় একমাস ঢাকায় ছিলেন। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইত। তিনি তাঁহাদিগকে ঠাকুর ও স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করিবার

জন্ম সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকটে যাইতেন তাঁহারা সকলেই এই পবিত্র ও প্রেমিক মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া একটা নূতন জীবনের প্রেরণা লইয়া ফিরিতেন। পূজনীয় হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ঢাকায় বাবুরাম মহারাজের নিকট একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের স্বর্ণপেটিকা। প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলুচ্চে রে। ভাই, আমাদেব জন্যেও কিছু রেখে দিও।' এই চিঠির উক্তি হইতেই বুঝা যায় ঠাকুরের সন্তানদেব মধ্যে বাবুরাম মহারাজের স্থান কোথায়।

একদিন ঢাকার নবাব সলিমুল্লা বাবুরাম মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রাসাদে লইয়া যান। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কাজ দেখিয়া নবাব বাহাদুর খুব আকৃষ্ট হন। নবাবের ইচ্ছা ছিল মুসলমান ছেলেদের দ্বারা তিনি ঢাকায় একটি সেবা-সমিতি গঠন করেন। এই বিষয়ে কিছু পরামর্শ ও অন্যান্য কথাবার্তার পর মহারাজ নবাব বাহাদুরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে দেশে গো-কোরবানি বন্ধ করিয়া হিন্দু-মুসলমান-মিলনের সেতু নির্মাণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। নবাব এই বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে ও দেওভোগে

ঢাকা হইতে বাবুরাম মহারাজকে নারায়ণগঞ্জে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় নিতাইগঞ্জ বাজারে একটি দ্বিতল বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। নেপালবাবু (পরে স্বামী গৌরীশানন্দ) এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সমিতির হল-ঘরে লোকজন সমবেত হইতেন। নারায়ণগঞ্জে পৌছিবার ২।১ দিনের মধ্যেই বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের গৃহী ভক্ত সাধু নাগমহাশয়ের বাড়ী দেওভোগ গ্রামে যান। যে ঘরে নাগমহাশয় বসিয়া তামাক খাইতেন ও বিশ্রামাদি করিতেন, সেই ঘরেই বাবুরাম মহারাজের বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। তথায় পৌছিয়াই বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের একখানা প্রতিকৃতি আনিতে বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় নাগমহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুরের কোনও ছবি ছিল না। ঐ গ্রামের অন্য এক বাড়ী হইতে ঠাকুরের একখানা ফটো আনা হইল। অনুসন্ধানে জানিলাম, নাগমহাশয়ের কয়েকজন গোঁড়া ভক্ত নাগমহাশয়কেই সর্বস্ব মনে করিয়া ঠাকুরের ফটো ঐ বাড়ীতে রাখাব প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই। নাগমহাশয়ের গৃহে সমবেত ভদ্রলোকগণের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, নাগমহাশয় সর্বদাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ই আলাপ করিতেন। বাবুরাম মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষ্যে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে সমবেত ভক্তদিগকে খাওয়ানো হইয়াছিল। আহারের সময় বাবুরাম মহাবাজ নিজহস্তে তরকারি পরিবেশন করেন।

লাঙ্গলবন্ধে

বাবুরাম মহারাজ অশোকাষ্টমী-যোগ উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে লাঙ্গলবন্ধে পুণ্যস্নানের জন্য গমন করেন। বাবুরাম মহাবাজকে নৌকাযোগে আমরা তথায় লইয়া যাই। স্নানার্থীর অত্যধিক ভিড় দেখিয়া তীরে নৌকা না লাগাইয়া মাঝ নদীতেই আমরা স্নান করিলাম। ঐ স্থানে নদীতে তখন কোমর পরিমাণ জল ছিল। বাবুরাম মহারাজ নদীতে নামিয়াই স্নান করিলেন। তিনি স্নানান্তে নৌকায় উঠিবামাত্র এক বৈষ্ণবী কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও ঐভাবে প্রণাম করায় আমরা খুব বিরক্ত হইলাম, কিন্তু দয়ার মূর্তি বাবুরাম মহারাজ তাহাকে বাধা দেন নাই।

বেলুড় মঠে

১৯১৪ খৃঃ এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১৪ হইতে ১৯১৭ খৃঃ পর্যন্ত কার্যোপলক্ষে আমাকে ২।১ মাস অন্তরই কলিকাতায় যাইতে হইত। কলিকাতায় আসিলেই আমি ৫।৬ দিন বেলুড় মঠে বাস করিয়া বাবুরাম মহারাজের পূতসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইতাম। ঐ কয় বৎসর যত দিনই আমি মঠে বাস করিয়াছি প্রতিদিনই দুই বেলা বাবুরাম মহারাজের কাছে বসিয়া প্রসাদ পাইতাম। পুরাতন ঠাকুরঘরের নীচে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিতেন। মহারাজগণ সকলেই মন্দিরে নীচের অংশে এবং ভক্তেরা ও ব্রহ্মচারিগণ বারান্দায় বসিতেন। যখনই আমি বেলুড় মঠে গিয়াছি বাবুরাম মহারাজের স্নেহপূর্ণ আচরণ তখনই আমার মনপ্রাণকে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ করিয়াছে।

একদিন ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর বাবুরাম মহারাজ মঠবাড়ীর পশ্চিম দিকের বারান্দায় বড় বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। আমি দক্ষিণ দিকের ছোট বেঞ্চে বসিয়াছিলাম। বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়াই মনে হইল ভিতরের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সমস্ত মুখখানি লাল হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা অননুভূত দিব্য আকর্ষণ অনুভব করিলাম। বাবুরাম মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেন।

একদিন বিকালে আমি বেলুড় মঠে গিয়াছি। বাবুরাম মহারাজ উপর তলার বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমি গঙ্গার ধার দিয়া মঠের বাড়ীতে ঢুকিতেছিলাম। বাবুরাম মহারাজ উপর হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রসাদ নিয়ে যাও।' আমি ভিতরে গিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যে ঘরে থাকে, তথা হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উপরে বাবুরাম মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রসাদ নিয়েছ?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, ঠাকুরের প্রসাদ নিয়াছি।' তিনি তখন প্রসাদ দেওয়ার জন্য একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহা বাবুরাম মহারাজের প্রসাদ। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'যিনি ঠাকুরের ভিতরে ছিলেন, যিনি স্বামীজীর ভিতরে ছিলেন, তিনিই এর ভিতরে (নিজেকে দেখাইয়া) আছেন।' এরূপ কথা তাঁহার মুখে আর কখনও শুনি নাই।

বাবুরাম মহারাজ আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আমি কি ডাইলুট হয়ে যেতে পেরেছি?' তিনি যে ঠাকুরের প্রেমে একেবারে 'ডাইলুট' হইয়া গিয়াছিলেন—ইহা নিশ্চিত। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে যে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রতিটি হাবভাব হইতেই বুঝিতে পারা যাইত। তিনি সর্বদা 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেন।

একবার পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) অনেক দিন পর বাহির হইতে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষজী আসন হইতে উঠিয়া, হাত জোড় করিয়া, প্রতিনমস্কার জানাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'আমি অতটা পারবো না ভাই। আমি অতটা পারবো না।'

এক বৎসর বেলুড় মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন অপরাহ্নের দিকে বাবুরাম মহারাজ নীচে জ্ঞান মহারাজের ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সমস্ত দিন উৎসবের বিভিন্ন দিক

তত্ত্বাবধান করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত শরীরে একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। সমস্ত শরীরে এক দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল। জানালা দিয়া বহু লোক তাঁহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ পর বাবুরাম মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে উপর হইতে 'হরি ভাই'কে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ নীচের ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, 'আপনি কেবল উপরেই থাকতে চান, মাঝে মাঝে নীচে নেমে আমাদিগকে দয়া করতে হয়।' এই কথা শুনিয়া হরি মহারাজ বলিলেন, 'আমরা কখনও উপরে, আবার কখনও নীচে আসি, কিন্তু তুমি তো নীচে-উপরের পার হয়ে গেছ।'

প্রচারের কথায় একদিন বলিতেছিলেন, 'আমি স্বামীজীর চেলা, স্বামীজীই আমাকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঠাকুরের কথা শুনাতে বলেছেন।' ঠাকুরের লীলা ও শিক্ষা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার করার একটা ভাব বাবুরাম মহারাজের ভিতরে ছিল। তাঁহার মুখে ঠাকুরের কথা শুনিয়া কত লোক যে ভক্ত হইয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই।

একদিন মঠের উপর তলায় গিয়া দেখি মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে তিন গুরুভাই—মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও হরি মহারাজ হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন। পরে হরি মহারাজ বলিতেছিলেন, "শাস্ত্রে জীবন্মুক্তের কথা আছে। স্বামীজীকে দেখেই ঠিক ঠিক জীবন্মুক্ত কাকে বলে তা বুঝতে পারা গেল। আমেরিকায় কিছুদিন বেদান্ত প্রচার করবার পর স্বামীজীর মনে হ'ল, এই ঘোর কামকাঞ্চনাসক্ত দেশে বেদান্ত প্রচার ক'রে কি হবে? দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল। এই চিন্তার উদয় হওয়ামাত্র ঠাকুর স্বামীজীকে দর্শন দিয়ে তাঁর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, 'বলে যা, বলে যা। ভয় কি? আমি আছি'! এরূপ দর্শনের পর স্বামীজী আবার পূর্ণ উদ্যমে বেদান্ত প্রচার করতে লাগলেন।" এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীজীর প্রচারকার্য ঠাকুরেরই ইচ্ছা এবং স্বামীজীর বাণী ঠাকুরেরই বাণী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বাবুরাম মহারাজ অনেক সময় বলিতেন, 'ঠাকুরের মতো অবতারও আসেননি, এরূপ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধও আর হয়নি।' এই কথা বলিয়াই আবার বলিতেন, 'আরও একটা যুদ্ধ হবে।'

ছুটি

শ্রীঅজিতকুমার সেন

আমায় তুমি যখন দেবে ছুটি,
ঘুচবে যবে আমার প্রয়োজন,
একে একে পড়বে যবে টুটি,
মিথ্যা যত কাজের আভরণ,
তখন শুধু মোদের পরিচয়
নিবিড় হবে—এমন মনে হয়।

কাজ অকাজের কৃষ্ণ যবনিকা
মোদের মাঝে ঘটায় ব্যবধান;
কোথায় আলো,—তোমার জ্যোতিশিখা
অন্ধকারে গুমরে কাঁদে প্রাণ!
চলার পথে নিত্য সাধে বাদ
চিত্ত জোড়া ক্লান্তি অবসাদ!

ছুটি,—এবার ছুটি যে হায় মাগি,—
দিনের শেষে চাই যে অবসর!
অধীর হিয়া আজকে সে ঠাঁই লাগি—
যেথা আমার চিরকালের ঘর,—
যেথায় তুমি আছ দিবস রাত—
আমার পানে বাড়িয়ে দুটি হাত!

ধ্যানযোগ

[শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের উপদেশসংগ্রহ]

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

যে সাধক যে পথ—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ বা কর্ম ধরিয়া ভগবান লাভ করিতে অগ্রসর হউন, ধ্যান-জপ তাঁহাকে করিতেই হইবে। ধ্যান-জপের দ্বারা মন শুদ্ধ এবং একাগ্র হইলে তবে ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ ধ্যান জপ সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে ও সরলভাবে এখানে আলোচিত হইল।

জপ ও ধ্যান : 'সাধন প্রাণায়াম' পুস্তিকায় মহাপুরুষ মহারাজ লিখিয়াছেন যে, সাধনের অঙ্গ প্রধানতঃ গুরূপদিষ্ট নামজপ ও ধ্যান। জপ সম্বন্ধে 'শিবানন্দ বাণী'তে পাই : প্রীতির সহিত বারবার নাম করাই জপ। 'পঞ্চদশী'তে ধ্যান অর্থে আমরা দেখিতে পাই :

"তাভ্যাং নির্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ (১।৫৪)

শাস্ত্রকার জপ অর্থে বলিয়াছেন, 'তজ্জপ-স্তদর্থভাবনম্'। পতঞ্জলি 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ'কে যোগ বলিয়াছেন, এই সব শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত মহাপুরুষ মহারাজের উপদেশের শুধু যে বেশ মিল আছে তাহা নহে, তিনি এগুলিকে সাধারণের বুঝিবার জন্য বেশ সরলভাবেই আলোচনা করিয়াছেন।

ধ্যানে বসিবার স্থান : একই স্থানে, একই আসনে বসে ধ্যান-জপ করা ভাল, তাতে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং শীঘ্র মন স্থির হবার সাহায্য করে।—(শিবানন্দ-বাণী)

ধ্যানের সময় : দিন যাইতেছে রাত্রি আসিতেছে, রাত্রি যাইতেছে দিন আসিতেছে এ সময় প্রকৃতি শান্ত থাকে, সাধারণতঃ এই সন্ধিক্ষণ ধ্যানের অনুকূল সময়। মহাপুরুষ মহারাজ বলিতেছেন : জপ করবি গভীর রাতে, মহানিশায় জপ করলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি, সমগ্র মন-প্রাণ আনন্দে ভরে যাবে, জপ করতে করতে ধ্যান হয়ে যাবে। রাত্রিই ধ্যান-জপের প্রশস্ত সময়। জপের সঙ্গে খুব একাগ্র ভাবে ভাববে যে তিনি সস্নেহে তোমার দিকে চেয়ে আছেন, এই ভাবনা এক ভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হলেই ধ্যান।

আসন : কিভাবে ধ্যানে বসিতে হইবে ও শরীরের কোন্ স্থানে ধ্যান করিতে হইবে, তাহার উত্তরে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছেন :

সোজা হইয়া বসিয়া হৃদয়ে মূর্তি কল্পনা করাই ধ্যান। ধ্যেয় মূর্তি নাভি, হৃদয়, ভ্রূমধ্যে ও সহস্রারে কল্পনা করিবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন, 'সুষুম্নায় নানা centre (কেন্দ্র) চিন্তা করতে হয়, হৃদয়ে (রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম) ইষ্টের, ও মস্তকে (শ্বেত সহস্রদল পদ্ম) গুরুর স্থান। এ সব ধ্যান জপের সহায়ক, তাই করতে হয়।

ধ্যান আরম্ভ : মহাপুরুষ মহারাজ বলিতেন, বসা মাত্রই ধ্যান করিতে নাই। 'ধ্যান-জপ করতে আসনে বসে তখনই ধ্যান বা জপ শুরু করো না। প্রথমটায় ধীরভাবে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে যে ঠাকুর আমার মন ঠিক ক'রে দাও। তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা ক'রে তাঁকে চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে।'

ধ্যান : মহাপুরুষ মহারাজ বলিতেন, ধ্যান দুই প্রকার : নিরাকার ও সাকার।

নিরাকার ধ্যান : 'অরূপের ধ্যান বড় কঠিন,

তবে বেদে আকাশকে প্রতীক নিতে বলেছে, সমুদ্রকে বা প্রান্তরকেও (ধ্যান) করা যেতে পারে তবে আকাশই ভাল।'

সাকার ধ্যান: 'তোমাদের পক্ষে ভগবানের সগুণ সাকার ভাবই ভাল, তাতে সহজে মন স্থির করতে পারবে'।

'কোন মূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করা এক প্রকার ধ্যান, কিন্তু উহা যেন চেতন মূর্তি বলিয়া মনে থাকে, জড় নয়। তিনি যেন তোমায় দেখিতেছেন, তোমায় দয়া করিতেছেন, স্নেহ-ভালবাসার চক্ষে দেখিতেছেন—এইরূপ ভাবিলে তবে তোমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে ও জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। ভগবানের কোন চৈতন্য মূর্তির ধ্যানকালে তাঁর গুণ চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে করা এবং একটা chain of thoughts (চিন্তাপরম্পরা) সেই মূর্তি সম্বন্ধে মনে রাখা, উভয়ই এক প্রকার ধ্যান, গুণ চিন্তাও তাহাই।

মহাপুরুষ মহারাজ আরও বলিয়াছেন যে, তিনি (ভগবান) শুদ্ধতা বিশ্বাস জ্ঞান ভক্তি প্রেম ত্যাগ ও দয়া—এই সকলের প্রতিমূর্তি। অতএব তাঁকে চিন্তা করিলে এ সকল গুণ ভক্তে আসে—এই রূপ চিন্তা করবে। গুণরাশির চিন্তা করাও এক প্রকার ধ্যান।

তাঁর উপদেশ হইতেছে যে, এমন ধ্যান করবে যে তাঁর (ভগবানের) সঙ্গে এক হয়ে যাবে।—'শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া তাঁহার চিন্তা করিলে নিশ্চয় ধ্যান হইবে'।

মূর্তিধ্যানের পদ্ধতি: 'সমস্ত মূর্তি একবারে যদি ধ্যান করতে না পার, এক এক অঙ্গ ধ্যান করবে। প্রথমতঃ শ্রীচরণ ধ্যান করবে, ক্রমে ক্রমে অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পরে ঠাকুরের মূর্তি সমস্তটা একবার ধ্যানে আনবার চেষ্টা করবে। পুরাপুরি সমস্ত মূর্তিই একবার ধ্যান করতে পারলে ভাল হয়।'

'ধ্যানের পূর্বে প্রথমে গুরুমূর্তি ধ্যান করিলে ভাল, পরে সেই গুরুস্থানে ঠাকুরের মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হইবেই হইবে। দাঁড়ান অবস্থাই হউক বা বসা অবস্থাই হউক, যাহা তোমার ভাল লাগে তাহা করিবে। সম্পূর্ণ মূর্তি ধ্যান করিতে পারিলেই ভাল—নচেৎ শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীমুখ বা হৃদয়। হৃদয়ে ধ্যান করিলে ভাল হয়, কখনও কখনও তাহা না পারিলে তিনি সম্মুখে আছেন—এই ভাবনা করিয়া ধ্যান করিও।'

জনৈক ভক্তকে মহারাজ বলিতেছেন:

'আপনি এক মনে খুব নাম জপ ক'রে যান, দেখবেন—ক্রমে আপনা হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ স্থায়ী হলে তাও এক প্রকার ধ্যান। * * ক্রমে মূর্তি লয় হয়ে যাবে এবং কেবল চৈতন্যময় এক প্রকার আনন্দ অনুভূত হবে, এও এক প্রকার ধ্যান। আরও কত রকমের ধ্যান আছে। পরে পরে আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন।'

মহাপুরুষ মহারাজ একস্থানে বলিয়াছেন, 'ধ্যানের সময় এরূপ চিন্তা করিবে, ইষ্ট যেন তোমার হৃদয়পদ্মে, ঠাকুর তোমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন এবং তুমিও তাঁহার দিকে প্রেম ভক্তি ভরে দেখিতেছ—এইরূপ চিন্তা করাও ধ্যান।' 'তাঁর (ভগবানের) এমন ধ্যান করবে যে তাঁর সঙ্গে একবারে এক হয়ে যাবে অভেদ বোধে।'

তিনি নিজে কিরূপে ধ্যান করিতেন তাহা এইখানে পাঠকের অবগতির জন্য উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না—তবে ইহা চরম ধ্যান।

'আমি কি রকম ধ্যান করি জানো? মহা ব্যোম বা মহাশূন্যের ভিতর আমি স্থির হয়ে বসে আছি—সত্তা মাত্র আছে—দ্রষ্টা বা সাক্ষী রূপে থাকি, এমনকি কোন চিন্তাই উঠতে দিই না। একভাবে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে, সত্তামাত্র অবলম্বন ক'রে বসে থাকি। আমার এই ধ্যানটা ভাল লাগে।'

ধ্যানের শেষে: 'ধ্যান করার পরেই আসন ছেড়ে চলে যেতে নাই। বরং ধ্যানভঙ্গের পরে নিজ আসনে বসে অন্ততঃ খানিকক্ষণ ধ্যানের বিষয় ভাবতে হয়।'

ধ্যানের উদ্দেশ্য: 'আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর। তাঁকে লাভ করলে ভববন্ধন চিরতরে কেটে যাবে। আর এ সংসারে বারবার যাতায়াত করতে হবে না।'

চার্লস ডারুইন

ডক্টর শ্রীবিধানরঞ্জন রায়

[চার্লস রবার্ট ডারুইন (১৮০৯—৮২) বিখ্যাত প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, ব্রিটিশ জাহাজ 'বীগল'-এর যাত্রীরূপে পাঁচ বৎসর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা ও নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ হইতে তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন, পরবর্তী ২০ বৎসর সেগুলি লইয়া গবেষণা করিয়া জীবের ক্রমবিকাশ বাদের ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ (Theory of Natural Selection to explain Organic Evolution) উপস্থাপিত করেন। এ বৎসর ডারুইনের এই অসাধারণ আবিষ্কারের শত-বার্ষিক স্মরণকালে এই মহান বিজ্ঞান-সাধকের জীবন অনুধ্যান সময়োপযোগী হইবে আশা করা যায়।—উঃ সঃ]

ডারুইনের Origin of Species (প্রজাতির উৎপত্তি) ১৮৫৯ খৃঃ ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়—বেরুবার দিনই ১২৫০ কপি বিক্রী হয়ে যায়। বইটি সমালোচনার ঝড় তুলল। বাইবেলের 'বুক অব জেনিসিস'-এ বিশ্বাসী ধর্ম-বাদীরা, আর যারা বিশেষ সৃষ্টিবাদে (Theory of Special Creation) আস্থাবান্, তারা জেহাদ ঘোষণা করল, দ্বিতীয় মতানুসারে প্রত্যেক প্রজাতি স্থায়ীভাবে ঠিক ঠিক সৃষ্ট হয়েছে এবং এর কখনও এদিক সেদিক হয় না। ডারুইনের কথায় সাধারণ লোকেরা আশ্চর্য হ'ল, আর বিজ্ঞানীরা ভেবে চিন্তে দেখলেন যে এটা একটা তথ্যের মত তথ্য হয়েছে, চিন্তা ও সমীক্ষার এমন সুন্দর মিলন আর হয়নি। তাই, সেই একশো বছরের পুরানো মতবাদ এখনও বিজ্ঞানীরা মানেন, যদিও এতে কিছু কিছু পরিবর্ধন করা হয়েছে।

চিন্তার জগতে ডারুইন একজন বড় বিপ্লবী, যা সত্য বলে জেনেছেন হাজার প্রতিবাদের মুখেও তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন, প্রচলিত মৌলিক ধারণাকে আঘাত করতে কুণ্ঠিত হননি। বিজ্ঞানকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিরীক্ষা ও তথ্যের মিলিত ভিত্তির উপর।

ডারুইনের জীবন-কথা আকর্ষণীয়, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রও বহু সদ্‌গুণে পূর্ণ ছিল। ডারুইন তাঁর তথ্য নিয়ে বহু বৎসর ভেবেছেন—পরে স্থির ধারণায় পৌঁছে তবেই তথ্যের কথা একান্ত বন্ধুদের জানিয়েছেন, বই লিখেছেন আরও অনেক পরে।

যখন তিনি তাঁর তথ্য লিখলেন, তখন মালয় থেকে প্রসিদ্ধ বৃটিশ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ওয়ালেস তাঁকে চিঠি লেখেন—চিঠিতে একটি প্রবন্ধ ছিল, অনেক দিক দিয়ে তা ডারুইনের তথ্যেরই অনুরূপ, ডারুইন মুস্কিলে পড়লেন। ওয়ালেস প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে কিছুই বলেননি, কিন্তু ডারুইন ভাবলেন যে এখন তাঁর পক্ষে নিজের তথ্য প্রকাশ করা অনুচিত। আর একজন একই ক্ষেত্রে কাজ করছে—একই ভাবে, জেনে শুনে সেটি প্রকাশ না ক'রে নিজেরটি প্রকাশ করা নীতিবিরুদ্ধ হবে। তাঁরই আগ্রহে উভয়ের প্রবন্ধের অনুলিপি পড়া হ'ল এক বিজ্ঞানী-সভায়।

বিজ্ঞানী-সুলভ এই নীতিগুলি তাঁর পাণ্ডিত্যকে উজ্জ্বল করেছে। খারাপ স্বাস্থ্য ছিল তাঁর চিরসঙ্গী, রোগজনিত কষ্ট তিনি প্রকাশ করতেন না। কাজ করেই যেতেন যে পর্যন্ত না স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ত। তখন হয়তো তিনি সামান্য বিশ্রাম নিতেন, এবং পরিশ্রমের পরের অধ্যায়ের জন্য তৈরী হতেন।

স্বভাবতঃ তিনি বিনয়ী আর সাধাসিধা হলেও তাঁর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় ছিল; অন্যের থেকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যে তাঁর বেশী ছিল—তা তিনি জানতেন এবং বলতেনও।

ডারুইনের বই বেরুবার পরেই খুব উত্তেজনা ও বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। তখন খুব চমৎকার এক নাটকীয় ঘটনা হয় অক্সফোর্ডে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন সভায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। ডারুইনের বিরুদ্ধবাদীরা খুব বড এক ষডযন্ত্র করে বিশপ উইলবারফোর্স-এর নেতৃত্বে ঐ সভায় তারা দল বেঁধে হাজির হয়। ডারুইনকে পরাস্ত করবে এই মতলব ক'রে। ডারুইন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না—দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হুকার ও হাক্সলে তাঁর পক্ষে হাজির হলেন। তুমুল উত্তেজনা। ঘরে একটুও জায়গা খালি ছিল না—অনেক আগে থেকেই শ্রোতারা অপেক্ষা করছিল।

বিশপ প্রথমে আরম্ভ করলেন, ঝাডা আধ ঘণ্টা বললেন। বক্তৃতা শূন্যগর্ভই ছিল বলা যায়—কোন যুক্তি ছিল না, কথার ঝলক আব বিদ্রূপে পূর্ণ ছিল। সব শেষে পাশে বসা হাক্সলের দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাঁর ঠাকুরদা অথবা ঠাকুরমা—কার দিক থেকে বানরের উত্তরাধিকার পেয়েছেন? তারপর খুব খুশী হয়ে বক্তৃতা শেষ করলেন। মোট কথা বলেন যে ডারুইনের মতবাদ বাইবেল-বিরোধী। পরে গির্জার ভ্রাতৃবৃন্দের ঘন ঘন করতালি এবং ঐ পক্ষের মহিলাদের রুমাল নাড়ানোর মধ্যে তিনি বীরের মতো বসে পডলেন।

হাক্সলে বললেন, তিনি বিজ্ঞানের খাতিরে এখানে এসেছেন; বিশপ এমন কিছুই বলতে পারেননি যাতে ডারুইনের মতবাদে ঘা লাগে। তারপর বিশপের কথার অসারতা বুঝিয়ে, সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে বিশপ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার কত অযোগ্য। সব শেষে তিনি বিশপের বিদ্রূপের উত্তর দিলেন তার সেই প্রসিদ্ধ কথায়: বানর থেকে উদ্ভূত বলতে আমার কোন লজ্জা নেই। কিন্তু অবশ্যই আমি এমন লোককে পূর্বপুরুষ হিসাবে পেলে লজ্জিত হব যে কৃষ্টি এবং বাগ্মিতার শক্তিকে অসদুদ্দেশ্যে নিয়োগ করেছে—কুসংস্কার এবং মিথ্যার বেসাতিতে। আনন্দ, রাগ ও প্রতিবাদে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেল।

ডারুইনের ঠাকুরদা ইরেসমাস চিকিৎসক ছিলেন। রাজা তৃতীয় জর্জের আহ্বানে তিনি লণ্ডন্ শহরে আসেন। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, কবি ও স্বাধীন চিন্তার মানুষ ছিলেন। বিবর্তনবাদে (Theory of Evolution) বিশ্বাসও তিনি করতেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র রবার্টও ডাক্তার হয়ে শ্রুসবেরীতে বসবাস আরম্ভ করলেন। এখানেই ১৮০৯ খৃঃ চার্লস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছয় ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম, ৮ বছর বয়সেই মা মারা যান, বোনেরা ও বাবা মাতৃহারা বালককে দেখাশুনা করতেন। ছেলে-বেলার ও গৃহজীবনের সুখস্মৃতি অনেক সময়ে তিনি বলতেন।

কাছাকাছি স্কুলেই লেখাপড়া আরম্ভ ক'রে সেখান থেকেই প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং নমুনা-সংগ্রহের প্রতি তিনি আগ্রহান্বিত হন। সবারই ইচ্ছা ছিল বাবা ও ঠাকুরদার মত তিনিও চিকিৎ-সক হবেন—তাই ১৮২৫ খৃঃ তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হলেন। কিন্তু ঔষধতত্ত্ব তাঁর ভাল লাগত না, শারীরবিদ্যার কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল না তাঁর কাছে। তখনকার দিনে অজ্ঞান ক'রে অপারেশন করা হ'ত না; অপারেশন-গৃহ তাঁর কাছে নরকের মতো মনে হ'ত। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ছেড়ে গির্জায় প্রবেশ করছে

চাইলেন। কিন্তু তখন তাঁর বন্ধু ও উপদেষ্টা ডাঃ গ্রাণ্ট—এক প্রাণী-বিজ্ঞানী প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। তাঁরই প্রেরণায় তিনি তখন সমুদ্রতীরের কতগুলি প্রাণীকে পরীক্ষা করেন। এই সূত্রে ক্যাম্ব্রিজ ক্রাইষ্ট কলেজে তিনি ১৮২৭ খৃঃ ভরতি হন।

ক্যাম্ব্রিজে কয়েকটা বছর তাঁর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় হয়েছিল। তখন তিনি খুব পরিশ্রম করতেন, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রচুর কাজ করলেন ডিগ্রীর জন্য। অবসর-সময়ে ঘোড়াচড়া, বন্দুক-চালনা, তাস খেলা, পার্টি এবং নমুনা-সংগ্রহ এইগুলি নিয়ে থাকতেন। একদিন দুটি নতুন জাতের মক্ষিকা ধরেছেন একটা পুরানো গাছের ছালের ভিতর থেকে। দুটিকে দুই হাতে ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ আর একটা নতুন নমুনা পেলেন, সেটিকে ছেড়ে যেতেও পারেন না, কি করবেন হঠাৎ ভেবে না পেয়ে একটাকে মুখে পুরলেন। মাছিটা তখন এমন কামড় দিল যে তিনি তখনই ঐটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে দিলেন, তৃতীয়টিও হাত ছাড়া হয়ে গেল।

ক্যাম্ব্রিজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক—হেনস্লর সঙ্গে ডারুইনের খুব বন্ধুত্ব হয়। তাতে তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করেন। হেনস্ল তাকে ভূবিদ্যাও পড়তে বললেন—ডারুইন ভূবিদ্যারও কয়েকটি লেকচারে যোগ দেন। তখন তিনি হামবোল্টের "পার্সন্থাল ন্যারেটিভ" (Personal Narrative) পড়েন, তা থেকে প্রকৃতির ইতিহাসের শিক্ষা পান এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসাবে ঘুরে বেড়ানোর উপযোগিতা বুঝতে পারেন।

তখন 'বীগল্' নামক জাহাজ পৃথিবীর অল্পজ্ঞাত অঞ্চলসমূহের সার্ভে ও বৈজ্ঞানিক অভিযানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। জাহাজে একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর প্রয়োজন ছিল। হেনস্ল ডারুইনের জন্য চাকরিটা ঠিক করেন; প্রাথমিক দ্বিধার পর তিনি গ্রহণ করলেন, এবং ১৮৩১ খৃঃ একরকম অবৈতনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসাবে ডারুইন 'বীগ্‌লে' ভাসলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে 'সার্ভে' চলল—দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ডের অনেক ভূখণ্ড ও দ্বীপ পরিদর্শন ক'রে ডারুইন প্রচুর ও চমৎকার নমুনা নিয়ে এলেন জীববিদ্যা ও ভূবিদ্যার। এই দুই বিজ্ঞানে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিও বাড়ল,—বহু ব্যাবহারিক জ্ঞান তাঁর আয়ত্ত হ'ল, বিশেষ ক'রে সমীক্ষার ক্ষমতা বাড়ল। দক্ষিণ আমেরিকার ফসিলের নমুনার ক্রমিক পরীক্ষা, গ্যালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জের পাখীদের জীবনধারা, আর প্রত্যেক জীব একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ও একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই ধারণা তাঁর চিন্তাধারাকে বিবর্তন-বাদের দিকে এগিয়ে দিল,—তিনি ভাবতে লাগলেন।

এর আগে ১৮০৯ খৃঃ থেকে ফরাসী জীব-বিজ্ঞানী লামার্ক বিবর্তন ব্যাপারে নিজের মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি উদ্ভিদ্-জগতে চারিদিকে অবস্থার প্রভাব দ্বারা এবং প্রাণী-জগতে অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার দ্বারা বিবর্তন হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেন। যদিও তাঁর মতবাদও সুদূরপ্রসারী ছিল এবং ডারুইনকে প্রভাবান্বিত করেছিল, প্রমাণ এবং দৃষ্টান্তের অভাবে তা দানা বাঁধতে পারেনি। বিবর্তন যে ঘটে এবং ঘটছে সে সম্বন্ধে অনেকেই জানতেন এবং মানতেন, ডারুইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' মতবাদ (Theory of Natural Selection) দ্বারা সুন্দরভাবে বিবর্তন ব্যাখ্যাত হয়—পরীক্ষা ও নিরীক্ষা দ্বারা এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়। "প্রকৃতির নির্বাচন" তথ্যটি হার্বার্ট স্পেনসারের

ভাষায় দাঁড়ায়—"বেঁচে থাকার সংগ্রামে সবচেয়ে যে উপযুক্ত তারই জয় (Survival of the fittest বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন)।" তথ্যটি উত্তরাধিকার (Heredity), জীবন-সংগ্রাম এবং পরিবর্তন (Variation)—এই তিনটির একীভূত ফল।

বীগ্‌লে কাজ শেষ ক'রে ১৮৩৩ খৃঃ থেকে তিনি ভাবতে লাগলেন। সেই সময় তিনি বহু শ্রমসাধ্য পরীক্ষাও করতে লাগলেন। পাখীদের কঙ্কাল জোড়া দিয়ে গোটা পাখীর কাঠামো করলেন, পায়রা নিয়ে প্রজননের পরীক্ষা করলেন; বীজের ব্যাপার নিয়েও দেখলেন। আর, বিদ্বান্ বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা ও তথ্যানুসন্ধান করতে লাগলেন। লায়েল ভূবিজ্ঞানী এবং হুকার ও গ্রে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী, এঁরা ডারুইনের বন্ধু ছিলেন। ১৮৪২ খৃঃ ৩৫ পৃষ্ঠায় মোটামুটি একটা খসড়া তিনি তৈরী করলেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' সম্বন্ধে। তবু সাবধান, প্রকাশ করলেন না। এ তো আর সাধারণ জিনিস নয়, ভেবে চিন্তে আট ঘাট বেঁধে বলতে হবে। অবশেষে ১৮৫৬ খৃঃ লায়েল ধরলেন যে এটা প্রকাশ করা হোক—আবার তিনি ভাল ক'রে লিখতে লাগলেন। ১৮৫৭ খৃঃ এক সভায় সেটি পড়া হ'ল। এবার বই,—বই সম্বন্ধেও তিনি এত বিনয়ী ও ভীরু ছিলেন যে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "যখন ভাবি যে কেউ কেউ অনেক বছর ধরে একই বিষয়ের সাধনা ক'রে পরে সত্য সম্বন্ধে অর্বাচীন তত্ত্ব খাড়া ক'রে গেছেন, আমার ভয় হয় আমিও না সেই একদেশদর্শীদের একজন হয়ে যাই"।

তাঁর বই নিয়ে যখন তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা—তখন তিনি কিন্তু নীরব ছিলেন; নীরবে তাঁর মতবাদের শক্তি বৃদ্ধি ক'রে যাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানেও গবেষণা করতেন—'অর্কিডের বংশবৃদ্ধি' বই লেখেন ১৮৬২ খৃঃ। দু' বৎসর পরে Movements and Habits of Climbing plant (লতার স্বভাব ও গতি) নামে আর এক খানা বই লেখেন।

১৮৬৮ খৃঃ তিনি তার বিবর্তনবাদের বৃদ্ধি ও সংযোজনা করেন—Variation of Animals and Plants under Domestication, (গৃহপালিত পশুর ও উদ্যানজাত লতার পরিবর্তন) তারপর Descent of Man (মানবের অবতরণ) বেরুল ১৮৭১ খৃঃ। এতে এনথ্রপয়েড গ্রুপ প্রাণী থেকে মানুষের আবির্ভাব হয়, বলেছেন তিনি।

১৮৭২ খৃঃ Expression of the Emotion in Man and Animals (মানব ও পশুর আবেগের প্রকাশ) বের হয়। জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি উদ্ভিদ্ সম্বন্ধীয় রচনাই লেখেন বেশী। ১৮৮২ খৃঃ এই অমর বিজ্ঞানী দেহত্যাগ করেন।

উডিপি ও মূকাম্বিকায়

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

মহীশূর হইতে প্রায় একশত ষাট মাইল দূরে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম সীমায় আরব সাগরের পূর্বতীরে মাঙ্গালোর শহরটি অবস্থিত। বাসে পশ্চিম ঘাট পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া মাঙ্গালোর আসিতে হয়, এই পথের মাঝে কুর্গের প্রধান শহর মাড়াকেরি বা মাড়কারা। এখানে বাস বদল করিতে হয়। মাড়কারা হইতে মাঙ্গালোর প্রায় পঁচাত্তর মাইল। এখানে মঙ্গলাদেবীর পুরাতন মন্দির আছে। দেবীর নাম হইতেই এই শহরের নাম হয় মঙ্গলুর বা মাঙ্গালোর। শহরটি দক্ষিণ-কানাড়া জেলায়, নেত্রাবতী ও গুরপুর নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত; লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। ভারতের মধ্যে ইহা একটী বিশিষ্ট বন্দর, বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং ইতিহাসেও প্রসিদ্ধ স্থান। টীপুসুলতান কয়েকবার আক্রমণ করিবার পর ইহা অধিকার করেন, তাঁহার নির্মিত দুর্গও টীপুকুয়া নামে একটি ইন্দারা আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে? এই শহরের মাঝে একটী ছোট পাহাড়ে মঞ্জুনাথ শিবের মন্দির অবস্থিত। এই পাহাড়ের নামেই গ্রামের নাম।

মন্দিরের চারিদিকে স্বাভাবিক জলধারা আছে। তন্মধ্যে একটীতে সব সময়েই জলধারা সমান ভাবে বহিতেছে। মন্দিরের সম্মুখে এই জল একটী কুণ্ডে পরিণত হইয়াছে, কুণ্ডটির চারিদিক পাথরে বাঁধানো। যাত্রী-গণ ইহাকে গঙ্গার সমতুল্য মনে করিয়া স্নান করত শিবের পূজার্চনা করে। এই জলে শিবের অভিষেকও হইয়া থাকে। পাহাড়ের অপর দিকে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক গুহা আছে, উহাদের নাম পাণ্ডব-গুহা। প্রবাদ এই যে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস-কালে এই সব গুহায় তপস্যা-রত থাকিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। পাশেই মায়া মচ্ছীন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের আশ্রম আছে। ইহার নাম 'যোগী-মঠ'। এই পাহাড়ের শিরোদেশ হইতে একদিকে সমগ্র শহরের, অন্যদিকে অকূল সমুদ্রের ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। এখান হইতে কফি, গোলমরিচ, দারুচিনি ও কাজুবাদাম বিদেশে রপ্তানী হয়। এ অঞ্চলে অনেক তীর্থ ও দর্শনীয় স্থান আছে।

কয়েক শতাব্দীর পূর্বে বিষ্ণুবর্ধন নামে জনৈক রাজা একটী যজ্ঞ সমাপন করিবার মানসে উত্তর ভারত হইতে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, মিথিলা, সরস্বতীর উপকূল ও গৌড় (বাঙ্গলা) প্রভৃতি দেশ হইতে গিয়াছিলেন। কার্য-সমাধার পর সরস্বতী উপকূলবাসিগণ ও গৌড়দেশীয় পণ্ডিত-গণ এই অঞ্চলেই বসবাস করিতে থাকেন। অন্য পণ্ডিতগণ আপন আপন দেশে ফিরিয়া যান। সরস্বতী-উপকূলবাসিগণ 'সারস্বত' ও গৌড়দেশীয়-গণ 'গৌড়সারস্বত' নামে অভিহিত হন। এখনও গৌড়সারস্বতদের ও বঙ্গবাসীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই দুই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণই বেশী দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীও অনেক আছে।

* * *

মাঙ্গালোর হইতে খোল্লা পথে কারকল প্রায় তেত্রিশ মাইল। বাস রোজ যাতায়াত করে। ইহা জৈন ধর্মাবলম্বীদের একটী বিশেষ তীর্থস্থান। এখানেও গোমতেশ্বরের বিরাট নগ্ন পাথরের মূর্তি অবস্থিত, উচ্চতায় বিয়াল্লিশ ফুট। শ্রবণবেলগোলার অনুকরণেই এই মূর্তি নির্মিত হইয়াছে। বহুদূর হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে উড়িপি বাসে চার মাইল মাত্র। ভারতের মধ্যে ইহা একটী বিশেষ তীর্থ স্থান। দুইটী কারণে এই পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য বর্ধিত হইয়াছে। প্রথম—এখানে শ্রীকৃষ্ণের পুরাতন মন্দির আছে, দ্বিতীয়—ইহা মধ্বাচার্যের জন্মস্থান। মধ্বাচার্য দ্বৈত মত-বাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জগৎকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সাত আটশত বৎসর পূর্বে এক ভট্ট পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি সংসার ত্যাগপূর্বক দ্বৈতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যে বাগ্মিতায় ও প্রতিভায় সকলেই মোহিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা গ্রহণ করিতে থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি বায়ুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

একদিন সকালবেলা তিনি সমুদ্রতীরে বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন। সেই সময় দেখিলেন হঠাৎ ঝড় উঠিয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত একটী জাহাজকে প্রায় জলমগ্ন করিয়াছে। নাবিক ও যাত্রী-গণ অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত। প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সকলেই অপেক্ষমাণ। এই দুর্ঘটনা দেখিয়া আচার্য বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

তাড়াতাড়ি তিনি তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি ঝড়ের অনুকূলে ধরিয়া সমাধিমগ্ন হইলেন। কাপড়খানা হাওয়ায় উড়িতে লাগিল, ধীরে ধীরে ঝড় থামিয়া গেল। আচার্য যোগবলে জাহাজটীকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। জাহাজ সমুদ্র-উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইল। নাবিক এই অলৌকিক ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিল না, অনতিদূরে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাইল, হাওয়ার অনুকূলে একটী কাপড় ধরিয়া একজন যোগীপুরুষ ধ্যানরত আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নাবিক বুঝিতে পারিল যে, এই যোগীপুরুষই জাহাজকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে।। নাবিক ঐ মহান্ যোগীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বলিল, প্রভো। আপনিই আমাদের সকলের জীবন দান করিয়াছেন। জাহাজের সমস্ত সম্পত্তিই আপনার শ্রীচরণযুগলে নিবেদন করিলাম, দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। আচার্য উহা হইতে মাত্র দুই খণ্ড গোপীচন্দন ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তিনি জানিতেন এই গোপীচন্দনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের অঙ্গরাগ করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিই উডিপির মন্দিরে পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আর সমুদ্রতীরে মালপেতে বেদভাণ্ডেশ্বর মন্দিরে বলরাম পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আচার্যের আটজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের চারিদিকে আটটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। মঠবাসীরাই ভগবানের পূজার্চনার সব রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রতি দুই বৎসর অন্তর পৌষ মাসের শেষ ভাগে 'পর্য্যায়' নামে একটী বিরাট উৎসব হয়। ঐ সময় ভগবানের পূজার্চনার পালা বদলাইয়া যায়। অদ্যাবধি সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

* * *

কোল্লুর বা কুল্লুর একটী পৌরাণিক তীর্থস্থান। ম্যাঙ্গালোর হইতে প্রায় সাতানব্বই মাইল। এই পবিত্র তীর্থস্থান বাইন্দুর হইতে বাসপথে—নিবিড় জঙ্গলে অবস্থিত। উডিপি হইতে গাঙ্গুলী চব্বিশ মাইল। পথে দুইটী নদী ও একটী খাড়ি অতিক্রম করিতে হয়। সমুদ্রের উপকূলে উপকূলে সামুদ্রিক হাওয়ায় দোলায়মান দীর্ঘাকৃতি সারি সারি নারিকেল বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া ধূলি উড়াইয়া বাস চলিয়া থাকে। গাঙ্গুলী হইতে একটী নদী অতিক্রম করিয়া বাইন্দুর, সেখান হইতে কুল্লুর বারো মাইল। এই পথের মধ্যে লোকজনের বসতি নাই বলিলেই চলে, এমনকি চাষ-আবাদও নাই। ঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়া বাস চলিয়া থাকে। ইহারই একটী স্থানের নাম অম্বাবন, এখানেই দেবীর মন্দির অবস্থিত। পাথরের অতি পুরাতন মন্দির; চারিদিকে পাথরের উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। গর্ভমন্দিরে একটী লিঙ্গমূর্তি আছে, বেদীতে চতুর্ভুজা পদ্মাসনা দেবী উপবিষ্টা। পাথরের মূর্তি প্রায় আড়াই ফুট উঁচু, নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া দেবী নিত্যপূজা গ্রহণ করিতেছেন। আচার্য শঙ্কর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাঁহার তপস্যার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পাশেই একটী ছোট পাহাড়ী নদী কুলু কুলু রবে বহিতেছে। অপর কূলে পূজারীদের বাসগৃহ। এইস্থানে মালাবার দেশের অন্তর্গত নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণ দেবীর পূজার্চনা করেন। মাঘ মাসে এখানে কয়েকদিন যাবৎ একটী বিরাট মেলা হয়, সেই সময় বহু যাত্রী মায়ের দর্শনার্থে আসিয়া থাকে।

এই তীর্থের একটী ইতিবৃত্ত আছে। পুরাকালে এই জনমানবহীন নিবিড় বনে মুনিঋষিগণ তপস্যায় রত থাকিতেন, মূকাসুর নামে এক দৈত্য আসিয়া তাঁহাদের তপস্যার ব্যাঘাত করিত।

তাহার অত্যাচারে ঋষিগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কোন প্রকারেই তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় না দেখিয়া অগত্যা শ্রীকোলমুনি পার্বতীর সকাশে উপস্থিত হইয়া দেবীর পাদপদ্ম বন্দনা করত অসুরের অত্যাচারের কথা দেবীকে বলিলেন। দেবী দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থে এখানে আসিয়া মূকাসুরকে নিহত করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। দেবী ঋষিগণকে বলিলেন, এই নির্জন নিবিড় বনে আমি অবস্থান করিব। তোমরা আমার নিত্য পূজার্চনা করিবে। এই লিঙ্গের নাম "উদ্ভব লিঙ্গ"। ইহার বিশেষত্ব এই যে লি ঙ্গর চারিদিকেই একটী স্বর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। অম্বাবনে মূকাসুরকে বধ করিয়াছেন বলিয়া দেবী 'মূকাম্বিকা' নামে এখানে পূজা গ্রহণ করিয়া জগতের কল্যাণ করিতেছেন।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য 'মূকাম্বিকা'-পুরাণান্তর্গত শ্রীকোলপুর-ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের সার সংক্ষেপ এখানে সন্নিবেশিত হইল :

তৃতীয় মনু উত্তমের সময় সহ্যাদ্রি পর্বতের নিকট মহারণ্যপুরে (বর্তমানে উত্তর কানাড়ার অন্তর্গত গোকর্ণ তীর্থের ৮০।৯০ মাইল দক্ষিণে) দীর্ঘকাল ধরিয়া কোল নামে এক মহামুনি কঠোর তপস্যা করিতেন। মুনি এইখানে সিদ্ধি লাভ করিলে মহারণ্যপুর কোলপুর (এখন কোল্লুর) নামে বিখ্যাত হয়। মুনি সেখানে শিবাজ্ঞায় একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। দেবাদিদেব তাঁহাকে আরও বলেন, চতুর্থ মনুর সময় এইস্থানে শিবের সহিত মহালক্ষ্মীরূপিণী শক্তি মিলিত হইয়া চিরদিন বাস করিবেন্।

ইতিমধ্যে কামাসুর উৎপন্ন হইয়া ভৈরবীর বরে অজেয় হইয়া উঠে, এবং কোল-মুনিকে মহারণ্যপুর হইতে বিতাড়িত করিয়া সে নিজেই সেখানে বাস করিতে থাকে। তাহার অত্যাচারে কেহ সেখানে যাইতে সাহস করিত না। ইহা দেখিয়া ত্রিপুরা-ভৈরবী অসুরকে ভয় দেখাইলেন। সেই ভয়ে কামাসুর মূকাদ্রি বনে তপস্যা আরম্ভ করিল।

চতুর্থ মনু তাপসের সময় মহিষাসুর দৈত্য কোলপুর অধিকার করিল। কোলমুনি তাহা জানিতে পারিয়া তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া শিব ও বিষ্ণুর বর লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবতাগণও মহিষাসুর পীড়িত হইয়া উদ্ধার-কামনায় শিব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। দৈত্যের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা সকলে স্ব স্ব শক্তি কেন্দ্রীভূত করিলেন, তাহাই মহালক্ষ্মীরূপ ধারণ করিল। দেবী তালুতে জিহ্বা লাগাইয়া বিকট শব্দ করিলেন, ইহা শুনিয়া মহিষাসুর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

এদিকে শিব ও বিষ্ণু কোল-মুনি দ্বারা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ স্থানে শ্রীচক্র স্থাপন করিলেন। শ্রীচক্রে সকল দেবতা শক্তির সমষ্টি, শ্রীচক্র মহালক্ষ্মীর প্রতীক।

দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধের পর মহিষাসুর নিহত হইলে কোলমুনির কাতর প্রার্থনায় মহালক্ষ্মী শিব-লিঙ্গাকৃতি শ্রীচক্রে বাস করিতে লাগিলেন। যেহেতু এই দিব্য লিঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতির একত্র সমাবেশ, সেহেতু ইহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। এই একটি লিঙ্গ-দর্শনে সহস্র লিঙ্গ দর্শনের ফল হয়।

দেবতারা মহালক্ষ্মীর নিকট প্রার্থনা করেন, তপস্যারত কামাসুর যেন মূক হইয়া যায়, তাহা হইলে সে আর শিবের নিকট বর চাহিতে পারিবে না, এবং তাহাদের বিপদাশঙ্কাও দূরীভূত হইবে। দেবী দেবতাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, কামাসুর মূক হইয়া গেল এবং মূকাসুর নামে পরিচিত হইল।

তপস্যা-সিদ্ধ মূকাসুর মূক হওয়ার জন্য অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল এবং স্বর্গ ও মর্ত্যকে ত্রাসিত করিতে লাগিল। প্রতিকারের জন্য দেবতারা আবার পার্বতীর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। দেবী জ্যৈষ্ঠের শুক্লাষ্টমীতে গদাঘাতে মূকাসুরের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া কোল-পুরের শ্রীচক্রে দিব্যলিঙ্গের সহিত মিলিত হন। মূকাসুরকে বধ করার জন্য দেবী এখানে মূকাম্বিকা নামে বিখ্যাত। মূকাম্বিকা দেবীর উপাসনা করিলে দেবী ভক্তদিগের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

'গীতা জ্ঞানেশ্বরী'

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

যে চোর সারা বিশ্বই চুরি করিয়া লইয়া যায় তাহার সন্ধান কে করিবে? ঠিক ঐ প্রকার যাহা অবর্ণনীয় শুদ্ধ অবস্থা তাহা আমিই, এই ভাবে কৈবল্যপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার উপাধিরহিত শুদ্ধ স্বরূপ কি করিয়া জড় ও সজীব —সমস্ত বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহাই নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করিলেন, আকাশে চন্দ্রোদয় হইলে ক্ষীরসমুদ্রে যেমন তাহাব প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি অর্জুনের অন্তঃকরণে বৈকুণ্ঠনাথের উপদেশের প্রতিবিম্ব পড়িল (অর্জুনের ও বৈকুণ্ঠনাথের মনে 'বোধ' সমানভাবে বিরাজ করিতে লাগিল) জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই এই যে, যেমন যেমন জ্ঞান হইতে থাকে তদনুপাতে জানিবার স্পৃহাও বাড়িতে থাকে, এইজন্য (আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু) অনুভবসিদ্ধ অর্জুন কহিলেন, 'হে দেব, আপনার উপাধিরহিত স্বরূপের যে বর্ণনা করিলেন, এখন স্পষ্ট ভাষায় সেই স্বরূপের কথা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।' দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন, তুমি ভালই বলিয়াছ; হে অর্জুন আমিও নিরন্তর প্রেম সহকারে এই কথাই বলিতে চাই, কিন্তু তোমার মত প্রশ্নকারী (তত্ত্বজিজ্ঞাসু) শ্রোতাও জোটে না, আজ তোমাকে পাইয়া আমার মনোরথ সফল হইল, কারণ তুমি প্রাণ ভরিয়া এইভাবে আমাকে স্পষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ, অদ্বৈতপ্রাপ্তির পর যে নির্মলস্বরূপের অনুভূতি হয় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তুমি আমাকে সুখী করিয়াছ। (৪৫০)

দর্পণ কাছে আনিলে যেমন তাহার মধ্যে আপনার চক্ষু দেখা যায়, সেই দর্পণের ন্যায় প্রশ্নকুশল-শিরোমণি তোমাকে পাইয়াছি; হে সখা অর্জুন, তুমি অজ্ঞানতাবশত প্রশ্ন করিতেছ কিংবা আমি তোমাকে শিখাইতে বসিয়াছি—এমন নহে। এই কথা বলিয়া ভগবান অর্জুনকে আলিঙ্গন করত তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন: "ওষ্ঠ দুইটি হইলেও বাক্য একই, চরণ দুইটি হইলেও চলন একই, তেমনি তোমার প্রশ্ন করা এবং আমার বলা—এ-দুটিও একই; তুমি ও আমি একই অর্থে (অভিপ্রায়ে) দৃষ্টি রাখিয়াছি, সুতরাং এখন প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতা দুই এক হইয়া গিয়াছে। এইভাবে বলিতে বলিতে ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভগবান অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া ঐভাবে কিছুক্ষণ রহিলেন, পরে চকিত হইয়া কহিলেন, "এত প্রেম ভাল নহে; ইক্ষুর রস হইতে গুড় তৈয়ারী করিবার সময় তাহাতে কিঞ্চিৎ হীনক্ষার মিশ্রিত করিতে হয়, তেমনি প্রেমের আবেশ এই সময় দূর না করিলে আমাদের সংবাদ-সুখের রসালত্ব নষ্ট হইবে। অর্জুন, তুমি নর এবং আমি নারায়ণ, প্রথম হইতেই আমাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু আমার এই প্রেমের বেগ (আবেশ) আমার অন্তরের মধ্যেই থামাইয়া দিতে হইবে। এই কথা ভাবিয়াই সহসা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'হে বীরেশ, তুমি এ কি প্রশ্ন করিলে?' এদিকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, একথা শুনিয়া তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসিল এবং তিনি প্রশ্নাবলীর উত্তর শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গদগদ ভাষায় অর্জুন বলিলেন, 'হে দেব, আপনি নিরুপাধিক স্বরূপের কথা বলুন।' ইহা শুনিয়া শার্ঙ্গধর শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিবার জন্য প্রথমতঃ উপাধির দুই প্রকারে বর্ণনা আরম্ভ

করিলেন, নিরুপাধিক স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু উপাধির কথা এখানে কেন বলিতেছেন—যদি কাহারও মনে এই শঙ্কা জাগে, তাহার উত্তর এই যে ঘোল হইতে সারাংশ বাহির করাকেই মাখন তোলা বলে, খাদ জ্বালাইয়া ফেলিলে পর সোনা খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। শৈবাল হাত দিয়া সরাইলে পর পানীয় জল পাওয়া যায়, মেঘ সরিয়া গেলেই আকাশ (অবশিষ্ট থাকে) নির্মল দেখায়। উপরের ভূষি ঝাড়িয়া আলাদা করিলে কি শস্যের কণা পাইতে কষ্ট হয়? তেমনি বিচার দ্বারা উপাধিযুক্ত বস্তুর উপাধির অন্ত হইলেই 'নিরুপাধিক কি?' তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না, কুলস্ত্রীকে পতির নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও নাম বলিলে সে যদি চুপ করিয়া থাকে, তবে যেমন তাহাই তাহার পতির নাম বুঝিতে হয়, তেমনি যাঁহার বর্ণনা করিতে বাণী শুদ্ধ হয়, সেই অবর্ণনীয় বস্তুই নিরুপাধিক শুদ্ধস্বরূপ। তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না, এই কথা বলিলেই নিরুপাধিক স্বরূপের বর্ণনা করা হয়, সুতরাং লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে উপাধির বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, প্রতিপদের চন্দ্রের সূক্ষ্মরেখা দেখিবার জন্য যেমন বৃক্ষের শাখাই সহায়ক, তেমনি এই সময় উপাধির আলোচনাই উপযোগী হইল। (৪৭০)

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

ভগবান কহিলেন: "হে সব্যসাচী, এই সংসাররূপ নগরের বাসিন্দা খুবই কম, শুধু দুইটি পুরুষ এখানে বাস করে। সারা আকাশে দিন ও রাত্রি—এই দুইটি দেখা যায়, এই সংসার-রূপ রাজধানীতেও সেইরূপ শুধু দুইটি পুরুষ দৃশ্যমান, অন্য একটি তৃতীয় পুরুষও আছেন, যিনি এই দুটির নামও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার উদয় হইলে তিনি নগর সমেত এই দুইটিকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। পরন্তু এসব কথা থাক, এখন এই দুইটি পুরুষের কথা শুন, যাহারা এই সংসার-গ্রামে বাস করিতে আসিয়াছে, ইহাদের মধ্যে একটি তো অন্ধ, পাগল, মূঢ ও পঙ্গু, অপরটি সর্বাঙ্গে হৃষ্ট পুষ্ট, একই গ্রামে থাকার জন্য উভয়ের মধ্যে সংসর্গ ঘটিয়াছে, ইহাদের একটির নাম 'ক্ষর', অপরটিকে 'অক্ষর' বলা হয়। ইহারা দুইটিতে এই সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছে, এখন 'ক্ষর' কোন্‌টি এবং 'অক্ষরে'র লক্ষণ কি—এই সমস্ত পূর্ণভাবে বিবেচনা করিয়া তোমাকে বলিতেছি। হে ধনুর্ধর, মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণের অঙ্কুর পর্যন্ত ছোট বড় চরাচর বস্তু যাহা কিছু এই সংসারে আছে, এক কথায়, মন ও বুদ্ধির গোচর যাহা কিছু আছে, যে সকল বস্তু পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, যাহাদের নাম ও রূপ আছে, তাহারা গুণত্রয়ের আয়ত্তের মধ্যে পড়ে। (৪৮০)

যে সোনা হইতে আকৃতি-সম্পন্ন মুদ্রা তৈয়ারী হয়, যে কড়ি দ্বারা কালরূপী জুয়াড়ীর খেলা চলে, বিপরীত জ্ঞান বা মোহ হইতে যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, যাহা কিছু প্রতিক্ষণে উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয়, ভ্রান্তিরূপ জঙ্গল হইতে যে সৃষ্টি রূপ গ্রহণ করে,—আর অধিক কি বলিব—যাহাকে লোকে 'জগৎ' বলে, যে অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে চব্বিশতত্ত্ব দ্বারা নির্মিত দেহক্ষেত্র বলা হইয়াছে। এই পূর্ববর্ণিত বিষয়ের আর কত বর্ণনা করা যায়? এখনই সংসার-বৃক্ষের রূপকের দ্বারা যাহার বর্ণনা করিয়াছি, তাহাই তাহাদের কল্পিত আবাসস্থান, এবং চৈতন্যই স্বয়ং এইসব আকার ধারণ করিয়াছেন। কূপের জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া সিংহ যেমন মনে করে—উহা আর একটি সিংহ এবং ক্রোধে গর্জন করিয়া ঐ কূপে লাফাইয়া

পড়ে ; কিংবা কেমন জলের অভ্যন্তরস্থ আকাশ-তত্ত্বের উপর আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি (মায়ার উপাধি দ্বারা) অদ্বৈত চৈতন্ত দ্বৈতরূপ (জগদাকার) ধারণ করে, হে অর্জুন, ইহার পর সাকার নগর কল্পনা করিয়া আত্মা আপনার মূল স্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং ঐ বিস্মৃতিতে নিদ্রা যায়; স্বপ্নে শয্যা দেখিয়া যেমন কেহ তাহাতে নিদ্রা যায়, তেমনি আত্মাও ঐ কল্পিত নগরে নিদ্রিত হয়। (৪৯০)

পরে নিদ্রার আবেশে 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' বলিয়া চিৎকার করে এবং অহংভাবে আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রার মধ্যে কথা বলিতে থাকে 'এই আমার পিতা, এই আমার মাতা', 'আমি গৌর-বর্ণ,' 'আমি হীন, আমি পূর্ণ' 'এই পুত্র, বিত্ত, কান্তা—ইহারা কি আমার নহে ?' এইরূপে স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া ভবস্বর্গের অরণ্যে দৌড়িতে থাকে। হে অর্জুন, এই চৈতন্যকেই 'ক্ষর' পুরুষ বলা হয়, যাহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলে যাহার অব-স্থাকে 'জীব' আখ্যা দেওয়া হয়, সে স্বয়ং আপ-নাকে ভুলিয়া সর্বভূতে সঞ্চারিত হয়। সেই আত্মাকে (জীবাত্মাকে) 'ক্ষর' পুরুষ নাম দেওয়া হয়, সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া আছে বলিয়া তাহাকে 'পুরুষ' বলে, আর দেহনগরে বাস করে বলিয়াও তাহার নাম 'পুরুষ', আর উপাধিযুক্ত বলিয়া বৃথাই তাহাকে 'ক্ষরতা' বা নশ্বরতার অপবাদ দেওয়া হয়; তরঙ্গায়িত জলের উপর চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব যেমন আন্দোলিত হইতে দেখা যায়, তেমনি উপাধির বিকারহেতু আত্মাকেও ঐরূপ দেখায়; জলের প্রবাহ যখন শুকাইয়া যায় উহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের প্রকাশও লুপ্ত হয়, তেমনি উপাধির নাশ হইলে উপাধিজনিত বিকারও লুপ্ত হয়; এইভাবে উপাধির সংযোগেই এই পুরুষ 'ক্ষণিকত্ব' (ক্ষণভঙ্গুরতা) প্রাপ্ত হয় এবং এই হ্রাসের জন্য ইহাকে 'ক্ষর' বলে। (৫০০)

এই প্রকার সমস্ত জীব-চৈতন্ত (জীবাত্মা)কে 'ক্ষর' পুরুষ বলিয়া জানিবে; এখন 'অক্ষর' পুরুষ কাহাকে বলে তাহাই তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি : হে ধনুর্ধর, 'অক্ষর' নামীয় যে দ্বিতীয় পুরুষ আছেন, তাঁহাকে 'মধ্যস্থ' (বা সাক্ষী)-রূপে দেখিবে যেমন পর্বতের মধ্যে মেরু—পৃথ্বী, পাতাল ও স্বর্গের ভেদে যেমন মেরু তিন প্রকারের হয় না, তেমনি এই 'অক্ষর' পুরুষ, তিনি জ্ঞান বা অজ্ঞানে লিপ্ত হন না; শুদ্ধজ্ঞানে তিনি একত্ব লাভ করেন না, বিপরীত জ্ঞান তাঁহাতে দ্বৈতভাব আনে না—এই দুই স্থিতির মধ্যে যে নিখিলভাব তাহাই তাঁহার স্বরূপ, মাটির মাটিত্ব নিঃশেষ হইলে, এবং তাহা দ্বারা ঘট-ভাণ্ডাদি তৈয়ারীর পূর্বে মৃৎপিণ্ড যেমন একটি মধ্যস্থ অবস্থা ঐ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় এই 'অক্ষর' তেমনি পুরুষের মধ্যস্থ স্থিতি, সাগর শুকাইলে তাহাতে তরঙ্গও থাকে না, জলও থাকে না, তেমনি মধ্যস্থ নিরাকার যে স্থিতি, হে পার্থ, ইহা ইহা সেই নিদ্রার মত অবস্থা, যাহাতে জাগৃতি চলিয়া যায় পরন্তু স্বপ্নাবস্থা আসে না; যখন বিশ্বাভাস মিটিয়া যায় কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না, সেই (মধ্যস্থ) 'কেবল' দশারই নাম 'অক্ষর', ষোলকলা বিরহিত অমাবস্যার চন্দ্রের যে রূপ (জ্ঞান ও অজ্ঞান-বিরহিত) এই এই অক্ষরের রূপও তেমনি জানিবে। সর্বো-পাধির বিনাশ হইলে জীবদশা তাহাতে লীন হয়, যেমন ফল হইলে পর বৃক্ষ তাহাতেই বীজরূপে সমাবিষ্ট হয়, (৫১০)

তেমনি উপাধিযুক্ত জীব সমস্ত উপাধি সহ যেখানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে তাহাকেই অব্যক্ত বলে, গাঢ় অজ্ঞানরূপ সুষুপ্তিকে 'বীজ-ভাব' বলে, স্বপ্ন ও জাগৃতি তাহারই 'ফলভাব'। বেদান্তে যাহাকে 'বীজভাব' (বা বীজস্থিতি) বলিয়াছে সেই স্থিতিই 'অক্ষর', পুরুষের

স্থান, সেখান হইতে বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জাগৃতি ও স্বপ্ন বিস্তার করে এবং বুদ্ধির (নানা তর্ক-বিতর্কের) অরণ্যে সঞ্চরণ করে; আর হে কিরীটী, সেখান হইতে জীবত্ব বিশ্বাভাসের সহিত উঠে এবং লয়প্রাপ্ত হয়, সেখানে এই উভয় ভেদস্থিতি (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) আসিয়া মিলিত হয়, সেই স্থিতিই 'অক্ষর' পুরুষ। অপরটি 'ক্ষর' পুরুষ বলিয়া জীব দেহধারণ করিয়া স্বপ্ন ও জাগৃতির খেলা খেলিতেছেন। এই দুই অবস্থা যেখান হইতে উৎপন্ন হয়, কিংবা অজ্ঞানঘন সুষুপ্তি বলিয়া যাহার খ্যাতি তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কিছু নিম্নের স্থিতি, আর হে বীর, এই জাগৃতি ও স্বপ্নাবস্থা না থাকিলে সে স্থিতিকে সত্যই 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলা যাইত, পরন্তু যে নিদ্রারূপী গগনে প্রকৃতি ও পুরুষ রূপ দুইটি মেঘের উৎপত্তি হয় ও যাহাতে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এই উভয়ের স্বপ্নাভাস হয়, মোট কথা এই অধঃশাখা যে সংসাররূপ বৃক্ষ তাহার মূলেই 'অক্ষর' পুরুষের স্বরূপ। (৫২০)

ইঁহাকে পুরুষ কেন বলা হয়? ইনি মায়াপুরীতে শয়ন করিয়া পূর্ণভাবে নিদ্রা যান বলিয়াই ইঁহাকে পুরুষ বলে, আর যে সুষুপ্তির মধ্যে বিকারের খেলা বা বিপরীত জ্ঞানের ভাস নষ্ট হয় তাহাই ইঁহার স্বরূপ, এইজন্য ইনি স্বয়ং নষ্ট হন না এবং জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু ইঁহাকে নাশ করিতে পারে না, সেইজন্য বেদান্তের মহাসিদ্ধান্তে ইনি 'অক্ষর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিকরিয়াছেন, সার কথা এই যে জীবরূপী কার্যের যে কারণ এবং মায়ার সঙ্গই যাঁহার লক্ষণ তাঁহাকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়া জানিবে।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭

বিপরীতজ্ঞানে এই বিশ্বে জাগৃতি ও স্বপ্ন এই যে দুইটি অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহা গাঢ় অজ্ঞানে লীন হইয়া যায়; অজ্ঞান যখন জ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া যায় এবং জ্ঞান আসিয়া অজ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়ায় তখন অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে জ্বালাইয়া স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি জ্ঞান অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া জ্ঞাতাকে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত হয়, এই অবস্থায় জ্ঞানের অতিরিক্ত যাহা কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে তাহাই 'উত্তমপুরুষ', যাহাকে তৃতীয় পুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত দুইটি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র।

হে অর্জুন, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি হইতে জাগৃতি যেমন এত সম্পূর্ণ একটি পৃথক্ অবস্থা মনে হয় (৫০০) সূর্যমণ্ডল—যেমন সূর্যকিরণ ও মৃগজল হইতে হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনি 'উত্তমপুরুষ'ও অন্য দুইটি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বৃহত্তর। শুধু ইহাই নহে, কাষ্ঠে নিহিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন, 'উত্তমপুরুষ'ও তেমনি 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' হইতে ভিন্ন। কল্পান্তে একার্ণবে জল বাড়িয়া যেমন আপনার সীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত নদনদীকে এক করিয়া দেয়—তেমনি যাহার সম্মুখে স্বপ্ন সুষুপ্তি বা জাগৃতি—কোনও অবস্থারই অস্তিত্ব থাকে না। যেমন প্রলয়ের সংহার-তেজ দিন ও রাত্রিকে গ্রাস করে, যাহাতে অদ্বৈত বা দ্বৈতাভাস হয় না, হওয়া না হওয়ার বোধও হয় না এবং যাহাতে অনুভব শুদ্ধ হইয়া ডুবিয়া যায়, এই যে একটি তত্ত্ব তাহাকে 'উত্তমপুরুষ' বলিয়া জানিবে, যাহাকে ইহলোকে পরমাত্মা বলা হয়। হে পাণ্ডুসুত, পরমাত্মায় লীন না হইয়া জীবত্ব আশ্রয় করিয়াই তাহাকে এইভাবে (উত্তমপুরুষ বলিয়া) অভিহিত করা যায়—যেমন ডুবিয়া যাইবার বার্তা (সংবাদ) শুধু সেই বলিতে পারে যে তীরে দাঁড়াইয়া থাকে। ঠিক ঐ প্রকার, হে কিরীটী, বেদ যতক্ষণ বিবেকের তীরে দাঁড়াইয়া থাকে, 'পরাবর' ততক্ষণ পরাবরের (এপার ও ওপারের) কথা বলিতে

সক্ষম হয় ; সেইজন্ত 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' এই দুইটি পুরুষকে 'অবর' (এপার) বলে, ও আত্মস্বরূপকে পরমাত্মা বা 'পর' (ওপার) এই আখ্যা দেওয়া হয় ; এইভাবে হে অর্জুন, 'পরমাত্মা' এই শব্দের দ্বারা 'পুরুষোত্তম'কেই বুঝাইতেছে—ইহাই জানিয়া রাখ। (৫৪০)

বস্তুতঃ যেখানে না বলাই বলার সমান, কিছু না জানাই জ্ঞান, না হওয়াই হওয়ার সমান সেই যে বস্তু, 'সোঽহম্'-ভাবই যেখানে লোপ পায়—সেখানে বক্তা ও বক্তব্য এক হইয়া যায়, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য লয়প্রাপ্ত হয়। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যবর্তী প্রভা যদি দৃষ্টি-গোচর না হয়, তবে একথা বলা যায় না যে ঐ প্রভাই নাই বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা নাক ও ফুলের মধ্যে যে সুগন্ধ তাহা দেখা যায় না বলিয়া একথা বলা ঠিক নয় যে সুগন্ধই নাই, তেমনি দ্রষ্টা ও দৃশ্য লুপ্ত হইলে ইহা 'অমুক বস্তু' তাহা কে বলিবে? অনুভব দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহাই তাহার স্বরূপ; প্রকাশ করিবার বস্তু (প্রকাশ্য) বিনাই সে স্বয়ংপ্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ করিবার পদার্থ বিনাই যে স্বয়ংনিয়ন্তা (ঈশ্বর), যাহা আপনার স্বরূপেই আপনি অবস্থান করে তাহা আপনারই অবকাশে আপনি ব্যাপ্ত হইয়া আছে। যাহা নাদব্রহ্মকে শুনিবার নাদ, স্বাদ গ্রহণ করিবার স্বাদ, ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবার আনন্দ, যাহা পূর্ণতার পরিণাম; পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম, বিশ্রামের বিশ্রামস্থান, যাহা সুখকে সুখ দেয়, তেজকে তেজপ্রাপ্ত করায়, শূন্তকে মহাশূন্তে লয়প্রাপ্ত করে, যাহা বিকাশকেও পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট থাকে—গ্রাসকেও গ্রাস করে, তাহা বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর। (৫৫০)

শুক্তি যেমন রৌপ্য না হইয়া অজ্ঞানের দৃষ্টিতে রৌপ্যের প্রতীতি আনয়ন করে, কিংবা অলঙ্কারের রূপে স্বর্ণ যেমন স্বর্ণত্ব ত্যাগ না করিয়াও স্বর্ণত্ব লোপের ভাস আনে, তেমনি বিশ্ব না হইয়াও যাহা বিশ্বাভাসের আধার হয়, অথবা জল বা জলে উৎপন্ন তরঙ্গের মধ্যে যেমন কোনও ভেদ নাই, তেমনি তিনি এই দৃশ্যমান জগৎরূপে আপনাকেই প্রকাশ করিতেছেন। হে বীরেশ, জলের মধ্যে প্রতি-বিম্বিত চন্দ্রের সমগ্র সংকোচ ও বিকাশের কারণ যেমন স্বয়ং চন্দ্রই, তেমনি বিশ্বাভাসে ইহার কোনও বিকার হয় না, বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হইলেও ইনি কোথাও যান না (ইঁহার লয় হয় না)। যেমন দিনে ও রাত্রিতে সূর্য দ্বিধাবিভক্ত হয় না (সূর্যের প্রকাশের কোনও বিভিন্নতা হয় না), তেমনি এমন কোনও স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, এমন দ্বিতীয় কিছুই নাই তাঁহার সংস্পর্শে তাঁহার বিকার বা ব্যয় হয়, তাঁহার তুলনা তিনি নিজেই। (৫৫৬)

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তম
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ
প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

হে ধনঞ্জয়, যিনি স্বয়ং আপনাকে প্রকাশিত করেন—(আর অধিক কি বলা যায়?)—যাঁহাতে কোনও দ্বৈতভাব নাই তাহা আমারই উপাধি-রহিত স্বরূপ, ক্ষর এবং অক্ষরের অতীত উভয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ সেই আমিই, এই জন্যই বেদ এবং সমস্ত জগৎ আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলে। (৫৫৮)

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥

আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। হে ধনঞ্জয়, যাঁহার মধ্যে জ্ঞানরূপী সূর্যের উদয় হইয়াছে, তিনি এইভাবে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া জানিতে পারেন; জাগ্রত হইলে যেমন

স্বপ্নাভাস চলিয়া যায় তেমনি জ্ঞানের স্ফুরণ হইলে ত্রিভুবন মিথ্যা হইয়া যায়। (৫৬০)

অথবা মালা হাতে স্পর্শ করিলে যেমন তাহাতে সর্পাভাসের ভয় দূরীভূত হয়, তেমনি স্বরূপের জ্ঞান হইলে এই বিশ্বের মিথ্যাভাস দূরীভূত হয়; যে অলঙ্কারকে সোনা বলিয়াই জানে তাহার দৃষ্টিতে অলঙ্কারত্ব মিথ্যা। তেমনি যিনি আমার সত্য স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি বহুজ্ঞান বা ভেদভাব পরিত্যাগ করেন। তিনি বলেন, আমিই সর্বব্যাপক, অদ্বিতীয়, স্বতঃসিদ্ধ, সচ্চিদানন্দ। যিনি নিজেকে আমা হইতে ভিন্ন মনে করেন না (আমাকে এইরূপ অদ্বৈত দৃষ্টিতে দেখেন), তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায়—তিনি সব কিছুই জানিয়াছেন। একথা বলিলেও কম বলা হয়, কারণ তিনি সর্বত্র আছেন এবং তাঁহার মধ্যে দ্বৈতভাব নাই। হে অর্জুন, এইজন্যই তিনি আমাকে ভজনা করিবার যোগ্য, যেমন আকাশই আকাশকে আলিঙ্গন করিবার যোগ্য। ক্ষীর সমুদ্রের আতিথ্য যেমন শুধু ক্ষীরসমুদ্রই গ্রহণ করিতে পারে, অমৃতই শুধু অমৃতে মিশিয়া একরস হইতে পারে, সোনা উত্তম সোনায় মিশাইলেই উত্তম সোনা হয়। তেমনি যিনি আমাতে মদ্রূপ হইয়া যান, তিনিই আমাকে ভক্তি করিতে পারেন। আর দেখ, গঙ্গা যদি সাগর হইতে ভিন্নই হয়, তবে তাহাতে মিলিবে কি প্রকারে? তেমনি মদ্রূপ না হইয়া আমার সহিত ভক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না, এইজন্যই কল্লোল (তরঙ্গ) যেমন সাগর হইতে ভিন্ন নয়, তেমনি আমাকে যিনি ভজনা করেন তাঁহাকে আম হইতে অনন্য জানিবে, সূর্য্য ও প্রভাব যেমন এক—আমাকে লাভ করিবার জন্য যিনি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন তিনিও তেমনি আমার সহিত এক। (৫৭০)

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥

এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইতে যে সর্বশাস্ত্রৈকলভ্য (সর্বশাস্ত্রসম্মত) কমলদলের সুগন্ধের ন্যায় উপনিষদের সুরভি (গীতার্থ) প্রতিপাদন করা হইয়াছে, যাহা শব্দব্রহ্ম (বেদ)-কে মন্থন করিয়া শ্রীবেদব্যাস তাঁহার প্রজ্ঞারূপ হস্তদ্বারা নিঙড়াইয়া বাহির করিয়াছেন সেই সারতত্ত্ব আমি জগতের সেবার জন্য উপস্থিত করিলাম।

ভগবান বলিয়াছেন: ইহা জ্ঞানামৃতের জাহ্নবী, আনন্দরূপী চন্দ্রমার সপ্তদশ কলা, বিচাররূপী ক্ষীর সমুদ্র হইতে উদ্ভূত নূতন লক্ষ্মীদেবী, ইনি আপন পদ (শব্দসমূহ) বর্ণ, (অক্ষর), ও অর্থরূপী জীবনে ও প্রাণে আমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানেন না; ইঁহার সম্মুখে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' দণ্ডায়মান; কিন্তু ইনি তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট করিয়া আপনার সর্বস্ব 'পুরুষোত্তম'কে অর্পণ করিয়াছেন; এইজন্যই এই সংসারে গীতাকে আমার (অর্থাৎ আত্মার) পতিব্রতা পত্নী (শক্তি) বলিয়া থাকে, আজ তুমি ইহাই শ্রবণ করিয়াছ। বস্তুতঃ এই গীতা শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা বুঝানো যায় না, পরন্তু সংসারকে জয় করিবার ইহা এক পরম অস্ত্র, যে মন্ত্রাক্ষর দ্বারা আত্মা প্রকট হয় তাহা এই গীতা। হে অর্জুন, তোমাকে যে গীতার কথা বলিলাম তাহা দ্বারা যেন আজ আমি আপনার গুপ্ত ধনভাণ্ডার তোমার সম্মুখে খুলিয়া দিলাম, গীতারূপী গঙ্গা চৈতন্যরূপ শম্ভুর মস্তকে লুকায়িত ছিল, হে পার্থ আজ তুমি তাহাকে আস্থাপূর্বক বাহির করিয়া দ্বিতীয় ভগীরথ হইয়াছ, হে ধনঞ্জয়! আমার শুদ্ধ স্বরূপ যথার্থভাবে দেখাইবার জন্য তুমি আজ আমার সম্মুখে দর্পণের ন্যায় রহিয়াছ, (৫৮০)

অথবা সমুদ্র যেমন চন্দ্রমা ও নক্ষত্রে ভরা আকাশের প্রতিবিম্ব ধারণ করে, তেমনি তুমি

গীতার সহিত আমাকে আপনার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়াছ, হে অর্জুন তোমার মধ্যে ত্রিবিধ তাপের যে মালিন্য ছিল তাহা দূর হইয়াছে এইজন্য তুমি গীতার সহিত আমার আবাস-স্থল হইয়াছ, পরন্তু (গীতার মাহাত্ম্য) আর কত বর্ণনা করিব? আমার এই জ্ঞানবল্লী গীতাকে যে জানে সে সমস্ত মোহ হইতে মুক্ত হয়, হে পাণ্ডুসুত, অমৃতরূপ নদীর জলপান করিলে যেমন সমস্ত রোগ দূর হয় এবং মনুষ্য দোষমুক্ত হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি গীতার জ্ঞানলাভ হইলে যদি মোহ বিনষ্ট হয় তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে? পরন্তু আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপ মিলিত হয়, আর যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখন কর্মও চলিতে থাকে এবং ঋণ শোধ হইলে উহা লয়প্রাপ্ত হয়, হে বীরবিলাস অর্জুন হারানো জিনিস প্রাপ্ত হইলে তাহাকে খুঁজিবার কর্ম শেষ হয়, কর্মরূপ মন্দিরের শীর্ষদেশে জ্ঞানই কলসরূপে স্থাপিত হয়, (সমস্ত কর্মই জ্ঞানে সমাপ্ত হয়), তখন জ্ঞানী পুরুষের করণীয় আর কোন কর্মই অবশিষ্ট থাকে না।

অনাথের সখা শ্রীকৃষ্ণ এইসব কথাই বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের এই কথামৃত অর্জুনের অন্তঃকরণ ভরিয়া বাহিরে ছাপাইয়া পড়িল, এবং সঞ্জয় ব্যাসদেবের কৃপায় সেই অমৃত প্রাপ্ত হইলেন; সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ঐ অমৃত পান করিতে দিলেন এবং এইজন্যই আয়ুর শেষে তাহার পরিণাম শুভই হইয়াছিল। (৫৯০)

সাধারণতঃ গীতাপাঠের সময় যদি কোনও অনধিকারী উপস্থিত থাকে তবে পরিণামে গীতা তাহারও উপকারী হয়, দ্রাক্ষালতার মূলে যদি দুধ ঢালা হয় তবে মনে হয় ঐ দুধ বৃথাই ঢালা হইল; পরন্তু যখন ঐ দ্রাক্ষালতার ফল ধরিতে আরম্ভ করে দেখা যায় তাহার ফলের মিষ্টত্ব দ্বিগুণ হইয়াছে, সঞ্জয় অতিশ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির মুখনিঃসৃত বাণী ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছিলেন, তাহার ফলে যথাসময়ে ঐ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রও সুখী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐ কথামৃত আমি মারাঠী ভাষায় অবিন্যস্ত ভাবে নিজবুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে আপনাদের সম্মুখে পরিবেশন করিতেছি। ফুলে অরসিক ব্যক্তি বিশেষ কিছুই দেখিতে পায় না, পরন্তু রসিক ভ্রমর তাহার সুগন্ধ আস্বাদন করে। ঐভাবে আপনারা আমার ভাষণে যাহা প্রমাণ যোগ্য তাহাই গ্রহণ করুন আর ত্রুটি বা ন্যূনতা যাহা আছে তাহা আমাকেই দিন। আমার ন্যায় বালকের পক্ষে সমস্ত বিষয় না বুঝাই স্বাভাবিক। বালক অজ্ঞান হইলেও তাহাকে দেখিয়া মাতাপিতার হর্ষের সীমা থাকেনা এবং তাহাকে আদর করিয়া তাহারা সুখী হইয়া থাকেন; তেমনি আপনারা সন্তজন, আমার পিতামাতার সমান—আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া আমি য আপনাদের প্রেমভাজন হইয়াছি এই গীতাগ্রন্থ মানিয়া লইয়া আপনারা তাহা স্বীকার করুন। এখন, জ্ঞানদেবের এই প্রার্থনা—হে বিশ্বস্বরূপ, আমার গুরু স্বামী শ্রীনিবৃত্তিনাথ মহারাজ, আপনি আমার এই বাক্যপূজা (বাণীরূপ সেবা) গ্রহণ করুন।

ইতি শ্রীজ্ঞানদেব বিরচিত ভাবার্থ-দীপিকায় পঞ্চদশ অধ্যায়— সমাপ্ত। (৬০০)

এস প্রভু গীতার উদ্গাতা

শ্রীমতী দিবাপ্রভা ভরালী

আবার এস গো তুমি আবার কর গো শঙ্খনাদ,
সজ্জনের রক্ষা করি দুর্জনের ঘটাও প্রমাদ,
ঘুচাও যুগের গ্লানি নিবিড় তিমির আবরণ,
অধর্মেরে বিনাশিয়া স্বধর্ম কর গো সংস্থাপন।
তোমার বিহনে আজি অন্ধকার এ ভারতভূমি
ঘনায়েছে কৃষ্ণপক্ষ—এইবার এস এস তুমি।

তব পথ চাহি কত দীর্ঘকাল করিছে যাপন
এ তব জনমভূমি, অশ্রুপূর্ণ আকুল নয়ন।
আবার এস গো তুমি, নতুন যুগের শুভ প্রাতে
লিখে যাও জয়টিকা জননীর উন্নত ললাটে।
ভীত ত্রস্ত আশাহত আজি কত ভারত সন্তান
ক্ষাত্র তেজে জাগাও আবার যত মুমূর্ষু পরাণ।

জীবন-সমরক্ষেত্রে কর্তব্যবিমুখ যত রথী
স্বকর্মে প্রেরণ কর, এস এস হে পার্থসারথি।
শোনাও সে মর্মবাণী : আত্মা তুমি চির অবিনাশী,
ওহে পার্থ নব ভারতের। তুলি লও তব অসি।
—এ ক্ষুদ্র দৌর্বল্য তব হৃদয়ের কর পরিহার,
'স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ'—লহ এ অমোঘ মন্ত্র সার।

শত্রু তব অন্তরে বাহিরে,দেখিতে পাওনা আজো ?
ছাড় তব তমোগুণ এইবার রণসাজে সাজো।
অক্ষমতা ভীরুতা মনের আজি কর পরিহার,
বাজাও বিজয়-ডঙ্কা আত্মনিষ্ঠা আত্মমর্যাদার;
শুন ওহে নেতৃবৃন্দ শুন শুন ভারত সন্তান—
জননীর বেদীমূলে আপনারে কর বলি দান।

ছিঁড়ে ফেল শত গ্রন্থি, অন্ধ স্বার্থপাশ, মাতৃপদে
কর আত্মসমর্পণ, রাখ তাঁরে সম্পদে বিপদে
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি—এই তব কর্তব্য প্রধান
তব জীবনের ব্রত, এই তব হৃদয়ের ধ্যান।
ওঠ, ওঠ, হও শত্রু-সম্মুখীন, ছাড় শোক ভয়,
ধর্মার্থে কর গো যুদ্ধ, তুচ্ছ করি জয় পরাজয়।

আবার এস গো তুমি নবশক্তি কর গো সঞ্চার
তোমার মাভৈঃ মন্ত্রে, ভারতেরে জাগাও আবার;
সুদীর্ঘ সুপ্তির জালে দিশাহারা যত নরনারী
দেখাও তাদের পথ—জনগণ-মন-অধিকারী
হে ভাগ্যবিধাতা ভারতের! আজি নেতৃত্বে তোমার
শৌর্যে, বীর্যে, গরিমায় মাতৃভূমি জাগুক আবার!

জগতের জাতিবৃন্দমাঝে সুউচ্চ আসন তাঁর
থাকুক অনন্তকাল অব্যাহত, কীর্তি প্রতিভার
হোক সুদূর প্রসার—নিশাশেষে যেন রবিকর
বিদূরি তমিস্রা ঘোর, কুহেলিকা মর জগতের
নতুন যুগের নবপ্রভাতের করুক সূচনা;
বিশ্ব আজি ঐকতানে তোমারই গাহুক বন্দনা!

আবার এস হে প্রভু ভগবান গীতার উদ্গাতা—
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার চরাচর বিশ্বপালয়িতা।

প্রাচীন ভারতের কয়েকটি আশ্রম-চিত্র

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা ও লক্ষ্মণসহ বৃহৎ এবং গভীর 'দণ্ডক' নামক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ঋষি এবং তপস্বিগণের আশ্রমসমূহ। সেই সকল আশ্রমে আশ্রমবাসিগণ ভগবান লাভ করিবার জন্য এবং জগতের হিতসাধন-কল্পে তপস্যা করিতেছিলেন। বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে সেই আশ্রমগুলির বর্ণনা এই ভাবে করিয়াছেন :

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্।
দদর্শ রামো দুর্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্মণ্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
যথা প্রদীপ্তং দুর্দর্শং গগনে সূর্যমণ্ডলম্॥
শরণ্যং সর্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা।
মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতম্॥
পূজিতং চোপনৃত্তং চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডৈরজিনৈঃ কুশৈঃ॥
সমিদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।
আরণ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্যুতম্॥
বলিহোমার্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
পুষ্পৈর্বন্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া॥
ফলমূলাশনৈর্দান্তৈশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ।
সূর্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্মুনিভির্বৃতম্॥
পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ।
তদ্ব্রহ্মভবনপ্রখ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্॥

—শ্রীমদ্বাল্মীকিরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে প্রথমসর্গে।

—আত্মবান্ রাম 'দণ্ডক' নামক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রমমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত কুটীরপরিব্যাপ্ত আশ্রমবাসী শ্রীসমন্বিত হইয়া আকাশস্থ প্রদীপ্ত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় দুর্দর্শ। সেই আশ্রমসমুদয় সর্বজীবের আশ্রয়স্থল, উহাদের প্রাঙ্গণ সদাই পরিষ্কৃত ও সুমার্জিত এবং চতুর্দিকে নানাবিধ পশু ও পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ। অপ্সরাগণ নিত্যই দলে দলে আসিয়া উহাদের সমীপে নৃত্যকরত উহাদের পূজা করিতেছে। উহারা বিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলপূর্ণ কলস, এবং ফলমূল দ্বারা শোভিত রহিয়াছে এবং বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যজাত সুস্বাদু ফলবিশিষ্ট পবিত্র বৃক্ষসমূহে সমাবৃত রহিয়াছে। ঐ আশ্রমসমূহে নিত্যই বলি ও হোম হইতেছে। প্রতিনিয়ত পুণ্যবেদধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বিবিধ পুষ্পনিচয় পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং বিচিত্র পদ্মশোভিত সরোবর বিরাজ করিতেছে। সেই সকল আশ্রমে ফলমূলাহারী চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী, সূর্য ও অগ্নিসদৃশ দীপ্তিশালী, দান্তস্বভাব প্রাচীন মুনিগণ বাস করিতেছেন। নিয়তাহার পবিত্র পরমর্ষিগণে শোভিত এবং নিয়ত বেদধ্বনি মুখরিত হওয়াতে আশ্রমসকল ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল।

বাল্মীকি অন্যত্র তপস্বিগণের আধ্যাত্মিকতার কথা বলিতে গিয়া এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে তাপসগণ সাবধানে নিয়মানুবর্তী হইয়া তাঁহাদের শরীর লঘু রাখিতেন এবং তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করিতেন। যেহেতু দৈহিক ভোগসমূহের দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জিত হইতে পারে না। যথা :

আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্শয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্মো ন সুখাল্লভ্যতে সুখম্॥

—অরণ্যকাণ্ড—৯।৩১

কবি কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এই সব তপোধন আশ্রমবাসিগণের সম্বন্ধে

এই উক্তি করিয়াছেন যে—এই সব তপস্বিগণের আধ্যাত্মিকতাই একমাত্র সম্পদ্। তাঁহারা সাধারণতঃ শান্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট। সূর্যকান্তমণি যেরূপ স্পর্শ করিলে শীতল মনে হয়, কিন্তু সূর্যের কিরণ বা অন্য কোন উত্তপ্ত কিরণের সংস্পর্শে আসিলে ইহা হইতে তাপ নির্গত হইয়া অন্য বস্তু পোড়াইয়া দেয়—সেইরূপ এই শান্তপ্রকৃতি তপস্বিগণের উপর অত্যাচার করিলে ইঁহাদের ভিতর হইতে তপঃসম্ভূত তাপ নির্গত হইয়া অন্যকে বিনাশ করিতে পারে।

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু
গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তা
স্তদন্যতেজোভিভবাদ্বমন্তি ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ২য় সর্গে

'কুমারসম্ভবে' কালিদাস রুদ্রাশ্রমের বর্ণনা করিতেছেন যে মহেশ্বর অপ্সরাদিগের সংগীত শ্রবণ করিয়াও ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন। বিঘ্নরাশি—জিতেন্দ্রিয় পুরুষের সমাধিভঙ্গ করিতে কোন মতেই সক্ষম হয় না। মহেশ্বরের অনুচর নন্দিকেশ্বর লতাগৃহের দ্বারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বামহস্তে স্বর্ণবেত্র ধারণপূর্বক মুখবিন্যস্ত-অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রমথগণকে স্থির থাকিতে আদেশ করিতেছেন। মহেশ্বরের গভীর সমাধির ফলে বৃক্ষরাজি নিষ্কম্প, ভ্রমরকুল নিশ্চল এবং পক্ষি-সরীসৃপাদি নীরব, মৃগকুল ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া প্রশান্ত ভাবে অবস্থিত। রুদ্রাশ্রমের নিখিল বনভূভাগই চিত্রলিখিতবৎ অধিষ্ঠিত ছিল।

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্ ॥
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বম্
চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥

—কুমারসম্ভবম্, ৩য় সর্গে

দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া তপস্বিগণ বলিতে লাগিলেন—হে রাম। আমরা তোমার রাজ্যে বাস করি, তুমি আমাদের রক্ষা করিও। আমরা কাম এবং ক্রোধ জয় করিয়াছি, আমরা হিংসা ত্যাগ করিয়াছি, আধ্যাত্মিকতাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র পূর্বে পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি অতিশয় ক্রোধী ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে আত্মসংযম করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি হন। যখন শ্রীরামচন্দ্র প্রায় পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন তখন বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথের প্রাসাদে আগমন করেন। দণ্ডকারণ্যে যাহারা তপস্বিগণের তপোভঙ্গ করিত তাহাদের বিনাশের জন্য বিশ্বা-মিত্র দশরথের নিকট হইতে শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া আসেন। যখন শ্রীরামচন্দ্র সরযূ নদীর দক্ষিণ তটে উপস্থিত হইলেন তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন: হে রাম। তুমি 'বলা' এবং 'অতিবলা' নামে দুইটি মন্ত্র গ্রহণ কর। এই মন্ত্রপ্রভাবে তোমার শ্রম, জ্বর বা রূপ-হানি হবে না। সুপ্ত বা অনবহিত থাকলেও রাক্ষসরা তোমাকে ধর্ষণ করতে পারবে না। সৌভাগ্যে দক্ষতায়, জ্ঞানে বা তথ্যনির্ণয়ে, অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে তোমার সমকক্ষ কেউ হবে না। বলা ও অতিবলা মন্ত্র পাঠ করলে তোমার ক্ষুৎপিপাসাও নিবৃত্ত হবে।"

বিশ্বামিত্র শ্রীরামের দ্বারা রাক্ষসগণের বিনাশ সাধন করিলেন। মিথিলায় হরধনুভঙ্গের পর শ্রীরামের বিবাহ সম্পন্ন হইলে বিশ্বামিত্র হিমালয় যাত্রা করিলেন। হিমালয়ের নিভৃত পরিবেশে ভগবচ্চিন্তা করিয়া বিশ্বামিত্র জীবনের অন্তিম সময় অতিবাহিত করিলেন।

অত্রি

শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূটে কিছুকাল কাটাইয়া দক্ষিণ

ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই তিনি স্বনামধন্য অত্রি মুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। অত্রি তাঁহার সহধর্মিণী অনসূয়াকে শ্রীরামের সহিত পরিচিত করাইলেন। অত্রি বলিলেন, "ইনি আমার পত্নী। দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইনি আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় রহস্য অবগত আছেন এবং আধ্যাত্মিকতাই এঁর একান্ত প্রিয়। সীতাদেবী ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

অনসূয়া সীতাকে নিজের কন্যার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সীতা প্রণাম করিলে অনসূয়া বলিলেন, "তোমার ধর্মজ্ঞান আছে। তুমি আত্মীয়-স্বজন এবং অভিমান ত্যাগ করিয়া রামের সঙ্গে বনে আসিয়াছ। স্বামী নগরবাসী বা বনবাসী, অনুকূল বা প্রতিকূল—যাহাই হউন না কেন যে স্ত্রী তাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করে তাহারই অপবর্গ লাভ হয়।" সীতা উত্তর দিলেন, "আর্য্যা? পতি যে নারীর গুরু, আমি তাহাই জানি।" অনসূয়া হৃষ্টা হইয়া সীতার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "সীতা, এই দিব্য বরমাল্য, বস্ত্র আভরণ, অঙ্গ-রাগ ও গন্ধানুলেপন তোমাকে দিতেছি, তুমি এ সমস্ত ধারণ করিয়া তোমার পতিকে শ্রীমণ্ডিত কর।"

অত্রি শ্রীরামকে বলিলেন, "যখন দশ বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে লোক দগ্ধ হইতেছিল, তখন অনসূয়া উগ্র তপস্যার প্রভাবে ফলমূল উৎপন্ন এবং গঙ্গাকে প্রবাহিত করিয়া ঋষিদের তপোবিঘ্ন দূর করিয়াছিলেন।" বিদায়কালে অনসূয়া সীতাকে বলিলেন, "পাতিব্রত্য ঠিক রাখিয়া হে জানকি, শ্রীরামের অনুগমন কর।"

পাতিব্রত্যং পুরস্কৃত্য রামমন্বেহি জানকি।

—অধ্যাত্মরামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড—৯

অনসূয়া সীতাকে আবার বলিলেন, "শোন সীতা, তোমার নাম স্মরণ করিয়া সব নারী পাতিব্রত্য পালন করিবে।"

সুনু সীতা তব নাম সুমিরি
নারি পতিব্রত করহি।

—রামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড-৫

মুনি অত্রি কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীরামের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু! আমার বুদ্ধি যেন কখনও তোমার পাদপদ্ম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন না করে।"

শরভঙ্গ

শ্রীরাম তারপর শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। শরভঙ্গ মুনি যোগপ্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীরাম প্রভৃতি তাঁহার আশ্রমে আগমন করিবেন। তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইলেও তিনি শ্রীরামাদির প্রতি আতিথেয়তা না করিয়া দেহত্যাগ করিলেন না। যখন শ্রীরাম আশ্রমে আগমন করিলেন, শরভঙ্গ মুনি বলিলেন, "হে রাম! সর্প যেমন তাহার খোলস ত্যাগ করে, আমিও তেমনি আমার জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিব। হে রাম। তুমি একটু অপেক্ষা কর এবং আমার প্রতি তোমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।" এই কথা বলিয়া শরভঙ্গ মুনি নিজহস্তে নিজের চিতা রচনা করিলেন এবং চিতাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। তারপর তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিলেন।

যোগী ও জ্ঞানী পুরুষ অনেক সময় এইরূপে মৃত্যু বরণ করিয়া আনন্দধামে প্রয়াণ করেন।

শরভঙ্গো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্।
তস্য রোমাণি কেশাংশ্চ দদাহাগ্নির্মহাত্মনঃ॥

—বাল্মীকিরামায়ণম্, অরণ্যকাণ্ড-৫

সুতীক্ষ্ণ

সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্যমুনির শিষ্য ছিলেন। তিনি তপঃপ্রভাবে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে শ্রীরাম

তাঁহার আশ্রমে আগমন করিতেছেন তখন তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। শ্রীরামের চিন্তায় এতই বিভোর যে তিনি পথিমধ্যে সব ভুলিয়া গিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দূর হইতে শ্রীরাম তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃক্ষের আড়ালে নিজেকে লুকাইলেন এবং তাঁহার প্রেমাবস্থা দেখিতে লাগিলেন। সুতীক্ষ্ণ রাস্তায় নিশ্চলভাবে বসিয়া পড়িলেন এবং শরীরের রোমরাজি সব খাড়া হইয়া গেল। সমস্ত শরীর পনস-ফলের মত দেখাইতে লাগিল।

মুনি মতা মাঝ অচল হোই বৈসা।
পুলক শরীর পনসফল জৈসা॥
—রামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড-৯

শ্রীরাম শরভঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইলেও মুনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে সুতীক্ষ্ণ বাহ্য চৈতন্য লাভ করিলেন এবং শ্রীরামের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীরাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পরেউ লকুট ইব চরণন্হি লাগী।
প্রেমমগন মুনিবর বড ভাগী।
ভক্ত বিশাল গহি লিয়ে উঠাই;
পরম প্রীতি রাখে উর লাই॥
—রামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড

অগস্ত্য

অগস্ত্য মুনি যোগপ্রভাবে অনেক বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় তপশ্চর্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার আশ্রমের পরিবেশের প্রশংসা করিয়া শ্রীরাম বলিতে লাগিলেন, "এই মুনির তপঃপ্রভাবে তাঁহার আশ্রমে কেহ মিথ্যাভাষণ, প্রতারণা বা অন্য কোন দুষ্কর্ম করিতে সাহস পায় না। দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ এবং পক্ষী সকলেই সংযম অভ্যাস করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়।" অগস্ত্য দীর্ঘকাল শ্রীরামের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখনই শ্রীরামকে দর্শন করিলেন অগস্ত্য আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। অগস্ত্য একদৃষ্টিতে শ্রীরামকে দেখিতে লাগিলেন। যথারীতি আতিথেয়তা সম্পাদন করিয়া অগস্ত্য কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীরামকে বলিতে লাগিলেন, "হে রাম! তোমাকে দর্শন করিয়া আমার জন্ম অদ্য সফল হইল। হে প্রভু! আমার দ্বারা সম্পাদিত সকল যজ্ঞ আজ সফলতা লাভ করিল। আমার দীর্ঘকালের তপশ্চর্যা যাহা আমি একমনে করিয়াছি, তাহার ফল এই যে তোমাকে সাক্ষাৎভাবে অর্চনা করিতে পারিলাম।"

অদ্য মে সফলং জন্ম ভবৎসন্দর্শনাদভূৎ।
অদ্য মে ক্রতবঃ সর্বে বভূবুঃ সফলাঃ প্রভো॥
দীর্ঘকালং ময়া তপ্তমনন্যমতিনা তপঃ।
তস্যেহং তপসো রাম ফলং তব যদর্চনম্॥
—অধ্যাত্মরামায়ণম্, অরণ্যকাণ্ড-৩

শবরী

শ্রীরাম পম্পা-সরোবরের দিকে যাইতে যাইতে শবরীর আশ্রমে উপনীত হইলেন। ঐ আশ্রমটি মতঙ্গ মুনির ছিল। তিনি শিষ্য-সমভিব্যাহারে তপশ্চরণ করিতেন। শবরী নিম্নজাতীয়া ছিলেন। অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মতঙ্গ মুনি ও তাঁহার শিষ্যদের সেবা করিতেন। তাঁহারা সকলেই শবরীর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। মতঙ্গ মুনি দেহত্যাগ করিবার সময় বলিয়া যান—"হে শবরী। শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণসহ এই পবিত্র আশ্রমে পদার্পণ করিবেন। তুমি তাঁহাদিগের প্রতি যথারীতি আতিথেয়তা করিও। শ্রীরামকে দর্শন করিয়া তুমি অমরধামে যাইতে পারিবে।" মতঙ্গ মুনির কথায় অচল

বিশ্বাস রাখিয়া শবরী বহু বৎসর ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীরামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শবরী একজন তপস্বীকে এই ভাবে তাঁহার দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও কালযাপনের কথা বলেন, "আমি প্রত্যহ শ্রীরামের পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করি। রোজ তাঁহার জন্য একটি আসন প্রস্তুত রাখি। আমি প্রত্যহ বনের স্বাদু ফল ও শীতল পানীয় যোগাড় করি। এই সব করিতে করিতে কত বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু আমি কোন কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ করি নাই। আকুল অন্তরে প্রত্যহ শ্রীরামের আগমনের পথের দিকে তাকাইয়া থাকি। শুষ্ক পত্রের ধ্বনিতে আমি চমকাইয়া উঠি এবং মনে করি এই বুঝি শ্রীরাম আসিতেছেন। সরোবরে কোন তাপস স্নান করিতে আসিলে আমি তৎক্ষণাৎ ধাবিত হই—হয়ত শ্রীরাম আসিয়াছেন। কোন পক্ষী মধুর কণ্ঠে গান করিলে আমার মনে হয় শ্রীরাম আমাকে ডাকিতেছেন। শ্রীরাম! শ্রীরাম!—এই আমার এক চিন্তা। শ্রীরামই আমার হৃদয়ের একমাত্র ধন! যখন ঘুমাই বা জাগিয়া থাকি সব সময় কেবল শ্রীরামের কথাই মনে জাগে।"

বহু বর্ষ এই ভাবে অতীত হইবার পর সত্যই শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণসহ শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শবরী তাঁহাদের শ্রীচরণপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের চরণ ধরিয়া রহিলেন। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শবরী কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের চরণে মাথা নত করিতে লাগিলেন।

> শ্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাই।
> সবরী পরী চরণ লপটাই ॥
> প্রেমমগন মুখ বচন ন আব।
> পুনি পুনি পদসরোজ সির নাব ॥
> —রামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩২

তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া শবরী শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে আসন প্রদান করিলেন। সুস্বাদু ফল আহরণ করিয়া শবরী তাঁহাদিগকে খাইতে দিলেন। আশ্রমের চারিদিক তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। শ্রীরাম বলিলেন, "হে শবরী! তোমার তপস্যার ফল পাইয়াছ কি?" শবরী বলিলেন, "হে রাম! আজ তোমার দর্শনেই সব ফল পাইয়াছি।" শ্রীরাম বলিলেন, "হে শবরী! তুমি ভক্তির সহিত আমার অর্চনা করিয়াছ। এখন ঈপ্সিত লোকে গমন কর।"

শেষের গান

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী

মোর জীবনে নানারূপে প্রভু
তোমারেই হেরিলাম
তার বিনিময়ে দিয়ে যাই শুধু
হৃদয়-গলা প্রণাম।
তোমার রূপের তুমিই তুলনা
সংসার মায়া তোমারই রচনা
তোমার মহিমা বোঝা তো হ'ল না
তৃষা লয়ে চলিলাম।

বহুর মাঝারে দেখেছি তোমারে
হাসি ও অশ্রু সাজে,
দুঃখ ও ভয় কিছু কিছু নয়
মিথ্যা স্বপন রাজে।
যা কিছু দিয়েছ, সব কিছু তাই
তোমারেই সঁপিলাম ॥

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-সঞ্চয়ন

স্বামী শান্তানন্দ

অনেকে মনে করেন শ্রীশ্রীঠাকুরই গিরিশবাবু কর্তৃক অভিনীত নাটক দেখেছিলেন, আর শ্রীশ্রীমা দেখেননি, এটা কিন্তু ভুল ধারণা। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেছিলেন ষ্টার থিয়েটারে গিরিশবাবুর চৈতন্যলীলা প্রভৃতি নাটক, মাষ্টার মশাই কথামৃতে সে-সব উল্লেখ করেছেন। শ্রীশ্রীমা দেখেছিলেন মিনার্ভাতে। মিনার্ভা ছিল বিডন ষ্ট্রীটে। গিরিশবাবুর প্রার্থনাতেই শ্রীশ্রীমা গিয়েছিলেন তাঁর অভিনীত 'পাণ্ডব-গৌরব' দেখতে।

* * *

অনেকদিন আগেকার ঘটনা। আমি তখন বাগবাজারে উদ্বোধনে থাকতাম, শ্রীশ্রীমায়ের সেবা নিয়ে। গিরিশবাবু একদিন এসেছেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। বুড়ো হয়েছেন। এসেই মাকে প্রণাম করলেন। যথারীতি কুশলপ্রশ্ন করার পর তিনি করজোড়ে তাঁর কাছে নিবেদন করলেন তাঁর প্রার্থনা—'মা, অনেকদিন হ'ল থিয়েটারে আছি। আর ও সব ভাল লাগে না, ছেড়ে দেব মনে করছি। তবে আপনি যদি অনুমতি করেন তাহ'লে একদিন আপনাকে আমার অভিনয় দেখাই, আর ঐ হবে আমার শেষ অভিনয়।' গিরিশবাবুর কাতর প্রার্থনাতে শ্রীশ্রীমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর সম্মতি দিলেন।

সেদিন ছিল ১৯০৯ খৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমনোপলক্ষে থিয়েটার সকাল সকাল আরম্ভ হবে বলেই আমরা সব তাড়াতাড়ি বেরুবার জন্যে ব্যবস্থা করতে লাগলাম। ডাঃ কাঞ্জিলাল ও ললিত চাটুজ্যে শ্রীশ্রীমার যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা, রাধু, মাকু ও মেয়ে-ভক্তদল ললিত চাটুজ্যের গাড়ীতে আর আমি, ললিত চাটুজ্যে ও ডাঃ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অন্য গাড়ীতে ক'রে একটু আগেই রওনা হলাম, কারণ আজ সন্ধ্যে ৬টায় হবে থিয়েটার আরম্ভ।

আগে থেকেই গিরিশবাবু শ্রীশ্রীমার বসবার সব ব্যবস্থা ক'রেই রেখেছিলেন। শ্রীশ্রীমার জন্যে Box (বক্স) প্রস্তুত ছিল। একটি বক্সে শ্রীশ্রীমা ও অন্য পাশে আমরা সব বসেছিলাম। আমি ছিলাম ঠিক শ্রীশ্রীমার কাছের বক্সেই। সেদিন হচ্ছিল 'পাণ্ডব-গৌরব' ও 'রঙ্গরাজ'। প্রথমেই পাণ্ডব-গৌরব আরম্ভ হ'ল। থিয়েটার যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় গিরিশবাবু তার জন্যে ব্যস্ত। শ্রীশ্রীমা এসেছেন আজ তাঁর অভিনয় দেখতে, কত আনন্দ তাঁর।

পাণ্ডব-গৌরবে গিরিশবাবু করছিলেন কঞ্চুকীর অভিনয়। কঞ্চুকী ছিল দণ্ডী-রাজার ব্রাহ্মণ ভাঁড়। শ্রীশ্রীমা দেখছেন : দুর্বাসা ঋষি তাঁর তপঃক্লিষ্ট দেহের কথা বলছেন দেবর্ষি নারদকে। আরো বলছেন, ক্লিষ্টতা-হেতু গিয়েছিলেন তিনি ইন্দ্রের সভায় একটু পরিবর্তনের আশায়। ইন্দ্র তাঁকে সম্মান ক'রে নিয়ে গেলেন যেখানে উর্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নাচ-গান করছেন। তাঁর চেহারা অতি রুগ্ণ ও শুকনো দেখে উর্বশী তাঁকে ঋষি ব'লে চিনতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন এই পশুটি আবার আমাদের নাচগানের কি বুঝবে? ঋষি কিন্তু তাঁর (উর্বশীর) মনের ভাব বুঝতে পেরে দিলেন অভিশাপ,—যেমন আমায় পশু ভাবছিস্ তেমনি তুইও হ'য়ে যা ঘোটকী—চলে যা মর্ত্যে।

শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে সব দেখে যাচ্ছেন। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। অভিশাপ জানতে পেরে ঋষির কাছে প্রার্থনা ক'রে এইটুকু হ'ল উর্বশীর যে—রাতে অপ্সরা থাকবে আর দিনের বেলায় হবে ঘোটকী। এর থেকে মুক্তির উপায়? তাও বললেন ঋষি—অষ্ট বজ্র যখন একত্র হবে তখনই হবে মুক্তি, তার আগে নয়।

উর্বশী এখন পৃথিবীতে ঘোটকীরূপে ঘুরছেন। একদিন অবন্তীর রাজা দণ্ডী মৃগয়া করতে এসে ঘোটকীটি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে ধরবার জন্যে খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যে অতিক্রম করলেন। তখন উর্বশীর পূর্ব রূপ দেখে আরো মোহিত হ'য়ে নিয়ে যান তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদের কাছে এ সংবাদ শুনে দূত পাঠালেন দণ্ডীর কাছে, বলে পাঠালেন—ঐ ঘোটকীটি আমি চাই। কিন্তু উর্বশীর মোহে পড়েছেন রাজা। রাজার অবস্থা দেখে তাঁর বৃদ্ধ কঞ্চুকী ব্রাহ্মণ খুব দুঃখিত হলেন।

ঠিক এ সময় দৃশ্যপটে নারদের সঙ্গে কঞ্চুকীকে কথা বলতে দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন—"ও, এই বুঝি গিরিশ, তা বেশ সেজেছে তো। মোটেই চেনা যাচ্ছে না কিন্তু।" গিরিশবাবুর অভিনয়ের সময় মাকে বেশ উৎফুল্ল দেখা যাচ্ছিল।

দণ্ডী-রাজা কৃষ্ণকে ঘোটকী দিতে অস্বীকার ক'রে অন্যান্য রাজাদের নিকট কৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এবং সাহায্য চেয়ে বিফলমনোরথ হলেন। তখন দুঃখে হতাশ হয়ে ঘোটকীকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যে চললেন। নদীতীরে রাজাকে বিষণ্ণ বদনে ঘুরতে দেখে সুভদ্রা কারণ জানতে চাইলেন, সব জেনে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আশ্বাস দিয়ে ক্ষত্রধর্মানুযায়ী দণ্ডীকে আশ্রয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এটা অবশ্য পাণ্ডবদের গৌরব বৃদ্ধির জন্যে ছলনাই করেছিলেন। সুভদ্রার তখন ভয় হ'ল। এখন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয় হয় কি ভাবে? এদিকে কৃষ্ণ ঐ বৃদ্ধ কঞ্চুকী ব্রাহ্মণকে দিয়ে সুভদ্রাকে বলে পাঠালেন, মহামায়ার আরাধনা কর। শ্রীশ্রীমা তখন ধীর স্থির ভাবে বসে রয়েছেন। রাতও হয়েছে অনেক। কোন্ দিক দিয়ে যে এত রাত হয়েছে কারুর হুঁশ নেই।

সুভদ্রা মহামায়ার আরাধনার জন্যে বৃদ্ধ কঞ্চুকীর সঙ্গে পীঠস্থানে গিয়ে অভিলষিত বর প্রাপ্ত হলেন। পতাকা রঞ্জিত করার জন্যে মহামায়া কর্তৃক প্রাপ্ত হলেন ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন সিন্দূর। যুদ্ধ শুরু হ'ল। একদিকে পাণ্ডবগণ, অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণ ও দেবতাগণ। যুদ্ধের দিন রাতেও যুদ্ধ হ'ল। যুদ্ধের সময় সুভদ্রা দেবী প্রাপ্ত পতাকা উড়িয়ে দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। পতাকা দেখেই শিব বললেন—দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। সবাই যুদ্ধ বন্ধ কর। সঙ্গে সঙ্গেই কালী মূর্তির আবির্ভাব। দেবতাদের সপ্ত বজ্র ও মহামায়ার শক্তি মিলে অষ্ট বজ্র একত্র হ'ল। তখনই হ'ল উর্বশীর মুক্তি। দেবীর সহচরী যোগিনীগণ তখন গান ধরছেন—"হের হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে" ইত্যাদি। এতক্ষণ শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে দেখছিলেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক এই সময়টিতে তিনি গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে স্থির হয়ে গেলেন। এই ভাবে সমাধিতে শ্রীশ্রীমা অনেকক্ষণ ছিলেন।

পাণ্ডব-গৌরবের শেষ পর্যন্ত অভিনয় শ্রীশ্রীমা দেখলেন। তখন অনেক রাত হয়েছে। সেজন্যে 'রঙ্গরাজ' অভিনয় না দেখেই ফিরবার জন্যে উঠে পড়লাম আমরাও। উদ্বোধনে যখন ফিরে এলাম তখন রাত দেড়টা।

এরপর গিরিশবাবু বোধ হয় আর অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন নি।

আগামী

'অনিরুদ্ধ'

হে আগামী এই বর্তমানে সহসা যে কভু কোন ক্ষণে
অভিনব তব মূর্তিখানি ভেসে ওঠে আমাব নয়নে
কাযাহীন ছায়া সে কি শুধু ? অর্থহীন অলস কল্পনা ?
সে কি শুধু ভ্রান্ত বিশ্বাসেব শক্তিহীন অসার বচনা ?
ভবিষ্যৎ যদি নাহি থাকে তবে ভাবি এই বর্তমান
কোন্ আশা বুকে নিয়া চলে অবিরত বাত্রি দিনমান ?
কি ভবসা ক্লান্ত তার মুখে ফুটায় বে স্নিগ্ধ মধু হাসি
কোন্ বলে এ রূঢ় সংসারে সদাই সে যায ভালবাসি ?
আছ আছ সংশয়ের পারে হে আগামী, শুক্র জ্যোতির্ময় !
আছ তুমি অমঙ্গলহাবী হে কল্যাণ, অক্ষয় অভয় !
আজিকাব পরাভব ক্ষতি, দৈন্য গ্লানি, যতেক ক্ষুদ্রতা;
জানি তুমি চকিতে ঘুচাবে হে আমাব আগামী পূর্ণতা !
হে আগামী, তোমাব আলয় জানি, নহে সুদূর সম্মুখে
জানি তুমি এখনো ফিরিছ প্রিয় সখা মোব সুখে দুখে।
পদধ্বনি বাজিছে তোমাব অতীতেব বিক্ত সিংহদ্বাবে;
শুভ্র তব উড়ে উত্তবীয় ত্রিকালেব সমীব-সঞ্চাবে।
নহ নহ তুমি স্বপ্ন নহ, ধ্রুবতম তুমি এ সৃষ্টিতে;
ঘটিতেছে প্রত্যেক স্পন্দন অলক্ষিত তোমারি ইঙ্গিতে।
তুমি সত্য চিব সন্নিকট তুমি জ্ঞান প্রকাশো সকলি,
তোমারি তো আনন্দের ধাবা চবাচবে পড়িছে উছলি।
আমার যে অনাদি মূঢ়তা রাখিয়াছে তোমায় ঢাকিয়া
সে আড়াল এখনি ভাঙিবে, যদি চাই সব প্রাণ দিয়া।
তাই আছি প্রতীক্ষিয়া কবে একান্তই ববিব তোমারে
ধন্য হবে মানব জীবন হে আগামী, তব আবিষ্কারে।

সমালোচনা

SELF-KNOWLEDGE.—Swami Abhedananda, Published by Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta 6 *Pp. 124 Price Rs 4/-*

বর্তমান যুগে—যখন জড়বাদ ও সংশয় মানব-মনে রাজত্ব করিতেছে তখন অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে কি পরিমাণ শাস্ত্রজ্ঞান ও নিশ্চয়াত্মক উপলব্ধি প্রয়োজন—তাহা এই পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি যুক্তি ও অনুভূতির মাধ্যমেই পরম সত্য মানবমনে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। এ যুগের সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ শ্রুতিতে বিশ্বাসী নহে, অনুভূতিলাভের জন্য যে সাধনা প্রয়োজন—তাহাও করিবার সময় বা শক্তি তাহার নাই, অতএব দুর্বল যুক্তিই তাহার একমাত্র অবলম্বন। আলোচ্য পুস্তকে শ্রুতি ও অনুভূতির সহিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লেখক এ যুগের মানুষের উপযোগী করিয়া উপনিষদের আত্মতত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছেন। পুস্তকখানি যে পাঠকসমাজে সমাদৃত—৮ম সংস্করণ প্রকাশই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

প্রজ্ঞা-বাণী (নগেন্দ্রনাথের পত্রাবলী)—সরযূবালা দেবী কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দির, বাঘাযতীন পল্লী, সি ব্লক, কলিকাতা—৩২। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—২৭২, মূল্য তিন টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ কিভাবে নিজ জীবনে গ্রহণ করা যাইতে পারে—এই চিন্তা যুবক নগেন্দ্রনাথের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে নগেন্দ্রনাথ আসেন এবং তাঁহাদের স্নেহলাভে সমর্থ হন। রংপুর কারমাইকেল কলেজের গ্রন্থাগারিক থাকাকালে তাঁহার পাঠানুরাগ সকলকে মুগ্ধ করিত। সাধনার ফলে নগেন্দ্রনাথ এক বিশিষ্ট চিন্তা-জগতের অধিকারী হইয়াছিলেন। কখনও সারাদিন, কখনও বা সারারাত্রি বন্ধুগণের সহিত ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন।

সঙ্কলিত পত্রগুলি নগেন্দ্রনাথের প্রজ্ঞার একটি নিখুঁত পরিচয় প্রদান করে। পত্রগুলিতে নিষ্কাম কর্ম, ত্যাগ, সেবা, ভক্তি ও জ্ঞানের অনেক মূল্যবান্ প্রসঙ্গ পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতিগুলিও চমৎকার। ধর্মজীবন গঠনে প্রয়াসী, দেশসেবক, ভক্ত ও কর্মী—সকল শ্রেণীর মানুষের চিন্তার বিষয়বস্তু 'প্রজ্ঞাবাণী'তে আছে।

গ্রন্থের আদিতে পণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী-লিখিত নগেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

—জীবানন্দ

বিদ্যাপীঠ (ছাত্রদের বার্ষিকী) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ বর্ষ (১৯৫৭-৫৮)। প্রকাশক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ও পুরুলিয়া।

সুমুদ্রিত সুচিত্রিত পত্রিকাখানি বিদ্যাপীঠের আনন্দমুখর জীবনের অভিব্যক্তি। বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত রচনার মাধ্যমে বর্তমানের সমস্যা চেয়েছে সমাধান আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝংকৃত হয়েছে শাশ্বত সুর। স্বরলিপি সহ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ-লিখিত 'বিদ্যাপীঠ-গীতি' বহু দিনের অভাব মিটাতে পারবে বলে মনে হয়। শিশু-বিভাগের 'কিশলয়' অংশের লেখাগুলি সরল ও সুনির্বাচিত।

মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

The Cultural Heritage of India—Volume-I (Early Phases)— published by Ramakrishna Mission Institute of Culture, 111, Russa Rd.—Calcutta-26. Pp. (652+64). Price Rs 35/-

১৯৩৬ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর পর স্মারকগ্রন্থরূপে 'The Cultural Heritage of India'—তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য দর্শনসাগরের সম্পাদনায় ১৯৫৩ খৃঃ তৃতীয় খণ্ড (Vol III —Philosphies) ও ১৯৫৬ খৃঃ চতুর্থ খণ্ড (Vol IV-Religions) প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন ভারত-কৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা শ্রীসর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন। সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত, ডক্টর শ্রীপুসলকার ও শ্রীনির্মলকুমার বসু। গ্রন্থের আদিতে রবীন্দ্র-লেখনীপ্রসূত 'Spirit of India' মহাগ্রন্থটিকে শুধু অলঙ্কৃতই করে নাই, উহার মাধ্যমে ভারতবাণী ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

এই খণ্ডটি চার ভাগে বিভক্ত, এবং ৩৩টি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে সমৃদ্ধ।

প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু **ভারতকৃষ্টির পটভূমিকা**ঃ পাঁচটি প্রবন্ধে ভূগোল, জাতি ও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া ভারতকৃষ্টির রূপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগে **প্রাগৈতিহাসিক ভারত**ঃ প্রস্তর-যুগ, মহেঞ্জোদাড়ো যুগ (সচিত্র ৮খানি প্লেট-সহ) প্রভৃতি চারটি প্রবন্ধ।

তৃতীয় ভাগে **বৈদিক সভ্যতা**ঃ ১২টি প্রবন্ধে বৈদিক কৃষ্টি সমাজ ধর্ম দর্শন কর্মকাণ্ড বেদাঙ্গ উপনিষদ্ প্রভৃতি আলোচিত।

চতুর্থ ভাগে **জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম**ঃ ১২টি প্রবন্ধে ঐ দুই ধর্মের ইতিহাস, মূলনীতি ও ভারতীয় জীবনে ইহাদের প্রভাব আলোচিত।

কয়েকখানি ম্যাপ, গ্রন্থপঞ্জী ও বিষয়সূচী থাকায় গ্রন্থখানি গবেষণাকারীদেরও ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে।

Eternal Values for a Changing Society

Swami Ranganathananda, published by Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas (Cal Office 4, Wellington Lane, Cal-13) Pp 244. Price Rs 3/-.

দিল্লী মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দের প্রদত্ত বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ কয়েকটি যুক্তির ক্রমবিকাশ অনুযায়ী এমনভাবে সাজানো হইয়াছে যে বর্তমান যুক্তিবাদী পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, নানা কারণে সমাজের পরিবর্তন হইলেও তাহার পিছনে শাশ্বত কতকগুলি ভাব রহিয়াছে, যাহার শক্তি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শক্তির উপরে ক্রিয়াশীল। পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সনাতন ধর্মের দার্শনিক-তত্ত্ব, উপনিষদ্ গীতা, বিভিন্ন অবতারের জীবন ও বাণী আলোচিত। দ্বিতীয় ভাগে—বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও ধর্ম, কল্যাণ-রাষ্ট্রের শাসক প্রভৃতি বিষয় আলোচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন বার্ষিক সভা

১৯৫৭ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী

গত ১৬ই নভেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে মঠ-প্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের সদস্য বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে বার্ষিক বিবরণী ও বার্ষিক আয়ব্যয় পঠিত হয়। পূজনীয় সভাপতি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া পরিশেষে মিশনের কর্মধারার অন্তর্নিহিত ভাব উল্লেখ করিয়া বলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মহা দায়িত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর উপর দিয়া যান। রামকৃষ্ণ মিশন তাহারই বহিঃপ্রকাশ।

৪৯তম সম্পাদকীয় বিবৃতিতে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে লোকবল আশানুরূপ না হওয়া সত্ত্বেও সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান ব্যতীত মিশনের প্রায় সর্বত্রই সাধারণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

নূতন নির্মাণ-কার্য

১৯৫৭ খৃঃ নিম্নোক্ত চারটি বহুমুখী (Multi-purpose) বিদ্যালয়ের ভবন-নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়: নরেন্দ্রপুর (আবাসিক), মেদিনীপুর, পুরুলিয়া (দেওঘর বিদ্যাপীঠের উপরের তিনটি শ্রেণী এখানে স্থানান্তরিত) এবং কলিকাতা নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

আলোচ্য বর্ষে নরেন্দ্রপুরে মোট ৭৫ একর জমির উপর বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্রাবাসের ভিত্তি, বৃন্দাবনে নূতন ২৩ একর জমির উপর সেবাশ্রমের আধুনিক ধরনের হাসপাতাল-ভবনের ভিত্তি, পূর্ব পঞ্জাবের নূতন রাজধানী চণ্ডীগড়ে তিন একর জমির উপর লাহোরের পরিত্যক্ত আশ্রমের পরিবর্তে নূতন আশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

বেলঘরিয়ায় ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল নির্মাণ-কার্য অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণ কলিকাতায় সেবা প্রতিষ্ঠান (শিশুমঙ্গল-বিভাগ স্বতন্ত্র) সাধারণ ১০০টি বেডসহ একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তরিত হইতেছে। কলিকাতা মাতৃভবনে একটি নূতন অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ খোলা হইয়াছে। রেঙ্গুন সেবাশ্রমের নূতন সার্জিক্যাল ব্লকের নির্মাণ-কার্য সমাপ্তপ্রায়। কৈম্বাতুরে গ্রাম্য উচ্চশিক্ষার কলেজ ও সমাজশিক্ষা-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লীকেন্দ্রে মন্দির-প্রতিষ্ঠাও এ-বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জামসেদপুরে এক বিরাট ভবনে মধ্য-যুক্ত-উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কালিকট-কেন্দ্রে দুইটি বড় নির্মাণ-কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছে—প্রথমটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয়টি কম্যুনিটি হল। ফিজিদ্বীপে নাদী-কেন্দ্রে শহরের উপকণ্ঠে প্রশস্ত উঁচু জমির উপর উচ্চবিদ্যালয়ের নূতন গৃহ নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ কলিকাতার 'কৃষ্টি প্রতিষ্ঠানে'র (Institute of Culture) নূতন বিরাট ভবনের নির্মাণ-কার্যের অগ্রগতি।

বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রধানকেন্দ্র বেলুড় ধরিয়া ১৯৫৭ খৃঃ ডিসেম্বরের শেষে মিশনের মোট ৭২টি কেন্দ্র ছিল, তন্মধ্যে ৮টি পূর্ব পাকিস্তানে, ২টি ব্রহ্মদেশে; ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল, মরিশাস ও ফ্রান্সে ১টি করিয়া; বাকী ৫৭টি ভারতে।

রাজ্যহিসাবে কেন্দ্র : ২৫টি পশ্চিমবঙ্গে, ৮টি মাদ্রাজে ; উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ৬টি করিয়া, আসামে ৪টি, অন্ধ্র ও ওড়িষ্যায় ২টি করিয়া, দিল্লী, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া।

এই কেন্দ্রগুলি ১০টি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল, ৫৩টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়, ২টি সাধারণ কলেজ, ১টি বি টি কলেজ, ২টি বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ১টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ১টি শারীর শিক্ষার কলেজ, ১টি সমাজশিক্ষক-শিক্ষণ-কলেজ, ১টি কৃষি-বিদ্যালয়, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ৫টি জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, ৪৬টি ছাত্রাবাস বা বিদ্যার্থী-আশ্রম, ৫টি অনাথাশ্রম, ৩টি চতুষ্পাঠী, ১৭টি বয়স্ক সমাজশিক্ষা কেন্দ্র, ৮টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ২০টি মাধ্যমিক (Secondary) বিদ্যালয়, ৩টি সিনিয়র বেসিক স্কুল, ১৩টি জুনিয়র বেসিক স্কুল, ৯৮টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫৮টি গ্রন্থাগার, মোট ৩৬২টি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছে।

কর্মধারা

মিশনের কাজকর্ম মোটামুটি পাঁচটি ধারায় প্রবাহিত : (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা (৪) সাহায্য ও (৫) কৃষ্টি।

(১) **রিলিফ :** ১৯৫৭ খৃঃ মাদ্রাজের মিশন কেন্দ্র হইতে নেলোর জেলায় বন্যার্তদের ও রামনাথপুরম্ জেলায় দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য করা হয়, ও ১৯৫৬ খৃঃ আরব্ধ তাঞ্জোর জেলার ঝঞ্ঝার্তদের পুনর্বাসন-কার্য এই বৎসর শেষ হয়। বোম্বাই ও রাজকোট আশ্রম মিলিতভাবে কচ্ছে ভূকম্প-পীড়িতদের পুনর্বাসন কার্য-পরিচালনা করে।

(২) **চিকিৎসা :** ১০টি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে মোট ৮১২টি বেডে ২৫,০২২ জন চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮,৫৯৫ ও বৃন্দাবন সেবাশ্রমে ৪,৬৯৩। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিয়াম ব্যবহার, বারাণসী ও বৃন্দাবনে মহিলা-বিভাগ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাঁচির নিকট ডুংরীতে যক্ষ্মা হাসপাতালে ১৭৭ বেডে এ বৎসর ১৭৬ জন নূতন রোগী ভরতি করা হয় এবং ১৪৭ জনকে চিকিৎসার পর বিদায় দেওয়া হয়। দিল্লী টি বি ক্লিনিকে ২৮টি বেডে ৫২৩ জনকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৫৩টি বহির্বিভাগীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোটের উপর ২৩,০১,৫০৮ জন রোগীর চিকিৎসায় স্থানকালপাত্র-ভেদে হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

(৩) **শিক্ষা :** মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা :

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
প্রথম শ্রেণীর কলেজ	১	১,৫৯১	
দ্বিতীয় „ „ (আবাসিক)	১	২০৮	
বি টি. „	১	৫০	
শারীর শিক্ষা „	১	১৫১	
বেসিক ট্রেনিং „	২	১২৩	
জুনিয়র „ „	১	৬০	
সমাজ শিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্র,	২	১৪৬	
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	৩	৫০৩	
জুনিয়র যন্ত্রশিল্প বিদ্যালয়	৫	৩৯১	৬১
বিদ্যার্থী আশ্রম	৪৬	২,১৭৭	৩৭
অনাথ আশ্রম	৫	৪৪৮	৫০
চতুষ্পাঠী	৩	৫৭	
সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র	১৭	৮৫৭	৭০
বহুমুখী বিদ্যালয়	৮	২,১৭৩	১৮৫
মাধ্যমিক „	২০	৯,৬০৩	৪,৬৭৫
সিনিয়ার বেসিক „	৩	৪২৭	১৭৪
জুনিয়ার „ „	১৩	১,৪২৯	৩৭১
নিম্নপ্রাথমিক „	৯৮	১০,৬০৩	৭,৪২১

(৪) **সাহায্য :** বেলুড় মঠ হইতে প্রদত্ত সাহায্য

	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত :	৮১	১৪৭	৭
সাময়িক :	২৫৭	৬৬	

এই সাহায্যের মোট পরিমাণ ২০,০০০৲ কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও এই প্রকার সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার পরিমাণ ৮,৬০০৲।

(৫) কৃষ্টি ঃ মিশনের প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়। ক্লাস, জনসভা, প্রকাশন প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের জনগণের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করা হয়।

এ সম্পর্কে কলিকাতার ইন্সটিটুট্ অব্ কাল্চার এবং দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বাহিরে

পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলির অবস্থা ভাল নয়—অদূর ভবিষ্যতে উহাদের উন্নতিরও বিশেষ আশা নাই। রেঙ্গুনে সেবাশ্রম ও সোসাইটি সমতালে উন্নতির পথে অগ্রসর।

সিংহলে বিভিন্নকেন্দ্রে ৪টি উচ্চ বিদ্যালয়সহ ২৫টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৭,৪৯০ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ২টি ছাত্রাবাস ও ৩টি অনাথাশ্রমে ২১৫ বালক ও ৫০ জন বালিকা ছিল।

সিঙ্গাপুরে ২টি মিডল স্কুলে ১২৫ বালক ও ১৭০ বালিকা এবং ছাত্রাবাসে ৫০ বিদ্যার্থী ছিল।

ফিজিদ্বীপে নাদীকেন্দ্র-পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩০০ বালক, ৬২ বালিকা এবং ছাত্রাবাসে ৭০ জন বিদ্যার্থী ছিল।

মরিশাস ও গ্রেজ (ফ্রান্স) কেন্দ্র ভাল-ভাবেই চলিয়াছে।

[অন্যান্য যে সকল কেন্দ্রের কথা এই বিবরণীতে নাই সেগুলি মিশন-কেন্দ্র নয়।]

কার্য-বিবরণী পাঠের শেষে সাধারণ সম্পাদক মহারাজ বলেন, এই কর্ম-বিস্তারের পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর শক্তি ও আশীর্বাদ কাজ করিতেছে। তথাপি আমাদের সতর্ক হইতে হইবে, পরিমাণ-গত বিস্তার সত্ত্বেও যেন কর্মের গুণগত মান অব্যাহত থাকে।

শ্রীশ্রীমায়ের 'গঙ্গা ঘাট'

জয়রামবাটী গ্রামের উত্তর প্রান্ত দিয়া আমোদর নদ প্রবাহিত, শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ গঙ্গা-জ্ঞানে একটি ঘাটে স্নান করিতেন। এই জন্য ভক্তগণের নিকট ইহা অতি পবিত্র স্থান। মায়ের শতবার্ষিক উৎসবের পর হইতে ভক্তেরা প্রতি বৎসর বাসন্তী শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ঘাটে স্নান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আসিতেছেন।

নদের যে স্থানে শ্রীশ্রীমা স্নান করিতেন স্রোতে সেই স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছিল বলিয়া সেখানে একটি পাকা ঘাট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গত মহালয়া তিথিতে বিষ্ণুপুরের মহকুমা-শাসক মহাশয় ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে কর্মিগণের সমবেত প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে গত ১৪ই অগ্রহায়ণ ইহার নির্মাণ-কার্য সমাধা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ ঐ দিবসই বিষ্ণুপুরের মহকুমা-শাসক ও বহু ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে, বিপুল জয়ধ্বনি শঙ্খ ও উলুধ্বনি সহ এই ঘাটের শুভ উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে ঘাটে সুসজ্জিত মণ্ডপে বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির পর উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়:

বলরাম-মন্দির ঃ নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী প্রতি শনিবার বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মাস	বিষয়	বক্তা
জুলাই	মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
	গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
	ভাগবতে সম্বন্ধ-তত্ত্ব	পণ্ডিত বিজপদ গোস্বামী
	যোগবাশিষ্ঠ	স্বামী জীবানন্দ
আগষ্ট	মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
	গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
	যোগবাশিষ্ঠ	„ জীবানন্দ
	রামকৃষ্ণ-কথকতা	„ পুণ্যানন্দ
	উপনিষদের বাণী	„ বোধাত্মানন্দ
সেপ্টেম্বর	শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম	„ জীবানন্দ
	চৈতন্যচরিতামৃত	পণ্ডিত বিজপদ গোস্বামী
	চণ্ডীর কথকতা	„ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
	মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
অক্টোবর	আনন্দময়ীর আগমনে	স্বামী নিরাময়ানন্দ

নরেন্দ্রপুরে ছাত্রাবাস উদ্বোধন

গত ৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতা হইতে দশ মাইল দূরে গড়িয়ায় নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবনির্মিত ছাত্রাবাস 'ব্রহ্মানন্দ ভবনে'র উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই।

এই নূতন ছাত্রাবাসে দুইশত ছাত্র থাকিতে পারিবে। মোট ছাত্রের শতকরা ৮০ ভাগই উদ্বাস্তু পরিবারের। প্রধানতঃ দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রগণ এখানে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ভরতি বিষয়ে অন্ধ ও অনগ্রসর শ্রেণী হইতে আগত ছাত্রদিগকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আসাম, ওড়িষ্যা, বিহার এবং উত্তর-প্রদেশের কতিপয় ছাত্রও এখানে আছে।

নূতন ভবন নির্মাণ করিতে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর হইতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীদেশাই তাঁহার ভাষণে এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের মহান আদর্শ এখানকার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হইবে এবং কর্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা তাহাদের জীবন সমুজ্জ্বল ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবে।

এতদুপলক্ষে আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক আশ্রমেরই অন্ধ শিক্ষক শ্রীভবানীপ্রসাদ চন্দ-রচিত 'ভারতের পুনর্গঠন' গীতিনাটিকা পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানের আদিতে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নাও একটি সুন্দর ভাষণে উদ্বাস্তু-সেবা-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে কলিকাতার ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণ যোগদান করেন।

সিঙ্গাপুর ও ফিজিদ্বীপে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

জাপানে নবম আন্তর্জাতিক ধর্মেতিহাস-সম্মেলনে যোগদান ও জাপানের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা-সফরের পর স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সিঙ্গাপুর ও ফিজিদ্বীপপুঞ্জে গমন করেন। এই উভয় স্থানেই রামকৃষ্ণ মিশন-কেন্দ্রের উদ্যোগে আহূত সভায় তিনি ধর্ম ও কৃষ্টি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সিঙ্গাপুরে তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী, রাজনীতিতে ধর্মের স্থান, বুদ্ধ—জগতের আলো, যীশুখৃষ্ট, নারীর অধিকার, শিল্পযুগে ধর্ম-জীবন, বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র এবং ভারতীয় চিন্তাধারা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৯ই অক্টোবর হইতে ১৪ই অক্টোবরের মধ্যে সিঙ্গাপুরে বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়। অতঃপর সিডনি হইয়া স্বামী রঙ্গনাথানন্দ অষ্ট্রেলিয়ার ২০০০ মাইল উত্তর-পূর্বে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিজিদ্বীপে গমন করেন ও এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়া সেখানে ইংরেজী, হিন্দী ও তামিল ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে ৩২টি বক্তৃতা দেন।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

নিউইয়র্ক ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী নিখিলানন্দ প্রথম ও তৃতীয় এবং স্বামী ঋতজানন্দ দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করেন :

সেপ্টেম্বর : হিন্দুধর্মের শক্তি, আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ, আত্মা ও অদৃষ্ট, সক্রিয় ধর্ম।

অক্টোবর : কর্ম ও স্বাধীন চিন্তা, কিরূপে মন পবিত্র করিতে হয়? ঈশ্বর—শাশ্বত মাতা, ধ্যান-জীবন।

স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি মঙ্গলবার 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' এবং স্বামী নিখিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ অধ্যাপনা করেন। দুর্গাপূজার সময় বিশেষ ভজন ও উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল।

সানফ্রান্সিস্কো : বেদান্ত সোসাইটি

প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় সমিতির ভাবণ-গৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন।

জুন — ভগবান বুদ্ধ ও বর্তমান মানুষ, আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ। মরণের পারে, কর্মের নিয়ম ও পাপের ধারণা, প্রজ্ঞা হইতে বজ্র, সাধকের জীবন, ব্যক্তি-মানস ও বিশ্ব-মানস। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত, বেদান্ত-মতে মানবের পরিণাম।

অক্টোবর — ঈশ্বরকে কিরূপে ভালবাসিব? মহাকাশ-যুগে মানুষ, সর্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন, অনুকরণ হইতে অনুভূতি। আচার্য শংকর তাঁহার অদ্বৈতবাদ, মাতৃপূজা। ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক শান্তি, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী, নৈরাশ্যের ঔষধ।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রতি রবিবার ছোটদের মধ্যে সকল ধর্মের উদার সর্বজনীন সাধারণ ভাবগুলি সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী অশোকানন্দ ধর্মজীবন-গঠনে আগ্রহশীল তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণকে ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ দেন।

বিবিধ সংবাদ

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী

গত ২০শে নভেম্বর হইতে সপ্তাহকাল ধরিয়া বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম-শতবার্ষিকী বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতা বসুবিজ্ঞান-মন্দিরে মহা উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। উদ্বোধন-ভাষণে আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া শ্রীনেহরু মন্তব্য করেন —জগদীশচন্দ্রে বিজ্ঞান ও আত্মিক মূল্য-বোধের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। উদ্বোধন-উৎসবে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ এবং কলিকাতায় অবস্থানকারী বিভিন্নদেশের কনসালগণ উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, কানাডা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিজ্ঞান-গবেষণা-সংস্থার পক্ষ হইতে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অপরাহ্নে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁহার বক্তৃতায় আচার্য বসুর উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যান্য দিনে বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে অধ্যাপক সত্যেন বসু—'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা', প্রমথনাথ বিশী—'জগদীশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য', অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু—'জগদীশচন্দ্রের ভারত-পরিক্রমা', শ্রীপুলিনবিহারী সেন—'জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ', অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী—'জগদীশচন্দ্র' বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন।

এই শতবার্ষিকী-উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় ব্যবহৃত যন্ত্রাদির প্রদর্শনী ও তাঁহার জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র।

কার্য বিবরণী

আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম : ১৯৪৪ খৃঃ শহরে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আরব্ধ হইয়া আশ্রম একটি গ্রন্থাগার ও একটি দাতব্য

চিকিৎসালয় চালাইতেছে। ১৯৪৯ খৃঃ উক্ত স্থানে আশ্রমের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৫০ খৃঃ শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে আশ্রমের উদ্বোধন হয়। ১৯৫৪ খৃঃ শুক্লাদ্বিতীয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর-মূর্তি নব-নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ আশ্রমে গ্রন্থাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও দুইটি নূতন পৃথক্ ভবন নির্মিত হইয়াছে। লাইব্রেরির হলে স্বামীজীর ধ্যানস্থ মর্মর-মূর্তি এবং ঔষধালয়-গৃহের প্রাঙ্গণে একটি মন্দিরে স্বামীজীর মর্মর চিকাগো-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৫৭ খৃঃ আশ্রম-পরিচালিত দুইটি চিকিৎসালয়ে ১২,৭০৯ জন চিকিৎসালাভ করেন। দুইটি গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা মোট ৩,৪০৯। ৭ খানি দৈনিক, ১৫ খানি মাসিক এবং ৫ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। ৪,১৫২ খানি পুস্তক পাঠার্থ চলাচল করে। আশ্রমে একটি ছাত্রাবাসে দুইজন দরিদ্র ছাত্র থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতির জন্মতিথি যথারীতি প্রতিপালিত হয়। আশ্রমে সাপ্তাহিক রামনাম-সংকীর্তন ও শাস্ত্রালোচনা এবং বিভিন্ন জায়গায় জনসভাদির আয়োজন করা হয়।

উজ্জয়িনীতে কালিদাস-জয়ন্তী

সম্প্রতি উজ্জয়িনীতে যে কালিদাস-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত কালিদাস-বিষয়ক পাঁচটি সংস্কৃত সঙ্গীত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সমাগত সুধীমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করে। এই সঙ্গীতালেখ্যের প্রারম্ভে ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী কালিদাসের দর্শন সম্বন্ধে এবং ডক্টর চৌধুরী কালিদাসের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে কথকতার আকারে ভাষণ প্রদান করেন। এই জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কবিসম্মেলনেও তাঁহারা যোগদান করেন।

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার

১৯৫৮ খৃঃ শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন—বেলজিয়ামের ডমিনিক্যান ফাদার জর্জেস পায়ার (Father Georges Pire) গত মহাযুদ্ধের পর হইতে নিজের চেষ্টায় ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে তিনি যুদ্ধে উদ্বাস্তুদের জন্য পুনর্বাসন পল্লী স্থাপন করিয়াছেন। নোবেল পুরস্কারের ১৪,৮০০ পাউণ্ড তিনি নূতন একটি পুনর্বাসন-পল্লী নির্মাণে নিয়োজিত করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ১০৬তম শুভ জন্মতিথি আগামী ১৬ই পৌষ, ১লা জানুআরি, ১৯৫৯—বৃহস্পতিবার বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।